দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস

রাজনৈতিক কূটনৈতিক ও সামরিক

[তৃতীয় খণ্ড]

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়



নবভারত পাবলিশার্স
৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ : ভাদ্র, ১৩৬৭

প্রকাশক : শ্রীরণজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯

মুদ্রক : প্যারট প্রেস, ১২ নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার, কলিকাতা ৯

উৎসর্গ

'মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হবো শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না—'

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম

—১৯২২ সালে হুগলী চুঁচুড়াতে যাঁর সঙ্গে আমার জীবনের প্রথম সাক্ষাৎ ও গভীর স্নেহের স্পর্শ আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে, তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকা

নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। এই তৃতীয় খণ্ডেই মহাযুদ্ধের সম্পূর্ণ ইতিহাস শেষ হয়ে গেল। এই তৃতীয় খণ্ডে আগের দুই খণ্ডের মতই মহাযুদ্ধের রণনীতি, রাজনীতি ও মানবিক দিকসংক্রান্ত বহু রোমাঞ্চকর, উত্তেজনাপ্রদ এবং মর্মান্তিক ঘটনাবলীর সমাবেশ ঘটেছে। এই খণ্ডে এমন সমস্ত তথ্য আছে, যা আমাদের দেশে অন্ততঃ বাংলা ভাষায় আগে কখনও প্রকাশিত হয়নি। সমগ্র ইতিহাস অপক্ষপাতভাবে রচনার জন্য এমন সমস্ত পুস্তক বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, যেগুলি আমাদের সুবিখ্যাত ন্যাশনাল লাইব্রেরীতেও প্রাপ্তব্য নয়। প্রত্যেকটি ঘটনাকে নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক করার জন্য পাদটীকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, মহাযুদ্ধের এই ইতিহাস রচনায় পৃথিবী প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের গ্রন্থগুলিরই সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং ত্রিশ বছরের অধিক কাল আমার কেটেছে মহাযুদ্ধের তথ্যাবলীর পিছনে। আশা করি আমার সেই পরিশ্রম একেবারে বৃথা যায়নি।

জার্মানী ও জাপানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্যে এই মহাযুদ্ধের ইতিহাস সম্পূর্ণ হলো নবম ও দশম পর্বে। অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের মে ও আগষ্ট মাসে নাৎসী জার্মানী ও জঙ্গীবাদী জাপানের চূড়ান্ত পরাজয়ের মধ্যে দশটি পর্বে বিভক্ত এই মহা নাটকীয় ইতিহাসের যবনিকা পড়লো। কিন্তু যবনিকা পড়ার আগে পাঠকবর্গ প্রত্যেকটি অঙ্কে এমন সমস্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন, যেগুলি রোমহর্ষক। যেমন, নবম পর্বের গোড়াতেই রাইন নদী অতিক্রম ও বার্লিন দখল নিয়ে প্রচণ্ড বিতর্কের ঢেউ উঠেছিল। কিন্তু চার্চিলের অপরিসীম আগ্রহ ও কূটবুদ্ধি সত্বেও বার্লিন নগরী ইঙ্গ-মার্কিন দখলে গেল না, গেল ষ্ট্যালিনের লালফৌজের দখলে! চার্চিল অনেক দিন পর্যন্ত এই 'শোক' ভুলতে পারেননি, যার ফলে যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে 'গ্রেট কোয়ালিশন' ভেঙে গেল এবং ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূত্রপাত হল

মার্শাল জুকোভ, মার্শাল কোনেভ, মার্শাল রকোসোভোস্কি প্রভৃতি খ্যাতনামা সোভিয়েত সেনাপতিদের নেতৃত্বে এবং সুপ্রিম কমাণ্ডার-ইন-চিফ মার্শাল ষ্ট্যালিনের নির্দেশে লালফৌজের দুর্দমনীয় বার্লিন অভিযান যে কোন যুগে সামরিক ইতিহাসের পক্ষেই অত্যন্ত স্মরণীয় ঘটনা। হিটলার তখন বার্লিনের ভূগর্ভে আশ্রম আশ্রয়ে এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি পরাজয় স্বীকারে অসম্মত ছিলেন। পরাজিত জাতির বেঁচে থাকার যে অধিকার নেই, এমন মনোভাব প্রকাশ করে হিটলার তার স্বদেশবাসীকে ধ্বংস ও অপমৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতেও বিবেকের বিন্দুমাত্র দংশন অনুভব করেননি। অবশেষে নিরুপায় ও হতাশ হিটলার ভূগর্ভের সেই সুরক্ষিত আশ্রয়ে প্রণয়িনী ইভা ব্রাউনসহ আত্মহত্যা করলেন। অবশ্য তার আগেই তাঁর ফ্যাসিষ্ট মিতা মুসোলিনীও তাঁর উপপত্নি ক্লারা পেতাচ্চিসহ ইতালিয়ান গেরিলাদের (কমিউনিষ্ট) হাতে ধৃত ও নিহত হয়েছিলেন। হিটলার তাঁর জীবনের অন্তিম লগ্নে তাঁর একান্ত

সুহৃদের এই ভয়াবহ মৃত্যুর কথাও শুনে গিয়েছিলেন। ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটর দব অত্যাচারের রাজত্ব যে ভয়াবহ ট্রাজিডির মধ্যে শেষ হয়েছিল, পাঠকবর্গ এই পুস্তকে সেই করুণ দৃশ্যেরও রেখাচিত্র পাবেন।

এরপর জাপানের পালা। যদিও রুজভেল্টের মৃত্যুর পর ট্রুম্যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নূতন প্রেসিডেন্টরূপে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা ও সহযোগিতা বজায় রাখতে উৎসুক ছিলেন না, তবু জাপানকে পরাজিত করার জন্য সোভিয়েত রাশিয়া সাহায্য না নিয়েও উপায় ছিল না। কিন্তু আমেরিকা কর্তৃক এ্যাটোমিক বোমা নির্মাণ ও প্রলয়ঙ্কর পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কারের পর এই মনোভাবেরও বদল হয়ে গিয়েছিল। তবু ঐতিহাসিক পটসডাম সম্মেলনে ব্রিটিশ, মার্কিন ও সোভিয়েত এই তিন মহাশক্তির সহযোগিতা অক্ষুণ্ণ রইল এবং জাপানের উদ্দেশ্যে চরমপত্র ঘোষিত হলো।

পারমাণবিক শক্তি ও পারমাণবিক বোমার আবিষ্কার এবং পরীক্ষা সম্পর্কে যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্য বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যে বিবরণীতে পাওয়া যাবে ঐ কালান্তক বোমার জনক সুপণ্ডিত ও শ্রীমদ্ভগবদগীতা ভক্ত-বিজ্ঞানী ওপেন হাইমারের বিচিত্র কাহিনী। এই অধ্যায়টি রচনায় একজন বিশিষ্ট বাঙালী বিজ্ঞানীর (ড ধ্রুব মার্জিত) সুলিখিত প্রবন্ধের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। এই জন্য তাঁর কাছে আমি ঋণী।

দেশপ্রেমিক ও সাম্রাজ্যগর্বী জাপানের আত্মসমর্পণকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত উত্তেজনাপূর্ণ নাটকীয় ঘটনার সমাবেশ হয়েছিল, সেগুলির বিস্তৃত বিবরণ আগে আমাদের দেশে জানা ছিল না—যেমন, স্বয়ং সম্রাটকে গ্রেপ্তার ও বন্দী করার জন্য উগ্র মস্তিষ্ক তরুণ জাপানী সৈন্যেরা এক চাঞ্চল্যকর ষড়যন্ত্র করেছিল। যে দেশে সম্রাটকে ভগবানের মত ভক্তি করা হয়ে থাকে, সেই দেশে তাঁকেই গ্রেপ্তারের ষড়যন্ত্র মারাত্মক বৈকি ?

ন্যুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং বাঘা বাঘা নাৎসী রণনায়কদের প্রাণদণ্ড দানের কাহিনী যেমন ঐতিহাসিক কারণেই উল্লেখযোগ্য, তেমনি প্রণিধানযোগ্য দূরপ্রাচ্যের আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং সেই প্রসঙ্গে ভারতের (বাংলার) সুপ্রসিদ্ধ আইন বিশেষজ্ঞ বিচারপতি ড রাধাবিনোদ পালের ভিন্ন অভিমত জ্ঞাপকে যে রায় সেদিনের আন্তর্জাতিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের প্রকাশিত বিবৃতিটি প্রামাণিক এবং তথ্যবহুল। পুস্তকের শেষের দিকে এই গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতিটি পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য একটি পৃথক অধ্যায়ের (একাদশ) আকারে দেওয়া হয়েছে—যাতে মহাযুদ্ধের ভারত ও ভারতীয় বাহিনীর অংশ গ্রহণ সহজেই উপলব্ধি করা যেতে পারে।

এই তৃতীয় খণ্ডে মহাযুদ্ধের উপসংহার টানা হয়েছে এবং যুদ্ধরত পৃথিবী ও যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর একটা রূপরেখার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এই আন্তরিক আশা ব্যক্ত করা হয়েছে যে মানুষ যেন আর এই পাশবিক ও মানবিক হত্যাকাণ্ডের শিকার না হয়।

এই পুস্তক রচনায় যে সমস্ত গ্রন্থ, সাময়িক পত্র, পুস্তিকা ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে, সেই সমস্ত গ্রন্থাগার, লেখক ও প্রকাশক এবং সম্পাদকদের নিকট অকপটে ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। পাদটীকায় সেই সমস্ত গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে বলে পৃথক কোন গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হলো না।

এই তৃতীয় খণ্ডের শেষে সমগ্র বইয়ের নির্দেশিকা বা ইনডেক্স দেওয়া হয়েছে এবং এটি বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নপূর্ব্বক রচনা করেছেন আমার প্রীতিভাজন শ্রীমান গৌতম সান্যাল। এই বইয়ের প্রচ্ছদপট অঙ্কন করেছেন শ্রীমান পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। এদের দুজনই ধন্যবাদের পাত্র। আর বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই সাক্ষরতা প্রকাশনের শ্রীমান পার্থ সেনগুপ্ত ও শ্রীমতি স্বপ্না দেবকে, যারা অগ্রণী হয়ে এই বৃহৎ পুস্তক প্রকাশের সাগ্রহ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রণে ও প্রকাশে সহায়তা করার জন্য প্রাক্তন কর্মী শ্রীমান কেশব আড্ডুকে এবং তৃতীয় খণ্ডের জন্য শ্রীমনোতোষ সরকারকে ধন্যবাদ জানাই এবং মানচিত্রের ব্যাপারে শিল্পী শ্রীঅজয় গুপ্তকে আমার আন্তরিক সাধুবাদ। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, যুগান্তর পত্রিকায় আমার পরলোকগত সহকর্মী মানচিত্র-শিল্পী অনিল মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত কয়েকটি ম্যাপ এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ব্যবহার করা হয়েছে। এজন্য তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

বলাবাহুল্য যে, তাড়াহুড়ার মধ্যে এবং দীর্ঘস্থায়ী লোডশেডিং-এর বিড়ম্বনার জন্য এই মহাযুদ্ধের ইতিহাস শেষ করতে গিয়ে কিছু কিছু মুদ্রণপ্রমাদ ঘটেছে, যার জন্য পাঠকদের কাছে আন্তরিক ভাবেই ক্ষমাপ্রার্থী।

বর্তমান বিংশ শতকের পরিবর্তিত পৃথিবী যেন এক স্বতন্ত্র জগৎ। এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনে পশ্চাৎপট বুঝিবার পক্ষে যদি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এই ইতিহাস পাঠকদের কিছুমাত্র সহায়তা করে, তবে নিজেকে ধন্য মনে করব।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

শিবির
১৩২ নগেন্দ্রনাথ রোড
কলকাতা—২৮
সেপ্টেম্বর, ১৯৭৮

সূচীপত্র

নবম পর্ব

নাৎসী জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ

[মে, ১৯৪৫]

দশম পর্ব

জাপানের আত্মসমর্পণ এ্যাটম্ বোমার আবির্ভাব

[মহাযুদ্ধের অবসান—আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫]

সব চেয়ে দীর্ঘ সম্মেলন; জার্মানীতে চতুঃশক্তির দখলদারিত্বে অ'নয়ন; জার্মানীর খণ্ডন রহস্য ও ক্ষতিপূরণের দাবী, নূতন পোল্যাণ্ডের প্রতিষ্ঠা; নাৎসী বাদ উচ্ছেদের সঙ্কল্প; এ্যাটম্ বোমার পটভূমিকায় পটসডাম সম্মেলন; জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় রাশিয়ার সহযোগিতা আর অত্যাবশ্যক নয়; রাশিয়ার বিরুদ্ধে পারমাণবিক কূটনীতি; ষ্ট্যালিনের কাছ থেকে এ্যাটম্ বোমা আবিষ্কারের খবর গোপন; চার্চিল-ট্রুম্যানের আনন্দ; পতনের মুখে জাপান; দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে দুরন্ত মার্কিন অভিযান, ওকিনাওয়া ইত্যাদি দখল; খাস জাপানী দ্বীপে মার্কিন বিমান হানা; অভূতপূর্ব গোপনীয়তার মধ্যে অ্যাটম বোমার নির্মাণ; প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের ভয়ঙ্কর দৃশ্য; 'আকাশে সহস্র সূর্যের উদয়'—বোমার জনক ওপেনহাইমার কর্তৃক গীতার শ্লোক আবৃত্তি; ৬ই আগষ্ট হিরোশিমায় প্রথম পারমাণবিক বোমা বর্ষণ; দ্বিতীয় বোমা বর্ষণ নাগাশাকিতে; এ্যাটম বোমার বর্বরতায় সারা পৃথিবী স্তম্ভিত; রাশিয়া কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী বাহিনীর বিদ্যুৎগতি পরাজয়; রাশিয়া কর্তৃক এ্যাটম বোমার খবর গোড়ার দিকে গোপন, চীন ও জাপান সম্পর্কে স্ট্যালিনের কূটনীতি; জাপানের বিরুদ্ধে ইঙ্গ মার্কিনের চরম পত্র; চরম পত্রের জবাবে ভাষাগত বিভ্রান্তি, জাপ সম্রাটের মর্যাদার প্রশ্ন; আত্মসমর্পণে জাপানের সম্মতি; ক্রুদ্ধ তরুণ সেনানীদের জাপ সম্রাটকে গ্রেপ্তারের ষড়যন্ত্র; মার্কিন যুদ্ধজাহাজে জাপানের আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর; জেনারেল ম্যাক-আর্থারের নেতৃত্ব, জাপানে আত্মহত্যার হিড়িক; জাপানের আত্মসমর্পণের সংবাদে আমেরিকায় উচ্ছৃঙ্খলতার দৃশ্য; খাস জাপানে নারীদের উপর বলাৎকার; ন্যুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, কয়েক জন বাঘা বাঘা নেতার প্রাণদণ্ড, দূরপ্রাচ্যের আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার; জাষ্টিস্ রাধাবিনোদ পালের ভিন্ন রায়, মহাযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে বৃটিশ সরকারী বিবৃতি; উপসংহার—হতাহতের তালিক ও অন্যান্য তথ্য—পারমাণবিক অস্ত্রবৃদ্ধির পরিণাম ভয়ঙ্কর; আর যুদ্ধ চাই না। [পৃঃ ১৩০-১৩০৩]

নবম পর্ব

প্রথম অধ্যায়

ইঙ্গ-মার্কিন বিতর্কে বার্লিন ঃ রাইন নদী অতিক্রম

১৯৪৫ সালের মে মাসে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের উপর যে যবনিকা পড়িল তার আগে পশ্চিম দিক থেকে ইঙ্গ-মার্কিন-কানাডীয় মিত্রবাহিনীর জার্মানির অভ্যন্তরে অভিযান এবং পূর্বদিকে ওডের নদীর সেতুমুখ থেকে মাত্র ৩০।৪০ মাইল দূরবর্তী বার্লিনের দিকে লালফৌজের অভিযান—এই দুইটিকেই মহাযুদ্ধের শেষ অঙ্ক বলা যাইতে পারে। অবশ্য এই শেষ অংকের চূড়ান্ত আঘাত হানিয়াছিল সোভিয়েত বাহিনী খাস বার্লিন শহরে, যেখানে ভূগর্ভের পাতালপুরীর আশ্রয়ে হিটলার তাঁর শেষ শয্যা রচনা করিয়াছিলেন এবং প্রায় একই সময়ে ইতালীর ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটর মুসোলিনী চরম দণ্ড লাভ করিয়াছিলেন ইতালীয় গেরিলা যোদ্ধাদের হাতে।…

পশ্চিম ইউরোপ থেকে মিত্র বাহিনী ১৯৪৪-এর শেষ ভাগে রাইন নদীর ধারে পৌঁছিয়াছিলেন। কিন্তু আর্দানেস অঞ্চলে ডিসেম্বর মাসে হিটলারের অপ্রত্যাশিত পাল্টা-আক্রমণে মিত্র বাহিনী বিষম জব্দ হইয়াছিল এবং সেই আকস্মিক প্রচণ্ড আক্রমণের ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে মিত্র বাহিনীর যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। তখন পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের সুপ্রীম কমাণ্ডার আইজেনহাওয়ারের সদর দপ্তর (Supreme Headquarters of the Allied Expetitionary Forces—সংক্ষেপে SHAEF) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল পুরাতন ও প্রসিদ্ধ রেইমস্ (Reims) শহরে। উত্তর-পূর্ব ফ্রান্সের এই অঞ্চলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অনেক যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়া গিয়াছে এবং অতীতে ফ্রান্সের রাজন্যবর্গের অভিষেক উৎসব এখানেই অনুষ্ঠিত হইত। সুতরাং মিত্রপক্ষের সুপ্রীম কমাণ্ডারের প্রধান শিবির-অঞ্চলের একটা ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ছিল বৈকি এবং সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে শেষ অভিযানের কাহিনীও যুক্ত হইল। হিটলারী নাৎসী বর্বরতার বিরুদ্ধে বৃটেন, আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার যে গ্রাণ্ড কোয়ালিশন সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই কোয়ালিশনের মধ্যে যুদ্ধের এই শেষ পর্যায়ে মতভেদ এবং বিরোধও কম হয় নাই—যদিও ভাগ্যক্রমে যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে কোয়ালিশন ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। কিন্তু এই মতভেদ ও বিরোধ দেখা দিয়াছিল একদিকে বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে এবং অন্যদিকে রাশিয়ার সঙ্গে রণনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় প্রশ্নে।

কয়েক মাস আগে পশ্চিম রণাঙ্গনে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টির পরিকল্পনার সময় সম্মিলিত সেনানীমণ্ডলীর প্রধানদের পক্ষ থেকে একটি মাত্র বাক্যে সুপ্রীম কমাণ্ডারকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল :

'আপনি ইউরোপীয় মহাদেশে প্রবেশ করবেন এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (ইউনাইটেড নেশন্স) অন্যান্যের সহিত একযোগে জার্মানীর মর্মস্থান লক্ষ্য করে ও সশস্ত্র বাহিনীগুলির ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে রণক্রিয়া অবলম্বন করবেন।'

এই দায়িত্ব তিনি যথাসম্ভব কৃতিত্বের সঙ্গেই পালন করিয়াছিলেন। তথাপি পশ্চিমী ঐতিহাসিকদের অনেকের কাছেই আইজেনহাওয়ার সমালোচনার পাত্র হইয়াছিলেন। কারণ, তিনি রাজনীতি নিয়া মাথা ঘামান নাই, ৫৫ বছর বয়স্ক আইক ইউরোপীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী বৃটিশ সেনাপতিদের মত রাজনৈতিক লক্ষ্যকে সামরিক রণনীতির অঙ্গীভূত বলে মনে ক'রতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি শুধু যুদ্ধজয় চাহিয়াছিলেন এবং রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি রাখিয়া দিয়াছিলেন রাষ্ট্রনেতাদের জন্য। 'যুদ্ধোত্তর জার্মানীর রাজনীতি সংক্রান্ত কোন নির্দেশ তাঁকে কখনও দেওয়া হয় নাই।' আইক তাঁর প্রতি প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পর্কে বলিয়াছিলেন- 'আমার কাজ ছিল খুব তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করা এবং যথাসম্ভব দ্রুত জার্মান আর্মিকে ধ্বংস করা।'—(১)

কিন্তু বার্লিন কে আগে দখল করিবে, ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ কিংবা সোভিয়েত রাশিয়ার সৈন্যদল? এই বিতর্ক উত্থাপন করিলেন বৃটিশ পক্ষ। ৫৮ বছর বয়স্ক বৃটিশ সেনাপতি খ্যাতিমান ফিল্ড মার্শাল মন্টগোমারী এবং ইম্পিরীয়েল জেনারেল স্টাফের প্রধান ফিল্ড মার্শাল স্যার অ্যালান ব্রুক বার্লিন দখলের রাজনৈতিক গুরুত্ব বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং একটী মাত্র বিদ্যুৎগতি আঘাতের দ্বারা (lightning-like single thrust) বার্লিন পর্যন্ত দখল ও যুদ্ধ শেষ করার দাবী জানাইয়া আসিতে-ছিলেন। বলা বাহুল্য যে, এর পিছনে সেরা মস্তিষ্ক ছিল স্যার উইনষ্টোন চার্চিলের, সেদিনের সারা পৃথিবীতে যাঁর মত কূটনৈতিক রণনীতিবিদ্ আর কেউ ছিলেন না। সুতরাং প্যারিস পুনরায় দখলের পরেই চার্চিলের পৃষ্ঠপোষিত ও প্রশংসিত মণ্টগো-মারী ২১তম আর্মি গ্রুপের দ্বারা জার্মানীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য জেনারেল আইজেনহাওয়ারের কাছে দাবী জানাইলেন। আইকের নিকট দাখিল করা এক স্মারকলিপিতে মণ্টি মন্তব্য করিলেন যে, আইজেনহাওয়ারের প্রস্তাবিত ব্রড ফ্রন্ট বা একাধিক রণক্ষেত্রে যুদ্ধ চালাইবার মত উপযুক্ত উপকরণ ও সমর-সম্ভার তখন পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছে নাই। সুতরাং সমস্ত শক্তি দিয়া একটি মাত্র রণাঙ্গনে আক্রমণের দ্বারাই যুদ্ধ শেষ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। অবশ্য উপকরণ জুটিলে অন্যান্য রণাঙ্গনেও আঘাত দেওয়া সম্ভব। কিন্তু মার্কিন মহলের ধারণা মন্টির প্রস্তাবিত দুইটি আর্মি গ্রুপের ৪০ ডিভিসন সৈন্য নিয়া এই ধরনের আক্রমণের সঙ্কল্প যেন একটা জুয়ার মত। কারণ, চূড়ান্ত জয়ের কোন নিশ্চয়তা নাই এবং এই জয় অর্জিত না হইলে অপূরণীয় ক্ষতি ও বিপর্যয়কর পরিণাম ঘটিতে পারে। অর্থাৎ সুপ্রীম কমাণ্ডারের কাছে এই প্রকার যুদ্ধে সাফল্যের চেয়ে বিপদের ঝুঁকি বেশী মনে হইল এবং সেই ঝুঁকি নিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। আইকের রণনীতির মর্ম ছিল আগে আরও সরবরাহের ব্যবস্থা করা—লে হাভর (Le Havre) এবং এণ্টোয়ার্প বন্দর মুক্ত করা এবং তারপর চওড়া রণাঙ্গনে জার্মানীর ভিতর দিয়া আগাইয়া যাওয়া। কিন্তু

(১) **The Last Battle—Cornelius Ryan, p. 197. Pocket Book edition, 1966, New York.**

বার্লিন অভিযানের আগে রাইন নদীর দুরূহ বাধা অতিক্রমপূর্বক রুড়ের বিখ্যাত শিল্পাঞ্চল দখল করা।

১৯৪৪, সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে যে সমস্ত মত বিনিময় হইল, সেগুলিই এক সপ্তাহ পর আইজেনহাওয়ার তাঁর তিন সেনাপতি মণ্টগোমারী, ব্রাড্‌লি ও ডেভার্সের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া জানাইয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, বার্লিনও আমাদের লক্ষ্য বটে, সেখানে শত্রুসৈন্যের সমাবেশও সর্বাধিক ঘটিবে। সুতরাং আমাদের সমস্ত সম্পদ সেদিকেই নিয়োগ করিতে হইতে পারে। কিন্তু একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে, আমাদের রণনীতিকে রুশদের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। সুতরাং বিকল্প উদ্দেশ্য ভাবা দরকার। যেমন, উত্তর জার্মানীর বন্দরগুলি আগে দখল করার প্রয়োজন হইতে পারে বার্লিন যুদ্ধের পার্শ্বদেশ রক্ষা করার জন্য। এমন কি লাইপজিগ-ড্রেসডেন এবং দক্ষিণ জার্মানীর দিকেও অভিযানের প্রয়োজন হইতে পারে।

মার্কিন লেখকদের মতে আইজেনহাওয়ারের 'ব্রড ফ্রন্ট পলিসি' ভুল হোক, আর শুদ্ধই হোক, তিনি ছিলেন পশ্চিম রণাঙ্গনের সুপ্রীম কমাণ্ডার। সুতরাং তাঁর হুকুম মানিতেই হইবে। কিন্তু আইজেনহাওয়ার এই দিক দিয়া বিষম হতাশা বোধ করিলেন। এদিকে বৃটিশ মহলে সেনাপতি হিসাবে মণ্টির জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি ছিল অসাধারণ। সুতরাং তিন মাসের মধ্যে যুদ্ধ খতম করার যে পরিকল্পনা তিনি করিয়াছিলেন, সুপ্রীম কমাণ্ডারের নিকট সেটা গৃহীত না হওয়ায় মণ্টি ক্ষুব্ধ হইলেন।

১৯৪৪ সালের শরৎকালে দুই সেনাপতির মধ্যে এই রণনৈতিক বিরোধের আরম্ভ কখনও সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত হয় নাই। বরং আর্দানেস অঞ্চলে জার্মানীর পাল্টা-আক্রমণের (ডিসেম্বর ১৯৪৪) ফলে এই বিরোধ যেন বিস্ফোরণের আকার ধারণ করিল। কারণ, এই আকস্মিক হিটলারী আক্রমনে ইঙ্গ-মার্কিণ ফ্রন্ট দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গেল। সুতরাং আইক বাধ্য হইলেন উত্তর স্ফীতিমুখের সমস্ত সৈন্য মণ্টগোমারীর নেতৃত্বাধীনে আনিতে। অর্থাৎ জেনারেল ব্রাড্‌লির ১২নং আর্মিগ্রুপের বারো আনাই (১নং ও ৯নং মার্কিনবাহিনী) মণ্টির পরিচালনাধীনে দিতে হইল।

এরপর আরও ঘোরালো অবস্থার উদ্ভব হইল। স্ফীতিমুখের যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জার্মানদের পশ্চাতে হটিবার পর মণ্টগোমারী একটি প্রেস কনফারেন্সে এমন ভঙ্গী দেখাইলেন যে, যেন তিনি একক হস্তে আমেরিকানদের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করিয়াছেন। অবশ্য উত্তর ও পূর্বদিক থেকে মণ্টির পাল্টা আঘাত খুব দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি মার্কিনদের উদ্ধারকর্তা ছিলেন না। অধিকন্তু তিনি এই সাংবাদিক বৈঠকে বিশিষ্ট মার্কিন সেনাপতি ব্রাড্‌লি, প্যাটন প্রভৃতির নাম একবারও উল্লেখ করিলেন না। অথবা প্রত্যেকটি ইংরেজ সৈন্যর জন্য ৩০ থেকে ৪০ জন মার্কিন সৈন্যকে যে লড়িতে হইয়াছিল কিংবা প্রত্যেকটি বৃটিশ সৈন্যের জন্য ৪০ থেকে ৬০ জন আমেরিকান সৈন্য যে হতাহত

হইয়াছিল, সে কথাও মন্টি উল্লেখ করিলেন না। অথচ স্বয়ং চার্চিল ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্কের এই গুরুতর অবনতিতে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া ১৮ জানুয়ারী ১৯৪৫, কমন্সসভায় যে বক্তৃতা দিলেন, তাতে তিনি আক্ষেপের সঙ্গে উল্লেখ করিলেন যে, আর্দেনেসের প্রায় সমস্ত যুদ্ধটাই করিয়াছেন আমেরিকানরা এবং দুষ্ট লোকদের প্ররোচনায় না ভুলিবার জন্য তিনি বৃটিশ জনমতকে সাবধান করিয়া দিলেন। উপরের উদ্ধৃত সৈন্য সংখ্যাও চার্চিলের দেওয়া)।(২)

বৃটিশ-মার্কিণ সম্পর্কের এমন অবনতি আর কখনও ঘটে নাই। 'মন্টিকে প্রমোশন দাও'—এই মর্মে যে প্রোপাগাণ্ডা শুরু হইয়াছিল তাতে মার্কিন সেনাপতি ব্রাড্‌লি ও প্যাটন উভয়েই আইজেনহাওয়ারকে জানাইলেন যে, যদি ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারীকে স্থল বাহিনীর ফিল্ড কমাণ্ডার পদে নিয়োগ করা হয়, তবে তাঁরা পদত্যাগ করিবেন। অবস্থা এমন গুরুতর আকার ধারণ করিল যে, সুপ্রীম কমাণ্ডারের নিকটও তা' অসহ্য মনে হইল। সুতরাং তিনি এর একটা হেস্তনেস্ত করিতে চাহিলেন। তিনি সম্মিলিত সেনানীমণ্ডলীর দপ্তরে সমস্ত বিষয়টি পেশ করিয়া মণ্টগোমারীকে অপসারণের কথা চিন্তা করিলেন।

এদিকে মন্টির সেনানীমণ্ডলীর অধিকর্তা জেনারেল ডি গুইনগাণ্ড (de Guingand) আসন্ন বিস্ফোরণের কথা জানিতে পারিয়া বিপদ গণিলেন। তিনি দ্রুত আইকের সদর দপ্তরে গিয়া হাজির হইলেন এবং সেখানে স্তম্ভিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, আইক এই মর্মে ওয়াশিংটনে এক বার্তা পাঠাইতেছেন যে, "হয় মন্টি থাকবে, কিংবা আমি থাকবো।" ('It is either me or Monty')। তখন ডি গুই-গ্যাণ্ড জেনারেল বেডেল স্মিথের (আইকের সেনানীমণ্ডলীর প্রধান) সহায়তায় ও সহযোগিতায় আইজেনহাওয়ারকে অনুরোধ করিলেন এই বার্তা ২৪ ঘণ্টা দেরী করিয়া পাঠাইতে। আইক শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে রাজী হইলেন।

মণ্টগোমারী সমস্ত অবস্থা অবগত হওয়ার পর সুপ্রীম কমাণ্ডারের নিকট সৈন্য-জনোচিত এক বার্তা পাঠাইলেন :

'আমার অবাধ্য হওয়ার কোন ইচ্ছা নেই। আমার উপর শতকরা ১০০ ভাগ নির্ভর করতে পারেন।' নীচে স্বাক্ষর দিলেন—'আপনার একান্ত অনুগত ও আজ্ঞাধীন—মণ্টি।'

এই বার্তার পর তখনকার মত বিরোধের অবসান হইল। (যুদ্ধের পর ১৯৬৩ সালে মণ্টি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তাঁর ঐ ধরনের প্রেস কনফারেন্স করা ঠিক হয় নাই। সে সময় বহু মার্কিন সেনাপতি তাঁকে অত্যন্ত অপছন্দ করিতেন)।

* * *

গত জানুয়ারী মাসে মাল্টায় সম্মিলিত সেনানীমণ্ডলীর প্রধানদের বৈঠকে রুড়ের উত্তর দিক দিয়া মূল আক্রমণ সম্পর্কে আইজেনহাওয়ারের যে পরিকল্পনা অনুমোদিত হইয়াছিল, মণ্টি সেটাকেই বাড়াইয়া বার্লিন পর্যন্ত বিস্তৃত করার জন্যে তাড়া

(২) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২০২।

দিতেছিলেন। কারণ, চার্চিল ও ফিল্ড মার্শাল ব্রুকের মত মণ্টগোমারীও বিশ্বাস করিতেন যে, সময় দ্রুত বহিয়া যাইতেছে। যদি রুশদের আগে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী বার্লিন দখল করিতে না পারে, তবে যুদ্ধজয় রাজনৈতিক ভাবে ব্যর্থ হইবে। অথচ ওয়াশিংটন থেকে সুপ্রীম কমাণ্ডার রাজনৈতিক পলিসিগত কোন নির্দেশ (যাতে ব্রিটিশ মনোভাব প্রতিফলিত হইতে পারে) পান নি। তিনি যখন রাইন নদী আক্রমণ এবং রুড়ের উত্তর দিক দিয়া মণ্টির প্রস্তাবিত অভিযান নিয়া আলোচনা করিতেছিলেন, তখন তাঁর বাস্তুত মনে হইয়াছিল যে, রুশদের বার্লিনের সীমানায় পৌঁছিতে আরও কয়েক মাস সময় লাগিবে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, লালফৌজ ইতিমধ্যেই বার্লিনের ৪০ মাইলের মধ্যে পৌঁছিয়া গিয়াছে এবং ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী তখন ২০০ মাইল দূরে!

সুতরাং আইকের মনে নানা প্রশ্ন দেখা দিল—ঝুকোভ কখন বার্লিন আক্রমণ করিবে? তিন সেনাপতি কি একযোগে অভিযান করিবে? জার্মানদের বাধাদানের শক্তি কিরূপ?—এই সমস্ত গুরুতর প্রশ্নের কোন উত্তর আইকের জানা ছিল না। অথচ তাঁর রণ-পরিকল্পনার জন্য এগুলি জানা নিতান্তই অপরিহার্য ছিল।

কিন্তু আসল সত্য এই ছিল যে, আইজেনহাওয়ার রুশদের পরিকল্পনার কিছুই জানিতেন না। তাঁর সদর দপ্তরের সঙ্গে মস্কোর ইঙ্গ-মার্কিন মিশনের কোন প্রত্যক্ষ রেডিও যোগাযোগও ছিল না। লণ্ডন থেকে বি বি সি যে রুশ সামরিক ইস্তাহার প্রচার করিত একমাত্র সেটুকুই ছিল সংবাদ জানার উৎস। অথচ রুশরা যখন বার্লিনের এত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে তখন আইকের কি উচিত হইবে বার্লিন অভিযান করা?

* * *

রাইন নদী অতিক্রম

কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন মহলের এই সমস্ত উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রশ্নের আলোচনার আগে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, পশ্চিম দিক থেকে রাইন নদী অতিক্রম করার পর মিত্রপক্ষীয় বিরাট সৈন্যবাহিনী অত্যন্ত দ্রুত জার্মানীর অভ্যন্তরের দিকে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পাইয়াছিল। কারণ, জার্মানী তখন পূর্ব ও পশ্চিম দুই দিক দিয়া আক্রান্ত ও বিপন্ন এবং এই দুই দিকের আক্রমণ ঠেকাইবার কোন সাধ্য জার্মানীর ছিল না। তবু ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম ও শেষ ভাগে হিটলার জার্মান জনগণের উদ্দেশ্যে দুইটি শেষ রেডিও বক্তৃতা দিলেন। কিন্তু এই বক্তৃতায়ও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গোঁ এবং গোয়ার্তুমি ফুটিয়া উঠিল। নববর্ষের বক্তৃতায় তিনি জার্মান জনগণকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন যে, যারা ভীরু, যারা পরাজয়বাদী, জার্মান জাতির এই জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে তাদেরকে নির্মমভাবে ধ্বংস করা হইবে। তবে, "১৯৪৬ সালের আগে জার্মানীর জয় ছাড়া এই যুদ্ধ শেষ হইবে না। কারণ, জার্মানী কখনও আত্মসমর্পণ করিবে না।" অতঃপর হিটলার মিত্রপক্ষকে তীব্র আক্রমণ করিয়া বলিলেন যে, বলশেভিক, ইহুদী এবং গণতন্ত্রীরা জার্মানীকে দাসজাতিতে পরিণত করিতে, জার্মানীর যুবশক্তিকে কলুষিত করিতে এবং লক্ষ লক্ষ নরনারীকে উপবাসে রাখিয়া মারিয়া

ফেলিতে চায়। যুদ্ধে পরাজয় ঘটিলে জার্মান জাতির অস্তিত্ব, সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির এই পরিণাম ঘটিবে।

২০শে জানুয়ারীর (১৯৪৫) দ্বিতীয় বক্তৃতায় নাৎসী নায়কের ক্ষমতা লাভের ১৩তম বার্ষিকী উপলক্ষে হিটলার শেষ পর্যন্ত আর নিজের সামরিক দম্ভের উপর ভরসা রাখিতে পারিলেন না। তিনি একেবারে করুণাময় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন, যেন প্রার্থনার ভঙ্গীতে বলিলেন :

'Almighty God will not abandon the man who throughout life wanted nothing but to preserve his people from a fate they did not deserve.'

'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নিশ্চয়ই সেই মানুষটিকে ত্যাগ করিবেন না, যে মানুষট তার জাতির জনগণকে এমন এক পরিণাম থেকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিল, যে পরিণাম তাদের প্রাপ্য ছিল না।'

ঈশ্বরের নিকট এই করুণ প্রার্থনার পরেই হিটলার তাঁর বক্তৃতার উপসংহারে বলিলেন, 'আমি আশা করি প্রত্যেকটি জার্মান তার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত কর্তব্য পালন করিবে। আমি প্রত্যাশা করি সমস্ত জার্মান স্ত্রীলোক ও যুবতী চরমতম ফ্যানাটিসিজম বা গোঁড়ামির দ্বারা এই যুদ্ধ সমর্থন করিবে। যে কেহ আমাদের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করিবে, তাকেই ঘৃণ্য ও অপমানজনক মৃত্যুবরণ করিতে হইবে।' (২)

কিন্তু হিটলারের বক্তৃতায় সেই আগের উত্তেজনা, বলিষ্ঠতা এবং দৃঢ়তা ও আত্ম-বিশ্বাস ছিল না। কারণ, পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক দিয়া অবস্থা মারাত্মক হইয়া উঠিতেছিল। জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ এই তিন মাসের মধ্যে মিত্রবাহিনী বহু বাধা অতিক্রমপূর্বক শেষ 'প্রাকৃতিক বিঘ্ন' রাইন নদী পার হইয়া আসিল। উত্তর ভাগে ১নং কানাডীয় বাহিনী, ২নং বৃটিশ বাহিনী এবং ৩নং মার্কিন বাহিনী ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারীর অধীনে, মধ্যভাগে ১২নং মার্কিন আর্মিগ্রুপ জেনারেল ওমর ব্রাডলির অধীনে এবং দক্ষিণভাগে ৬নং আর্মিগ্রুপ (মার্কিন ও ফরাসী বাহিনীসহ) লেঃ জেনারেল জ্যাকব এল ডেভার্সের (Jacob L. Devers) নেতৃত্বে যে অভিযান চালাইল তাতে আর্দানেসে জার্মান প্রত্যাক্রমণের ব্যর্থতার পর রাইনের পশ্চিম তীরে জার্মানীর আর বাধা দেওয়ার শক্তি রহিল না। তথাপি ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে বরফে, কাদায় ও জলে এবং অত্যন্ত বিরূপ প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে নিজমেজেনের (Nijmegen) দক্ষিণ-পূর্বে মিত্রবাহিনীর আক্রমণ এক ভয়ঙ্কর রক্তস্রাবী যুদ্ধে পরিণত হইল। জার্মানরা রাইনের সেতুগুলি উড়াইয়া দিয়া পিছু হটিয়া যাইতে বাধ্য হইল— ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫। রাইন নদীর অন্যান্য অংশেও জার্মানরা প্রতিরোধের চেষ্টা করিল এবং কোথাও কোথাও ড্যাম্ বা বাঁধ ভাঙিয়া দিয়া বন্যার জল সৃষ্টি করিল। কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও ১৩ই মার্চের মধ্যে রাইন নদীর পশ্চিম তীরের সমগ্র উত্তর অংশ মিত্রবাহিনীর হাতে গেল। মধ্য অংশেও একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটিল।

(২) শাইভার—পৃষ্ঠা ৫০১

৭ই মার্চ কলোন দখল হইয়া গেল এবং জার্মান সৈন্যেরা হোহেনজোলার্ন ব্রীজ ভাঙিয়া দিয়া পিছনে হটিয়া গেল।

কিন্তু সামরিক ইতিহাসে তা গ্যর সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিল ৭ই মার্চ, ১৯৪৫। রাইন নদীর এই মধ্যস্থলে প্রাকৃতিক বিঘ্ন ছিল সবচেয়ে প্রচণ্ড। কারণ, পূর্বতীর থেকে যে খাড়া পাহাড় উঠিয়া গিয়াছে, তা ছিল যেমন দুর্লঙ্ঘ্য তেমনি জার্মানরা অতি সহজেই সেখান থেকে আত্মরক্ষার লড়াই চালাইতে পারিত। এজন্য ১৮০৫ সালে নেপোলিয়নের পর আর কোন যোদ্ধা নদীর এই অংশ সাফল্যের সঙ্গে পার হইতে পারে নাই। কিন্তু মিত্রপক্ষের ভাগ্য সেদিন যেন দৈবক্রমেই খুলিয়া গেল। একজন জার্মান ক্যাপ্টেনকে রাইন নদীর রেমাজেনে অবস্থিত এই লুডেনডর্ফ ব্রীজটি বিকেল বেলা চারটাব সময় উড়াইয়া দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। ঠিক সাড়ে তিনটার সমষ বিস্ফোরক চার্জ করাও হইল। কিন্তু সেই বিস্ফোরণ এত দুর্বল ছিল যে, ব্রীজটির বিশেষ কোন ক্ষতি হইল না। ঠিক ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ৩-৫০ মিনিটের সময় সার্জেন্ট আলেকজান্দার ড্রাবিকের নেতৃত্বে এক প্লাটুন সৈন্যের ছোট্ট একটি দল সেখানে আসিয়া হাজির হইল। তারা উল্লাসে চিৎকার করিতে করিতে সেতু পার হইতে লাগিল। জার্মানরা গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল এবং তখন আর একবার বিস্ফোরণ ঘটিল। এবার সেতুটির কিছু ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু ভাঙিয়া পড়িল না। এরপর মার্কিন সামরিক ইঞ্জিনীয়াররা আসিয়া হাজির হইলেন এবং অতি দ্রুত সেতুটির এমন মেরামত করিলেন যে, ট্রাক, ট্যাঙ্ক, ট্রেন ইত্যাদি সমস্ত ভারী দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি পাঠাইবার উপযুক্ত হইল এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৮ হাজার সৈন্য পার হইয়া গেল। আর সেই সঙ্গে আরও ২টি অস্থায়ী ব্রীজ তৈরী হইল। অবশ্য জার্মান বোমারু বিমান পরে তীব্র পাণ্টা আক্রমণ চালাইয়াছিল। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য তারা কৃতকার্য হইতে পারিল না।

রাইন নদী তীরের রেমাজন সেতুর এই 'ঐতিহাসিক ঘটনা' পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানীর দ্রুত পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি স্বয়ং হিটলার এবং গোয়েরিংও ৲াকি একথা স্বীকার করিয়াছিলেন। (৩)

এমন অদৃষ্টপূর্বভাবে রাইন নদীর রুদ্ধদ্বার খুলিয়া যাইবে এবং রেমাজনের সেতু দিয়া দলে দলে মার্কিন ও মিত্রসৈন্য জার্মানীর অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ার সুযোগ পাইবে, এমন সৌভাগ্য আগে মিত্রপক্ষের সেনাপতিরা কল্পনা করিতে পারেন নাই। ওপেন-হাইম ব্রীজের উপর দিয়াও জেনারেল প্যাটনের সৈন্যেরা রাইন নদী পার হওয়ার অনুরূপ সুযোগ পাইয়াছিলেন। স্বয়ং আইজেনহাওয়ার মন্তব্য করিয়াছেন—"এটা ছিল মহাযুদ্ধের অন্যতম শুভ মুহূর্ত। জার্মানীর মর্মস্থলে প্রবেশ করার চিরন্তন প্রতিরক্ষার বাধা এভাবে বিদীর্ণ হয়ে যাবে, এমন কথা আগে ভাবা যায় নি।"

জার্মানীর এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী মনে করিয়া হিটলার ৪ জন অফিসারকে সামরিক আদালতে অভিযুক্ত এবং গুলি করিয়া হত্যা করিলেন। কিন্তু যে ক্যাপ্টেন

(৩) স্নাইডার—পৃষ্ঠা ৫০৬

(ব্রাটকে) আসলে দায়ী ছিলেন তিনি কিন্তু ত্রাণ পাইয়া গেলেন। কেননা, ভাগ্যক্রমে তিনি আগেই আমেরিকানদের হাতে বন্দী হইয়াছিলেন।..

জার্মানদের পক্ষে এরপর আরও বিস্ময়ের কারণ ঘটিল। কারণ, কয়েকদিনের মধ্যেই ১৫ হাজার মার্কিন সামরিক ইঞ্জিনীয়ার ৬২টি সেতু, ১১টি পাকা হাইওয়ে এবং ৫টি রেলওয়ে ব্রীজ রাইন নদীর উপর দিয়া তৈরী করিলেন। আর উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত ২৫ মার্চ ১৯৪৫ তারিখের মধ্যে ৭টি মিত্রবাহিনী বিপুলতম ট্যাঙ্ক ও অস্ত্রসম্ভার লইয়া সমগ্র রাইন নদীর ২০০ মাইল পার হইয়া গেল।

৭০টি জার্মান ডিভিসন ওদের সম্মুখীন হইয়াছিল বটে, কিন্তু এরা নামে মাত্র ডিভিসন ছিল, আর রণশক্তি ও নৈতিকশক্তি বলিতে এদের সামান্যই ছিল। কার্যতঃ রাইন নদী পার হওয়ার সাতদিনের মধ্যেই পশ্চিমে জার্মানীর প্রতিরোধ শক্তি ভাঙিয়া পড়িল। এদিকে ক্রুদ্ধ হিটলার পশ্চিম রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতি প্রবীণ যোদ্ধা ফিল্ডমার্শাল রুণ্ডস্টেডকে পদচ্যুত করিলেন এবং ইতালীয় রণাঙ্গনের ফিল্ডমার্শাল কেসেলরিংকে তাঁর জায়গায় নিযুক্ত করিলেন। (৪)

জার্মান লাইনের পিছনে মিত্রপক্ষের প্রচুর বিমানবাহী সৈন্য নামিয়া পড়িল এবং রাইন নদীর বাধা অতিক্রম করার পর প্রচণ্ড বোমা বর্ষণের দ্বারা সার ও রুড অঞ্চলের শিল্পসমৃদ্ধ এলাকাগুলিকে বাকী জার্মানী থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা হইল। ১৯৪৫, মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বোমারুগুলি এই সুবৃহৎ এবং প্রসিদ্ধ শিল্পাঞ্চলের উপর অন্ততঃ ৪২ হাজার বার হানা দিল। তারপর শুরু হইল রুড় অঞ্চলের বিরুদ্ধে বেষ্টন নীতি ও আক্রমণ। একথা সর্বজনবিদিত যে, রুড অঞ্চলই ছিল জার্মানীর শ্রমশিল্পের মর্মকেন্দ্র এবং জার্মান সমরশক্তির মূল উৎস। ভুবনবিখ্যাত ক্রুপ, থাইসেন, ডর্টমুণ্ড, ডুইসবার্গ ইত্যাদি নামকরা বিরাট কলকারখানা কিংবা শ্রমশিল্পের শহরগুলি ধ্বংস হইতে লাগিল। তবু হিটলার মরীয়া হইয়া হুকুম দিলেন রুড় অঞ্চলের এক-একটি কারখানাকে এক-একটি দুর্গে পরিণত করার জন্য। জার্মান সৈন্যেরা প্রাণপণ শক্তিতে বাধাও দিল, কিন্তু লেঃ জেনারেল সিম্পসনের নবম মার্কিন বাহিনী এবং লেঃ জেনারেল হড্জের (Hodges) ১নং মার্কিন আর্মি রুডকে ঘিরিয়া ধরিয়া সংহারকার্য চালাইতে লাগিল। ৩রা মার্চ, ১৯৪৫, সুপ্রীম কমাণ্ডার জেনারেল আইজেনহাওয়ার জার্মান সৈন্য ও জনগণের উদ্দেশ্যে আর একবার আবেদন জানাইলেন আত্মসমর্পণের জন্য। কেননা, এই অবস্থায় জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধ চালানো বৃথা লোকক্ষয় ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু হিটলার ও তাঁর চেলা-চামুণ্ডারা এবং গেস্টাপো ও এস এস সংগঠনগুলি এমন বজ্রমুষ্টি বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল যে, জয়ের কোন আশা নাই জানিয়াও তারা যুদ্ধ করিয়া যাইতে লাগিল।

অবশেষে ১লা এপ্রিল, ১৯৪৫, ৯নং ও ১নং মার্কিন বাহিনীর দুই অংশ সাঁড়াশীর দুই বাহুর মত লিপস্টাড্ (Lippstadt) শহরে আসিয়া মিলিত হইল এবং রুড় অঞ্চলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ফিল্ড মার্শাল ভালথার মডেলের নাৎসী সৈন্যেরা ৮০ মাইল ব্যাসার্ধের এক সুবৃহৎ চক্রব্যূহের মধ্যে আটকা পড়িল এবং ২রা থেকে ১৮ই

(৪) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৫০৭

এপ্রিল পর্যন্ত দুই সপ্তাহের মধ্যে রুড়ের সুবিখ্যাত শিল্পাঞ্চল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। অজস্র জার্মান সৈন্য এই প্রতিরক্ষার যুদ্ধে মারা পড়িল এবং চার্চিলের মতে মিত্রপক্ষের হাতে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার সৈন্য বন্দী হইল। ফিল্ড মার্শাল মডেল হিটলারের নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইয়া হতাশ ও বিষণ্ণ চিত্তে ২১ এপ্রিল, ১৯৪৫, ডুইসবার্গের নিকটবর্তী এক জঙ্গলে আত্মহত্যা করিলেন।

* * *

রাইন নদীর বাধা অতিক্রান্ত এবং সিগফ্রীড লাইন ফ্রান্সের ম্যাজিনো লাইনের মত ব্যর্থ প্রমাণিত হওয়ার পর ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর নিকট জার্মানীর অভ্যন্তর ভাগের শহরগুলির দ্রুত পতন হইতে লাগিল। বিশেষত পূর্বদিক থেকে সোভিয়েত বাহিনীর দুর্দান্ত অভিযানের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে জার্মান সৈন্যবাহিনীর শক্তি আরও বৃদ্ধি করার জন্য অনেকগুলি জার্মান ডিভিসনকে পূর্ব রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত করা হইল। এর ফলে পশ্চিমে মিত্রবাহিনীর পক্ষে আরও সুবিধা হইল এবং বৃটিশ মহল থেকে জেনারেল আইজেনহাওয়ারের উপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করা হইল বার্লিন অভিযানের জন্য। অর্থাৎ রুশদের আগে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী কর্তৃক বার্লিন দখলের জন্য। কিন্তু মার্শাল জুকোভের সৈন্যেরা ইতিমধ্যেই বার্লিনের ৩০/৪০ মাইলের মধ্যে পৌঁছিয়া গিয়াছিল। সুতরাং আইজেনহাওয়ার বার্লিন দখলের জন্য রুশদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামিতে রাজী ছিলেন না। কারণ এতে দুই পক্ষেরই বিব্রত ও বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অর্থাৎ অগ্রসরমান দুই মিত্রপক্ষের গতিশীল বাহিনীগুলির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটিতে পারিত। ১৯৩৯ সালে পোলাণ্ডে পূর্বদিক থেকে অগ্রসরমান সোভিয়েত বাহিনীর সঙ্গে জার্মান বাহিনীর এই ধরনের একটা সংঘর্ষও হইয়া গিয়াছিল।

তা ছাড়া আইকের মাথার উপর তখন খাঁড়ার মত ঝুলিতেছিল 'National Redoubt' কিংবা 'জাতীয় পার্বত্য আশ্রয়ের' এক চাঞ্চল্যকর গুপ্ত খবর। মিউনিকের দক্ষিণে ব্যাভেরিয়ার অ্যালপাইন অঞ্চলে পশ্চিম অস্ট্রিয়া ও উত্তর ইতালীর এলাকায় প্রায় ২০ হাজার বর্গমাইলব্যাপী এই পার্বত্য দুর্গই হইবে হিটলার ও তাঁর নাৎসী বাহিনীর শেষ আশ্রয়। এই 'ঈগল পাখির' নীড়ের মর্মকেন্দ্র হইতেছে বার্সেটগ্যাডেন। সেখানে প্রতিরক্ষার সমস্ত প্রকার সামরিক ব্যবস্থা নাকি একেবারে নিখুঁত করিয়া রাখা হইয়াছে। (৫)

আইকের সদর দপ্তরে এই শেষ পার্বত্য আশ্রয়ের একটি মানচিত্রও তৈরী করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং মিত্রবাহিনীর একাধিক গোয়েন্দা বিভাগ থেকে যে সমস্ত সংবাদ আসিতেছিল তাতে এমন ধারণার সৃষ্টি হইল যে, হিটলার দুই বছর পর্যন্ত প্রতিরক্ষার যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে পারিবেন।

২১শে এবং ২৫শে মার্চ ১৯৪৫, মিত্রপক্ষীয় সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের কাছ থেকে আইজেনহাওয়ারের সদর দপ্তরে দক্ষিণ জার্মানীতে হিটলারের শেষ পার্বত্য

(৫) The Last Battle—Cornelius Ryan. p. 206.

আশ্রয় সম্পর্কে আরও যে সমস্ত চাঞ্চল্যকর খবর আসিল, তাতে মার্কিন সুপ্রীম কমাণ্ডারের নিকট বার্লিনের সামরিক গুরুত্ব আরও কমিয়া গেল। সুতরাং এই শেষ জার্মান রণপরিকল্পনায় বাধা দেওয়ার জন্য জেনারেল ওমর ব্রাডলি প্রস্তাব করিলেন উত্তর জার্মানী দিয়া অভিযানের বদলে জার্মানীকে সেণ্ট্রাল বা মধ্যভাগ দিয়া আক্রমণ এবং দ্বিখণ্ডিতকরণ। কারণ, জার্মানী দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেলে নাৎসী বাহিনী আর দক্ষিণদিকের প্রস্তাবিত পার্বত্য এলাকায় আশ্রয় নিতে পারিবে না। এদিকে ওয়াশিংটনে মার্কিন উচ্চতর সামরিক কর্তৃপক্ষ জেনারেল মার্শালের যাঁকে আইক খুব ভক্তি করতেন) কাছ থেকে যে সমস্ত খবর ও নির্দেশ আইকের নিকট পৌঁছিল, তাতেও দক্ষিণ দিকে হিটলারের শেষ আশ্রয় সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া গেল। এই অবস্থায় পূর্বদিক থেকে অগ্রসরমান সে ভিয়েট বাহিনীর রণ-পরিকল্পনা এবং দুই পক্ষের সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতির সীমারেখা কোথায় টানা হইবে, সেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা আইকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং আইক তিনটি তারবার্তার খসড়া প্রস্তুত কবিলেন এবং সেই তিনটির মধ্যে একটি তারবার্তা ছিল 'ঐতিহাসিক' ও অভূতপূর্ব। কারণ, জেনারেল আইজেনহাওয়ার এই তারবার্তাটি সোজাসুজি মার্শাল স্ট্যালিনের নিকট পাঠাইলেন রুশ রণপরিকল্পনা জানিবার জন্য।

অন্য যে দুইটি তারবার্তা মার্কিন সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনাবেল মার্শাল এবং বৃটিশ সেনাপতি মণ্টগোমারীর নিকট পাঠানো হইল, তাতে রুশবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলাইবার প্রস্তাব এবং অন্যান্য রণনৈতিক কথা আইক বলিলেন বটে, কিন্তু এই সমস্ত বার্তায় বার্লিনের কোন উল্লেখ করা হইল না।

আইজেনহাওয়ার মার্শাল স্ট্যালিনের নিকট প্রেরিত বার্তায় নিজের পরিকল্পনার কথা জানাইলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে, রুশবাহিনীর সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর পক্ষে হাত মিলাইবার সবচেয়ে ভালো এলাকা হইতেছে এরফুর্ট-লাইপজিগ-ড্রেসডেন। কারণ, ওদিকেই জার্মান সরকারী দপ্তরগুলি অপসারিত হইতেছে। অপরপক্ষে দক্ষিণ জার্মানীর পার্বত্য অঞ্চলেও জার্মানরা শেষ আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং এই অঞ্চলে বাধা দেওয়ার জন্য মিত্রবাহিনীগুলির দ্বিতীয় মিলনক্ষেত্র হইতেছে রিজেন্সবার্গ লিঞ্জ (Regensburg Linz) অঞ্চল।

রুশদের সঙ্গে সামরিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের অধিকার সুপ্রীম কমাণ্ডার আইজেনহাওয়ারের ছিল এবং স্ট্যালিনও ছিলেন সোভিয়েট বাহিনীর সুপ্রীম কমাণ্ডার। সুতরাং আইক লণ্ডন বা ওয়াশিংটনের বড়কর্তাদের কাছে আগেই তাঁর তারবার্তার কথা জানাইবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। অবশ্য এই সমস্ত তারবার্তার কপি লণ্ডনে এবং ওয়াশিংটনে পাঠানো হইয়াছিল। কিন্তু লণ্ডনে চার্চিল আইকের তারবার্তার কপি পাইয়া যেন তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন। দীর্ঘ তিন বছরের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মধ্যে এই প্রথম চার্চিল আমেরিকানদের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। (৩০শে মার্চ তখন রুজভেল্ট অসুস্থ) বিশেষতঃ ২৭শে মার্চ মণ্টগোমারী তাঁকে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁর বাহিনী এলবে (Elbe) নদীর দিকে এবং সেখান থেকে অটোভান সড়ক (বার্লিনকে ঘিরিয়া আংটির মত তৈরী ফেরো কংক্রিটের

উৎকৃষ্টতম সড়ক) ধরিয়া বার্লিন দখলের অভিযান চালাইবেন। কিন্তু আইকের তারবার্তায় এই সমস্ত কিছুই ছিল না।

এই সময় বৃটিশের পক্ষে আর একটা ক্ষোভের কারণও ঘটিল। কারণ, মণ্টগোমারী ফিল্ড মার্শাল ব্রুককে জানাইলেন যে, মার্কিন নবম বাহিনীকে তাঁর কমাণ্ড থেকে সরাইয়া নিয়া মার্কিন জেনারেল ব্রাডলির ১২নং আর্মি গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত করা হইতেছে এবং এই সমস্ত বাহিনী মধ্য জার্মানী দিয়া লাইপজিগ-ড্রেসডেনের দিকে অভিযান করিবে। কিন্তু 'মণ্টির মতে এটা মারাত্মক ভুল।' (৬

উত্তর জার্মানী দিয়া বার্লিন অভিমুখে আক্রমণের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হওয়ায় বৃটিশপক্ষ রুষ্ট হইলেন। ২৯শে মার্চ ব্রুক ওয়াশিংটনে তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেন— মার্শাল স্ট্যালিনের নিকট সরাসরি বার্তা পাঠাইবার কোন এক্তিয়ার আইজেন-হাওয়ারের নাই। সম্মিলিত সেনানীমণ্ডলীর মারফৎ যোগাযোগ স্থাপন করা উচিত ছিল।

জর্জ মার্শাল বৃটিশ পক্ষের বিরক্তি এবং উত্তর জার্মানী দিয়া বার্লিনের দিকে প্রস্তাবিত অভিযানের কথা আইজেনহাওয়ারকে জানাইয়া দিলেন। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপার নিয়া বৃটিশ-মার্কিন বিরোধ ক্রমশ অত্যন্ত প্রবল হইল। তবে উভয় পক্ষই একটা আপোস মীমাংসা ও জোড়াতালি দিতে চাহিলেন। মিত্রপক্ষের প্রধানদের নিকট আরোও ক্ষোভের কারণ এই ছিল যে, আইক সংক্রান্ত ঘটনা এমন এক সময়ে ঘটিতেছিল, যখন বৃটিশ, মার্কিন ও রুশ—এই তিন পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক আদৌ ভালো যাইতেছিল না। অধিকন্তু প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টও অসুস্থ ছিলেন। অপর পক্ষে সাম্রাজ্যবাদী চার্চিল স্ট্যালিনের যুদ্ধ-পরবর্তী মতলব সম্পর্কে সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। ফলে, পশ্চিম দিকে অগ্রসরমান সোভিয়েত বাহিনীর জয়গুলিকে প্রীতির চক্ষে দেখিলেন না। সেই সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের নিকট রাশিয়ার আচরণ আরও ক্ষোভের কারণ হইয়া উঠিল। কারণ, স্ট্যালিন অভিযোগ করিলেন যে, পশ্চিম জার্মানীর মুক্ত বন্দীশালাগুলি থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত রুশ বন্দীদের উপর দুর্ব্যবহার করা হইতেছে।

অপর দিকে পশ্চিমী মিত্রদের পক্ষ থেকে স্ট্যালিনের নিকট অভিযোগ করা হইল যে, মিত্রবাহিনীর বোমারুগুলিকে তৈল নেওয়ার জন্য এবং অন্যান্য কারণে রুশ বাহিনীর পিছনে অবতরণ করার যে অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, কার্যক্ষেত্রে তা পালিত হইতেছে না।

অধিকন্তু ইতালীতে জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণের প্রস্তাব নিয়াও স্ট্যালিনের সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন কর্তাদের তীব্র ক্ষোভের কারণ ঘটিল। কারণ, স্ট্যালিন এই মর্মে গুরুতর অভিযোগ করিলেন যে, ইতালীতে জার্মান সৈন্যেরা ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের নিকট আত্মসমর্পণের জন্য গোপনে আলোচনা চালাইতেছে এবং এই সমস্ত চলিতেছে সোভিয়েত পক্ষের অজ্ঞাতসারে। অধিকন্তু এই সমস্ত জার্মান বাহিনীকে (৩ ডিভিসন) পূর্ব রণাঙ্গনে পাঠাইবারও মতলব করা হইয়াছে।

(৬) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক—পৃষ্ঠা ২২৭

অর্থাৎ সোজা কথায় স্ট্যালিন মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে "বিশ্বাসঘাতকতার" এবং হিটলারের সঙ্গে "পৃথক সন্ধি" করার গুরুতর অভিযোগ তুলিলেন।

বলা বাহুল্য যে, চার্চিল এবং রুজভেল্ট উভয়েই স্ট্যালিনের এই 'মিথ্যা' সন্দেহের ও 'ভিত্তিহীন' অভিযোগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেন। তথাপি রুজভেল্ট তাঁর প্রেরিত বার্তায় যথাসম্ভব সংযম ও শিষ্টাচার রক্ষার চেষ্টা করিলেন। কারণ, তিনি মিত্রপক্ষের মধ্যে ঐক্যরক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন।- (৭)

* * *

মিত্রপক্ষের মধ্যে এই ধরনের অপ্রীতিকর অবস্থার যখন উদ্ভব হইয়াছিল, তখন স্ট্যালিনের নিকট সোজাসুজি প্রেরিত আইজেনহাওয়ারের বার্তা নিয়া স্বভাবতই তীব্র বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি হইল। কারণ, চার্চিল ও বৃটিশ পক্ষের নিকট বার্লিনের রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম ছিল। কিন্তু আইক তাঁর সামরিক পরিকল্পনার দ্বারা সেটাই নষ্ট করিয়া দিতেছেন। অথচ রাজনৈতিক ব্যাপারে স্ট্যালিনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার কোন এক্তিয়ার আইজেনহাওয়ারের ছিল না। সুতরাং ২৯শে মার্চ রাত্রে চার্চিল জেনারেল আইজেনহাওয়ারের নিকট জরুরী টেলিফোন করিলেন। তবে চতুর চার্চিল আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক অব্যাহত রাখার জন্য আইকের সাথে আলোচনায় স্ট্যালিনের নিকট আইকের প্রেরিত বার্তার কথা চাপিয়া গেলেন, কিন্তু কৌশলে মন্টির প্রস্তাবিত বার্লিন অভিযানের উপর খুব জোর দিলেন। কিন্তু আইক দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিলেন যে, বার্লিনের আর কোন সামরিক গুরুত্ব নাই।

রেইমসের সদর দপ্তরে বসিয়া আইজেনহাওয়ার বৃটিশ প্রতিবাদের জন্য অত্যন্ত রাগিয়া গেলেন এবং ৩০শে মার্চ সকালে লণ্ডন ও ওয়াশিংটনে এই মর্মে জবাব পাঠাইলেন যে, লাইপজিগ-ড্রেসডেন ও মধ্য জার্মানীর ভিতর দিয়া অভিযান চালানো হইবে এবং দক্ষিণ দিকে জার্মানীর পার্বত্য আশ্রয় লাভে বাধা দেওয়া হইবে। দানিয়ুব নদী উপত্যকায় রুশ বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলাইবার চেষ্টা করা হইবে। তবে, পরিবর্তিত অবস্থায় এগুলিরও পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

কিন্তু এই সমস্ত জবাবে বার্লিনের কোন উল্লেখ ছিল না। বরং সুপ্রীম কমাণ্ডার ওয়াশিংটনে অভিযোগ করিয়া পাঠাইলেন যে, বৃটিশ পক্ষ রাইন ও জার্মানী অভিমুখে অভিযানে পদে পদে বাধা দিয়াছে। কিন্তু তিনি তাঁর পরিকল্পনা অনুসরণ করিয়াই যাইবেন।...

এদিকে চার্চিল আবার আইজেনহাওয়ারের নিকট প্রেরিত একটি বার্তায় স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, রুশ সৈন্যবাহিনী নিশ্চয়ই অস্ট্রিয়া ও ভিয়েনা দখল করিয়া নিবে। সেই সঙ্গে বার্লিনও তাদের দখলে গেলে সামরিক ও রাজনৈতিক ফলাফল গুরুতর হইবে। (৮)

মস্কোতে বৃটিশ ও মার্কিন মিলিটারি মিশনের (জেনারেল ডীন্) প্রধানগণ আইজেনহাওয়ারের প্রেরিত বার্তা স্ট্যালিনের হাতে দিলেন এবং স্ট্যালিন আইকের

( ) চেস্টার উইলমট—পৃষ্ঠা ৭৮৬-৮৭
(৮) কর্নেলিয়াস রায়ান্—পৃষ্ঠা ২৩৬

রণনৈতিক পরিকল্পনার তারিফ করিলেন। কিন্তু নিজেদের পরিকল্পনার কথা কিছু বলিলেন না।...

২৮শে মার্চের টেলিগ্রামের জবাবে স্ট্যালিন রাত্রি ৮টার সময় পাল্টা এক টেলিগ্রামে আইজেনহাওয়ারকে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁর রণ-পরিকল্পনা তিনি সমর্থন করিতেছেন, লাইপজিগ-ড্রেসডেন এলাকাতেই লালফৌজের সঙ্গে হাত মিলানো উচিত। সোভিয়েত বাহিনীরও প্রধান আক্রমণ ওদিকেই ঘটিবে এবং আইজেনহাওয়ারের সঙ্গে তিনিও একমত যে, বার্লিনের আর আগের মত সামরিক গুরুত্ব নাই। সেজন্য সেখানে দ্বিতীয় সারির সৈন্য পাঠানো হইবে। আর মে মাসের দ্বিতীয় অর্ধভাগে লালফৌজের আক্রমণ শুরু হইতে পারে।..

আইজেনহাওয়ারের নিকট প্রেরিত স্ট্যালিনের তারবার্তার কপি পাইয়া চার্চিলের সন্দেহ আরও গভীর হইল। তিনি আইজেনহাওয়ারের নিকট প্রেরিত পুনরায় একটি তারবার্তায় জানাইয়া দিলেন যে, মস্কোর মতে বার্লিনের সামরিক গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ার যে কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝিতে হইবে রাজনৈতিক গুরুত্বের বিচারে। সুতরাং বার্লিনে আমাদের আগে প্রবেশ করা দরকার। কারণ, 'যত পূর্বে রাশিয়ানদের সঙ্গে হাত মেলানো যায় ততই ভালো'— "that we should shake hands with the Russians as far to the east as possible..." (১)

অর্থাৎ চার্চিলের মতে সোভিয়েত রাশিয়াকে মধ্য ইউরোপ থেকে যত দূরে রাখা যায়, ততই পশ্চিম ইউরোপের পক্ষে মঙ্গল। কিন্তু এই রাজনৈতিক মতামতের গুরুত্ব নিয়া আইজেনহাওয়ার মাথা ঘামাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ, রাশিয়ার সঙ্গে সদ্ভাব রাখার প্রয়োজন ছিল।

বার্লিন কেন ইঙ্গ মার্কিন দখলে গেল না?

জেনারেল আইজেনহাওয়ার কর্তৃক সরাসরি মার্শাল স্ট্যালিনের নিকট তারবার্তা পাঠাইবার জন্য আইকের বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকারী মহলে সমালোচনা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, বিদেশী গভর্নমেন্টের সঙ্গে এভাবে আলোচনা করার অধিকার তাঁর ছিল না। তেমনি লালফৌজের আগেই বার্লিন দখলের অভিযান না করার জন্যও তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হইয়াছে। বিশেষত যুদ্ধের পরবর্তীকালে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আবহাওয়ায় আইজেনহাওয়ার, রুজভেল্ট প্রভৃতির বিরুদ্ধে অতলান্তিকের এপারে-ওপারে সমালোচনার সুর আরও তীব্র হইয়াছিল। তাঁদের মতে চার্চিলের রণনীতিই সঠিক ছিল। যদি রুজভেল্ট ও মার্কিন সেনানীমণ্ডলী চার্চিলের রণনীতি অনুমোদন এবং অনুসরণ করিতেন, তবে, বলকান ও পূর্ব ইউরোপ যেমন সোভিয়েত কিংবা কমিউনিস্ট দখলদারিতে যাইত না, তেমনি জার্মানী ও বার্লিন নিয়াও এত বিভ্রাট দেখা দিত না।

কিন্তু যাঁরা এই সমালোচনা ক্রমশ উচ্চ পর্দায় চড়াইয়াছেন, তাঁরা গোড়াকার আসল অবস্থাটাই ভুলিয়া গিয়াছেন, কিংবা উপেক্ষা করিয়াছেন। কারণ, হিটলারী

(১) The Last Battle—Cornelius Ryan. p. 244-45, 246.

জার্মানীর মারাত্মক সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে সবচেয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছিল রাশিয়া। যে রাশিয়ার ৫ লক্ষ বর্গ মাইল ভূমি জার্মানরা দখল করিয়া নিয়াছিল এবং অপরিমিত লোকক্ষয় ও ধ্বংসলীলা বিস্তার করিয়াছিল রাশিয়াতে যে পরিমাণ রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তার কোন তুলনা নাই। পশ্চিমের সামরিক লেখকদের পুস্তকেই এবং যে সমস্ত লেখক সোভিয়েত-বিরোধী তাঁদের লেখাতেই (যেমন, চেস্টার উইলমট, ক্যাপ্টেন হ্যারি বুচার প্রভৃতি) স্বীকার করা হইয়াছে যে, ১৯৪৩ সালের নভেম্বরে মোট ৩১০ ডিভিসন জার্মান সৈন্যের মধ্যে একমাত্র পূর্ব রণাঙ্গনেই ২০৬ ডিভিসন জার্মান সৈন্য লালফৌজের বিরুদ্ধে রণলিপ্ত ছিল। আর বাকী ডিভিসনগুলি ছিল ইউরোপের অন্যান্য অংশে। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার সময়েও ১৫৭ ডিভিসন জার্মান সৈন্য ছিল পূর্ব রণাঙ্গনে। আর ৫০ ডিভিসন ছিল জানুয়ারী মাসে বৃটেনের বিপরীত দিকে, এবং এর মধ্যে আবার ২৬ ডিভিসন ছিল 'অতলান্তিক প্রাচীর' পাহারা দেওয়ার জন্যে। পশ্চিমের সামরিক গোয়েন্দাদের ধারণা ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে ১৯৯ ডিভিসন জার্মান সৈন্য ছিল পূর্ব রণাঙ্গনে। আর ১৩৭ ডিভিসনের মধ্যে ৫১ ডিভিসন ছিল ফ্রান্স ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসেও মাত্র ৫২ ডিভিসন ছিল পশ্চিম রণাঙ্গনে, যেগুলি নামে মাত্র ডিভিসন ছিল। এমন কি, ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে পর্যন্ত ১৩৩ ডিভিসন জার্মান সৈন্য ছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে —অর্থাৎ জার্মানীর মোট স্থলসৈন্যের অর্ধেকই ছিল পূর্ব রণাঙ্গনে। আর পশ্চিম রণাঙ্গনে ৭৬ ডিভিসন এবং ইতালীতে ২৪ ডিভিসন। সুতরাং এই সংখ্যাগুলির দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, জার্মান সমরশক্তির বিরুদ্ধে আসল লড়াই চালাইতেছিল লালফৌজ এবং ইউরোপীয় মহাদেশের যুদ্ধের আসল মর্মকথাও ছিল এখানে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এই ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করিয়া কেবল গল্প বা উপকথা রচনা করিলেই চলিবে না। (১০) জার্মানীর বিশাল সামরিক শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য একদিকে সোভিয়েত শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে, অন্যদিকে আবার বলকান বা পূর্ব ইউরোপে তাদের বিজয়ী সৈন্যদের প্রবেশ রুদ্ধ করা হইবে—এমন অবাস্তব অবস্থা তো চলিতে পারে না। 'চার্চিল এই শতাব্দীর সবচেয়ে চতুর এবং দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ রাজনৈতিক রণনীতিবিদ্ ছিলেন বটে, কিন্তু ঠিক সেই কারণেই তাঁর সামরিক রণনীতি অনির্ভরযোগ্য এবং বিপজ্জনক ছিল"—একথা লিখিয়াছেন আমেরিকার বিখ্যাত চিন্তাশীল রাজনীতিক গ্রন্থকার মিঃ ডি এফ ফ্লেমিং।

বার্লিন দখলের প্রশ্ন নিয়া এই কারণেই বৃটেনের সঙ্গে আমেরিকান সেনানীদের তীব্র মতভেদ ও বিরোধ দেখা দিয়াছিল। কারণ, চার্চিল তখনই ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, "মুক্ত দুনিয়ার পক্ষে রাশিয়া সবচেয়ে মারাত্মক বিপদরূপে দেখা দিয়াছে"

কিন্তু চার্চিল বা বৃটিশ সেনানীমণ্ডলী কর্তৃক প্রস্তাবিত বার্লিন দখলের প্রশ্ন তখন বাস্তবতাসম্মত ছিল না। কারণ, মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদলের কাছ থেকে বার্লিন তখন ৩০০ মাইল দূরে। আর জুকোভের অধীন রুশ সৈন্যেরা ছিল বার্লিনের মাত্র ৩০

(১০) The Cold War—D. F. Fleming. P. 166

মাইল দূরে ওডের নদীর সেতুমুখ থেকে। ১০ লক্ষ সোভিয়েত সৈন্য বার্লিন আক্রমণের জন্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং আইজেনহাওয়ার যদি সেই সময় বার্লিন জয়ের জন্য আগাইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিতেন, তবে, খুব সম্ভবত মার্শাল জুকোভ আগেই সেখানে পৌছিয়া যাইতেন এবং সেই অবস্থা মার্কিণ অধিনায়কদের পক্ষে খুব অসুবিধাজনক ও লজ্জার বিষয় হইয়া পড়িত। যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়াও লওয়া যায় যে, পশ্চিমের মিত্রপক্ষীয় সৈন্যেরা ওডের নদী পার হইতে পারিবেন, তথাপি সেই অবস্থায় তাঁদের খাল-বিল-নদী এবং জলা ও জংলা জায়গায় ৫০ মাইল অতিক্রম করিতে হইত। সেজন্যই আইজেনহাওয়ারের প্রশ্নের জবাবে জেনারেল ওমর ব্রাডলি বলিয়াছিলেন যে, এই অঞ্চল জয় করিয়া বার্লিনে অগ্রসর হইতে ১ লক্ষ মিত্রপক্ষীয় সৈন্য হতাহত হইবে। আইজেনহাওয়া স্বভাবতই এই প্রকার বিপদের ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক ছিলেন না কারণ, এর দ্বারা শত্রুসৈন্য সংহারের যে আসল দায়িত্ব সুপ্রীম কমাণ্ডার হিসাবে তাঁর উপর অর্পিত হইয়াছিল, সেটাও পালন করা কঠিন হইত।

এই সমস্ত ছাড়াও আর একটি গুরুতর প্রশ্ন ছিল, যে প্রশ্নটিকে সমালোচকগণ বাহ্যত উপেক্ষা করিতেছেন। পরাজিত জার্মানীকে বৃটেন, আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে ভাগ করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। (পরবর্তীকালে ফ্রান্সকেও এই অংশীদারীতে গ্রহণ করা হইয়াছিল।) ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে লণ্ডনে ইউরোপীয়ান অ্যাড্ভাইসরি কমিশনের বৈঠকে স্থির করা হইয়াছিল তিন প্রধান শক্তির মধ্যে পরাজিত জার্মানীর কে কোন্ এলাকা দখল করিবেন। সোভিয়েত রাশিয়ার জন্য স্বভাবতই জার্মানীর পূর্বাংশ (বার্লিন সহ) নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এই পরিকল্পনাও রাশিয়ার রচিত ছিল না, ছিল বৃটিশ পক্ষের। তিন প্রধান শক্তির মধ্যে জার্মানীর দখলীকৃত অঞ্চল সম্পর্কে এই চুক্তি ইয়াল্টার শীর্ষ সম্মেলনে অনুমোদিত হইয়াছিল। সোভিয়েত দখলীকৃত এলাকার মধ্যে ছিল বার্লিন, পশ্চিম দিকের ইঙ্গ-মার্কিন দখলীকৃত লাইন থেকে যে বার্লিনের দূরত্ব ছিল ১১০ মাইল। তবে বার্লিন সম্পর্কে এই বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল যে, ইহা মিত্রশক্তিদের যৌথ দখলদারিতে একটি স্বতন্ত্র এলাকারূপে পরিচালিত হইবে। এই ভাগ-বাঁটোয়ারায় আমেরিকানদেরও সম্মতি ছিল। এমন কি, ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েত রাশিয়া যে জার্মানীর মাত্র এক-তৃতীয়াংশ দখলে রাখার প্রস্তাবেই সন্তুষ্ট ছিল, সেটাও রাশিয়ার উদারতা বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছিল। কারণ, তখন একমাত্র ইতালীতে ছাড়া ইউরোপের কোথাও পশ্চিমী মিত্রশক্তির কোন পাত্তা ছিল না।

সুতরাং আইজেনহাওয়ার যদি বার্লিন দখল করিয়া নিতেও পারিতেন, তথাপি ভাগ-বাঁটোয়ারার চুক্তি অনুসারে জার্মানীর সেই পূর্বাংশ ছাড়িয়াদিয়া আসিতে হইত। সুতরাং এই অবস্থায় জার্মানীর রাজধানীর দিকে অভিযান করা আইজেনহাওয়ারের মতে বোকামি বা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হইত।(১১)

হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশনের তিন প্রধান শক্তি যে আগে থেকেই পরাজিত

(১১) Cold War—P. 168

—After Victory—W.L. Newman P. 132.

জার্মানীর ভাগ-বাঁটোয়ারা এবং অধিকৃত এলাকাগুলির মোটামুটি একটা সীমারেখা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেটা তাঁদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়াই গণ্য হইয়াছিল। কেন না, মিত্রশক্তিবর্গ যদি জার্মানী ও বার্লিন দখলের জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করিয়া দিত, তবে, গুরুতর জটিলতা ও বিপদের কারণ ঘটিত। মিঃ ডি এফ ফ্লেমি য়ের মতে যদি মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে কেউ বার্লিন দখলের অধিকারী ছিল, তবে, সেই অধিকার ছিল একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়ার। কারণ, হিটল রী শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য সে একাই সবচেয়ে বেশী বুকের রক্ত ঢালিয়াছিল। সুতরাং বার্লিন দখলে তার অধিকারকে কোন মতেই অস্বীকাব করা চলিত না।

উইনস্টো চার্চিল চতুর ও বুদ্ধিমান ছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু অতিরিক্ত বুদ্ধি খাটাইয়া পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলিতে গিয়া তিনি ও তাঁর সমর্থকগণ এত বেশী বিলম্ব করিয়াছিলেন যে, তখন মধ্য ইউরোপ পর্যন্ত লালফৌজের অগ্রগতিকে বাধা দেওয়ার কোন সুযোগ ছিল না।

* * *

অবশ্য ৯৪৮ সালের শরৎকালেই ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ বার্লিন দখলেব প্রশ্নটি নিয়া জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলেন। এমন কি, মণ্টগোমারীর সঙ্গে মার্কিন পক্ষের মত বিরোধের সময় আইজেনহাওয়ার ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৪, তাঁর নিকট এক পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, যদি শক্তি ও সম্পদে কুলায় তবে, বার্লিন দখলেব কথাও নিশ্চয়ই ভাবিতে হইবে।

কিন্তু এটা ছিল মন্টিকে স্তোকবাক্য দেওয়ার মত। কেননা, ১লা এবং ২রা এপ্রিল রুজভেল্ট ও আইজেনহাওয়ারের নিকট চার্চিলের পর পর তারবার্তা সত্ত্বেও বার্লিন অভিযান অনুমোদিত হয় নাই। কারণ, মিত্রবাহিনী তখন বার্লিন আক্রমণ ও দখলের জন্য প্রস্তুত ছিল না। রুজভেল্টের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ব্যক্তি ও পরামর্শদাতা হ্যারি হপকিন লিখিয়াছেন—"যদি আমাদের শক্তি থাকিত, তবে আমরা বার্লিন দখল করিতাম। কেননা, আমাদের সৈন্যবাহিনীর জয়গৌরব তার দ্বারা বৃদ্ধি পাইত।"(১২)

সুতরাং চার্চিল ও বৃটিশ পক্ষের দুর্ভাগ্য এই যে, বার্লিনের দিকে প্রস্তাবিত অভিযানে রুজভেল্ট ও আইজেনহাওয়ারের তেমন কোন সম্মতি ও উৎসাহ ছিল না। কেন না, মূলগতভাবে এটা রুজভেল্ট ও স্ট্যালিনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। মিত্র পক্ষের বাহিনীগুলির মধ্যে বার্লিনে আগে কে পৌঁছিবে সেই প্রশ্নটা এক্ষণে রণনীতির চেয়ে কূটনৈতিক গুরুত্ব বেশী অর্জন করিল এবং লাল-ফৌজেরও অনেকে ধরিয়াই লইলেন যে, বার্লিন তারাই আগে দখল করিবেন। এজন্য রুশ বাহিনীর মধ্যে অনেকেই বার্লিন অভিযানে যাত্রা করার জন্য অস্থির হইয়া পড়িল। তাঁদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, ইয়াল্টাতে রুজভেল্ট ও স্ট্যালিনের মধ্যে আগেই এই বিষয়ে একটা চুক্তি হইয়া গিয়াছে এবং জেনারেল

(১২) রবার্ট ই শেরউড—পৃষ্ঠা ৮৮৩

আইজেনহাওয়ার এজন্যই বার্লিনের বদলে দক্ষিণ জার্মানীর দিকে অভিযানের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু স্ট্যাটিনিয়াস এর প্রতিবাদে বলিয়াছেন যে, ইয়াল্টাতে স্ট্যালিন-রুজভেল্টের মধ্যে এমন কোন চুক্তি হইয়াছে বলিয়া তাঁর জানা নাই। (হপকিন্সও এমন গুজবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।) তবে, আসল সত্য এই যে, রুশদের আগে আমেরিকানরা বার্লিন দখল করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে ভয়ঙ্কর বিরোধ দেখা দিত এবং সেকথা রুজভেল্ট জানিতেন (১৩)

(১৩) আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থ—পৃষ্ঠা ৮৩২

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মৃত্যু

পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক থেকে জার্মানী যখন আক্রান্ত এবং মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা যখন ভিতরের দিক অগ্রসরমান এবং লালফৌজ যখন খোদ বার্লিন অভিযানে প্রস্তুত (১৬ই এপ্রিল) মহাযুদ্ধের ঠিক সেই চরম মুহূর্তে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। হিটলারী জার্মানীর পতন ও মিত্রপক্ষের চরম জয়লাভের সুনিশ্চয়তা তিনি দেখিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মাত্র সামান্য কয়েকদিনের জন্য তিনি জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পনের ঐতিহাসিক মুহূর্তটা প্রত্যক্ষ করিয়া যাইতে পারিলেন না। ১২ই এপ্রিল ১৯৪৫, তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যু কেবল আমেরিকা, বৃটেন ও সোভিয়েত রাশিয়ার নয়, পৃথিবীর সর্বত্র মিত্রপক্ষীয় মহলে গভীর শোক উদ্রেক করিল। কেননা, ফ্যাসীবিরোধী গ্রাণ্ড কোয়ালিশনের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান নায়ক এবং সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে একত্রে বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য ইউনাইটেড নেশন্স সংগঠনের প্রধানতম উদ্যোক্তা।

কিন্তু তাঁর মৃত্যু আকস্মিক হইলেও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল না। কেননা, যুদ্ধ-সংক্রান্ত অসংখ্য কার্যাবলীর অসম্ভব চাপে তাঁর স্বাস্থ্য অনেক দিন আগেই ভাঙিয়া পড়িয়াছিল এবং অসুস্থ দেহ নিয়াই তিনি একমাত্র মনের জোরে ইয়াল্টার ঐতিহাসিক শীর্ষ সম্মেলনে (ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে) যোগ দিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে সেই সম্মেলন পরিচালনা করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি ছিলেন চার্চিল ও স্ট্যালিনের মধ্যে মধ্যস্থের মত এবং সেদিক থেকে তিনি তিন পক্ষেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

কিন্তু তিনি যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জাহাজযোগে মাল্টায় চার্চিলের সঙ্গে মিলিয়াছিলেন এবং পরে বিমানযোগে ইয়াল্টায় (ক্রিমিয়া) স্ট্যালিনের সঙ্গে বৈঠকে একত্র হইয়াছিলেন, তখন স্বয়ং চার্চিল ও অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিয়া উদ্বেগ বোধ করিয়াছিলেন। একমাত্র মানসিক শক্তি এবং মহৎ কর্তব্যবোধের দ্বারাই তিনি সেই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের সাফল্যজনক পরিণতি ঘটাইতে পারিয়াছিলেন। অনেক দিন ধরিয়াই তিনি অসুস্থ ছিলেন এবং মৃত্যুর ৯ মাস আগে তিনি বলিয়াছিলেন—

'All that is within me cries out to go back to my home on the Hudson River' (১)

'হাডসন নদীর তীরে আমার স্বগৃহে ফিরে যাওয়ার জন্য আমার অন্তরাত্মা কাঁদছে।'

অবশেষে সেই নদী তীরে তাঁর স্বগৃহে তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রাণহীন দেহে।...

---

(১) Roosevelt: the Lion and the Fox—by James Mac Gregor Burns, New York, p. 478

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩২তম প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডিল্যানো রুজভেল্ট ৬৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আমেরিকার ঐতিহাসিক সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া (দুই বারের বেশী প্রেসিডেন্ট হওয়ার নিয়ম নাই) তিনি চতুর্থবারের জন্য রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং এই নির্বাচনের তিন মাসের মধ্যেই তাঁর জীবনদীপ নিভিয়া গেল। যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি সেই সময় হোয়াইট হাউসে যাতায়াত করিতেন, তাঁরা কিন্তু উদ্বেগের সঙ্গে প্রেসিডেন্টে স্বাস্থ্য লক্ষ্য করিতেন এবং বলাবলি করিতেন যে, হয় রাষ্ট্রপতি গুরুতর অসুস্থ কিংবা শীঘ্রই তাঁর দেহে অস্ত্র পচার করা হইবে।

জর্জিয়ার ওয়ারম্ স্প্রীংস অঞ্চলের একটি পাহাড়ের ১ ` ৎ। ই ২ ইট হাউস' নামে ৬ কামরার যে পার্বত্যনিবাস ছিল, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সেখানে গেলেন তাঁর দীর্ঘ প্রত্যাশিত বিশ্রাম লাভের জন্য। ১২ই এপ্রিল, ১৯৪৫, যখন মধ্যাহ্নের সময় তিনি একটি আরামকেদারায় বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছিলেন এবং একজন মহিলা শিল্পী তাঁর প্রতিকৃতি অঙ্কন করিতেছিলেন, তখন বেলা ১টার সময় রুজভেল্ট তাঁর হাতঘড়ির দিকে তাকাইলেন এবং বলিলেন যে, আর কিন্তু মাত্র ১৫ মিনিট সময় আছে। মিস্ ডিল্যানো নাম্নী একজন আত্মীয়া মহিলা যখন ফুলদানিতে ফুল সাজাইতেছিলেন এবং রুজভেল্ট একটি সিগারেট ধরাইয়াছিলেন, তখন হঠাৎ তিনি বাঁ হাত দিয়া কপালের শিরা চাপিয়া ধরিলেন এবং অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, আমার ভয়ঙ্কর মাথা ধরেছে' (I have a terrific headache), বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত এবং মাথা ঝুলিয়া পড়িল এবং তিনি জ্ঞান হারাইলেন। তাঁর এই বাক্যটিই ছিল তাঁর জীবনের শেষ কথা। তখন বেলা ১টা ১৫ মিঃ—যে ১৫ মিনিটের কথা তিনি আগেই বলিয়াছিলেন।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নৌবিভাগের ডাক্তার কমাণ্ডার হাওয়ার্ড ব্রুয়েন (Bruenn) আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রুজভেল্টকে বহন করিয়া তাঁর বেডরুমে লইয়া যাওয়া হইল। তাঁর খুব শ্বাসকষ্ট হইতেছিল, তাঁর নাড়ীর গতি ছিল ১০৪ এবং তাঁর রক্তের চাপ ৩০০-এর উপরে উঠিয়া গিয়াছিল। ডাক্তার বলিলেন প্রেসিডেন্ট মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে আক্রান্ত হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াশিংটনে খবর গেল মিসেস রুজভেল্টের (হোয়াইট হাউজে) নিকট এবং অন্যা ডাক্তাররাও আসিলেন। কিন্তু ওয়াশিংটনের সময় অনুযায়ী বেলা ৪টা ৩৫ মিনিটের সময় রুজভেল্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।—(২)

১৯৩৩ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ১২ বছর ধরিয়া রুজভেল্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং আন্তর্জাতিক জগতের বহু সঙ্কটজনক সমস্যার মধ্যে প্রেসিডেন্টের দুরূহ কর্তব্য পালন করিয়াছেন। তাঁর সাহস, তাঁর সুমিষ্ট স্বভাব এবং তাঁর উজ্জ্বল আনন্দময় ব্যক্তিত্বের জন্য তিনি লক্ষ লক্ষ লোকের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। জর্জ ওয়াশিংটন ও লিঙ্কনের মত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রেসিডেন্টের মর্যাদা ও

(২) The Last Hundred Days—John Toland, pp 412-413

জনপ্রিয়তা যেমন তাঁর ছিল তেমনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জগতে তাঁর বিরোধীর সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। কারণ, ১৯৩৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চরম আর্থিক দুর্গতির সময় তিনি যখন রাষ্ট্রতরণীর হাল ধরিয়াছিলেন, তখন তাঁকে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্র পাড়ি দিতে হইয়াছিল এবং সেই অর্থনৈতিক দুর্গতি থেকে আমেরিকাকে উদ্ধার করার জন্য তিনি এমন কতকগুলি জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন যার জন্য তাঁর বিরোধীপক্ষ এবং ধনিকমহলের একাংশ তাঁকে কমিউনিস্ট-পক্ষপাতী বলিয়া সন্দেহ করিতেন। জর্জ ওয়াশিংটন ও লিঙ্কনের পর এত শত্রুতার বিরুদ্ধেও আর কোন প্রেসিডেন্টকে লড়িতে হয় নাই। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবিশ্রান্ত রকমের চাপ তাঁকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। অথচ জীবনব্যাপী তাঁকে পোলিও-রোগের যন্ত্রণা বহন করিতে হইয়াছিল এবং তিনি বীরের মত এই রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। গণতন্ত্রের ও স্বাধীনতার মহান আদর্শের প্রতি তাঁর ছিল গভীর নিষ্ঠা, সর্বোপরি তিনি ছিলেন বাস্তববাদী—কাজের লোক এবং কাজের মধ্য দিয়াই তিনি তাঁর নীতি ও আদর্শকে প্রতিফলিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁর ত্রুটি ছিল না, দুর্বলতা ছিল না, এমন নয়। কিন্তু এই সমস্ত ত্রুটি ও দুর্বলতাকে ছাড়াইয়া তিনি মানবতার পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। ফ্যাসিজম ও হিটলার-বিরোধিতার মূলেও ছিল তাঁর এই মানবতা ও গণতান্ত্রিক আদর্শবোধ। তিনি ও তাঁর একান্ত অনুরক্ত সহকর্মীগণ এজন্য প্রায় গোড়া থেকেই অনুভব করিয়াছিলেন যে, হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে শস্ত্র পর্যন্ত আমেরিকাকে অস্ত্রধারণ করিতেই হইবে এবং তাঁর এই কার্য সহজ হইয়া গেল জাপান কর্তৃক পার্ল হারবার আক্রমণের জন্য। তারপর থেকে আমেরিকার সর্বসাধারণ মানুষ রুজভেল্টের পিছনে দাঁড়াইল। জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি আরোহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ১২ই এপ্রিল আচম্বিতে তাঁর মৃত্যুসংবাদ ঘোষিত হওয়ায় অনেকেই গোড়ার দিকে তা বিশ্বাস করিতে চাহেন নাই। কিন্তু পরে যখন তাঁরা বুঝিতে পারিলেন যে, সত্য সত্যই রুজভেল্ট আর বাঁচিয়া নাই, তখন অসংখ্য মানুষ শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। তাঁর এই মৃত্যু সম্পর্কে সমর বিভাগ থেকে একটি অদ্ভুত বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল:

Army-Navy Casualty List Washington, April 13—Following are the latest casualties in the military services, including next-of—kin.

Army-Navy Dead—Roosevelt, Franklin D, Commander in Chief, wife Mrs. Anna Eleanor Roosevelt, the White House.

মার্কিন সশস্ত্রবাহিনীর সর্বোচ্চ সেনাপতির মৃত্যু-সংক্রান্ত এই বিজ্ঞপ্তি সামরিক ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। মিসেস রুজভেল্ট মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, তাঁর স্বামী "সৈনিকের মত মৃত্যু বরণ করিয়াছেন।"

হোয়াইট হাউসে অবিলম্বেই মন্ত্রিসভার জরুরী অধিবেশন ডাকা হইল এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান প্রেসিডেন্টরূপে শপথ গ্রহণ করিলেন এবং ঘোষণা করিলেন তিনি পরলোকগত প্রেসিডেন্টের নীতি ও পদাঙ্ক অনুসরণ করিবেন—যদিও

এই আকস্মিক গুরুদায়িত্ব বহনের জন্য তিনি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না এবং শেষ পর্যন্ত রুজভেল্টের আদর্শ ও নীতির প্রতিও তিনি নিষ্ঠা রাখিতে পারিলেন না।

অপরাহ্নে এই মৃত্যু সংবাদের প্রচারে গোটা আমেরিকা সেদিন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল এবং তাঁর শোকযাত্রায় ওয়াশিংটনে অসংখ্য লোক যোগ দিয়াছিলেন।

* * *

১৩ই এপ্রিল, ১৯৪৫, শুক্রবার সকালে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টান চার্চিল প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের এই মৃত্যুসংবাদ পাইলেন এবং গভীর শোকে অভিভূত হইলেন। তিনি তাঁর যুদ্ধের বইতে লিখিয়াছেন যে, তিনি যেন এই অপ্রত্যাশিত সংবাদের দ্বারা 'একটা গুরুতর দৈহিক আঘাত পাইলেন।" যুদ্ধের ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে তাঁর সহায়তা, সাহচর্য ও অন্তরঙ্গতা স্মরণ করিয়া চার্চিলের মনে হইল এই ক্ষতি অপূরণীয়—বিশেষতঃ ইতিহাসের এই সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে। তিনি মিসেস রুজভেল্টের (যাঁকে তিনি ধৈর্যশীলা ও মহিয়সী মহিলা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন) কাছে এবং হ্যারি হপকিন্স ও নূতন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের কাছে গভীর সমবেদনাপূর্ণ বার্তা পাঠাইলেন এবং যুদ্ধে চরম জয়ের আশা ব্যক্ত করিলেন।

চার্চিলের প্রস্তাব অনুযায়ী সেদিন কমন্সসভার অধিবেশন সর্বসম্মতিক্রমে স্থগিত রাখা হইল। চার্চিল নিজেই বলিয়াছেন যে, কোন 'বিদেশী রাষ্ট্রনায়কের' মৃত্যুতে কমন্সসভার অধিবেশন স্থগিত রাখা এক অভূতপূর্ব ঘটনা।(৩)

মস্কোতেও কালো রঙের বর্ডার দেওয়া পতাকা উত্তোলিত হইল এবং সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশনে সদস্যগণ দণ্ডায়মানপূর্বক শোকনম্র চিত্তে রুজভেল্টের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। রাশিয়ার সমস্ত সংবাদপত্রে রুজভেল্টের জন্য গভীর বিয়োগবেদনা প্রকাশ করা হইল।

চার্চিল ও স্ট্যালিনের মধ্যে শোকবার্তার বিনিময় হইল এবং নূতন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নিকট স্ট্যালিন সোভিয়েত সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে গভীর সমবেদনা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন এবং রুজভেল্টকে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনেতারূপে বর্ণনা করিলেন—যে রাষ্ট্রনেতা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করিতে চাহিয়াছিলেন। স্ট্যালিন তাঁর বার্তায় বৃহৎ শক্তিবর্গের পারস্পরিক সহযোগিতার উপরেও জোর দিলেন।

সোভিয়েত রাশিয়াতে কেবল সরকারী স্তরে নয়, জনসাধারণের মধ্যেও শোকের ছায়া নামিয়া আসিল। প্রত্যক্ষদর্শী মিঃ আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থ লিখিয়াছেন যে, ইয়াল্টা সম্মেলনেই রুজভেল্ট পীড়িত ছিলেন এবং তাঁকে খুব শীর্ণ দেখাইতেছিল। মস্কোর মেট্রোপোল হোটেলের বয়স্কা পরিচারিকা শ্রীমতী ফেনায়া ইয়াল্টাতেও রুজভেল্টের ব্যক্তিগত 'চেম্বারমেড্' ছিলেন। তিনি মস্কোতে ফিরিয়া আসিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিয়াছিলেন—"এত মিষ্টিস্বভাব, এত দয়ালু মানুষ, কিন্তু ভয়ঙ্কর পীড়িত ছিলেন।"

কেবল ফেনায়া নয়, সেদিনের রাশিয়ার হাজার হাজার নারী রুজভেল্টের মৃত্যু-সংবাদে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন।

(৩) চার্চিল—ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১২

অক্ষ শক্তিবর্গের মনেও রুজভেল্টের এই আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। জাপানের প্রধানমন্ত্রী অ্যাডমিরাল সুজুকি আমেরিকার জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁদের নেতার মৃত্যুতে 'গভীর সমবেদনা' প্রকাশ করিলেন এবং মন্তব্য করিলেন—'এই নেতার জন্যই আমেরিকানরা আজ এই সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছিয়াছে।'

অপর পক্ষে জার্মান রেডিওতে ঘোষণা করা হইল—"ইতিহাসে রুজভেল্টের নাম এই বলিয়া চিহ্নিত থাকিবে যে, ইনি সেই ব্যক্তি যাঁর প্ররোচনায় বর্তমান যুদ্ধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরিণত হইয়াছিল এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্টরূপে তাঁর বৃহত্তম শত্রু বলশেভিক সোভিয়েত ইউনিয়নকে ক্ষমতায় আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।(৪)

ফ্রান্সে এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশে গীর্জায় গীর্জায় প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হইল। জেনারেল দ্য গল স্বয়ং প্যারিসের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।...

হিটলারী শিবিরে উল্লাস

হিটলারী শিবিরে এক অদ্ভুত পাগলামির দৃশ্যের অবতারণা হইল যদিও সমগ্র জার্মানী এবং রাজধানী খাস বার্লিন শত্রুর আক্রমণের মুখে বিপন্ন, তথাপি হিটলার এবং তাঁর একান্ত ভক্ত কয়েকজন অনুচর বিশেষভাবে গোয়েবেলস্ তখনও এই বলিয়া নিজেদেরকে আশ্বাস দিতেছিলেন যে, শেষ মুহূর্তে এমন একটা 'মিরাক্যাল' বা অঘটন ঘটিবে, যার ফলে জার্মানী রক্ষা পাইয়া যাইবে।

হিটলার বিগত নভেম্বর মাসেই (১৯৪৪) পূর্ব প্রুশিয়ায় তাঁর র‍্যাস্তেনবুর্গের সদর দপ্তর ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। কারণ, বিজয়ী লালফৌজ আগাইয়া আসিতেছিল। তারপর থেকে তিনি বার্লিনেই অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ডিসেম্বর মাসে পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে আর্দেনেস অঞ্চলে পাল্টা আক্রমণ চালাইবার জন্য তিনি জিয়েগেনবার্গে (Ziegenberg) তাঁর সদর দপ্তর স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু আর্দেনেসের এই বেপরোয়া অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি ১৬ই জানুয়ারী আবার বার্লিনে ফিরিয়া আসিলেন এবং সেখানে চ্যান্সেলারি বা মন্ত্রিভবনের ৫০ ফুট ভূগর্ভের নিম্নে যে বিখ্যাত (বা কুখ্যাত?) বাঙ্কার বা আশ্রয়শালা নির্মিত হইয়াছিল বিমান আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য, সেখানে তিনি আশ্রয় নিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। এদিকে মিত্রপক্ষীয় বিমানবহরের প্রচণ্ড বোমাবর্ষণে মন্ত্রিভবনের বিশাল মার্বেল হল ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। এখানে তিনি তাঁর পাত্রমিত্র নিয়া অবস্থান করিতেছিলেন বার্লিন ও জার্মানীর বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের আক্রমণ রোধ ও সৈন্যবাহিনী পরিচালনার জন্য। যদিও হিটলারের দৈহিক শক্তি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তবু সেই অবস্থাতেও তাঁর মানসিক শক্তি অটুট ছিল এবং তিনি নিজে ও তাঁর পাত্রমিত্রেরা বিশ্বাস করিতেন যে, শেষ মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটিবেই।...

হিটলার যে সমস্ত সামরিক গ্রন্থ ও ইতিহাস পড়িতে ভালোবাসিতেন সেগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল মনীষী কার্লাইল রচিত ফ্রেডেরিক দি গ্রেটের ইতিহাস। এপ্রিল মাসের এক সন্ধ্যায় গোয়েবেলস সেই ইতিহাস থেকে একটা অধ্যায় হিটলারকে পড়িয়া

(৪) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪১৩

শুনাইতেছিলেন। সাত বছর যুদ্ধ চালাইয়া ফ্রেডেরিক দি গ্রেট তখন পরাজয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে অন্ধকার পর্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তখন রাজা ফ্রেডেরিক তাঁর মন্ত্রি-বর্গকে বলিলেন—যদি ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে যুদ্ধের গতির পরিবর্তন না হয়, যদি সেই গতি ভালোর দিকে না যায়, তবে তিনি রণে ক্ষান্ত দিবেন এবং বিষপানপূর্বক জীবনের অবসান ঘটাইবেন। এই অধ্যায়টিই গোয়েবেলস্ তাঁর প্রভুকে পড়িয়া শুনাইতেছিলেন অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গীতে এবং সেই অধ্যায়ের এক জায়গায় ছিল—'বীর রাজা, আর একটু ধৈর্য ধরুন। আপনার ভাগ্যসূর্য মেঘমুক্ত হইয়া শীঘ্রই পূর্ণ দীপ্তি নিয়া দেখা দিবে। সেই লক্ষণ ইতিমধ্যেই প্রকাশমান। ১২ই ফেব্রুয়ারী জারিনা (রানী বা সম্রাজ্ঞী) মারা গেলেন এবং ব্রাণ্ডেনবুর্গ রাজবংশের মিরাক্যাল ঘটিয়া গেল।'

অর্থাৎ ফ্রেডেরিক জয়লাভ করিলেন। ইতিহাসের এই অংশ শুনিতে শুনিতে হিটলারের চোখে জল আসিল।(৫)

এদিকে আর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৩৩, হিটলারের একটা ঠিকুজি তৈয়ার হইয়াছিল। ঐদিন তিনি ক্ষমতায় আসিয়াছিলেন। আর একটা ঠিকুজি কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কর্তৃক ৯ই নভেম্বর, ১৯১৮ তারিখে তৈয়ারি হইয়াছিল ভেইমার রিপাব্লিকের ভাগ্য সম্পর্কে। এই দুই ঠিকুজিতেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল যে, ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধিবে এবং ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ক্রমাগত জয়লাভ ঘটিবে। কিন্তু তারপর কতকগুলি পরাজয় ঘটিবে এবং সর্বাপেক্ষা বিষম পরাজয় ঘটিবে ১৯৪৫ সালের প্রথম ভাগে—বিশেষতঃ এপ্রিল মাসের প্রথম অর্ধভাগে। এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় অর্ধভাগে সামরিক সাফল্য ঘটিবে। তারপর আগস্ট মাস পর্যন্ত একটা অচল অবস্থা দেখা দিবে এবং সেই সঙ্গেই শান্তি। কিন্তু পরবর্তী তিন বছর জার্মানীর খুব খারাপ অবস্থা যাইবে। কিন্তু ১৯৪৮ সালে জর্মানী আবার উঠিয়া দাঁড়াইবে।(৬)

একদিকে কার্লাইল এবং অন্যদিকে ঠিকুজির ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রচারবিশারদ গোয়েবেলস ৬ই এপ্রিল তারিখে সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যে এক মর্মস্পর্শী আবেদনে বলিলেন—"ফুরার ঘোষণা করেছেন যে, এই বছরেই আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন ঘটিবে। সত্যকার প্রতিভার লক্ষণ হচ্ছে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী আগেই জানতে পারা। একমাত্র ফুরারই সেই পরিবর্তনের মুহূর্তটি জানেন। ভাগ্যদেবতা তেমন এক ব্যক্তিকে আমাদের নিকট পাঠিয়েছেন, একমাত্র তিনিই জানেন কখন সেই মিরাক্যাল বা দৈবঘটনা ঘটবে।"...

এই ঘটনার এক সপ্তাহ পর ১২ এপ্রিল রাত্রে যখন মার্কিন সৈন্যেরা ডেসাউ-বার্লিন অটোব্যান সড়ক দিয়া আগাইতেছিল এবং অগ্রসরমান লালফৌজের কামান গর্জন বার্লিন থেকে শুনা যাইতেছিল, তখনও গোয়েবেলস দৈবঘটনার প্রতীক্ষায় ছিলেন এবং একজন অফিসার যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—এবার জারিনা কে হবেন?'

(৫) শাইরার, পৃষ্ঠা ১৩১৬
(৬) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৩১৭

তখন গোয়েবেলস জবাব দিলেন—'জানি না বটে, তবে, ভাগ্যে যে কোন ব্যাপার ঘটতে পারে।'...

সেদিন রাত্রে বার্লিনের উপর মিত্রবাহিনীর বোমাবর্ষণের পর যখন সাইরেনে মোক্ষধ্বনি ('অল্ ক্লিয়ার্') বাজিয়া উঠিল, তখন প্রচার মন্ত্রিভবনের ভূগর্ভ আশ্রয় থেকে প্রেস সেক্রেটারি রুডলফ সেমলার একটি টেলিফোন-বার্তা পাইলেন। সরকারী জার্মান নিউজ এজেন্সির একজন অফিসার টেলিফোনে বলিলেন—

'হ্যালো, শুনন, একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটেছে। রুজভেল্ট মারা গেছেন!"

'তুমি কি ঠাট্টা করছো?'

'না,. ই মাত্র রয়টারের খবর এলো—রুজভেল্ট আজ দ্বিপ্রহরে মারা গেছেন!'

তখনই খবরটা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল এবং একজন চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'এই সেই দৈবঘটনা যার অপেক্ষায় আমরা ছিলুম।'

কয়েকজন অফিসার তাড়াহুড়া করিয়া গোয়েবেলসের দপ্তরে গিয়া হাজির হইলেন। গোয়েবেলসের গাড়ি মাত্র তখনি দপ্তরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেছিল, আর মিত্রপক্ষের বোমাবর্ষণের জন্য তখন একটি হোটেল ও মন্ত্রিভবনের অট্টালিকা জ্বলিতেছিল। অগ্নিশিখায় সেই অঞ্চলটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, গোয়েবেলসকে দেখিতে পাইয়া একজন রিপোর্টার বলিয়া উঠিলেন—'মন্ত্রী মহাশয় রুজভেল্ট মারা গেছেন।'

গোয়েবেলস খবরটা শুনিয়া গাড়ি থেকে লাফাইয়া পড়িলেন এবং যে কয়েকজন অফিসার সেখানে একত্র হইয়াছিলেন, তাঁরা উত্তেজিতভাবে মন্ত্রিমহোদয়কে ঘিরিয়া ধরিয়াছিলেন। গোয়েবেলস আবেগজড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—'আমাদের সব চয়ে ভালো শ্যাম্পেন নিয়ে এসো, আর এসো আমরা ফুরারের সঙ্গে কথা বলি।'

গোয়েবেলস তাঁর দপ্তরে ঢুকিবা মাত্র প্রেস সেক্রেটারি সেমলার আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, গোয়েবেলসের দিকে চেঁচাইয়া খবরটা বলিলেন।

আর গোয়েবেলস মন্তব্য করিলেন —'এবার ইতিহাসের মোড় ঘুরছে।'

তারপর অবিশ্বাসের সুরে বলিলেন—'খবরটা কি সত্যি?'

গোয়েবেলস তখন হিটলারকে টেলিফোন করিলেন, আর জনাদশেক লোক গোয়েবেলসের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল এবং গোয়েবেলস অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে টেলিফোনে হিটলারকে বলিলেন—'আমার ফুরার, আপনাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। রুজভেল্ট মারা গেছে। রাশিনক্ষত্রেই লেখা ছিল এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমাদের বরাত খুলে যাবে। আজ শুক্রবার, ১৩ই এপ্রিল। মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত, ভাগ্য আপনার সবচেয়ে বড় শত্রুকে নিপাত করেছে। ভগবান আমাদের ত্যাগ করেন নি। দু'বার আপনাকে বর্বর হত্যাকারীদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। ১৯৩৯ এবং ১৯৪৪ সালে শত্রুরা আপনাকে খুন করতে চেয়েছিল। আর আজ আমাদের সব চেয়ে ভয়ঙ্কর শত্রু খতম হয়েছে। এটাই সেই মিরাক্যাল বা দৈবঘটনা।'

হিটলার টেলিফোনে এই সমস্ত শুনিলেন এবং বলিলেন যে, এখন যে কোন ঘটনাই ঘটতে পারে। 'ট্রুম্যান রুজভেল্টের তুলনায় অনেক বেশী মডারেট হতে পারেন।'

গোয়েবেলস এত উল্লসিত হইলেন যে, প্রেস সেক্রেটারি সেমলারের মনে হইল যুদ্ধ যেন শেষ হইয়া গিয়াছে! এমন কি হিটলারের অর্থমন্ত্রী অভিজাত বংশের বিখ্যাত কাউন্ট Schwerin Von Krosigk পর্যন্ত এই ঘটনার মধ্যে 'ইতিহাসের দেবদূতের পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন' এবং গোয়েবেলসকে অভিনন্দন জানাইয়া লিখিতভাবে মন্তব্য করিলেন –

"রুজভেল্টের মৃত্যুর মধ্যে ভগবানের ন্যায়বিচার প্রতিফলিত হয়েছে।"—(৭)

ইউরোপীয় যুদ্ধের যবনিকা পড়ার আর বেশী দিন বাকী ছিল না। কিন্তু তার আগে বার্লিনে হিটলারী সাঙ্গোপাঙ্গোদের মধ্যে যেন চূড়ান্ত পাগলামির অভিনয় হইয়া গেল।…

অবশ্য গোয়েবেলসের টেলিফোনের জবাবে হিটলারের প্রতিক্রিয়ার কোন লিখিত দলিল পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু হিটলারও যে রুজভেল্টের মৃত্যুকে ভাগ্যদেবতার ইঙ্গিত ও দৈবঘটনা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ বার্লিনে 'বলশেভিকদের আক্রমণ যে রক্তের বন্যায় ডুবিয়া যাইবে' এমন আশা তিনি প্রকাশ করিলেন সৈন্যদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত একটি দীর্ঘ বিবৃতিতে এবং এই বিবৃতিই ছিল জার্মান জনগণ ও প্রতিরক্ষাকারী বাহিনীর উদ্দেশে তাঁর 'শেষ' আহ্বান। এই আহ্বানের উপসংহারে তিনি বলিলেন—"এই সন্ধিক্ষণে ভাগ্যদেবতা পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বকালের সবচেয়ে বড় যুদ্ধাপরাধী রুজভেল্টকে অপসারণ করিয়াছেন। সুতরাং এখন থেকেই এই যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া যাইবে।"(৮)

যুদ্ধের মোড় অবশ্য অনেক আগেই ঘুরিয়াছিল। কিন্তু সেটা হিটলার ও নাৎসী জার্মানীর ধ্বংসের মধ্যে।

(৭) The Last Hundred Days, John Toland, p. 417-419.

(৮) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪৪২

নবম পর্ব

তৃতীয় অধ্যায়

বার্লিন দখলের অভিযান

যদিও জার্মানীর ইতিহাস-বিখ্যাত রাজধানী বার্লিন শহর দখলের অভিযান শুরু হইয়াছিল এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে, তথাপি লালফৌজ পশ্চিম রণাঙ্গনে বিব্রত মিত্রপক্ষীয় বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য অত্যন্ত কদর্য আবহাওয়া ও ঠাণ্ডা উপেক্ষা করিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করিয়াছিল জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে। সোভিয়েত বাহিনীর কৃতিত্ব এই যে, ১ জানুয়ারী তারিখে 'অসময়ে' (অর্থাৎ সেই সময় আক্রমণের জন্য সোভিয়েত সমর কর্তৃপক্ষ তেমন প্রস্তুত ছিলেন না) জার্মানীর বিরুদ্ধে যে অভিযান শুরু হইয়াছিল, চার মাস পর বার্লিন দখলের আগে সেটা আর শেষ হইল না।

ভিশ্চুলা থেকে ওডর নদী অভিমুখে সোভিয়েত বাহিনীর এই অভিযান জার্মানীর নিকট কিছুটা অপ্রত্যাশিত ছিল। অবশ্য এই দুই নদীর মধ্যে মধ্যে তারা ৭টি প্রতিরক্ষার লাইন গাড়িয়া তুলিয়াছিল। কারণ, ওয়ারশ থেকে বার্লিন অভিমুখে রুশ আক্রমণের সম্ভাবনা সম্পর্কে তারা সচেতন ছিল বটে কিন্তু জার্মানী মনে করিয়াছিল 'মধ্য রণাঙ্গনের' এই অভিযানের আগে কোরল্যাণ্ডে (বাল্টিক অঞ্চলের অন্তর্গত) আটকা পড়া ৩০ ডিভিসন জার্মান সৈন্যকে খতম না করিয়া সোভিয়েত বাহিনী এই দিকে অগ্রসর হইবে না। এমন কি, তার আগে হাঙ্গেরীকে জার্মানীর কবলমুক্ত না করিয়া ছাড়িবে না। কিন্তু তার আগেই ১নং বেলোরুশিয়ান এবং ১নং উক্রাইনীয়ান ফ্রন্টের (ফ্রন্ট অর্থে আর্মিগ্রুপ—৩ থেকে ৮টি পর্যন্ত বাহিনী নিয়া গঠিত ১৬৩ ডিভিসন সৈন্য কিংবা মোট ২২ লক্ষ লোক ও বহু সহস্র ট্যাঙ্ক, কামান ও বিমান নিয়া জয়যাত্রা শুরু করিল। ওয়ারশ-বার্লিন ছিল এই অভিযানের মুখ্যপথ এবং শত্রুর তুলনায় তখন লালফৌজ সব দিক দিয়াই অধিকতর শক্তিশালী ছিল। যেমন—সৈন্যসংখ্যা ৫.৫ গুণ, কামান ৭.৮ গুণ, ট্যাঙ্ক ৫.৭ গুণ এবং বিমান ১৭.৬ গুণ বেশী। (সোভিয়েত সরকারী ইতিহাসের মতে)।

১৮ জানুয়ারীর মধ্যে এই বিপুল অভিযানের রূপরেখা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল :

১। জেনারেল কোনেভ দক্ষিণ পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া শিল্পসমৃদ্ধ সাইলেশিয়া অভিমুখে।

২। জেনারেল ঝুকোভ মধ্য পোল্যাণ্ডের ভিতর দিয়া জার্মানীর মর্মস্থলের দিকে।

৩। জেনারেল রকোসোভোস্কি উত্তর পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া ডানজিগ অভিমুখে।

৪। দক্ষিণে চতুর্থ উক্রাইনীয়ান ফ্রন্টের জেনারেল পেট্রোভ কার্পেথিয়ান পর্বতের দিকে এবং উত্তর দিকে—

৫। জেনারেল চেরনিয়াখোভস্কি তৃতীয় বেলোরুশিয়ান ফ্রন্টের অধিনায়করূপে পূর্ব প্রুশিয়ার ভিতরের দিকে।

এই পাঁচটি ফ্রন্ট বা আর্মিগ্রুপ জার্মানী অভিমুখে যেন দুর্বার গতিতে অগ্রসর হইতেছিল। ২১ জানুয়ারীর মধ্যে ঝুকোভ ১৯৩৮ সালের জার্মান সীমানা অতিক্রম

করিয়া পোজনানের জার্মান দুর্গ ঘিরিয়া ফেলিল এবং ওডের নদীতীরস্থ ফ্রাঙ্কফুর্টের অভিমুখে জার্মানীর ব্রাণ্ডেনবুর্গ প্রদেশের মধ্যে প্রবেশ করিল। এই অবস্থার মধ্যে হিটলার তাঁর ক্ষমতালাভের দ্বাদশ বার্ষিকী উপলক্ষে যে বক্তৃতা দিলেন, মনে হইল তা গোরস্থানের ভাষণ। কেননা, তখন মাত্র একটি প্রতিবন্ধক বাকী ছিল—ওডের নদী এবং লালফৌজ কর্তৃক এই নদী পার হওয়ার পরেই জার্মানী খতম।…

বার্লিনে নিদারুণ আতঙ্কের সঞ্চার হইল। হাজার হাজার আশ্রয়প্রার্থী ভীড় করিতে লাগিল। বহু প্রকার গাড়িতে পলায়মান জনতা—স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ এবং বন্দীশালা থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত যুদ্ধবন্দী ও দাস-শ্রমিকের দল। বার্লিনকে নিরাপদ মনে করিয়া এই জনতা রাজধানী অভিমুখে ছুটিল। কিন্তু প্রচণ্ড শীতে, তুষারদংশনে এবং মিত্রপক্ষীয় বিমানের ভয়াবহ বোমাবর্ষণে অজস্র নর-নারী প্রাণ হারাইল। মাইলের পর মাইল আগুনে জ্বলিয়া গেল এবং পূর্বদিক থেকে উদ্বাস্তু স্রোত পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইল। আক্রান্ত প্রুশিয়ার বিখ্যাত ট্যানেনবার্গ (প্রথম মহাযুদ্ধের) থেকে জার্মানী কর্তৃক হিণ্ডেনবুর্গ ও তাঁর স্ত্রীর দেহাবশেষ বার্লিনে অপসারিত হইল। আর জার্মান সামরিক ভাষ্যকার জেনারেল ডিটমার রেডিও যোগে ঘোষণা করিলেন—'পূর্ব-রণাঙ্গনের অবস্থা অবিশ্বাস্য রকমের গুরুতর।'(১)

কিন্তু এই চরম দুর্গতি এবং বিষম বিপদ সত্ত্বেও জার্মান সৈন্যেরা অপরিসীম বীরত্বের সঙ্গে রুশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে। দলে দলে এবং হাজারে হাজারে মৃত্যুবরণ করিয়াছে, তবু 'বর্বর বলশেভিকদের' হাতে ধরা দিতে চাহে নাই। কারণ, তারা একথা বুঝিয়াছিল যে, রাশিয়াতে তারা যে ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিয়াছে এবং রুশ যুদ্ধবন্দীদের যেভাবে হত্যা করিয়াছে, তাতে রুশদের হাতে ধরা পড়িলে জার্মানদের আর রক্ষা নাই। অতএব মরিয়া হইয়া তারা যুদ্ধ করিয়াছে।

আর এদিকে পশ্চিমের ইঙ্গ-মার্কিন মিত্রবাহিনীও পশ্চিম ও দক্ষিণ জার্মানীর দিকে ধাবমান। কিন্তু দক্ষিণ জার্মানীর ব্যাভেরিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের নিরাপদ দুর্গে দুর্ধর্ষ নাৎসীবাহিনীর শেষ 'জাতীয় প্রতিরক্ষার আশ্রয়' (ন্যাশনাল রিডাউট) গড়িয়া উঠিবে—এটা ছিল নিতান্তই সাজানো গুজব এবং গোয়েবেলসের অতি কৌশলপূর্ণ প্রোপাগাণ্ডার সাফল্য। অবশ্য কিছু-কিছু সরকারী দপ্তর দক্ষিণদিকে অপসারিত হইয়াছিল এবং কিছু কিছু নাৎসী নেতাও সেদিকে পালাইয়াছিলেন। কিন্তু হিটলার বার্লিন ছাড়িয়া এক পা নড়িতে রাজী ছিলেন না।

* * *

১৯৪৫ সালের বসন্তকালে কেবল সোভিয়েত বাহিনীই নয়, মিত্রবাহিনীও জার্মানীর অভ্যন্তরে রণক্রিয়ায় লিপ্ত ছিল। লালফৌজ যখন বার্লিন থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরে তখন ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী হামবুর্গ-উইটেনবার্গ-ম্যাগডেবার্গ রণক্ষেত্রের লাইন ধরিয়া এপ্রিলের মধ্যভাগে এলবে নদীতীরে পৌঁছিল। সেখান থেকে তাদের অগ্রগতি ন্যুরেমবার্গ এবং স্টাটগাটের দিকে। বার্লিন থেকে তখন মিত্রবাহিনীর

(১) আলেকজান্ডার ওয়ার্থ, পৃষ্ঠা ৮৫১-৫৩

দূরত্ব ছিল ১০০ থেকে ১২০ কিলোমিটার। কিন্তু তার আগে মস্কোতে একটি ছোট্ট —কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নাটকীয় ঘটনার অবতারণা হইয়াছিল।

* * *

কিন্তু সেই ঘটনা বলার আগে মহাযুদ্ধের চূড়ান্ত বছর ১৯৪৫ সাল সম্পর্কে উল্লেখ করা দরকার যে. হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার আন্তর্জাতিক মর্যাদা খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। যুদ্ধের আগে যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মাত্র ২৫টি দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল, সেখানে যুদ্ধ জয়ের জন্য ১৯৪৫ সালে ৪১টি দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সর্বোপরি সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক আদর্শের মতবৈষম্য থাকা সত্ত্বেও 'সাধারণ শত্রু' ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে বৃটেন, আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে ঐতিহাসিক মহাজোট বা গ্রেট কোয়ালিশনের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ১৯৪৫ সালের আরম্ভে ইউরোপের রণনৈতিক পরিস্থিতি রাশিয়া, আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনীর পক্ষে অনুকূল ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্মরণে রাখা দরকার যে, জার্মানীর অবস্থা বা পজিশন খুব খারাপ হওয়া সত্ত্বেও, তখনও তার সৈন্যশক্তি প্রচুর ছিল। জার্মান আর্মিতে তখন ৭৪ লক্ষ ১৬ হাজার লোক ছিল। এর মধ্যে ৫৩ লক্ষ ৪৩ হাজার সৈন্য ছিল প্রত্যক্ষরূপে রণাঙ্গনের কাজে এবং সেই সমস্ত সৈন্যের মধ্যে ৩১ লক্ষ ছিল পূর্ব রণাঙ্গনে। আর তাদের অস্ত্রের সংখ্যা ছিল ২৮৫০০ কামান ও মর্টার, ৩৯৫০ ট্যাঙ্ক ও গান্, এবং ১৯৬০ ছিল বিমান। অবশ্য ১৯৪৪ সালের তুলনায় এটা কম ছিল। কারণ, ইতিমধ্যে রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ও ফিনল্যাণ্ড রণক্ষেত্র থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হইয়াছিল।

অপর পক্ষে ১৯৪৫ সালের জানুয়ারীতে ১৯৪৪ সালের মতই সোভিয়েত বাহিনীতে ১ কোটি ১৫ লক্ষ ৫৬ হাজার সৈন্য ছিল। এর মধ্যে রণাঙ্গনে ছিল ৬০ লক্ষ। কামান ও মর্টার ছিল ৯১ হাজার ৪ শত, রকেট নিক্ষেপকারী ছিল ২৯৯৩, ১১ হাজার ট্যাঙ্ক ও স্বয়ংচালিত কামান ও ১৪ হাজার ৫ শত বিমান (লেনিনগ্রাদ ও দক্ষিণ-পূর্ব বুলগেরিয়া ছাড়া)।[১] পোলিশ, চেক, রুমানীয় ও বুলগেরিয়ান সৈন্যেরাও (মোট ২৯ ডিভিসন ৫ ব্রিগেড) লালফৌজের সঙ্গে একত্র লড়িয়াছিল. এবং তাদের মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ২৬ হাজার ৫ শত এবং সমরসম্ভারের মধ্যে ছিল ৫ হাজার ২ শত কামান ও ২ শত ট্যাঙ্ক. একটি ফরাসী বিমান ইউনিটও সোভিয়েত বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছিল (২)

পশ্চিমের মিত্রপক্ষের তখন ৮৭টি পুরো ডিভিসন সৈন্য, ৬ হাজার ৫ শত ট্যাঙ্ক ও ১০ হাজারের বেশী রণবিমান ছিল। আর বিপরীত দিকে জার্মানীর ছিল ৭৪টি নিম্নমানের ডিভিসন ও ৩ ব্রিগেড সৈন্য, ১ হাজার ৬ শত ট্যাঙ্ক ও 'আঘাতকারী কামান' এবং ১,৭৫০টি রণবিমান। অর্থাৎ পশ্চিমের মিত্রপক্ষ সৈন্যসংখ্যায় ও মারাত্মক অস্ত্রশক্তিতে জার্মান বাহিনীর তুলনায় অনেক বেশী বলশালী ছিল। ইতালীতে ও

(2) Great Patriotic War of the Soviet Union—Moscow, p. 350-52.

বলকানেও মিত্রপক্ষের শক্তি বেশী ছাড়া কম ছিল না। কিন্তু তবু তাদের দ্রুতগতি জয় হইল না। অন্যদিকে সোভিয়েত বাহিনী সমগ্র রণাঙ্গন ব্যাপিয়া অর্থাৎ ভিশ্চুলা নদীর মুখ থেকে ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া) পর্যন্ত আঘাত করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু আসল আক্রমণের পথ ছিল ওয়ারশ' থেকে বার্লিন। সুতরাং জার্মানীও বার্লিনের প্রবেশ-পথে বাধা দেওয়ার জন্য পরপর ৭টি প্রতিরক্ষার লাইন তৈরী করিয়াছিল। ভিশ্চুলা ও ওডের নদীর মধ্যবর্তী পোলিশ ভূমির মধ্য দিয়া ৫০০ কিলো মিটার গভীর আত্মরক্ষার ব্যূহ তৈরী হইয়াছিল এবং পুরাতন জার্মান-পোলিশ সীমান্তে ওডের নদী বরাবর জার্মানদের বাধাদান বেশ প্রচণ্ড ছিল। (৩)

* * *

রাইন নদী পার হওয়ার পর ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী আর জার্মানীর কাছ থেকে তেমন বাধার সম্মুখীন হইল না। সুতরাং তারাও জার্মানীর অভ্যন্তরে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল এবং বার্লিনের দখল নিয়া মিত্রপক্ষীয় মহলে যে বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছিল, তা আগেই বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ভিয়েনা ও বার্লিন লালফৌজের দখলে গেলে রণনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক দিয়া সোভিয়েত রাশিয়াই ইউরোপে অজেয় হইয়া উঠিবে, বৃটিশপক্ষ এবং বিশেষভাবে চার্চিল এই আশ-ঙ্কায় ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যাপত্যের উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। যদিও পশ্চিম রণাঙ্গনে মার্কিন সুপ্রীম কমাণ্ডার জেনারেল আইজেনহাওয়ার বার্লিনের রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব স্বীকার করিতে তেমন রাজী ছিলেন না, তবু লণ্ডন এবং ওয়াশিংটনের সরকারী মহলে লালফৌজের আগে বার্লিনে পৌঁছিবার জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল।

এই সময় মস্কোতে সেই নাটকীয় ঘটনাটির অবতারণা হইল, যে কথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে।...

সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল আইভান কোনভের বার্লিন যুদ্ধ সংক্রান্ত স্মৃতি-কথায় দেখা যায়—

১৯৪৫ সালের ১লা এপ্রিল সুপ্রীম কমাণ্ডার-ইন-চীফ মার্শাল স্ট্যালিন হঠাৎ ১নং বেলোরুশিয়ান ফ্রন্টের প্রধান সেনাপতি মার্শাল জুকোভ এবং ১নং উক্রাইনীয়ান ফ্রন্টের অধিনায়ক মার্শাল আইভান কোনেভকে মস্কোর সদর দপ্তরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ক্রেমলিনে স্ট্যালিনের সুবৃহৎ পাঠকক্ষে কনফারেন্সের জন্য একটি সুদীর্ঘ টেবিল ছিল এবং প্রাচীরগাত্রে ছিল অতীত রাশিয়ার জাতীয় বীর সেনানী সুভোরোভ ও কুটোজোভের প্রতিকৃতি। রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটির বিশিষ্ট সদস্য—সেনানীমণ্ডলীর প্রধান এ আই আন্তানোভ এবং অপারেশন কমাণ্ডের প্রধান এস এম স্তেমেঙ্কো (Shtemenko) প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। স্ট্যালিন জুকোভ ও কোনেভকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইবার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—

'পরিস্থিতি কি দাঁড়াচ্ছে সে বিষয়ে আপনারা কিছু খবর রাখেন?'

জুকোভ ও কোনেভ জবাব দিলেন যে, তাঁরা তাঁদের প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী খবর রাখেন।

---

(৩) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩৫৩

স্ট্যালিন তখন স্তেমেংকোর দিকে তাকাইলেন এবং টেলিগ্রামটি পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন। স্তেমেংকো যে তারবার্তা পড়িয়া শুনাইলেন তার মর্ম এই:

"—the U. S British Command was staging an operation to capture Berlin with the aim of taking the city before the Soviet Army could do it. The main forces were being organised under the command of Field Marshal Montgomery. The direction of the main attack was being planned north of the Ruhr, via the shortest road between Berlin and the main British forces."

'সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী কর্তৃক বার্লিন অধিকার ও শহর দখল করার আগেই মার্কিন ও বৃটিশ সৈনাপত্য বার্লিন দখলের উদ্দেশ্যে রণক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেছে। ফিল্ড মার্শাল মন্টগোমারীর অধীনে প্রধান সৈন্যদল সংগঠিত হইতেছে। বার্লিন ও প্রধান বৃটিশ বাহিনীগুলির মধ্যে সংক্ষিপ্ততম রাস্তা ধরিয়া এবং রুড়ের শিল্পাঞ্চলের উত্তর দিক দিয়া এই মূল আক্রমণ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা চলিতেছে।"(৪)

টেলিগ্রামের মধ্যে মিত্রপক্ষের অন্যান্য প্রস্তুতির কথাও ছিল। সুতরাং স্তেমেংকোর পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্ট্যালিন জুকোভ ও কোনেভকে জিজ্ঞেস করিলেন:

"তা হলে বার্লিন কারা দখল করছে?—আমরা না মিত্রপক্ষীয়রা?"

মার্শাল কোনেভই আগে জবাব দিলেন এবং বলিলেন—'আমরাই আগে বার্লিন দখল করবো এবং মিত্রপক্ষের আগেই করবো।'

স্ট্যালিন একটু মৃদু হাসিয়া মন্তব্য করিলেন—'তা হলে আপনারা তেমন লোক? ...কিন্তু আপনি আপনার সৈন্যদলকে কিভাবে পুনর্গঠন করবেন? কারণ, আপনার আসল সৈন্যবাহিনী তো রয়েছে আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে অতএব আপনাকে পুনর্গঠনের জন্য অনেক কিছু করতে হবে।'

'কমরেড স্ট্যালিন, আপনি এ নিয়ে কোন দুর্ভাবনা করবেন না। যথা সময়ে বার্লিনের দিকে অভিযানের জন্য আমরা 'সমস্ত প্রকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিব।'—জবাব দিলেন মার্শাল কোনেভ।

আর জুকোভ বলিলেন যে, তাঁর সৈন্যেরা বার্লিন দখলের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। ১নং বেলোরুশিয়ান ফ্রন্ট সৈন্যবলে ও অস্ত্রবলে সুসজ্জিত হইয়া সংক্ষিপ্ততম পথে বার্লিন অভিযানের জন্য তৈয়ার হইয়া রহিয়াছে।

স্ট্যালিন তখন বলিলেন—'আচ্ছা বেশ, দু'জনে আপনাদের পরিকল্পনা সদর দপ্তরে বসে দু-একদিনের মধ্যেই ঠিক করে ফেলুন এবং সদর দপ্তরের অনুমোদিত পরিকল্পনা নিয়ে নিজ নিজ রণাঙ্গনে ফিরে যান।'

স্ট্যালিনের সঙ্গে এই আলোচনার ফলে বুঝা গেল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বার্লিন অভিযান করিতে হইবে। ১নং বেলোরুশিয়ান ফ্রন্টের অধিনায়ক জুকোভ সোজাসুজি

(৪) How Wars End—(Berlin Operation), Ivan Conev, Moscow, 1969, p. 9.

এবং নং উক্রাইনীয়ান ফ্রন্টের প্রধান সেনাপতি কোনেভ দক্ষিণ দিকে কটবাস (Kottbus) অঞ্চল হইয়া বার্লিন আক্রমণ করিবেন।

উভয় ফ্রন্টের সৈন্যেরাই মধ্যভাগে ড্রেসডেনের দিকে আক্রমণ চালাইয়া এলবে নদীতীরে পৌছিবে।(৫)

এখানে আর একটি তাৎপর্য্যব্যঞ্জক ঘটনা উল্লেখ করা দরকার। স্ট্যালিন যখন দুই প্রধান নায়কের সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন এবং আক্রমণের গতিপথ নিয়া আলোচনা করিতেছিলেন তখন তিনি একটি পেন্সিল দিয়া মানচিত্রের উপর ১নং বেলোরুশিয়ান ও নং উক্রাইনীয়ান ফ্রন্টের অগ্রগতির সীমারেখা টানিয়া দিতেছিলেন। কিন্তু বার্লিনের ৮০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে লুব্বেন (Lubben) শহরের দিকে আসিয়া তিনি তাঁর পেন্সিলের লাইন টানা হঠাৎ থামাইয়া দিলেন।

এই লাইন টানার পর স্ট্যালিন নিঃশব্দ রহিলেন। কিন্তু পরে তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন—

'Wno gets in first, let him take Berlin.

অর্থাৎ যিনি আগে ঢুকিতে পারিবেন, তিনিই বার্লিন দখল করুন। (৬)

বার্লিন দখলের জন্য লালফৌজের সাধারণ সৈন্য থেকে শুরু করিয়া অফিসারদের মধ্যে পর্যন্ত গভীর ঔৎসুক্য ও উত্তেজনা দেখা দিয়াছিল। এমন কি কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছেন যে, বার্লিন আক্রমণ ও দখল করার বিষয়ে তিন মার্শালের—জুকোভ, কোনেভ এবং রকোসোভোস্কির মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব পর্যন্ত দেখা দিয়াছিল। স্ট্যালিন তাঁর সদর দপ্তরের মানচিত্রের উপর লাইন টানিয়া অত্যন্ত কৌশলে এই প্রতিযোগিতার উস্কানি দিয়াছিলেন।

২নং বেলোরুশিয়ান ফ্রন্টের অধিনায়ক মার্শাল কে কে রকোসোভস্কি ৬ই এপ্রিল তারিখ স্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। তাঁকে ভার দেওয়া হইয়াছিল সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের উত্তর দিক দিয়া বার্লিন দখলে সহযোগিতা করার জন্য।

বার্লিন অভিযানের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য ছিল 'ভিশ্চুলা' নদী এবং 'সেণ্টার' বা মধ্য রণাঙ্গনের দুইটি জার্মান আর্মিগ্রুপকে ধ্বংস করিয়া বার্লিন দখল করা এবং সেই সঙ্গে এলবে নদীতে পৌছিয়া ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর সহিত মিলিত হওয়া। ইউরোপীয় যুদ্ধ শেষ করার এইটাই ছিল চূড়ান্ত পরিকল্পনা।

বার্লিনের দিকে যখন অভিযান চলিতে থাকিবে তখন চেকোস্লভাকিয়া আক্রমণ করাও সোভিয়েত বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল। এবং এই আক্রমণের লক্ষ্য ছিল চেকোস্লভাকিয়া থেকে যাতে জার্মান বাহিনী বার্লিনের দিকে অপসারিত হইতে না পারে, তেমন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা।

লালফৌজ কর্তৃক বার্লিন দখলের অভিযানে নাৎসী জার্মানী সর্বপ্রকার পণ করিয়া বাধা দিবে এবং পশ্চিমের ইঙ্গ-মার্কিন মিত্রবাহিনীকে তেমন কোন প্রতিরোধ করা হইবে না, সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ এই সম্ভাবনা পূর্বেই বিবেচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং

(৫) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৭২

(৬) Great Patriotic War of the Soviet Union—p. 377.

বার্লিন বেষ্টন ও জার্মানীকে আক্রমণের জন্ম সোভিয়েত হাইকমাণ্ড যে সামরিক শক্তির সমাবেশ করিলেন, তেমন শক্তি অন্য রণক্ষেত্রে দেখা যায় নাই। ঝুকোভ, কোনেভ এবং রকোসোভস্কি—এই তিন মার্শালের নেতৃত্বে তিনটি সম্মিলিত ফ্রন্টের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়াইল ২৫ লক্ষ, কামান ও মর্টার ৪২ হাজার, ট্যাঙ্ক ৬২৫০, রণবিমান ৭৫০০ এবং রকেট-নিক্ষেপক ১ হাজারের বেশী। আর আসল রণাঙ্গনের প্রতি কিলোমিটারে ২৫০টি কামান। অর্থাৎ জার্মান বাহিনীর তুলনায় সোভিয়েত বাহিনী রণক্ষেত্রের সৈন্যশক্তিতে এবং অস্ত্রশক্তিতে দ্বিগুণ থেকে চারগুণ বেশী বলশালী ছিল।

এই ঐতিহাসিক আক্রমণের তারিখ নির্দিষ্ট হইয়াছিল ১৬ এপ্রিল শেষ রাত্রি—কুস্ত্রিণ থেকে ওডের নদী পার হইয়া এই আক্রমণের বোধন করা হইবে।

* * *

কিন্তু একমাত্র বার্লিন শহর দখলের জন্য ১০ লক্ষ সৈন্য, ১০ হাজার ৪ শত ফিল্ডগান এবং অন্যান্য অস্ত্র ও সমরসম্ভারের সমাবেশ কি প্রয়োজনের তুলনায় মাত্রাতিরিক্ত ছিল না এবং ফলে অতিরিক্ত সৈন্যক্ষয় কি হইয়াছিল না?—এই প্রশ্ন সোভিয়েত মহল থেকে উঠিয়াছিল।(৭)

এই প্রশ্নের জবাবে বার্লিন যুদ্ধের অন্যতম সেনাপতি লেঃ জেনারেল কে. এফ টেলেগিন তাঁর এক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, হাঁ. কথাটা আংশিক সত্য, পুরাপুরি নয়। কুস্ত্রিন-বার্লিন মধ্য রণাঙ্গনের সংক্ষিপ্ততম পথে ১নং বেলোরুশিয়ান এবং ১নং উক্রাইনীয়ান ফ্রন্টের (আর্মি গ্রুপ) পারস্পরিক সহযোগিতায় বার্লিনের যুদ্ধ হয়তো আরও কম সৈন্য ও কম অস্ত্রশক্তির সহযোগিতায় জয় করা যাইত। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে, জার্মান হাইকমাণ্ড তাঁদের সর্বশক্তি বার্লিন প্রতিরক্ষার যুদ্ধে নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাঁরা ধরিয়াই লইয়াছিলেন যে, ওডের নদীর যুদ্ধেই বার্লিনের ভাগ্য চূড়ান্ত রূপে নির্ণীত হইয়া যাইবে। এজন্য বার্লিন রক্ষাকারী ৯নং আর্মির অধিকাংশকেই ওডের রণাঙ্গনের দিকে পাঠানো হইয়াছিল। বার্লিনের উত্তর দিক থেকে মার্শাল ঝুকোভের সৈন্যবাহিনীর পার্শ্বদেশে আক্রমণের পরিকল্পনায় জন্য কিছু মজুত সৈন্যও জমায়েত করিয়া রাখা হইয়াছিল জার্মানীও ১০ লক্ষ সৈন্য ১০ হাজার কামান ও মর্টার, প্রায় দেড় হাজার ট্যাঙ্ক এবং তিন হাজার রণবিমান সমাবেশ করিয়াছিল। অধিকন্তু বার্লিনের প্রতিরক্ষার জন্য প্রচণ্ড আয়োজন করা হইয়াছিল। এমন কি, পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে সৈন্য সরাইয়া আনিয়া পূর্ব দিকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল এবং পশ্চিমের ঘাঁটিও শহরগুলি থেকে জার্মান সৈন্যেরা স্বেচ্ছায় ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছিল। ১১ এপ্রিলের মধ্যেই মার্কিন বাহিনীর অগ্রবর্তী দল ম্যাগডেবুর্গে হাজির হইয়াছিল। এলবে নদীর বিস্তৃত রণাঙ্গনেও তাঁরা পৌঁছিয়াছিল। এমন কি ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর বিমান-সৈন্যেরা বার্লিনের সন্নিহিত অঞ্চলে অবতরণ করিয়া লালফৌজের আগেই বার্লিন শহর দখল করিয়া নিবে—সোভিয়েত কমাণ্ডের নিকট এই মর্মে রিপোর্ট পৌঁছিয়াছিল। মার্কিন বিমান-বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি জেনারেল গ্যাভিন সোভিয়েত সেনাপতি লেঃ জেনারেল

(৭) The Great March of Liberation, Moscow, 1972, p. 268.

টেলেগিনের নিকট এক সময় মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, রুশরা এক আশ্চর্য জাতি। ভিশ্চুলা থেকে ওডের নদী পর্যন্ত তাঁরা যেভাবে যুদ্ধ চালাইয়া আসিয়াছেন, তাতে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের ধারণা হইয়াছিল যে, মে মাসের মাঝামাঝির আগে সোভিয়েত সৈন্যেরা বার্লিনের দিকে অভিযান করিতে পারিবে না। কিন্তু কি আশ্চর্য তার আগেই তাঁরা বার্লিন দখল করিয়া নিয়াছিলেন। (৮)

১১ই এপ্রিল সোভিয়েত সর্বাধিনায়ক মার্শাল স্ট্যালিন মার্শাল জুকোভের দপ্তরে এই মর্মে এক টেলিগ্রাম পাঠাইলেন:

"হিটলার বার্লিন এলাকায় মাকড়শার জাল বুনতেছে। উদ্দেশ্য হইতেছে রাশিয়া ও মিত্রপক্ষের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা। এই জাল ছিন্ন করার জন্য সোভিয়েত বাহিনীকে বার্লিন দখল করিতে হইবে।...আমরা এটা করিতে পারি এবং আমাদের অবশ্যই এটা করিতে হইবে।"

অর্থাৎ মার্শাল স্ট্যালিন যথাসম্ভব দ্রুত বার্লিন দখলের জন্য মার্শাল জুকোভ এবং মার্শাল কোনেভকে তাগিদ দিলেন। (৯)

* * *

উচ্চতম সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল ১২ থেকে ১৫ দিনের যুদ্ধে বার্লিন শহর দখল করা। হিটলারও রাজধানী রক্ষা করার জন্য শহরের প্রবেশপথে গভীরতর ব্যূহ তৈয়ার করিলেন এবং ওডের নদী ও স্প্রী নদী বরাবর প্রচুর প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিলেন। পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ এবং উত্তর—সমস্ত দিক দিয়াই বার্লিনকে দুর্ভেদ্য করার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করা হইল না। হিটলারের পক্ষে আর একটা ভরসার কারণ এই ছিল যে, বার্লিনের চারিদিকে প্রাকৃতিক বিঘ্নও প্রচুর ছিল—জঙ্গল, জলাভূমি, নদী ও ক্যানেল বা খাল ইত্যাদি ছিল। আর রাজনৈতিক দিক দিয়া চেষ্টা ছিল "সোভিয়েত রাশিয়া ও পশ্চিমের মিত্রপক্ষের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো।" সৌভাগ্যক্রমে হিটলার ও তাঁর দলবলের সেই আশা পূর্ণ হইল না। মার্শাল কাইটেল নুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালতে তাঁর সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, ১৯৪৪ সাল থেকেই হিটলার রাশিয়া ও ইঙ্গ-মার্কিনের মধ্যে বিচ্ছেদের আশায় ছিলেন।

কিন্তু মিত্রপক্ষের মধ্যে যেমন বিচ্ছেদ ঘটানো সম্ভব হইল না তেমনি বার্লিনের প্রবেশপথ থেকে শুরু করিয়া রাস্তায় রাস্তায় যে অজস্র প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হইয়াছিল, লালফৌজের ভয়াবহ আক্রমণের বন্যাবেগে সেগুলি যেন ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল। ১৬ই এপ্রিল রাত্রি ৪টায় মার্শাল জুকোভের বাহিনী কুস্ট্রিন থেকে অভূতপূর্ব গোলাগুলি বর্ষণের দ্বারা বার্লিনের দিকে অভিযানের বোধন করিলেন। প্রচণ্ড আলোকের বন্যায় (১৪৩টি ফ্লাড লাইট) জার্মান সৈন্যদের চোখ যেন ধাঁধিয়া গেল এবং হাজার হাজার কামানের অগ্নি উদ্গিরণে শত্রুসৈন্যেরা একবারে হতভম্ব হইয়া পড়িল। ১৭ই এপ্রিল জার্মানদের দ্বিতীয় আত্মরক্ষার ব্যূহ বিদ্ধ হইল এবং তৃতীয়ের দিকে আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইল। ১৮ই এপ্রিল স্প্রী (Spree) নদী অতিক্রান্ত

---

(৮) পূর্বোক্ত পুস্তক, লেঃ জেনারেল টেলেগিনের প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা ২৬৭।

(৯) ঐ পুস্তক, ঐ পৃষ্ঠা।

হইল এবং ২০শে এপ্রিল জোসেন্ (Zossen) বা জার্মান সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের প্রতিরক্ষার লাইন ভাঙ্গিয়া গেল। অভিযানের ষষ্ঠ দিনে ওডের-নেইসী নদী বরাবর ৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ রণাঙ্গন বিদীর্ণ হইল। ২১শে এপ্রিল সন্ধ্যায় রুশ সৈন্যেরা বার্লিনের শহরতলীতে প্রবেশ করিল এবং ২২শে এপ্রিল বার্লিনের বহির্ব্যূহ ভাঙ্গিয়া গেল এবং অপরাহ্নে বার্লিনের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল– যদিও স্ট্যালিনগ্রাদের অনুরূপ নয়।

বার্লিন দুর্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল এবং যে ১২নং জার্মান আর্মি মার্কিন বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য গঠিত হইয়াছিল, তাদের নিয়োগ করা হইল অগ্রসরমান সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে। ক্রমে বার্লিন তিনটি সম্মিলিত ফ্রন্টের অর্থাৎ জুকোভ, কোনেভ ও রকোসোভস্কির দ্বারা বেষ্টিত হইতে লাগিল।

বার্লিনে বিপর্যয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি হইল এবং দলে দলে নরনারী সেই আতঙ্কের শিকার হইল। এদিকে জল, কয়লা, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি বন্ধ হইয়া গেল। ত্রাসগ্রস্ত হিটলারের চেলারা এবং একদা যাঁদের দোর্দণ্ড প্রতাপে জার্মানী ও অধিকৃত ইউরোপ কাঁপিত, হিটলারের সেই দুর্দান্ত চেলারা—হিমলার, গোয়েরিং প্রভৃতি বার্লিন থেকে চম্পট দিল। বোমায় ও কামানের গোলাবর্ষণে বার্লিন নগরী তখন মাইলের পর মাইল অগ্নিশিখায় জ্বলিতেছিল। মিত্রপক্ষ ৬৫ হাজার টন বোমা বর্ষণ করিয়াছিল, আর সোভিয়েত পক্ষ ৪০ হাজার টন গোলা নিক্ষেপ করিল। কিন্তু সেই অবস্থায়ও জার্মান সৈন্যেরা রাস্তায় রাস্তায় বাধা দিতেছিল। এমন কি প্রত্যেকটি গৃহকে যেন তারা সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করিয়াছিল। অবশ্য রাস্তার যুদ্ধে সোভিয়েত সৈন্যদেরও প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল,—স্ট্যালিনগ্রাদেই তার প্রমাণ। মার্শাল জুকোভ বার্লিন যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং রণনীতি ও রণক্রিয়া সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, বার্লিন যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে সুপ্রীম কমাণ্ডার-ইন-চীফ মার্শাল স্ট্যালিন অত্যন্ত দক্ষতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে এই রণপ্রস্তুতির পরিচালনা করিয়াছিলেন।(১০)

বার্লিন যুদ্ধে উভয় পক্ষেই প্রচুর সৈন্য হতাহত হইয়াছিল। কেননা, গোয়েবেলসের দপ্তর 'বলশেভিক বর্বরতা' এবং নিঃসর্ত আত্মসমর্পণের ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে জার্মান সৈন্য ও জনগণের চিত্তে প্রচণ্ড উত্তেজনা ও ভীতির সঞ্চার করিয়াছিলেন। ফলে, রুশদের হাতে বন্দী হওয়ার চেয়ে যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া ভালো—এই মনোভাবের দ্বারা জার্মানরা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। এদিকে ৯ই মার্চ ১৯৪৫, হিটলারের কড়া হুকুম ছিল 'শেষ সৈন্যটিকেও প্রাণ দিয়া রাজধানী রক্ষা করিতে হইবে।' এবং এই কাজে যারা ব্যর্থ হইবে কিংবা পশ্চাতে হটিতে চাহিবে তাদেরকে গুলি করিয়া মারা হইবে। সুতরাং বার্লিনের জন্য জার্মানদের মৃত্যুপণ যুদ্ধ না করিয়া উপায় ছিল না।

শেষের কয় মাসের এই মর্মান্তিক অবস্থা সম্পর্কে লেঃ জেনারেল কে এক টেলেগিন লিখিয়াছেন:

"The history of the last months of the Nazi dictatorship is a bloody chronicle of the tragedy of thousands af German families,

(১০) Great Patriotic War of the Soviet Union, p. 376, 382.

of the officers and men who had been shot or tortured 'for disobedience, "for loss of the German spirit' for desertain and for attempts to surrender. Special S S groups had orders to shoot on the spot any person who left his position without orders or tried to surrender. 'Any person, whether private or officer, who will retreat will be shot on the spot' such was Hitler's order."—(১১)

সোজা কথায় এর মর্ম হইতেছে যে কোন জার্মান সৈন্য রাজধানী রক্ষার এই যুদ্ধে হুকুম পালন করিতে ব্যর্থ হইবে, কিংবা পালনের চেষ্টা না করিবে, অথবা পশ্চাদপসরণ করিবে, তাকেই তৎক্ষণাৎ গুলি করিয়া হত্যা করা হইবে। হিটলারী ডিক্টেটরির শেষ কয়েক মাসে হাজার হাজার জার্মান পরিবার এভাবে ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডির সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

হিটলারের আদেশ ও গোয়েবেলসের প্রচারকার্য মিলিয়া বার্লিনের জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামকে ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছিল—যদিও তখন সোভিয়েত সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বার্লিনের আত্মরক্ষার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং এই যুদ্ধ জার্মানীর প্রায় আত্মহত্যার সমান ছিল। কারণ, লালফৌজের ২৫ লক্ষ সৈন্য তখন জার্মানীকে তিন দিক দিয়া ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল এবং পশ্চিমের ইঙ্গ-মার্কিন মিত্রবাহিনী পশ্চিম ও দক্ষিণ জার্মানীর ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া যাওয়ার ফলে জার্মানী উত্তরে ও দক্ষিণে বিচ্ছিন্ন এবং বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। ২৫শে এপ্রিল এলবে নদীতীরের টোরগাউ (Torgau) শহরের নিকট রুশ ও মার্কিন সৈন্যদল পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলাইলেন। জার্মানীর অভ্যন্তরে মিত্রবাহিনীর পরস্পরের মধ্যে এই হাত মিলানো ইউরোপে এক নতুন ইতিহাসের অধ্যায় খুলিয়া দিল। কেননা, হিটলারের ঘোষিত 'হাজার বছরের রাইখে'র অন্তিম দশা ঘনাইয়া আসিল এবং ইউরোপীয় মানচিত্রের ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গুরুতর পরিবর্তন ডাকিয়া আনিল।

কিন্তু জার্মানী ও বার্লিনের বিরুদ্ধে যখন এই চূড়ান্ত যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন নাৎসী মহানায়ক হিটলার এবং তাঁর দলবল কি করিতেছিলেন? সেই অদ্ভুত ট্র্যাজিক ও রোমহর্ষক কাহিনী পরবর্তী অধ্যায়ে বিধৃত হইয়াছে।

(11) The Gread March of Liberation. p. 270-71.

নবম পর্ব
চতুর্থ অধ্যায়
ভূগর্ভের অন্তিম আশ্রয়ে হিটলার

২০শে নভেম্বর, ১৯৪৪, হিটলার পূর্ব প্রুশিয়ার রাস্তেনবুর্গের সদর দপ্তর শেষ বারের জন্য ত্যাগ করিয়া বার্লিনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পূর্ব রণাঙ্গনের যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়াকে ধ্বংস করার জন্য হিটলার এত কাল যে সদর দপ্তরে ছিলেন, সোভিয়েত বাহিনীর ঐতিহাসিক জয় ও অগ্রগতির জন্য রাস্তেনবুর্গের সেই বিখ্যাত সদর দপ্তর পরিত্যক্ত হইল। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব রণাঙ্গনের এই ভয়াবহ যুদ্ধের আবম্ভের পর হিটলার কদাচিৎ বার্লিনে আসার সুযোগ পাইয়াছেন। কিন্তু ২০শে নভেম্বর রাস্তেনবুর্গের আস্তানা ত্যাগ করিয়া তিনি বার্লিনে আসার পর পশ্চিম দিকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে আর্দেনেস অঞ্চলে যে বেপরোয়া পাল্টা আক্রমণ তিনি চালাইয়াছিলেন, সে জন্য ১০ই ডিসেম্বর বার্লিন ত্যাগ করিয়া তিনি পশ্চিমের সদর দপ্তর জিয়েগেনবার্গে (Ziegenberg) কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পাল্টা আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৪৫, আবার বার্লিনে ফিরিয়া আসিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বার্লিনেই ছিলেন। কিন্তু পশ্চিম ও পূর্ব দিক থেকে মিত্র পক্ষের প্রবল আক্রমণের জন্য হিটলারের পক্ষে বার্লিনে মন্ত্রিভবনে বা চ্যান্সেলারিতে অবস্থান করা আর সম্ভব ছিল না। কারণ, রাইখ চ্যান্সেলারির সেই বিখ্যাত ভবন মিত্রপক্ষীয় (প্রধানতঃ ইঙ্গ-মার্কিন রোমারু) বোমা বর্ষণে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল এবং হিটলার ও তাঁর দলবল পুরাতন চ্যান্সেলারি ও বাগানের ৫০ ফুট মাটির নীচে বিশেষভাবে নির্মিত ভূগর্ভের বৃহৎ বাঙ্কারে আশ্রয় নিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই বাঙ্কারে জার্মান রণপ্রভুর দৈনন্দিন জীবনযাপন ও যুদ্ধ পরিচালনার জন্য মোটামুটি সব ব্যবস্থাই ছিল। অবশ্য এই বাঙ্কারে আরাম ও বিলাসিতার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ৫০ ফুট মাটির নীচে হিটলার যেন পাতালপুরীর কংক্রীটের আশ্রয়ে এক ধরনের 'আত্মগোপনে'র মত অবস্থান করিতেছিলেন। বলাই বাহুল্য যে, বোমা ও গোলা-বর্ষণ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেই হিটলার ও তাঁর স্টাফ এভাবে ভূগর্ভের নিরাপদ আশ্রয় অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছিলেন। বার্লিনের যুদ্ধ এবং হিটলারের অন্তিম আশ্রয়ের জন্য এই বাঙ্কার সারা পৃথিবীতে 'খ্যাতি' অর্জন করিয়াছিল। এই বৃহৎ বাঙ্কার প্রধানতঃ দুইটি অংশে বিভক্ত ছিল। প্রথম অংশে ছিল ১২টি রুম বা কক্ষ। হিটলার দুর্দান্ত ও নৃশংস হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জীবনযাত্রা সহজ ও অনাড়ম্বর ছিল। কোন প্রকার নেশা তাঁর ছিল না এবং তিনি নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করিতেন। বাঙ্কারে এজন্য বিশেষভাবে নিরামিষ রান্নাঘর ছিল। এছাড়া দ্বিতীয় অংশে, অর্থাৎ ফুয়ারের নিজস্ব বাঙ্কারে ১৮টি কক্ষ ছিল। কিন্তু কক্ষগুলি আয়তনে খুব ছোট ছিল এবং যাতায়াতের পথ ছিল সঙ্কীর্ণ। তবে বাঙ্কার থেকে জরুরী অবস্থায় পলায়নের বা বহির্গমনের জন্য একটা গোপন সুড়ঙ্গপথের ব্যবস্থাও ছিল। হিটলার ছাড়া গোয়েবেলস, বোরম্যান প্রভৃতি পদস্থ নাৎসী নেতাদের জন্য সরকারী ভবনগুলির নীচে

আরও কয়েকটি বাঙ্কার ছিল এবং যুদ্ধের শেষের দিনগুলিতে এই সমস্ত বাঙ্কারে আড্ডা ও আলোচনা-সভা বসিত। জড্‌ল, কাইটেল প্রভৃতি শীর্ষ রণনায়কেরা তাঁদের সদর দপ্তর জোসেন (Zossen) বা পটসড্যাম থেকে এই সমস্ত আলোচনা সভায় যোগ দিতেন। আর আসিতেন আর্মি জেনারেল স্টাফের নূতন অধিনায়ক জেনারেল হ্যান্স ক্রেবস্। কারণ, ইতিমধ্যে পূর্ববর্তী অধিনায়কদের মত জেনারেল গুডেরিয়ানের সঙ্গেও হিটলারের তীব্র মত বিরোধ ও ঝগড়া হইয়াছিল। ৩০শে মার্চ হিটলার-প্রস্তাবিত রণনীতি নিয়া জেনারেল গুডেরিয়ান ও হিটলারের মধ্যে ঝগড়ার এক "হিংস্র দৃশ্যের" অবতারণা হইয়াছিল এবং এই ঝগড়ার শেষে হিটলার গুডেরিয়ানকে পরামর্শ দিলেন তাঁর "দুর্বল হার্টের" জন্য অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিতে। সুতরাং গুডেরিয়ানের বদলে জেনারেল ক্রেবস্ সেনানীমণ্ডলীর নূতন নায়ক নিযুক্ত হইলেন। এককালে অবশ্য তিনি মস্কোর জার্মান দূতাবাসে 'মিলিটারি অ্যাটাশে' ছিলেন। সেনাপতি হিসাবে তিনি দক্ষ ছিলেন বটে, তবে হিটলারের বশংবদ ছিলেন।

* * *

হিটলার তাঁর এই পাতালপুরীর আশ্রয়ে তাঁর পাত্রমিত্র নিয়া রোজ দরবার করিতেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নামজাদা ঐতিহাসিক এইচ. আর. ট্রেভর রোপার "হিটলারের শেষের দিনগুলি" (দি লাষ্ট ডেইজ অব হিটলার) নামে মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই যে মূল্যবান পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাতে হিটলারের বাঙ্কারের ঘটনাবলীর অত্যন্ত নিপুণ ও প্রামাণিক বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। মৌলিক গ্রন্থ হিসাবে বইটি সর্বত্র শিক্ষিত মহলে সমাদৃত। মিঃ ট্রেভর রোপার বলিতেছেন যে, হিটলার ও নাৎসী রাষ্ট্র সম্পর্কে কতকগুলি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। হিটলারের শেষের দিনগুলির ঘাতপ্রতিঘাত বুঝিতে হইলে এই ভুল ধারণাগুলির সংশোধন হওয়া দরকার। প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, হিটলার কাহারও হাতের "দাবার বড়ে" ছিলেন না এবং 'নাৎসী রাষ্ট্র কোন তাৎপর্যব্যঞ্জক অর্থেই টোটেলিট্যারিয়ান বা সর্বগ্রাসী ছিল না' এবং এই রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় রাজনীতিকরাও 'গবর্নমেন্ট' ছিলেন না। কিন্তু এটা ছিল একটা কোর্ট বা রাজদরবারের মত—যে দরবারের প্রশাসন ক্ষমতা ছিল নগণ্য। কিন্তু চক্রান্তবাজিতে এর ক্ষমতা ছিল অপরিমিত—প্রাচ্য দেশের যে কোন স্বেচ্ছাচারী সুলতানের মত। অবশ্য একটা রাইখ ক্যাবিনেট ছিল। কিন্তু এই মন্ত্রিসভাও ছিল নামে মাত্র। কারণ কোনদিন কার্যতঃ এর কোন অধিবেশন বা বৈঠক বসে নাই। নাৎসী সংবিধানের পণ্ডিত নামে পরিচিত মিঃ ল্যামার্স (Lammers) নুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালতে বলিয়াছিলেন যে, তিনি একদা মন্ত্রিসভার সদস্যদের একত্রে একটা বীয়ার পানসভায় মিলাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু হিটলার তা জানিতে পারিয়া নিষেধ করিয়া দিলেন এবং মন্তব্য করিলেন যে, 'এরূপ পরীক্ষা বিপজ্জনক।'(১)

(১) The Last Days of Hitler—H. R. Trevor Roper, Pan-Books, 1952, p. 9.

১৯৪৪ সালের শীতকালে কিংবা ১৯৪৫ সালের বসন্তকালে অভিশপ্ত বার্লিন শহর থেকে যে কণ্ঠস্বর শুনা যাইত, সেটাই ছিল নাৎসী পার্টির আসল মনের কথা—হয় বিশ্বব্যাপী শক্তির অধিকারী কিংবা ধ্বংস। (World power or Ruin)। এর জন্য তাদের দরকার রাশিয়া বা শ্লাভ জাতিকে সংহার করা এবং পূর্ব ইউরোপকে উপনিবেশে পরিণত করা। নাৎসীবাদের পক্ষে এটা ছিল অপরিহার্য। ফ্রান্স বা বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছিল গতানুগতিক—সাধারণ রাজ্যজয়ের যুদ্ধ কিংবা রাশিয়াকে সংহার করার পরিপূরক যুদ্ধমাত্র। কিন্তু নাৎসীদের কাছে সোভিয়েত রাশিয়ার 'অস্তিত্বই ছিল অপরাধজনক'। সুতরাং দণ্ডযোগ্য বা সংহারযোগ্য।...পশ্চিমদিকের যুদ্ধ ছিল কূটনৈতিক এবং সীমাবদ্ধ লক্ষ্যের যুদ্ধ। অতএব কিছু আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন সেই সমস্ত যুদ্ধে মানা হইত। কিন্তু পূর্ব রণাঙ্গণের যুদ্ধ ছিল 'ক্রুসেড' বা ধর্মযুদ্ধের মত—মতাদর্শের সংগ্রাম, যে সংগ্রামে সমস্ত নিয়মকানুন অগ্রাহ্য করা হইয়াছিল। মূলগতভাবেই নাৎসীবাদ রুশবিরোধী ছিল :

"As Russia's crime was its existence, so its judgment was extermination. The war in the west was a traditional war, a war of diplomatic aims and limited objectives, in which some residue of international convention was regarded ; the war in the east was a crusade, a 'war of ideologies' in which all conventions were ignored. It is essential that we remember the basic anti-Russian significance of Nazism !' (২)

মিঃ ট্রেভর রোপার হিটলারী চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, হিটলারী মতে প্রকৃতি হইতেছে নিষ্ঠুর। সুতরাং তাঁর পক্ষেও নিষ্ঠুর হইতে কোন বাধা নাই—১৯৩৪ সালে ইহুদী ও শ্লাভদের সম্পর্কে তাঁর এই মন্তব্য। অতএব তিনি স্থির করিলেন বিন্দুমাত্র করুণা না দেখাইয়া সংহারপর্ব চালাইতে হইবে। তিনি ছিলেন রক্তপিপাসু এবং আগাগোড়া যুদ্ধ পরিচালনার সময় তিনি এই রক্তপিপাসার অনবরত পরিচয় দিয়াছেন। 'হত্যার জন্যই হত্যার' একটা দৈহিক ও মানসিক আনন্দ তিনি উপভোগ করিতেন। এমন কি যে-সমস্ত জেনারেল রক্তপাতে ও কঠোরতায় অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁরা পর্যন্ত হিটলারী নির্মমতার দৃষ্টান্তে গভীরভাবে আহত হইতেন। কেবল পরের দেশে নয়, নিজের দেশেও সৈন্য ও লোকেদের রক্তপাতেও তিনি উল্লাস বোধ করিতেন। কারণ, 'এই সমস্ত রক্তপাত ছিল ভবিষ্যৎ মহত্ত্ব অর্জনের বীজ বপন স্বরূপ।' হিটলার যেন এক নরমাংসাশী অপদেবতার মত ছিলেন এবং তাঁর এই ভয়ঙ্কর রক্তের তৃষ্ণা কোনদিন পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে নাই এবং তাঁর ধ্বংসের আকাঙ্ক্ষাও কোন দিন পূর্ণ চরিতার্থ হয় নাই এবং তাঁর প্রায় শেষের দিনের নির্দেশগুলিও ছিল হত্যা করার কিংবা বধ করার কলঙ্কে লিপ্ত। প্রাচীনকালের 'বীরদের' মত নরবলি-সহ তাঁকে গোর দেওয়া হোক, এটাই যেন ছিল তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা। তাঁর নিজের

(২) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৩

দেহ পোড়াইয়া ভস্মীভূত করার আদেশও ছিল তাঁর সেই 'ধ্বংসাত্মক বিপ্লবের যুক্তিসঙ্গত উপসংহার মাত্র।' (৩)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নরমেধযজ্ঞের কথা মনে রাখিলে মিঃ ট্রেভর রোপারের এই মন্তব্য নিশ্চয়ই অতিরঞ্জিত মনে হইবে না। কারণ, বার্লিনের ভূগর্ভের অন্তিম আশ্রয়েও তিনি পাশবিক নিষ্ঠুরতার অনেক বর্বর দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন এবং গোটা জার্মান জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন।

* * *

২০শে এপ্রিল ছিল হিটলারের ৫৬তম জন্মদিন। তাঁর ইচ্ছা ছিল দক্ষিণ দিকে ওবেরস্যালজবার্গে এই জন্মদিন পালন করার এবং সেখান থেকে বারবারোসার পৌরাণিক কাহিনীমণ্ডিত পার্বত্য দুর্গ থেকে তৃতীয় রাইখের শেষ আত্মরক্ষার যুদ্ধ পরিচালনা করার। এজন্য ১০ দিন আগেই বার্সেটিসগ্যাডেনে তিনি তাঁর ভৃত্য ও গৃহস্থালির লোকেদের পাঠাইয়া দিয়াছিলেন তাঁর বার্গহোফের মনোরম ভিলাটিকে সাজাইবার জন্য। ট্রাকের পর ট্রাক ভর্তি করিয়া সরকারী স্টাফ ও দপ্তরখানা এবং দলিলপত্র ইত্যাদি দক্ষিণ দিকে পাঠানো হইল। বার্লিনের আসন্ন পতনের আশঙ্কায় ভীত সরকারী কর্মচারীরাও সেদিকে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। (এজন্যই পশ্চিম দিক থেকে অগ্রগামী ইঙ্গ-মার্কিন সৈনাপত্যমহলে গোপন রিপোর্ট পৌঁছিয়াছিল যে, দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চল থেকেই হিটলারী জার্মানী তার শেষ প্রতিরক্ষার সংগ্রাম চালাইবে এবং পশ্চিম রণাঙ্গনের মিত্রপক্ষীয় সুপ্রীম কমাণ্ডার আইজেনহাওয়ারও সেই রিপোর্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বার্লিনের সামরিক গুরুত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন, যার জন্য পশ্চিমের মিত্রপক্ষীয় মহলে প্রচুর ক্ষোভ ও বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল।) কিন্তু হিটলারের অদৃষ্টে আলপাইনের সেই মনোরম নিবাস দেখার সুযোগ আর ঘটিল না। কেননা, যে দশদিন আগে তিনি তাঁর ভৃত্য ও সরকারী কর্মচারীদের সেই পার্বত্য নিবাসে পাঠাইয়াছিলেন, সেই কয়েকদিনের মধ্যেই একটার পর একটা বিপর্যয় ঘটিতে লাগিল। এত দ্রুত জার্মানী ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল যে, হিটলার তা অনুমান করিতে পারেন নাই। কার্যতঃ জার্মানী দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। মার্কিন ও রুশ বাহিনী এলবে নদীতীরে পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলাইবার জন্য দ্রুত আগাইয়া আসিতেছিল। রুশরা ইতিমধ্যেই ওডের এবং নেইসী নদী তটবর্তী এলাকায় পৌঁছিয়া গিয়াছিল এবং ড্রেসডেন ও বার্লিন বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। আর উত্তর দিকে বৃটিশ বাহিনী ব্রেমেন ও হাম্বুর্গ বন্দরের শহরগুলিতে পৌঁছিয়া জার্মানীকে অধিকৃত ডেনমার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। দক্ষিণ দিকে ফরাসী সৈন্যেরা উত্তর দানিয়ুবে এবং রুশ সৈন্যেরা ১৩ এপ্রিল ভিয়েনায় পৌঁছিয়া গেল। নাৎসী পার্টির রাজধানী ন্যুরেমবার্গ অবরুদ্ধ হইল এবং মার্কিন সপ্তম বাহিনীর একাংশ নাৎসী আন্দোলনের জন্মভূমি মিউনিকের দিকে ধাবমান হইল। ইতালীতেফিল্ড মার্শাল আলেকজান্দারের সৈন্যেরা বলোগনা কাড়িয়া লইল এবং পো নদীর উপত্যকায় প্রবেশ করিল। মার্কিন

(৩) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৭৮-৭৯

জেনারেল প্যাটন ব্যাভেরিয়া ও রাইখের মর্মস্থল ভেদ করিয়া দক্ষিণে আল্পসের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। তখন খোদ রাজধানী বার্লিন থেকে সোভিয়েত বাহিনীর বৃহৎ কামানগুলির গোলাবর্ষণের শব্দ শুনা যাইতেছিল।

এই অবস্থার মধ্যে হিটলার যখন তাঁর জন্মদিন অনুষ্ঠানের কথা ভাবিতেছিলেন, তখন তাঁর পণ্ডিতম্মন্য অর্থমন্ত্রী কাউন্ট সেভেরিন ভন ক্রোসিগ (Schwerin Von Krosigk) বলশেভিকদের অগ্রগতির সংবাদ শুনিবা মাত্র বার্লিন ছাড়িয়া উত্তর দিকে পলায়ন করিলেন এবং ২৩ এপ্রিল ডায়েরিতে মন্তব্য করিলেন—"আমাদের জাতির ভাগ্যে ঘোরতর অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।"

কিন্তু এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতি সত্ত্বেও হিটলার যেন নিশ্চিন্ত এবং তাঁর ধারণা বার্লিনের প্রবেশপথে সোভিয়েত বাহিনী নিশ্চয়ই চূর্ণ হইবে এবং তাঁর বশংবদ ভক্তেরাও—যেমন, হিমলার, গোয়েরিং, গোয়েবলস, ডোয়েনিৎস, কাইটেল, জড্‌ল, বোরম্যান, রিবেন্ট্রপ প্রভৃতি তাঁর জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাইতে আসিয়া তাঁকে নানা স্তোকবাক্য শুনাইলেন। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই আন্তরিক ছিলেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ, তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হিটলারকে তোয়াজ করা এবং পরস্পরকে ল্যাং মারিয়া সম্ভব হইলে আরও ক্ষমতার আসন দখল করা।...

তবু সেদিনের সামরিক নেতাদের বৈঠকে রাইখের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা নিয়া উদ্বেগ দেখা দিল এবং নেতারা হিটলারকে পরামর্শ দিলেন অবিলম্বে বার্লিন ছাড়িয়া দক্ষিণ দিকে আশ্রয় নেওয়ার জন্য। কারণ, এর পরে আর বিচ্ছিন্ন জার্মানীর স্থলপথ দিয়া দক্ষিণ অংশে যাওয়া সম্ভব হইবে না। আর রুশ সৈন্যেরা যেভাবে বার্লিন শহরকে ঘিরিয়া ধরিতেছে, তাতে এই অবরুদ্ধ শহর থেকে পলায়নের আর কোন উপায় থাকিবে না। সুতরাং বড় বড় নাৎসী নেতারা হিটলারকে অনুরোধ করিলেন বার্লিন ত্যাগ করার জন্য। কিন্তু হিটলার দৃঢ়তার সহিত অস্বীকৃত হইলেন। বরং তিনি জার্মানীর বিচ্ছিন্ন দুই অংশে—উত্তর ও দক্ষিণে দুইটি পৃথক কমাণ্ড গঠন করিতে চাহিলেন। উত্তর অংশের নেতৃত্বে থাকিবেন গ্রাণ্ড অ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস এবং দক্ষিণ অংশে ফিল্ড মার্শাল কেসেলরিং। এই দুই জনের প্রতিই হিটলারের গভীর আস্থা ছিল। কিন্তু হিটলার তখনও জানিতেন না যে, তাঁর প্রিয় ফিল্ড মার্শাল ততক্ষণে ইতালীতে জয়লাভের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। সুতরাং হিটলারের এই সমস্ত পরিকল্পনা মুখে ও কাগজ-পত্রেই রহিয়া গেল।

বৈঠকের শেষে সেই রাতেই অনেক রথী-মহারথীই বার্লিনের বাঙ্কার ছাড়িয়া লরী ট্রাক প্লেন ও অন্যান্য যানবাহনের কনভয় যোগে ওবারস্যালজবার্গের দিকে পলায়ন করিলেন। এই পলায়িত বীরপুরুষদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাম হিমলার ও গোয়েরিং, যে দুই নেতা হিটলারের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও একনিষ্ঠ সহকর্মী-রূপে পরিচিত ছিলেন। বলা বাহুল্য যে, গোয়েরিং পলায়নের আগে অনেক ট্রাক ভর্তি করিয়া তাঁর বিশাল ঐশ্বর্যপূর্ণ কারিনহল্‌ জমিদারি থেকে অনেক মূল্যবান

লুণ্ঠিত মাল লইয়া গেলেন। তবে, হিমলার ও গোয়েরিং উভয়েই এই মনোভাব নিয়া বার্লিন ত্যাগ করিলেন যে, তাঁদের প্রিয়তম ফুয়ার শীঘ্রই মারা পড়িবেন, সুতরাং রাইখের সর্বময়ক্ষমতা তাঁদের হাতেই বর্তাইবে।

অন্যান্য যে সমস্ত সেনাপতি ও অফিসারেরা পলায়ন করিলেন, তাঁরা অন্ততঃ এই ভাবিয়া সান্ত্বন পাইলেন যে, আর অনবরত হিটলারের গালাগালি শুনিতে ও অসম্মান বহন করিতে হইবে না। কেননা, শেষের দিকে যতই পরাজয় ঘটিতেছিল ততই হিটলারের মেজাজ বিগড়াইতে ছিল। বিশেষভাবে বিমান বাহিনীর ব্যর্থতার জন্য হিটলার চিৎকার করিয়া বলিতেছিলেন—'দু একজন অফিসারকে গুলি করিয়া মারো, কি বা বিমানবাহিনীর গোটা স্টাফকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দাও।'

কিন্তু ততক্ষণে বিমানবাহিনীর বড় কর্তা হেরমন গোয়েরিং বার্লিন থেকে চম্পট দিয়াছেন।(৪)

হিটলার ভূগর্ভের বাঙ্কার ত্যাগ করিয়া বার্লিন ছাড়িয়া যাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন। এর অন্যতম কারণ এই ছিল যে, তিনি নিজেকে রণবিশারদ বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং বার্লিন থেকে রুশ বাহিনীকে হটাইয়া দেওয়ার জন্য তিনি একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে চাহিলেন। তিনি বার্লিন রক্ষার জন্য একটা রণ-পরিকল্পনাও স্থির করিলেন এবং বিভিন্ন সেনাপতির উপর পশ্চিম, পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে আক্রমণ চালাইয়া রুশদেরকে হটাইয়া দেওয়ার জন্য হুকুম দিলেন। এই সমস্ত পরি-কল্পিত আক্রমণের মধ্যে তিনি মানচিত্রের দিকে তাকাইয়া 'স্টেইনার' (Steiner) 'স্টেইনার' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিতেন। অর্থাৎ এস এস জেনারেল স্টেইনারকে তিনি তাঁর সৈন্যদল সহ রুশদের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস এই যে, স্টেইনারের অধীনে কোন শিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্যদল ছিল না। তিনি সেনাবিভাগের বড় কর্তা জেনারেল ক্রেবসকে সে কথা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু হিটলার সেই সমস্ত কথা কানে তুলিতেই চাহিলেন না। তিনি এক দীর্ঘ জোরালো বক্তৃতায় স্টেইনারকে বলিলেন—"তুমি দেখে নিও স্টেইনার, রুশ সৈন্যেরা বার্লিন প্রবেশের ফটকে বৃহত্তম পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হবে।"

যদিও বার্লিন রক্ষার আর কোন আশা ছিল না, তবু হিটলার সেই সমস্ত যুক্তি অগ্রাহ্য করিলেন এবং স্টেইনারের 'মাথার বিনিময়ে' এই হুকুম কার্যকর করার নির্দেশ দিলেন।(৫)

গত কয়েক দিন হিটলার নিজেই বার্লিন শহরের বিভিন্ন ব্যাটেলিয়নকে পরি-চালনা করিতেছিলেন এবং ২১ এপ্রিল বার্লিনের দক্ষিণ শহরতলীতে রুশদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ও সর্বাত্মক আক্রমণের আদেশ দিলেন। প্রত্যেকটি সৈন্য, প্রত্যেকটি ট্যাঙ্ক এবং প্রত্যেকটি প্লেন এই আক্রমণে নিয়োগ করিতে হইবে। কেবল স্টেইনার নয়, গোয়েরিংয়ের বিমানবাহিনীর প্রধান জেনারেল কোলার (Koller) ও অন্যান্য অফিসারদেরকেও হুকুম দেওয়া হইল যদি কেউ পিছনে হটে কিংবা লড়াইতে বিমুখ

---

(৪) ট্রেভর-রোপার, পৃষ্ঠা ১১৮

(৫) The Last Battle—Ryan, p. 402-3

হয়, তবে ৫ ঘণ্টার মধ্যে তার প্রাণ হনন করা হইবে। কোলারকে তাঁর মাথা বাজি রাখিয়া শেষ সৈন্যটিকে পর্যন্ত রণক্ষেত্রে নিয়োগ করিতে হইবে।

সারা দিন ধরিয়া হিটলার আশা করিয়া রহিলেন স্টেইনারের পাল্টা-আক্রমণের সংবাদের জন্য। কিন্তু কার্যতঃ কোন আক্রমণই ঘটিল না। কারণ, একমাত্র হিটলারের উত্তপ্ত মস্তিষ্কে ছাড়া এই সমস্ত সৈন্যের কোন পাত্তাই ছিল না। বাস্তবতার সঙ্গে হিটলারের যে কোন সম্পর্ক ছিল না এই ঘটনাই তাঁর সুস্পষ্ট প্রমাণ। পরদিন বেলা ৩টা পর্যন্ত তিনি টেলিফোনের কাছে বসিয়া রহিলেন বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে আক্রমণের সংবাদ পাওয়ার জন্য। কিন্তু কোন খবরই পাওয়া গেল না।(৬)

সে দিন, অর্থাৎ ২২ এপ্রিল অপরাহ্ণে সামরিক নেতাদের আলোচনা বৈঠকে এতদিনের অবরুদ্ধ ঝড় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং হিটলারের শেষের দিনগুলির ইতিহাসের সেটাই যেন ছিল চূড়ান্ত ও ভাগ্য নিয়ামক :

'Then came the storm, which made the conferance of 22nd April famous and decisive in the History of Hitler's last days.' . (৭)

সেই ঝড়ের দৃশ্য সেদিন যে সমস্ত সামরিক অফিসার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং তাঁদের সহকারীরা যে দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতেছিলেন, তাঁদের বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, হিটলার ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন, গলার স্বর সপ্তমে চড়াইয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন— 'সকলেই তাঁকে ত্যাগ করিয়াছে।' আর্মির উদ্দেশ্যে গালাগাল করিলেন, সকলকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মুণ্ডপাত করিলেন এবং চারিদিকে কেবল বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যর্থতা, দুর্নীতি এবং মিথ্যাচার দেখিতে পাইলেন। তারপর ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে, সব শেষ হইয়া গিয়াছে। অবশেষে এই প্রথম তিনি স্বীকার করিলেন যে, তাঁর মিশন বা ব্রত ব্যর্থ হইয়াছে, কিছুই আর বাকী নাই। তৃতীয় রাইখ ব্যর্থতায় পরিণত এবং এই রাইখের প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যু বরণ ছাড়া আর কিছু করার নাই। সমস্ত সন্দেহ সংশয় তাঁর পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। তিনি বার্লিন ছাড়িয়া দক্ষিণ দিকে যাইবেন না। যাঁদের তেমন ইচ্ছা আছে, তাঁরা চলিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু তিনি বার্লিনেই থাকিবেন এবং সেখানেই মৃত্যু বরণ করিবেন।

হিটলারের এই প্রকার বিস্ফোরণে বিক্ষুব্ধ ও বিস্মিত সেনাপতিরা এবং রাজনৈতিক নেতারা প্রতিবাদ করিলেন এবং বলিলেন এখনও সব শেষ হইয়া যায় নাই। ফিল্ড মার্শাল শোয়েরনারের (Schoerner) আর্মি গ্রুপ চেকোশ্লভাকিয়াতে এবং ফিল্ড মার্শাল কেসেলরিংয়ের অধিকাংশ সৈন্য ইতালীতে এখনও অটুট আছে। সুতরাং হিটলারের উচিত আর বিলম্ব না করিয়া বার্লিন ছাড়িয়া দক্ষিণদিকে চলিয়া যাওয়া।

হিমলার, ডোয়েনিৎস এবং রিবেনট্রপ তাঁদের সহকারীদের কাছ থেকে টেলিফোনে সংবাদ পাইয়া ফুয়ারকে অনুরোধ জানাইলেন ওবারসাল্জবার্গে চলিয়া যাওয়ার জন্য। কিন্তু হিটলার তাঁর সংকল্পে অবিচলিত রহিলেন এবং তাঁর নির্দেশে

(৬) উইলিয়াম শাইরার, পৃষ্ঠা ১৩২১

(৭) ট্রেভর-রোপার, পৃষ্ঠা ১২৫

বার্লিন রেডিও থেকে ঘোষণা করা হইল যে, ফুরার বার্লিন ত্যাগ করিবেন না। তিনি ও গোয়েবেলস বার্লিনেই অবস্থান করিবেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বার্লিন রক্ষার জন্য লড়াই চালাইবেন :...

এই নাটকীয় ঘোষণার পর হিটলার গোয়েবেলস ও তাঁর পত্নীকে তাঁদের বোমা-বিধ্বস্ত আবাস ত্যাগ করিয়া ফুরারের বাঙ্কারে আসিয়া থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন। কারণ, গোয়েবেলস দম্পতিও ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁরা এবং তাঁদের ৬টি শিশুসন্তান বার্লিনেই অবস্থান করিবেন এবং ফুরার-শূন্য জার্মানীতে তাঁরাও বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন না, তাঁরাও মৃত্যুবরণ করিবেন। তাঁদের সন্তানদের বিষপ্রয়োগে মারিয়া ফেলা হইবে—এমন নিদারুণ সংকল্পের কথা কোন শিক্ষিত দায়িত্বশীল বাবা-মার মুখ থেকে কদাচিৎ শুনা গিয়াছে। কিন্তু গোয়েবেলস দম্পতি সেই সংকল্পের কথাই ব্যক্ত করিলেন।

এইভাবে হিটলারের সেই পাতালপুরীর নাট্যমঞ্চে যেন একটির পর একটি অঙ্ক চূড়ান্ত যবনিকা পতনের দিকে অগ্রসর হইতেছিল এবং তারই প্রস্তুতি স্বরূপ হিটলারের নির্দেশে কিছু বাছাই-করা দলিলপত্র পোড়াইয়া ফেলা হইল। তারপর তাঁর দুই শীর্ষ সামরিক নেতা কাইটেল ও জড্‌লকে তিনি বার্লিন ছাড়িয়া দক্ষিণে চলিয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু তাঁরা অস্বীকৃত হইলেন। তখন হিটলার কাইটেলের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন—'আপনি আমার হুকুম মানিতে বাধ্য।' সমগ্র সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান কাইটেল হিটলারের প্রতি কুকুরের মত অনুরক্ত ছিলেন এবং কোনদিন তিনি হিটলারকে অমান্য করা দূরের কথা, হিটলারের জঘন্যতম অপরাধমূলক নির্দেশ-গুলিও তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করিয়াছেন। সুতরাং কাইটেল আর কথা না বলিয়া চুপ করিয়া গেলেন। রণক্রিয়ার প্রধান জড্‌ল যদিও গোঁড়া হিটলারভক্ত ছিলেন, তথাপি তিনি একেবারে অন্ধ ছিলেন না। তিনি এই প্রস্তাবে ঘোরতর আপত্তি জানাইলেন। কিন্তু হিটলার তাঁর প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন, তিনি নিজে বার্লিন রক্ষা করার যুদ্ধ পরিচালনা করিবেন। কারণ, অন্যেরা যখন ব্যর্থ হইয়াছে, তখন তিনি নিজে একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। তবে, তিনিও যদি ব্যর্থ হন, তা হলে শেষ মুহূর্তে তিনি বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করিবেন। অবশ্য তিনি স্বীকার করিলেন যে, তাঁর শরীর একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। তথাপি তিনি জীবিত বা মৃত অবস্থায় শত্রুর হাতে ধরা দিবেন না। তখন জড্‌ল ও কাইটেল প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁরা পশ্চিম দিক থেকে সৈন্যবাহিনী ফিরাইয়া আনিবেন এবং সমগ্র পশ্চিম জার্মানী তাঁরা বৃটিশ ও আমেরিকানদের হাতে তুলিয়া দিবেন এবং এভাবে অন্ততঃ বার্লিনকে রুশদের হাত থেকে রক্ষা করা যাইবে। সম্ভবতঃ এই সমস্ত ঘটনার জন্যই সোভিয়েত পুস্তকাদিতে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, জার্মানবাহিনী পশ্চিমে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে তেমন বাধা দেয় নাই।

কাইটেল ও জড্‌ল আরও স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, তাঁরা সকলেই যদি বার্লিন ছাড়িয়া দক্ষিণে চলিয়া যান, তবে, জেনারেল স্টাফের সহযোগিতা ছাড়া তিনি বার্লিনের যুদ্ধ চালাইবেন কিভাবে? সুতরাং সুপ্রীম কমাণ্ডারের নিকট তাঁরা হুকুমের

প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতেছেন। হিটলার জবাব দিলেন যে, তাঁর পক্ষে আর হুকুম দেওয়ার কিছু নাই। কারণ, সমগ্র জার্মানী ভাঙিয়া পড়িতেছে, আর কিছু করিবার নাই। সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে। তবু যদি তাঁরা হুকুম নিতে চান, তবে, তাঁরা রাইথ মার্শালের কাছ থেকে আদেশ নিতে পারেন। এর জবাবে কাইটেল ও জড্‌ল বলিলেন যে, একজন জার্মান সৈন্যও রাইখ মার্শালের (গোয়েরিং) অধীনে যুদ্ধ করিতে রাজী হইবে না।

এর জবাবে হিটলার যা বলিলেন তার তাৎপর্য ও প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। কারণ, হিটলার বলিলেন যে, এক্ষণে যুদ্ধ করার আর প্রশ্ন উঠে না। কারণ, যুদ্ধ করিবার মত আর কিছু নাই। আর যদি পশ্চিমের ইঙ্গ মার্কিন পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির আলোচনা করিতে হয়, তবে, তার উপযুক্ত পাত্র হইতেছে গোয়েরিং। সে এই সমস্ত বিষয়ে আমার চেয়ে ভালো আলোচনা চালাইতে পারিবে।'(৮)

এরপর হিটলার কাইটেলের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন কি ভাবে বার্লিনকে উদ্ধার করা যাইতে পারে। তিনি প্রস্তাব করিলেন জেনারেল ভেঙ্কের (Wenck) যে ১২ নং আর্মি বার্লিনের দক্ষিণ-পশ্চিমে এলবে নদীর ধারে রহিয়াছে, তাদের উচিত অবিলম্বে সেখানকার রণক্রিয়া ত্যাগ করিয়া পট্‌সডামের দিকে অভিযান করা এবং বার্লিন, চ্যান্সেলারি ও ফুরারকে উদ্ধার করা।

কিন্তু এই সমস্ত প্রস্তাবও বাস্তবে কোন কাজে আসিল না। কিন্তু হিটলার বার্লিন ত্যাগে অস্বীকৃত হওয়ার ফলে কাইটেল ও জড্‌লকে বাধ্য হইয়াই হাই কমাণ্ডের কিছু স্টাফসহ বার্লিনের পশ্চিম শহরতলীতে একটা দপ্তর খুলিতে হইল। কিন্তু সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত এই দপ্তর উত্তর প্রান্তবর্তী ডেনমার্ক সীমানায় ফ্লেন্সবুর্গে অপসারিত হইয়াছিল। অবশ্য জেনারেল ক্রেবস্‌ হিটলারের সামরিক পরামর্শদাতা হিসাবে বাঙ্কারেই রহিয়া গেলেন।

* * *

হিমলার তখন বার্লিনের উত্তর-পশ্চিমে হোহেনলাইচেন শহরে অবস্থান করিতেছিলেন। সদর দপ্তরের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী এস এস অফিসার হেরমান ফেগেলিনের (Hermann Fegelein) মুখ থেকে টেলিফোনযোগে যখন তিনি বাঙ্কারের এই সমস্ত ঘটনাবলী শুনিতেছিলেন তখন তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন— 'বার্লিনে সকলেই পাগল হয়ে গেছে! আমি আর কি করতে পারি?'

কেউ কেউ তাঁকে বার্লিনে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তিনি গেলেন না। কারণ, তখন তিনি এস এস জেনারেল শোলেনবার্গের উস্কানিতে সুইডেনের কাউন্ট বার্নাডোটের (রেডক্রশের বড় কর্তা) সঙ্গে পশ্চিম দিকে জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণের কথা চিন্তা করিতেছিলেন। অবশ্য হিমলার হিটলারের বাঙ্কারে টেলিফোন করিয়া তাঁকে বার্লিন ত্যাগের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। এদিকে হিমলারের যুদ্ধবন্দী বিভাগের প্রধান গটলোব বার্গার (Gottlob Berger) পশ্চিম জার্মানীতে আটক কয়েকজন বিশিষ্ট বন্দী—বৃটিশ, ফরাসী ও আমেরিকান এবং প্রাক্তন জার্মান সেনাপতি

(৮) ট্রেভার-রোপার, পৃষ্ঠা ১২৭

স্থানান্তর, অর্থনীতিবিদ্ শাকট ও অস্ট্রিয়ার প্রাক্তন চ্যান্সেলার শুসনিগ প্রভৃতির স্থানান্তরিতকরণ সম্পর্কে যখন হিটলারের মতামত জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তখন রিপোর্ট পাওয়া গেল যে, অস্ট্রিয়া ও ব্যাভেরিয়াতে বিচ্ছিন্নতার দাবিতে বিদ্রোহের মত দেখা দিয়াছে, তখন হিটলার পুনরায় ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন এবং তাঁর হাত-পায়ের কাঁপুনি সত্ত্বেও চিৎকার করিয়া উঠিলেন—'সবাইকে গুলি করে মারো!'

তবে এই চিৎকার বন্দীদের উদ্দেশ্যে কিংবা বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে তা স্পষ্ট বুঝা গেল না। সেদিন রাত্রি ১টার সময় রুশ গোলাবর্ষণের মধ্য দিয়াই বাঙ্কারের অধিকাংশ কর্মী ও সহকারী, এমন কি হিটলারের বিশ্বাসভাজন ও ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ মোরেল পর্যন্ত ওবারস্যালজবার্গের দিকে পলায়ন করিলেন। অবশ্য মার্টিন বোরম্যান এবং আরও কয়েকজন থাকিয়া গেলেন। কিন্তু বিমানবাহিনীর জেনারেল কোলার রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় বাঙ্কার ত্যাগ করিয়া বিমানযোগে মিউনিক চলিয়া গেলেন এবং সেখান থেকে দুপুরের দিকে (২৩ এপ্রিল) ওবারস্যালজ-বার্গে পৌঁছিলেন এবং রাইখ-মার্শাল গোয়েরিংকে সমস্ত ঘটনা বলিলেন। সমস্ত কাহিনী শুনিয়া গোয়েরিং অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

গোয়েরিং ও হিমলার কর্তৃক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা

গোয়েরিং তাঁর সহকারী ও পরামর্শদাতাদের সঙ্গে এক আলোচনা বৈঠকে বসিলেন। তাঁর পক্ষে ক্ষমতা দখলের সময় আসিয়াছে এবং এরূপ একটা সুযোগের জন্যই তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁকে সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে। কেননা, তাঁর 'মারাত্মক শত্রু' মার্টিন বোরম্যানের কোন ফাঁদে গিয়া তিনি না পড়েন। এবং বোরম্যান সম্পর্কে তাঁর এই ভীতি যে ভিত্তিহীন ছিল না, সেটা পরে প্রমাণিত হইয়াছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে গোয়েরিং দ্বিধায় পড়িলেন। তাঁর পরামর্শ-দাতাদের নিকট তিনি বলিলেন—'যদি এই সময় আমি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করি, তবে আমি বিশ্বাসঘাতক রূপে চিহ্নিত হইতে পারি। আবার কোন কিছু না করিয়াই যদি আমি চুপচাপ থাকি, তবে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠিতে পারে যে, জাতির এই ভয়ঙ্কর দুর্বিপাকের সময় আমি কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হইয়াছি।'

তথাপি এ কথা সত্য যে, ১৯৪১ সালের ২৯শে জুন হিটলার এই মর্মে এক ডিক্রি জারি করিয়াছিলেন যে, যদি হিটলার মারা যান, তবে, গোয়েরিং হইবেন তাঁর উত্তরা-ধিকারী কিংবা হিটলার যদি কোন কারণে অক্ষম হইয়া পড়েন, তবে গোয়েরিং তাঁর ডেপুটি হিসাবে কাজ করিবেন। সুতরাং গোয়েরিং এই প্রশ্নে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আইন বিশেষজ্ঞ হান্স ল্যামার্সের (যিনি তখন বার্সেটিসগ্যাডেনে) মতামত আহ্বান করিলেন। মিঃ ল্যামার্স এই মর্মে অভিমত জ্ঞাপন করিলেন যে, ৯৪১ সালের সেই ডিক্রির তখনও আইনগত সত্তা পুরাপুরি বজায় আছে। কারণ, নূতন কোন আদেশের দ্বারা এই ডিক্রি বাতিল করা হয় নাই। সকলেই এই বিষয়ে একমত হইলেন যে, হিটলার বার্লিনে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিয়া সামরিক কম্যান্ড ও গবর্নমেণ্ট পরিচালনা উভয় দিক থেকেই অক্ষম হইয়াছেন। সুতরাং আইন অনুসারে গোয়েরিংয়ের কর্তব্য হইতেছে রাষ্ট্রের ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করা। অতএব সমস্ত দিক বিচার-বিবেচনা

করিয়া এবং 'ঘরে-বাইরে সমস্ত প্রকার ক্ষমতা লাভ' সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া তাঁর সহকারীগণ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে একটি টেলিগ্রামের খসড়া রচনা করিলেন। কারণ, গোয়েরিংয়ের একান্ত ইচ্ছা ছিল ক্ষমতা লাভের পরেই তিনি পশ্চিমের যুদ্ধবিরতির জন্য আলোচনা আরম্ভ করিবেন। এমন কি, প্রয়োজন হইলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে আইজেনহাওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উড়িয়া যাইবেন! কিন্তু আইজেন-হাওয়ারের সঙ্গে দেখা করার সময় কি পোশাক পরিয়া যাইবেন—সে কথা নিয়া তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। এদিকে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে তখন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। একমাত্র বেতারবার্তা পাঠানো ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। গোয়েরিংয়ের সেই ঐতিহাসিক বার্তাটি অত্যন্ত সুরচিত ছিল :

"My Fuehrer!—In view of your decision to remain at your post in the fortress of Berlin, do you agree that I take over at once the total leadership of the Reich, with full freedom of action at home and abroad, as your deputy, in accordance with your decree of 29 June 1941? If no reply is received by ten o'clock tonight, I shall take it for granted that you have lost your freedom of action, and shall consider the conditions of your decree as fulfilled, and shall act for the best interests of our country and our people. You know what I feel for you in this gravest hour of my life. Words fail me to express myself. May God protect you, speed you quickly here in spite of all. Your loyal—Hermann Goering."(১)

এর সহজ মর্ম :

আমার ফুরার! বার্লিনের দুর্গে আপনার অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে আপনি কি মনে করেন যে, আপনার ২৯ জুন ১৯৪১ তারিখের ডিক্রি অনুযায়ী আপনার সহকারী হিসাবে ঘরে এবং বাইরে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে কাজ করার অধিকারসহ আমার পক্ষে অবিলম্বেই উচিত রাইখের সম্পূর্ণ নেতৃত্বভার গ্রহণ করা? আজ রাত্রি ১০টার মধ্যে যদি আমি কোন উত্তর না পাই, তবে আমি একথাই নিশ্চিত হিসাবে ধরিয়া নিব যে, আপনি আপনার স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা হারাইয়াছেন এবং আপনার ডিক্রির সর্তগুলিও পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং আমার দেশের ও জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থের জন্যই আমি কাজ করিয়া যাইব। আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমি আপনার জন্য কিরূপ অনুভব করছি তা আমার পক্ষে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ভগবান আপনাকে রক্ষা করুন এবং সব কিছু সত্ত্বেও আপনি যেন যথাসম্ভব শীঘ্র এখানে আসিতে পারেন। ইতি,

আপনার বিশ্বস্ত
হের্মন গোয়েরিং

(১) উইলিয়াম শাইরার, পৃষ্ঠা ১৩২৫-২৬ এবং ট্রেভর-রোপার, পৃষ্ঠা ১৩৬

গোয়েরিংয়ের এই টেলিগ্রামের উপযুক্ত ভাষ্য ও ব্যাখ্যা কাইটেল, রিবেন্ট্রপ এবং কর্নেল নিকোলা'স ফন বিলোকেও (হিটলারের বিমানবাহিনীর সহকারী) পাঠানো হইল। কিন্তু এই টেলিগ্রামের ফলাফল অত্যন্ত গুরুতর হইল।...

ঐদিন সন্ধ্যায় বার্লিন থেকে কয়েক শত মাইল দূরে হিটলারের আর একজন 'বিশ্বস্ত' ও শীর্ষস্থানীয় সহকর্মী হাইনরিখ হিমলার বাল্টিক সমুদ্রের লুয়েবেক শহরের সুইডিশ দূতাবাসে (কনসুলেট) কাউন্ট বার্নাডোটের সঙ্গে আলোচনা করিতেছিলেন। এস এস জেনারেল ভাল্টার শেলেনবার্গও হিমলারের সঙ্গে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। গোয়েরিং তবু হিটলারের উত্তরাধিকারীরূপে ক্ষমতা দখল করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু হিমলার ধরিয়াই লইয়াছিলেন যে, তিনি ক্ষমতায় আসিয়া গিয়াছেন! বার্লিনের পাতালপুরীতে বাঙ্কারের অভ্যন্তরে যে সমস্ত গুরুতর ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, শেলেনবুর্গ এবং কাউন্ট বার্নাডাট সেই সমস্ত কিছুই জানিতেন না, কিন্তু হিমলার সমস্তই অবগত ছিলেন। সুতরাং তাঁর গত কয়েকদিনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব সবই কাটিয়া গিয়াছিল। তিনি কাউন্ট বার্নাডোটকে বুঝাইতেছিলেন যে, ফুয়ারের বৃহৎ জীবনের অবসান আসন্ন। দুই-একদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হইবে। সুতরাং হিমলার বার্নাডোটকে অনুরোধ করিলেন তিনি যেন জেনারেল আইজেনহাওয়ারকে জানাইয়া দেন যে, জার্মানী পশ্চিমদিকে আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু পূর্বদিকে জার্মানী যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেই ইচ্ছুক, যতক্ষণ না পশ্চিমী শক্তিবর্গ নিজেরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে পূর্ব রণাঙ্গনের দায়িত্ব নিতেছেন।

এস এস বাহিনীর প্রধান ও প্রতিপত্তিশালী নাৎসী নেতা হিমলার কত নীরেট মস্তিষ্কের লোক কিংবা বোকা ছিলেন, বার্নাডোটের নিকট তাঁর এই বক্তব্যেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। হিমলার আরও বুঝাইলেন যে, বার্লিনের পতন ঘনাইয়া আসিয়াছে এবং হিটলার মারা যাইবেন। সুতরাং আগে তিনি বার্নাডোটকে যে কথা দিতে পারেন নাই এখন সে কথা দিতেছেন। কারণ, পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অতএব সুইডিশ সরকারের মারফৎ তিনি জার্মানীর আত্ম-সমর্পণের প্রস্তাব করিতেছেন। তখন বার্নাডোট হিমলারকে অনুরোধ করিলেন তাঁর এই আত্মসমর্পণের প্রস্তাব লিখিতভাবে দাখিল করার জন্য। হিমলারও তৎক্ষণাৎ মোমবাতির আলোকে তাড়াতাড়ি একটা চিঠি লিখিয়া দিলেন। ভূগর্ভের একটি কক্ষে মোমবাতির আলোকে এই পত্র রচনা করিতে হইল এজন্য যে, তখন বৃটিশ বিমানবহর বোমাবর্ষণ করিতেছিল এবং লুয়েবেক শহরের বিদ্যুৎ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেই অবস্থাতেই হিমলার আত্মসমর্পণের চিঠিতে স্বাক্ষর করিয়া দিলেন।...

বলা বাহুল্য যে, হিমলার এবং গোয়েরিং উভয়েই 'অসময়ে' 'কাঁচাকাজ' করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কারণ হিটলার যদিও তাঁর ভূগর্ভে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিলেন এবং যদিও ২৩শে এপ্রিল সন্ধ্যার মধ্যে সোভিয়েত বাহিনীর সৈন্যেরা বার্লিনকে প্রায় ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল, তথাপি অতি শীর্ণ ও সামান্য

বেতারব্যবস্থার যোগে হিটলার তাঁর সৈন্যবাহিনী ও মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চালিতেছিলেন এবং তিনি প্রমাণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন যে, তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা ও প্রেস্টিজের দ্বারা তিনি এখনও জার্মানীর ভাগ্য-নিয়ন্তার পদেই আছেন। সুতরাং তাঁর অনুচরদের মধ্যে যিনি যতই ক্ষমতাশালী বা খ্যাতিমান হইয়া থাকুন না কেন, বিশ্বাসঘাতকতা বা দেশদ্রোহিতার অপরাধে তাঁকে উপযুক্ত দণ্ড দেওয়ার শক্তি এখনও তাঁর অব্যাহত আছে। এবং সেটা তিনি প্রমাণ করিয়াও ছাড়িয়াছিলেন।

সেই রাত্রে যখন গোয়েরিং ওবারস্তালজবার্গে তাঁর টেলিগ্রামের উত্তর পাওয়ার জন্য প্রায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং হিমলার লুয়েবেক শহরে কাউন্ট বার্নাডোটের নিকট জার্মানীর আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিতেছিলেন, তখন হিটলারের বাঙ্কারে আর একটি চমকপ্রদ এবং অভিনব দৃশ্যের অবতারণা হইল। অস্ত্রসজ্জা ও গোলাবারুদের মন্ত্রী আলবার্ট স্পীর (Albert Speer) যে কোন ভাবেই হউক, সেই অবরুদ্ধ নগরীতে ভূগর্ভের বাঙ্কারে আসিয়া হাজির হইলেন হিটলারের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের জন্য। স্থপতি-শিল্পী হিসারে তিনি যেমন দীপ্তিমান ও প্রতিভাধর ছিলেন, তেমনি অস্ত্রসজ্জার মন্ত্রী হিসাবে তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। সুতরাং নিয়মমাফিক নাৎসী নেতা না হওয়া সত্ত্বেও উচ্চতম মহলে তিনি সমাদৃত ছিলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে হিটলারের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও অনুগত ছিলেন। কিন্তু এ হেন ব্যক্তিও শেষপর্যন্ত হিটলারের প্রতি বিগড়াইলেন, কিন্তু কেন? জার্মানীর পতনের মুখে সেই ঘটনাটা নিতান্ত উল্লেখযোগ্য।...

আলবার্ট স্পীর তাঁর আত্মস্মৃতিমূলক বিখ্যাত বইতে নাৎসী পার্টি ও হিটলারী রাজত্বের অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সমস্ত তথ্যে প্রকাশ যে, জার্মানীর পরাজয় যতই আসন্ন হইয়া উঠিল, হিটলার ততই তাঁর পুরাতন সহকর্মী-দের মধ্যে একমাত্র গোঁড়া ভক্তদের সাহচর্যের গণ্ডীতে আবদ্ধ রহিলেন। রাতের পর রাত তিনি একমাত্র গোয়েবেলস্, বরার্ট লে (জার্মান লেবার ফ্রন্টের অধিকর্তা) এবং বোরম্যানের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরামর্শে কাটাইতেন। সেই মন্ত্রণাকক্ষে আর কাহারও প্রবেশের অধিকার ছিল না। তাঁদের এই আচরণ সন্দেহজনক ছিল এবং তাঁদের ভাবভঙ্গীতে বুঝা গেল যে, জাতির ভাগ্যের চেয়েও নিজেদের ভাগ্যকে তাঁরা বড় করিয়া দেখিতেন। তাঁরা জার্মানীর ভাগ্য সম্পর্কে স্থির করিলেন—"We will leave nothing but a desert to the Americans, English and Russians." —আমরা আমেরিকান, ইংরেজ ও রুশদের জন্য একমাত্র মরুভূমি ছাড়া আর কিছুই রাখিয়া যাইব না।" (১০)

প্রথমে ব্যাপারটা ছিল কেবল মৌখিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে হিটলার স্বয়ং জাতির অস্তিত্ব ধ্বংস করার জন্য হুকুমনামা জারি করিলেন। কারণ তাঁর মতে পরাজিত জাতির বাঁচিয়া থাকার অধিকার নাই। তিনি

(১০) Inside the Third Reich—Albert Speer. First Sphere Books edition, 1971, p. 570.

স্পীরের নিকটও মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, যদি যুদ্ধে পরাজয় ঘটে, তবে জার্মান জাতিও ধ্বংস হইবে। তাদের আদিম জীবনযাত্রা বাঁচাইয়া রাখার দরকার নাই। এজন্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কলকারখানা এবং বড় বড় সমস্ত সেতু ইত্যাদি ধ্বংস করিয়া দেওয়ার জন্য তিনি হুকুম জারি করিলেন।

[মার্কিন ঐতিহাসিক শাইরারও তাঁর পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে নাৎসী পার্টির প্রশাসনিক অফিসারদের (gauleiter) কাছে এক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন—"যদি জার্মান জনগণ এই যুদ্ধে পরাজিত হয়, তবে, প্রমাণিত হইবে যে, জাতি হিসাবে তারা অত্যন্ত দুর্বল এবং তাদের ভাগ্যে একমাত্র ধ্বংসই লেখা আছে।"—পৃষ্ঠা ১০১০।

'দি লাস্ট হানড্রেড ডেইজ' (পৃষ্ঠা ৫৩৬) জন টোল্যান্ড লিখিয়াছেন যে, হিটলার তাঁর বাঙ্কারে এপ্রিল মাসে একজন সেনাপতির নিকট মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, তাঁর নেতৃত্বে যদি জার্মান জাতি এই চূড়ান্ত যুদ্ধে পরাজিত হয়, তবে তাদের বাঁচিয়া থাকার অধিকার থাকিবে না। বরং পূর্বদিকের জাতি তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিবে এবং জার্মান জনগণের পতন মানিয়া লওয়া ছাড়া আর কিছু করিবার থাকিবে না।]

শত্রুকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে এই ধরনের পোড়ামাটির নীতি অনুসরণ করিলে জার্মান জাতির পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা করাও সম্ভব হইবে না এবং হিটলারের মৃত্যুর সঙ্গে জার্মানীরও মৃত্যু ঘটিবে। এমন একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া আলবার্ট স্পীর এই সর্বনাশা হুকুম বানচাল করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন এবং সম্ভাব্য যে-সমস্ত অধিনায়ক বা নায়কদের হাত দিয়া এই সর্বাত্মক ধ্বংসকার্য বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব স্পীর অত্যন্ত দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতার সঙ্গে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করিয়া এই আদেশ বানচাল করার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি গভীর বিপদের ঝুঁকি নিয়া হিটলারকেও একটি স্মারকলিপিতে এই আদেশের বিপর্যয়কর দিকটা বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন।

আলবার্ট স্পীর এই সময় যেন একটা মানসিক যন্ত্রণায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, হিটলার বাঁচিয়া থাকিতে এই যুদ্ধ শেষ করা যাইবে না। অথচ জার্মনী ধ্বংস হইয়া যাইবে। সুতরাং তিনি হিটলারকে সংহার করার সংকল্প করিলেন। হিটলারের বাঙ্কারের বায়ু চলাচল করার রন্ধ্রপথ দিয়া তিনি বিষাক্ত গ্যাস প্রবেশ করাইয়া হিটলার এবং তাঁর সামরিক নেতাদের একযোগে হত্যা করার পরিকল্পনা করিলেন। এই উদ্দেশ্য নিয়া তিনি একদিন বাঙ্কারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে গেলেন। কিন্তু সেখানে গিয়া তিনি বিস্ময়ে হতবাক হইলেন। কেননা, তিনি দেখিতে পাইলেন যে, বায়ু চলাচল করার সেই রন্ধ্রের উপর ইতিমধ্যে দশফুট উঁচু একটা চিমনি বসানো হইয়াছে। আর সশস্ত্র প্রহরীরা সারাক্ষণ সেখানে পাহারা দিতেছে এবং রাত্রিবেলা প্রভূত সার্চ লাইটের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং হিটলারকে হত্যার এই শেষ পরিকল্পনাও নষ্ট হইয়া গেল। (১১)

২৩শে এপ্রিল সন্ধ্যায় আলবার্ট স্পীর হিটলারের বাঙ্কারে আসিয়া হাজির হইলেন এবং সেখানে অবশিষ্ট নেতাদের মধ্যে দেখা পাইলেন বোরম্যান, গোয়েবেলস,

(১১) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৫৭৭

রিবেন্ট্রপ, ক্রেবস, ফন্ বিলো এবং হিটলারের সহকারীবৃন্দ ও তাঁর প্রণয়িনী ইভা ব্রাউনকে। স্পীর অত্যন্ত সাহস ও সরলতার সঙ্গে হিটলারের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে জানাইয়া দিলেন যে, বার্লিনকে পোড়ামাটির নীতির দ্বারা ধ্বংস করার যে আদেশ তিনি দিয়াছিলেন, জার্মান জাতির অস্তিত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে গত কয়েক দিন বহু চেষ্টার পর সেই আদেশ স্পীর অকেজো করিয়া দিয়াছেন।

স্পীর ভাবিয়াছিলেন যে, হিটলারের আদেশ অমান্য করার অপরাধে নিশ্চয়ই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হইবে। এমন কি তাঁর প্রাণদণ্ডও হইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই সমস্ত কিছুই ঘটিল না। হিটলার অত্যন্ত মন দিয়া স্পীরের বক্তব্য শুনিলেন এবং বাহ্যতঃ মনে হইল স্পীরের আন্তরিকতায় তাঁর হৃদয় 'গভীরভাবে স্পর্শ' করিয়াছিল। যে রক্তপিপাসায় হিটলার কাতর ছিলেন এবং নির্বিকার চিত্তে খ্যাত-অখ্যাত অজস্র মানুষের রক্তপাত ঘটাইয়াছেন, সেই হিটলার আলবার্ট স্পীরের বেলা অত্যন্ত শান্ত ভাব ধারণ করিলেন। বোধ হয় তরুণ বয়স্ক (বয়স ৪০ বছর) স্পীরের শিল্পপ্রতিভার প্রতি হিটলারের গভীর অনুরাগ ছিল এবং অস্ত্রসজ্জার মন্ত্রী হিসাবে তাঁর দক্ষতার প্রতিও হিটলারের আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। সুতরাং স্পীরের বেলা হিটলারের আচরণের বিস্ময়কর ব্যতিক্রম দেখা গেল। বাঙ্কারে ৮ ঘণ্টা কাটাইবার পর স্পীর ভোর রাত্রি ৪টার সময় বোমাবিধ্বস্ত এবং আক্রান্ত বার্লিন ত্যাগ করিলেন।

* * *

হিটলারের পার্শ্বচর এবং নাৎসী পার্টির বড় বড় নেতাদের মধ্যে লোভ, ঈর্ষা এবং ক্ষমতা দখলের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব অত্যন্ত প্রবল ছিল। একমাত্র গোয়েবেলস ছাড়া এঁদের অনেকের মধ্যেই বিদ্যাবুদ্ধির কোন প্রাখর্যও ছিল না। গোয়েরিং, হিমলার ও মার্টিন বোরম্যান হিটলারের শূন্য স্থানে জার্মানীর ভাগ্যনিয়ামকের আসনে বসিবার জন্য ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। সুতরাং হিটলারের শেষের দিনগুলিতে এঁদের কার্যকলাপ চক্রান্তপ্রবণ হইয়া উঠিল।

মার্টিন বোরম্যান চার বছর ধরিয়া অপেক্ষমাণ ছিলেন গোয়েরিংকে ধ্বংস করার জন্য। কিন্তু কোন উপযুক্ত সুযোগ পান নাই। এবার সেই সুযোগ আসিল। কিন্তু এদিকে সময় খুব সঙ্কীর্ণ। কারণ, হিটলার যে কোন দিন মারা যাইতে পারেন। কিন্তু ইতিপূর্বেই আইনগত যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাতে হিটলারের পর গোয়েরিংয়েরই ক্ষমতা লাভ করার কথা। সুতরাং এই আইনগত অবস্থার যদি কোন পরিবর্তন না ঘটানো যায়, তবে গোয়েরিংই হইবেন হিটলারের উত্তরাধিকারী এবং বোরম্যানের কপালে আর কোনদিন ক্ষমতা জুটিবে না। কিন্তু এতদিন পর তাঁর সুযোগ আসিয়াছে। গোয়েরিং তাঁর টেলিগ্রামের দ্বারা বোরম্যানের ফাঁদে পা দিয়াছেন। কেননা, কাইটেল ও জডল ইতিমধ্যে বাঙ্কার ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন এবং এখনও যে দুই তিন জন আছেন, তাঁরা কেউ গোয়েরিংকে বাঁচাইবার জন্য মাথা ঘামাইবেন না। সুতরাং বোরম্যানের পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ ছিল হিটলারের কান ভাঙানি দেওয়ার। বোরম্যান প্রথমেই হিটলারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন গোয়েরিংয়ের টেলিগ্রামের সেই অংশটির উপর যেখানে রাত্রি ১০টার মধ্যে জবাব পাওয়ার দাবি ছিল। তিনি

পরিষ্কার বুঝাইয়া দিলেন যে, গোয়েরিংয়ের এটা চরমপত্র বা 'আলটিমেটাম'। সেই সঙ্গে বোরম্যান হিটলারকে আরও স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ৬ মাস আগেই গোয়েরিং সম্পর্কে এই সন্দেহ কর হইয়াছিল যে, তিনি ভিতরে ভিতরে মিত্রশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ বিরতির আলোচনা চালাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। সুতরাং পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, গোয়েরিং সেই চেষ্টা চালাইবার জন্যই ক্ষমতা দখল করিতে চাহিতেছেন। এবার সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হিটলারের গভীর সন্দেহ আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। বিগত ২০শে জুলাইয়ের ভয়াবহ হত্যা-চক্রান্তের কথা তিনি আদৌ ভুলেন নাই। সুতরা গোয়েরিংয়ের নিকট এক টেলিগ্রাম পাঠাইয়া জানাইয়া দেওয়া হইল যে, হিটলার এখনও সমস্ত ক্ষমতা খাটাইবার অধিকার ও সামর্থ্য রাখেন, অতএব স্বাধীনভাবে কোন চেষ্টা (যুদ্ধবিরতির) চালানো নিষিদ্ধ করা হইল।

তখন পর্যন্ত আলবার্ট স্পীর বাঙ্কারেই ছিলেন। হিটলার তাঁর সামনেই গোয়েরিংয়ের বিরুদ্ধে তীব্র রোষ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন যে, গোয়েরিং অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত ও নেশাগ্রস্ত এবং তাঁর কাজকর্মেও তিনি ব্যর্থ হইয়াছেন।

একথা বলার পরেই হিটলার কিছুটা শান্ত হইলেন এবং বলিলেন—'গোয়েরিং যদি আত্মসমর্পণের কথা চালাতে চান, তবে, চালাতে পারেন। এখানে একমাত্র ব্যক্তির কথাই বড় নয়।'

এই মন্তব্যের পরেই হিটলারের মেজাজ আবার বিগড়াইয়া গেল এবং বোরম্যানের প্ররোচনায় এই মর্মে এক টেলিগ্রাম গোয়েরিংকে পাঠানো হইল যে, গোয়েরিং নাৎসী পার্টি এবং ফুয়েরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। এর একমাত্র শাস্তি হইতেছে মৃত্যুদণ্ড। তবে, নাৎসী পার্টি ও রাষ্ট্রের প্রতি তিনি দীর্ঘকাল সেবা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁকে এই শর্তে ক্ষমা করা যাইতে পারে, যদি তিনি অবিলম্বে তাঁর সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দেন। হিটলার দাবী করিলেন—এর জবাবে গোয়েরিংকে অবিলম্বে উত্তর দিতে হইবে 'হাঁ কিংবা না'।

কিন্তু বোরম্যান এই সুযোগে তাঁর ধূর্ত বুদ্ধি খাটাইয়া ওবারস্যালজবার্গে অবস্থিত এস এস বাহিনীর নেতাদেরকে আর একখানা টেলিগ্রামে জানাইয়া দিলেন গুরুতর দেশদ্রোহিতার অপরাধে গোয়েরিং এবং কোলর ও ল্যামার্সসহ তাঁর সমস্ত পরামর্শদাতা ও উপদেষ্টাদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের জন্য। সেদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর দলবলসহ গোয়েরিংকে গ্রেপ্তার এবং তাঁদের স্ব স্ব গৃহে আটক করা হইল। হিটলারের পর যিনি অদ্বিতীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং জার্মানীর ইতিহাসে যিনি একমাত্র 'রাইখ মার্শাল' ছিলেন, যাঁর বিলাসিতা, দাম্ভিকতা এবং ঐশ্বর্য ছিল অপরিমিত, যিনি সমগ্র জার্মান বিমানবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন, তাঁকে এভাবে চূড়ান্ত অপমানের মধ্যে গ্রেপ্তার করা হইল।

পরদিন বার্লিনে ঘোষণা করা হইল যে, স্বাস্থ্যের কারণে গোয়েরিং তাঁর সমস্ত পদে ইস্তফা দিয়াছেন। অর্থাৎ বোরম্যানেরই জয় হইল এবং আবার হিটলারের উত্তরাধিকারীর প্রশ্নটি দেখা দিল। (১২)

(১২) ট্রেভর রোপার। পৃষ্ঠা ১৪৪-৪৫

২৪শে এপ্রিল সোভিয়েত বাহিনী বার্লিন ঘিরিয়া ফেলিল এবং বাঙ্কার অবরুদ্ধ হইল। এই সময় বার্লিনবাসীদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য রটনা করা হইল যে, জেনারেল ভেঙ্কের (Wenck) বাহিনী পশ্চিম দিক থেকে আগাইয়া আসিতেছে বার্লিনকে উদ্ধারের জন্যে। কিন্তু এই সমস্তই ছিল মিথ্যা গুজব মাত্র। হিটলার তাঁর অবরুদ্ধ বাঙ্কারে যে অবস্থার মধ্যে ছিলেন, তাতে বহির্জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তাঁর ধারণাও ছিল সামান্য। ইতিমধ্যে হিমলারের বদলে কর্নেল-জেনারেল হেইনরিসিকে (Heinrici) নিয়োগ করা হইল এবং রেডিও-টেলিফোনের যে সামান্য যোগাযোগ জেনারেল স্টাফের সঙ্গে ছিল, সেই সূত্র ধরিয়া হিটলার পাগলের মত খোঁজ নিতে লাগলেন—হেইনরিসি, ভেঙ্ক প্রভৃতি কোথায়? কাইটেলই বা কি করিতেছেন? কিন্তু এই সমস্ত প্রশ্নের কোন জবাব পাওয়া গেল না। কেননা, সৈন্যবাহিনীগুলি কার্যত ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল এবং পারস্পরিক যোগাযোগ নষ্ট হইয়া বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। এদিকে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে চ্যান্সেলারি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। এই দুর্যোগের মধ্যে রাত্রিবেলা প্রচার দপ্তর থেকে হিটলারের বাঙ্কারে খবর পৌঁছিল যে, হিমলার কাউন্ট বার্নাডোটের মারফৎ পশ্চিমের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির আলোচনা চালাইতেছেন। বৃটিশ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান রয়টারের মারফৎ এই খবর বিদেশী সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়াছিল।...

হিটলারের পাতালপুরীর আস্তানায় এই সময় শেষ যে দুই ব্যক্তি সাক্ষাতের জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁদের একজন ছিলেন জার্মানীর সবচেয়ে খ্যাতিসম্পন্ন মহিলা পাইলট (টেস্ট পাইলট)—নাম হান্না রিৎস্ (Hanna Reitsch) এবং অপরজন হইতেছেন মিউনিক থেকে আগত সেনাপতি রিটার ফন গ্রীম (Ritter von Greim)। ২.শে এপ্রিল সন্ধ্যায় জীবন বিপন্ন করিয়া হান্না রিৎস কোনমতে বার্লিনের বাঙ্কারে পৌঁছিলেন বটে, কিন্তু যে বিমানে তাঁরা আসিয়াছিলেন, রুশদের গুলিবর্ষণে সেটি ঘায়েল হইয়াছিল এবং জেনারেল গ্রীমের একটি পা চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাঁর পায়ে যখন অস্ত্রোপচার করা এবং ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হইতেছিল, তখন হিটলার সেখানে আসিয়া হাজির হইলেন এবং গ্রীমকে জানাইয়া দিলেন যে, গোয়েরিং তাঁর প্রতি এবং দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। এজন্য তাঁকে গ্রেপ্তার এবং সমস্ত পদ থেকে বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং তাঁর শূন্যপদে জেনারেল গ্রীমকে সমগ্র বিমানবাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োগ করা হইল। এমন কি তাঁকে মার্শাল পদবীতে উন্নীত করা হইল। বলা বাহুল্য হয়, আহত গ্রীম হতবাক হইলেন। কেননা, এই আদেশ তাঁকে বেতারবার্তা যোগেও জানাইয়া দেওয়া যাইত, তা' হলে এভাবে শত্রুর গুলিতে তাঁকে আহত হইতে হইত না! কিংবা বাঙ্কারে শুইয়া থাকিয়া তিনটি মূল্যবান দিবসও নষ্ট করিতে হইত না। কিন্তু জার্মানীর রণপ্রভু হিটলার চাহিয়াছিলেন তাঁকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁর মনের কথা জানাইয়া দিতে। অতএব গোয়েরিংয়ের টেলিগ্রামটি তিনি বিমানবাহিনীর নূতন সেনাপতিকে পড়িয়া শুনাইলেন এবং ক্রুদ্ধ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—'গোয়েরিং এত বড় কাপুরুষ যে, আমাকে না জানাইয়া শত্রুর সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে।'

হঠাৎ তাঁর মুখের শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিল এবং তাঁর হাত-পা কাঁপিতে লাগিল। হিটলার চিৎকার করিয়া উঠিলেন—এত বড় স্পর্ধা আমাকে সে চরমপত্র পাঠাইয়াছে!

"An ultimatum! A crash ultimatum! Nothing now remains! nothing is spared me! no loyalty is kept, no honour observed; there is no bitterness, no betrayal that has not been heaped upon me: and now this! It is the end. No injury has been left undone."

(অর্থাৎ সহজ কথায় হিটলারের বক্তব্য ছিল এই যে, এমন কোন অসম্মান, এমন কোন বিশ্বাসঘাতকতা, এবং এমন কোন ক্ষতি নাই, য' তাঁর প্রতি করা হয় নাই! অতএব এখানেই শেষ)।

এইসব কথা বলিতে বলিতে হিটলারের চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এদিকে বার্লিনের উদ্ধারের জন্য হিটলারের প্রত্যাশিত পশ্চিম দিক থেকে জেনারেল ভেঙ্কের অধীন ১২ নং আর্মি, কিংবা উত্তর দিক থেকে জেনারেল হেইনরিচির অধীন ভিশ্চুলা আর্মিগ্রুপ কিংবা দক্ষিণ দিক থেকে জেনারেল বুশের (Busse) অধীন ৯নং বাহিনীর কোন সৈন্যদলই আগাইয়া আসিল না বা আসিতে পারিল না। কারণ এই সমস্ত সৈন্যবাহিনীর কোনই শক্তি ছিল না এবং সেগুলি ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। হিটলার তাঁর উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনায় এই সমস্ত প্রত্যাক্রমণের স্বপ্ন দেখিতে ছিলেন। অথচ ২৮শে তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরও তাদের কোন খবর পর্যন্ত পাওয়া যাইতেছিল না।

২৬শে এপ্রিল রাত্রি থেকে রুশ কামানের গোলা সোজাসুজি চ্যান্সেলারির উপর আসিয়া পড়িতেছিল এবং বাঙ্কার সহ সমগ্র এলাকা যেন কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। আর বাঙ্কারের অভ্যন্তরে যাঁরা ছিলেন, তাদেরকে কেন্দ্র করিয়া যেন পাগলামির দৃশ্যের অবতারণা হইল। নাচ, হল্লা ও মদ্যপান ইত্যাদির মত্ততা দেখা দিল। অর্থাৎ জীবনের এক বেপরোয়া রূপের উদ্‌ঘাটন হইল—প্রত্যক্ষদর্শী মহিলা পাইলট হান্না রিৎস'-এর বর্ণনা অনুসারে।

সেই অবস্থায়ও জেনারেল গ্রীম এবং হান্না রিৎস হিটলারকে অনুরোধ করিলেন বার্লিন ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে। কিন্তু হিটলার আগের মতই অস্বীকৃত হইলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে, রুশরা বার্লিন দখল করিয়া নিলে তিনি এবং ইভা ব্রাউন একত্রে আত্মহত্যা করিবেন এবং তাঁদের দেহ আগুনে পোড়াইয়া ফেলা হইবে—এই ব্যবস্থা তিনি পাকা করিয়া রাখিয়াছেন। তখন হান্না রিৎস এবং জেনারেল গ্রীমও বাঙ্কারে অবস্থানের এবং হিটলারের সঙ্গে মৃত্যুবরণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। হিটলার তাঁদেরকে এক শিশি করিয়া বিষ দিলেন সঙ্কটজনক অবস্থায় ব্যবহারের জন্য।

ইতিমধ্যে অবস্থার আরও অবনতি ঘটিল এবং রুশরা বার্লিনের অভ্যন্তরে আরও আগাইয়া আসিতে লাগিল। ২৮শে এপ্রিল তারিখটি বাঙ্কারের বাসিন্দাদের পক্ষে নিদারুণ হইয়া উঠিল। কারণ, ঐদিন রাত্রে বি বি সি-এর সংবাদে প্রচারিত হইল যে, হিমলার সুইডিশ সরকারের মাধ্যমে পশ্চিমের মিত্রপক্ষের নিকট জার্মানীর আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই সংবাদ যেন বাঙ্কারের অভ্যন্তরে বজ্রপাত ঘটাইল এবং প্রায় সকলেই হিমলারের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া

উঠিলেন। হিটলার এই সংবাদে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কেননা হিমলারকে তিনি সবচেয়ে বিশ্বস্ত বলিয়া মনে করিতেন। অথচ তাঁর এই নীচতা ও বিশ্বাসঘাতকতা? গোয়েরিং তবু হিটলারের কাছে অনুমতি চাহিয়াছিলেন সরকারী ক্ষমতা লাভের জন্য। কিন্তু হিমলার ততটুকু নিয়মকানুনের জন্য পর্যন্ত অপেক্ষা করেন নাই। হিটলারের অজ্ঞাতসারে আত্মসমর্পণের চক্রান্ত করিয়াছেন। হিটলারের এখন সন্দেহ হইল সকলেই তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে। অন্যথা বার্লিনকে উদ্ধারের জন্য কোন সৈন্যবাহিনী আগাইয়া আসিল না কেন? হিটলার ক্রোধে জ্বলিতে লাগিলেন। হিমলারের এই বিশ্বাসঘাতকতা ইতিহাসে সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপার বলিয়া তাঁর কাছে প্রতিভাত হইল সুতরাং ২৮-২৯ রাত্রিবেলা হিমলারকে পদচ্যুত এবং তাঁর উত্তরাধিকারের দাবি বাতিল করিয়া তিনি দলিলপত্র স্বাক্ষর করিলেন।

এদিকে হিমলারের ঘটনায় হিটলারের সন্দিগ্ধ মন আরও সন্দেহাতুর হইয়া উঠিল। হেরমন ফেগেলিন (Fegelein) ছিলেন হিটলারের দরবারে হিমলারের প্রতিনিধি। হিটলারের সন্দেহ হইল যে, ফেগেলিনও নিশ্চয়ই হিমলারের প্রস্তাবিত আত্মসমর্পণের চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত আছে। অন্যথা হিটলারের কাছে অনুমতি না নিয়াই সে বাঙ্কার থেকে এবং তার দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে পালাইতে চাহিয়াছে কেন? কার্যতঃ সে ২৬শে তারিখে নিঃশব্দে বাঙ্কার থেকে সরিয়া পড়িয়াছিল। পরদিন অপরাহ্ণে হিটলারের সেটা নজরে আসিল এবং তৎক্ষণাৎ তিনি এস এস বাহিনীর একটি দলকে পাঠাইয়া দিলেন ফেগেলিনকে ধরিয়া আনার জন্য। প্রকাশ যে, গেস্টাপোর অধিকর্তা মুয়েলারের নিকট সে স্বীকার করিয়াছিল যে, হিমলার ও বার্নাডোটের মধ্যে সাক্ষাতের কথা সে জানিত। ফেগেলিনকে গ্রেপ্তার এবং পদচ্যুত করা হইল। হিটলারের প্রণয়িনী ইভা ব্রাউনের ভগ্নীকে সে বিবাহ করিয়াছিল সুতরাং তার আশা ছিল ইভা ব্রাউন নিশ্চয়ই হিটলারের প্রতিহিংসা থেকে তাঁর ভগ্নীপতিকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু ইভা কোন চেষ্টাই করিল না। বরং হান্না রিৎসের কাছে কাঁদো কাঁদো সুরে সে বলিল "আহা বেচারা অ্যাডলফ! সকলেই তাঁকে ত্যাগ করিয়াছে। সকলেই তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। বরং ১০ হাজার লোকের প্রাণ যাউক সেও ভালো, তবু জার্মানী তাঁকে (হিটলারকে) যেন না হারায়।"

হিটলারের রক্তপিপাসা জাগিয়া উঠিল। ফুয়ারের হুকুমে সশস্ত্র প্রহরীরা ফেগেলিনকে বাঙ্কারের বাইরে চ্যান্সেলারির বাগানে নিয়া গেল এবং সেখানে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিল।...

এদিকে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর হিটলার জেনারেল গ্রীমের কক্ষে আসিলেন এবং তাঁকে তাঁর শেষ হুকুম দিলেন—

প্রথমতঃ জার্মান বিমানবহরের সাহায্যে চ্যান্সেলারি আক্রমণকারী রুশসৈন্যদের ঘাঁটির উপর বোমা বর্ষণ করিয়া ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করিয়া দিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ হিমলারের মত জঘন্য বিশ্বাসঘাতককে নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার করিতে হইবে। হিটলার চিৎকার করিয়া বলিলেন—"একজন বিশ্বাসঘাতককে নিশ্চয়ই আমার শূন্য পদে বসিতে দেওয়া হইবে না। সেই ব্যবস্থা তোমাকে অবশ্যই পাকা করিতে হইবে।"

জেনারেল গ্রীম (Greim) এবং হান্না রিৎস (Reitsch) বার্লিনের ভূগর্ভের আশ্রয় থেকে রুশ আক্রমণের গুরুতর বিপদ মাথায় নিয়া বিমানযোগে যাত্রা করিলেন। ইভা ব্রাউন তাঁর বোন মিসেস ফেগোলিনের কাছে একখানা চিঠি লিখিয়া হান্না রিৎসের হাতে দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু চিঠিটা এত বাজে ছিল যে, রিৎসের নিকট তা অপাঠ্য মনে হইয়াছিল। কিন্তু ইভা যখন সেই চিঠি লিখিতেছিল, তখন ইভার ভগ্নীপতি ফেগেলিনের মৃতদেহ চ্যান্সেলারির বাগানে গেরে দেওয়া হইতেছিল।

নবম পর্ব

পঞ্চম অধ্যায়

মুসোলিনীর চরমদণ্ড ঃ উপপত্নীসহ নিহত

হিটলার যখন বার্লিনের ভূগর্ভে তাঁর অন্তিম আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পূর্ব ও পশ্চিম দুই দিক থেকে জার্মানী যখন ক্রমশঃ চূড়ান্ত পতনের মুখে পড়িতেছিল, তখন তাঁর মিতা ও সমরসঙ্গী এবং ইউরোপে ফ্যাসিজমের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা মুসোলিনী কি অবস্থায় ছিলেন? একথা আগেই উল্লেখ (ষষ্ঠ পর্ব, তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) করা হইয়াছে যে, ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হিটলারের নির্দেশে স্কোরজেনি (Skorzeny) কর্তৃক বন্দী মুসোলিনীর (১৯৪৩, ২৫ জুলাই ইতালীর রাজা কর্তৃক পদচ্যুত) উদ্ধারের পর উত্তর ইতালীর লেক গারডা অঞ্চলে একটি নতুন ফ্যাসিষ্ট রিপাব্লিকান গবর্নমেণ্ট স্থাপন করিয়াছিলেন। রোম থেকে ৫০০ মাইল দূরে স্যালো নামক ক্ষুদ্র শহরে এই সরকারের দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এজন্যে এই নতুন সরকার 'স্যালো রিপাব্লিক' নামে পরিচিত ছিল। আসলে এটা কোন স্বাধীন ও সার্বভৌম গবর্ণমেণ্ট ছিল না এবং মুসোলিনী নিজেকে এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান বলে ঘোষণা করিলেও এর বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা ও শাসনকার্য চালাইবার ক্ষমতা ছিল না। এটা ছিল সম্পূর্ণরূপে নাৎসী জার্মানীর কবলিত এবং হিটলার ও তাঁর প্রতিনিধিদের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত—যদিও স্যালো রিপাব্লিকের তথাকথিত কয়েকজন মন্ত্রীও ছিল। প্রকৃতপক্ষে মুসোলিনী এস এস জার্মান গুণ্ডাবাহিনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। যিনি বিশ বছর ধরিয়া ইতালীর ভাগ্যবিধাতা এবং আন্তর্জাতিক জগতের একজন নেতা ছিলেন, তাঁর পক্ষে এই অবস্থা বরদাস্ত করা নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল না। অথচ মুসোলিনীর পক্ষে স্বাধীনভাবে কিছু করারও উপায় ছিল না। মুসোলিনী তখন নিতান্তই হতাশ ও ভগ্নস্বাস্থ্য। তবু, নাৎসী জার্মানদের অসম্মানজনক ও অসহনীয় কবল থেকে তিনি ত্রাণ পাইতে চাহিলেন।

১৯৪৪ সালের শেষভাগে ইতালীতে মিত্রপক্ষের অগ্রগতি শুরু হইল এবং জার্মানদের গোথিক লাইন নামে প্রতিরক্ষার ব্যূহ ভাঙ্গিয়া গেল এবং উত্তর ইতালী ক্রমশঃ বিপদের মুখে পড়িল। জার্মান ও ইতালীয় ফ্যাসিষ্টরা একত্রে বাধাদানের কথা চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু বাস্তবে তেমন কিছু ঘটিল না। তখন ১৯৪৫ সালের আরম্ভে ইতালীয় ফ্রন্টে মিত্রপক্ষের নতুন অভিযানের ফলে ইতালীর জার্মান নায়কেরা যুদ্ধাবসানের কথা ভাবিতে লাগিলেন। কারণ, তখন ইউরোপের সর্বত্রই ফ্যাসিষ্ট নেতাদের অধিকাংশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে আর জয়লাভের আশা নাই। কিন্তু বলশেভিক রাশিয়ার ভয়ে তাঁরা ভীত ছিলেন এবং এজন্য নানা সূত্র ধরিয়া বৃটিশ ও মার্কিন পক্ষের নিকট যুদ্ধবিরতি বা আত্মসমর্পণের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। গোয়েরিং, হিমলার, রিবেণ্ট্রপ এবং কালটেনব্রুনার প্রমুখ বাঘা বাঘা নাৎসী নেতারা সুইডেন, মাদ্রিদ ও সুইজারল্যাণ্ডে তাঁদের প্রতিনিধি বা অনুচরদের পাঠাইয়া কিংবা নিরপেক্ষ দূত মারফৎ শান্তি স্থাপনের জন্য আলোচনার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিশেষভাবে ইউরোপে নিরপেক্ষ সুইজারল্যাণ্ডের ভৌগোলিক সংস্থান সুবিধাজনক

বলিয়া এবং সেখানে মার্কিন গোয়েন্দা শিরোমণি অ্যালান ডালাসের প্রধান দপ্তর প্রতিষ্ঠিত থাকায় পশ্চিমী মিত্রশক্তির সঙ্গে যুদ্ধাবসানের চেষ্টা চলিতে লাগিল। মুসোলিনীও এই সুযোগে জার্মান হাত থেকে ত্রাণ পাওয়ার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কারণ, উত্তর ইতালী ছিল অত্যন্ত শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল এবং তখন পর্যন্ত মিত্রপক্ষের অধিকারের বাইরে। কিন্তু ইতালীর ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী দেশপ্রেমিক যোদ্ধারা কিংবা পার্টিজান গেরিলারা ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিলেন। এঁদের মধ্যে কমিউনিস্টরা ছিলেন বিশেষ শক্তিশালী এবং ৬টি অ্যান্টি-ফ্যাসিষ্ট দল এমনভাবে গড়িয়া উঠিতে লাগিল যে, তাঁরা শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত ছাইয়া ফেলিলেন ইতালীর জার্মান ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে। পার্টিজানদের সংখ্যা ১ লক্ষ ৭০ হাজারে দাঁড়াইল এবং এদের সঙ্গে বহু স্ত্রীলোক বা মহিলারাও যোগ দিয়াছিলেন। নাৎসী ফ্যাসিষ্টদের যুদ্ধ-যাত্রায় বাধা দেওয়ার জন্য তাঁরা উত্তর ইতালীর বড় বড় শিল্প-কলকারখানাগুলিতে এবং রেলওয়েতে ধর্মঘট বাধাইয়া দিলেন। আর সেই সঙ্গে হানাদারি গুপ্ত আক্রমণ ও সাবোটাজ অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ফলে, ইতালীয়-জার্মান ফ্যাসিষ্টরা পার্টিজান-দের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ভয়াবহ ও বর্বর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে লাগিল। এখানে শত শত 'লিডিস্'-এর সৃষ্টি হইল এবং একটি গ্রাম থেকেই ১৮০০ লোককে হত্যা করা হইয়াছিল।(১)

উত্তর ইতালীর কলকারখানা ও শিল্পোৎপাদনের গুরুত্বের জন্য এই অঞ্চলটা কমিউনিস্টদের দখলে গেলে পশ্চিমী শক্তিগুলির রাজনৈতিক ভবিষ্যতের পক্ষে বিপদের কারণ ঘটিবে। সুতরাং এই পরিণতি নিবারণের জন্য হয়তো ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ ফ্যাসিষ্ট-দের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় রাজী হইতে পারেন, এমন চিন্তা ঢুকিল নাৎসী নেতাদের মাথায়। এমন কি কিছুকালের জন্য হিটলার এবং সেই সঙ্গে মুসোলিনীর মস্তিষ্কেও এই কল্পনার ঢেউ খেলিয়া গেল। আর ভ্যাটিকান বা খ্রীষ্টান ধর্মগুরু পোপের দপ্তরেও ফ্যাসিষ্ট যুদ্ধের ধ্বংস ও ত্রাস এবং রক্তপাত ও বিপ্লব থেকে উত্তর ইতালীকে রক্ষা করার জন্যে উদ্বেগ দেখা দিল।···(২)

কিন্তু জার্মানদের পক্ষ থেকে এই সমস্ত শান্তি প্রচেষ্টায় মিত্রপক্ষ তেমন কিছু সাড়া দিলেন না এবং সোভিয়েত রাশিয়া উত্তর ইতালীর জার্মান নায়কদের এই সমস্ত প্রচেষ্টা সন্দেহের চোখে দেখিলেন এবং চার্চিলের নিকট আপত্তি জানাইলেন। বিশেষভাবে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মৃত্যুর পর এই আপত্তি আরও তীব্র হইল—যদিও মুসোলিনীর মনে রুজভেল্টের মৃত্যু সংবাদ কিছুটা আশার সঞ্চার করিয়াছিল এবং অন্যান্য ফ্যাসিষ্ট-দের মত তাঁরও মনে হইয়াছিল যে, অতঃপর সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী শক্তি-বর্গের বিচ্ছেদও ঘটিতে পারে। অবশ্য ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গের বিপর্যয়কর অবস্থার জন্যই এই সমস্ত রঙীন কল্পনা তাদের পক্ষে সান্ত্বনা স্বরূপ ছিল।···

এদিকে মুসোলিনীর সঙ্গে জার্মানদের বিশেষ বনিবনা হইতেছিল না। উত্তর

(১) দি সেকেন্ড গ্রেট ওয়ার, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭০১-৩৭০৩

(২) The Last Days of Mussolini—F. W. Deakin, Panguin, 1962, p. 262.

ইতালীর স্যালো রিপাব্লিকে জার্মানীর নূতন দূত রুডলফ র‍্যান (Rudolf Rahn) অত্যন্ত ধূর্ত কূটনৈতিক ছিলেন এবং তিনি মুসোলিনীর গতিবিধির উপর নজর রাখিলেন। অধিকন্তু এস এস বাহিনীর কমান্ডার জেনারেল উলফ (Wolff) সামরিক প্রতিনিধি হিসাবে মুসোলিনীর শান্তি প্রচেষ্টা সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। মার্শাল গ্রাৎসিয়ানীকে মুসোলিনী পছন্দ করিতেন না। কিন্তু হিটলার তাঁকে মুসোলিনীর নতুন সরকারের সমরসচিব ও সেনানীমণ্ডলীর প্রধানের পদে নিয়োগ করিতে বাধ্য করিলেন।(৩) অনুরূপভাবে গুইডো বুফারিনি (Guido Buffarin) স্যালো রিপাবলিকের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যদিও বুফারিনি একজন পাকা রাজনীতিক ও দক্ষ প্রশাসক ছিলেন, তবু মুসোলিনী তাঁর নিয়োগ বাতিল করিয়া দিলেন। কিন্তু কি কারণে তাঁকে বরখাস্ত করা হইল, তা স্পষ্ট বুঝা গেল না। সুতরাং জার্মান মহল মুসোলিনীর উপর খুব অসন্তুষ্ট হইলেন এবং জার্মানীর সঙ্গে মুসোলিনীর দৈনন্দিন সম্পর্ক খুব খারাপ হইতে লাগিল। (৪)

* *

মুসোলিনী হিটলারী গ্রাস থেকে নিজেকে উদ্ধার করার কথা ভাবিতে লাগিলেন এবং কিভাবে একটা 'ইতালীয় রাজনৈতিক মীমাংসার' দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটানো যায়, সেই চিন্তা তাঁর মাথায় ঘুরিতে লাগিল। হিটলারের কাছ থেকে তিনি ক্রমশ দূরে সরিয়া যাইতে চাহিলেন এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গের সঙ্গে একটা আপোস মীমাংসায় আসিবার জন্য মিলানের আর্ক বিশপের মারফৎ "রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে" লিখিতভাবে একটি আবেদন পাঠাইলেন। এই আবেদনে তিনি উত্তর ইতালীকে ধ্বংস, রক্তপাত ও কমিউনিস্ট বিপ্লব থেকে রক্ষা করার, এমন কি রিপাব্লিকান ফ্যাসিষ্ট পার্টি ভাঙ্গিয়া দেওয়ার প্রস্তাব পর্যন্ত করিলেন। কিন্তু ৬ই এপ্রিল (১৯৪৫) পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও তিনি তাঁর আত্মসমর্পণের প্রস্তাবের কোন জবাব পাইলেন না। অধিকন্তু ঐ দিনই তিনি ইতালীয়-জার্মান বাহিনীর পক্ষ থেকে সুইজারল্যাণ্ডে যুদ্ধ বিরতির আলোচনার সংবাদ শুনিতে পাইলেন। অবশ্য এই সংবাদ মিথ্যা ছিল না এবং এই শান্তি প্রচেষ্টার নাম ছিল 'অপারেশন সানরাইজ'। মুসোলিনী এই সংবাদে হতভম্ব হইলেন এবং জার্মান রাষ্ট্রদূতকে ডাকিয়া আনিয়া ব্যাপারটা বুঝিতে চাহিলেন। কিন্তু ডঃ রুডলফ র‍্যান জানিয়াও না জানার ভান করিলেন এবং সামরিক প্রতিনিধি উলফকে ডুচের বিরক্তি ও অসন্তোষ সম্পর্কে সাবধান করিয়া দিলেন।(৫)

এখানে পাঠকবর্গকে আর একবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে, মুসোলিনীর অবস্থা নিতান্তই শোচনীয় ছিল। উত্তর ইতালীর লেক গারডার পশ্চিম তীরে যে ছোট্ট স্যালো শহরে তাঁর 'গবর্নমেন্ট' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেটা সম্পূর্ণ রূপেই জার্মানদের কবলিত ছিল এবং লেক গারডা, লেক কমো, স্যালো ইত্যাদি জায়গাগুলি ছিল সুইজারল্যান্ড, আল্পস, বিখ্যাত ব্রেনার গিরিবর্ত্ম, অস্ট্রিয়া ইত্যাদি সন্নিহিত সীমান্ত অঞ্চলে, ১৯৪৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ইতালীর আত্মসমর্পণ এবং ১৩ অক্টোবর ইতালী

(৩) ডুচে—রিচার্ড কোলিয়েব, পৃষ্ঠা ২৮০
(৪) দি লাষ্ট ডেইজ অব্ মুসোলিনী, পৃঃ ২৭৭
(৫) দি লাস্ট হাণ্ড্রেড ডেইজ্, পৃষ্ঠা ৫৩০

কর্তৃক জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পরেই ইতালী উত্তরে ও দক্ষিণে ভাগ হইয়া-গিয়াছিল দক্ষিণ নিকট ছিল মিত্রপক্ষের দখলে। ১৯৪৪ সালের ৪ঠা জুন মিত্রবাহিনী রোম দখল করিয়া নিয়াছিল। অর্থাৎ জার্মানরা রোম ছাড়িয়া উত্তর ইতালীতে চলিয়া গিয়াছিল। তারপর থেকেই উত্তর ইতালীতে বাকী ইতালীয় ফ্যাসিষ্ট ও জার্মানদের বিরুদ্ধে পার্টিজান ও গেরিলা বাহিনী সংগঠিত হইতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত তারাই বিখ্যাত মিলান শহর সহ সারা উত্তর ইতালী ছাইয়া ফেলিয়াছিল।

এই অবস্থার মধ্যে মুসোলিনী স্যালো শহরে জার্মানদের আশ্রয়ে "স্বাধীন" সরকার গঠন করিলেন। কিন্তু তখন তিনি দেহে ও মনে ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ কার্যতঃ তখন তিনি ফুরারের ইতালীয় এজেন্টে পরিণত হইয়াছিলেন এবং তাঁরই চাপে পড়িয়া ভেরোনা জেলে তাঁর জামাতা কাউন্ট চিয়ানো (প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী) ও অন্যান্যের বিচার প্রহসন ও প্রাণহনন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অথচ কন্যা এড্ডাকে তিনি ভালোবাসিতেন কিন্তু এই ভালোবাসার জোরেও তিনি তাঁর জামাতাকে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ থেকে রক্ষা করিতে পারিলেন না এবং কার্যতঃ কন্যার কাছে মুখ দেখাইতেও সাহস পাইতেছিলেন না। মন্দভাগিনী কাউন্টেস এড্ডা শোকে, দুঃখে, ক্ষোভে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন এবং এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য পিতা মুসোলিনীকে আত্মহত্যার জন্য বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, মুসোলিনীর স্ত্রী জার্মান পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁর জামাতা কাউন্ট চিয়ানোর উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁর প্রাণদণ্ড সমর্থন করিয়াছিলেন!

অধিকন্তু এই সময় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিল কমন্সসভার এক বক্তৃতায় তীব্র কণ্ঠে মন্তব্য করিলেন যে, নিজের জামাতার রক্তে হাত কলঙ্কিত করিয়া মুসোলিনী আবার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখা দিতেছে!

চার্চিলের এই মন্তব্য মুসোলিনীকে গভীরভাবে আহত করিয়াছিল। সুতরাং তিনি এক যাজকের কাছে প্রার্থনা করিলেন তাঁর 'আত্মার শান্তির জন্য' এবং "ভগবানের সঙ্গে তাঁর আত্মার সংযোগ বিধানের চেষ্টা করার জন্য।"(৬)

কিন্তু ভগবানের দরবারে মুসোলিনীর শান্তি প্রার্থনার কি দশা হইয়াছিল, তা জানার সুযোগ ছিল না। তবে ১১ই এপ্রিল, ১৯৪৫, এটা জানা গেল যে, পশ্চিমীদের নিকট তাঁর যুদ্ধ বিরতির বা শান্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইল। সুইজারল্যান্ডে ডালেসের দপ্তর থেকে ভ্যাটিকানের মারফৎ মুসোলিনীকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, একমাত্র নিঃসর্ত আত্মসমর্পণ ছাড়া মিত্রপক্ষের নিকট আর কিছু গ্রহণযোগ্য নহে।

* * *

লেক গারডা ও স্যালো থেকে মুসোলিনী এবার তাঁর গবর্নমেন্ট মিলানে স্থানান্তরিত করিতে চাহিলেন এবং ১৬ই এপ্রিল সকালে তাঁর 'মন্ত্রিসভার' নিকট সে কথা ঘোষণা করিলেন। অবশ্য তার আগে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যদি শেষ যুদ্ধ চালাইয়া মরিতেই হয়, তবে, তিনি স্বদেশের ভূমিতেই মরিতে চান এবং উত্তর দিকে ভালটেলিনাতে তিনি তাঁর শেষ যুদ্ধ করিতে চান। কিন্তু তাঁর এই প্রস্তাবে বাধা দিলেন মার্শাল গ্রাৎসিয়ানী। কারণ, তাঁর মতে জার্মানীর সম্মতি ছাড়া এমন কার্য করা উচিত নয়। আর বাধা দিলেন ইতালীতে জার্মানীর সামরিক

(৬ ডুচে—রিচার্ড কোলিয়ার, পৃ ৩০৩

প্রতিনিধি এস এস জেনারেল উলফ। অধিকন্তু উলফ মুসোলিনীকে যুদ্ধবিরতির কোন আলোচনা চালাইতেও নিষেধ করিলেন। কারণ, এটা মানিয়া নিলে মুসোলিনীর স্বাধীন সত্তা স্বীকার করিতে হয়, যেটা ছিল জার্মানীর স্বার্থের একান্ত বিরোধী। এদিকে জেনারেল উলফ ইতালী সম্পর্কে আলোচনার জন্য বার্লিনে আহূত হইলেন।...

কিন্তু ডুচে মিলানে যাওয়ার জন্য উদ্যোগ আয়োজন কবিলেন। তিনি মনে মনে স্থিব করলেন এই যুদ্ধের একটা 'ইতালীয় মীমাংসা' করিতেই হইবে। সুতরাং মিলানে গিয়া তিনি পার্টিজানদের কমিটির সঙ্গে অথবা পশ্চিমীদের সঙ্গে যুদ্ধ বিরতির আলোচনা কবিবেন কিংবা শেষ পর্যন্ত ভলটেরিনাতে গিয়া জীবনের শেষ সংগ্রাম চালাইবেন।

আগেই বলা হইয়াছে মুসোলিনী হিটলাবের কাছ থেকে দূরে সরিয়া যাইতে চাহিতেছিলেন। কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি যেন মাকড়শার জালে আটকা পড়িয়াছেন। অপর পক্ষে হিটলারও ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে ইতালীতে মুসোলিনীব ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই মুসোলিনীর সম্পর্কে মোহমুক্ত হইতেছিলেন। সেই সময় তিনি তাঁব অন্তরঙ্গদের সঙ্গে প্রাইভেট আলোচনা প্রসঙ্গে স্বীকার কবিয়াছিলেন যে, মুসোলিনীর সঙ্গে তাঁব 'অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব' সম্ভবতঃ ভুল হইয়াছিল। 'স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইতালীর সঙ্গে আমাদের মিত্রতা আমাদেব শত্রুদের পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক হইয়াছিল। আমাদের সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও যদি এই যুদ্ধে আমরা হারিয়া যাই, তবে, বুঝিতে হইবে সেই পরাজয়ের জন্য ইতালীর সঙ্গে মিত্রতা কম দায়ী ছিল না। ইতালী আমাদের সবচেয়ে বেশী উপকাবে আসিতে পারিত, যদি সে এই সংঘর্ষে যোগদান না করিত।' কিন্তু তবু হিটলার এখনও ইতালীর জন্য যেন একটা 'সহজাত প্রেরণা' বলেই বন্ধুতা অনুভব করেন। কিন্তু আমি নিজেকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করি এজন্যে যে, আমি যুক্তির কথা মানি নাই—যার জন্যে ইতালীর সঙ্গে বন্ধুতায় আমাকে নির্মম করিয়া তুলিয়াছিল।'(৭)

কিন্তু মুসোলিনীর সঙ্গে এই 'নির্মম বন্ধুতার বা পাশবিক মিত্রতার' (কোন কোন লেখক যেমন—এফ ডব্লিউ ডিকিন এই ক্ষেত্রে 'ব্রুটাল ফ্রেণ্ডশিপ' শব্দটি ব্যবহার কবিয়াছেন) আয়ুও শেষ হইয়া আসিতেছিল। ১৮ই এপ্রিল সন্ধ্যা সাতটায় মুসোলিনী জার্মান নিরাপত্তা বাহিনীর পাহারায় ৫টি মোটরগাড়ী এবং একটি মালভর্তি ট্রাকের কনভয় যোগে মিলানের দিকে রওনা হইলেন এবং রাত্রি ৯টায় মিলানের নগররক্ষীব দপ্তব বা আবাসই ছিল মুসোলিনীর শেষ কর্তৃত্বের আশ্রয়স্থল এবং এখানে তিনি মিলানের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিলেন।

কার্ডিনাল সুস্টারের (Schuster) মধ্যস্থতায় মিলানে আর্কবিশপের প্রাসাদে মুসোলিনীব সঙ্গে পার্টিজান বাহিনীর ন্যাশনাল কমিটি অব্ লিবারেশন-এর প্রতিনিধিদেব দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা হইল। মুসোলিনীর দিকে তাকাইয়া কার্ডিনালের মনে হইল যে, 'এক নিদারুণ বিপর্যয়ে মুসোলিনী যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে'। তবু কার্ডিনাল তাকে একটু চাঙ্গা করিতে চাহিলেন এবং বলিলেন যে,

(৭) দি লাস্ট্ হানড্রেড ডেইজ, পৃ ৫৩০

ইতালীকে আর অনাবশ্যক ধ্বংসের মধ্যে টানিয়া না নিয়া তাঁর উচিত আত্মসমর্পণ করা। কিন্তু জবাবে মুসোলিনী বলিলেন যে, তিনি ৩০০০ কালোকুর্তা সৈন্যসহ ভালটেলিনাতে গিয়া শেষ যুদ্ধ চালাইবেন। কিন্তু কার্ডিনাল তাঁকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ডুচের মনে যেন কোন মোহ না থাকে, তিন হাজার দূরের কথা, তিনশত কালোকুর্তাও তিনি পাইবেন কিনা সন্দেহ। মুসোলিনী জবাব দিলেন যে, তাঁর কোন মোহ নাই, তবে তিন শতের চেয়ে কিছু বেশী পেতে পারেন।

ইতিমধ্যে মুসোলিনীর সঙ্গে যুদ্ধবিরতির আলোচনার জন্য লিবারেশন কমিটির তিনজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি আসিয়া হাজির হইলেন। কিন্তু সেই সময় হঠাৎ মার্শাল গ্রাৎসিয়ানি মুসোলিনীর দুইজন মন্ত্রীসহ সেখানে উপস্থিত হইলেন। কার্ডিনালের প্রস্তাব অনুসারে তাঁরা সকলে একটি বড় গোলটেবিলের চারদিকে আসন গ্রহণ করিলেন। মুসোলিনী যেন কিছুটা অধৈর্যের সঙ্গে লিবারেশন কমিটির সদস্যদের জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনাদের প্রস্তাব কি?

পার্টিজানদের মুখপাত্র মারাজ্জা (Marazza) জবাব দিলেন— 'আমাদের প্রস্তাব খুব ছোট্ট এবং সুনির্দিষ্ট। আমরা শুধু আপনার আত্মসমর্পণের দাবি করতে ও গ্রহণ করতে এসেছি।'

মুসোলিনী বাধা দিয়া বলিলেন—'আমি কিন্তু সেজন্য আসি নি। আমার সঙ্গে কথা ছিল আমরা একত্রে মিলে শর্তাদি সম্পর্কে আলোচনা করবো। আমি এসেছিলাম আমার লোকজন, তাদের পরিবারবর্গ ও ফ্যাসিষ্ট মিলিশিয়ার রক্ষাকবচ দাবি করার জন্য। তাদের ভাগ্যে কি ঘটবে সেটাও আমার জানা দরকার। আমার সরকারের কর্মচারীদের পরিবারবর্গের নিরাপত্তার জন্য অবশ্যই গ্যারেণ্টি দিতে হবে এবং আমার সৈন্যেরা যদি আত্মসমর্পণ করে, তবে, তাদেরকে যুদ্ধবন্দীর মর্যাদা দিতে হবে।'

তখন একজন পার্টিজান প্রতিনিধি বলিলেন—'এগুলি বিস্তৃত আলোচনার বিষয়। সেই আলোচনা করার অধিকার আমাদের আছে।'

ডুচে তখন বলিলেন—'বেশ কথা, তবে, আমরা একটা মীমাংসার সর্তে পৌছুতে পারি।

তখন মার্শাল গ্রাৎসিয়ানি হঠাৎ যেন লাফাইয়া উঠিলেন—"না, না, ডুচে। আপনি তা করতে পারেন না। জার্মানদের প্রতি আমাদের বাধ্যবাধকতা আছে। তাদের সম্মতি ও পরামর্শ ছাড়া আমরা এভাবে আত্মসমর্পণের কোন চুক্তিপত্রে সই দিতে পারি না। কর্তব্যের ও আত্মমর্যাদার নিয়মকানুনগুলি আমরা ভুলিতে পারি না।'

তখন পার্টিজান প্রতিনিধিরা বলিলেন, 'জার্মানদের কিন্তু তেমন কিছু নিয়ম-কানুনের বালাই নেই। গত চারদিন ধরে আমরা তাদের আত্মসমর্পণের সর্ত নিয়ে আলোচনা করছি! যে কোন মুহূর্তে তাদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে।'

মুসোলিনী তখন ব্যথিত ও ক্ষুব্ধচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন—'আগে আমি জার্মান কন্সালের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করিতে চাই এবং বলিতে চাই যে, জার্মানী ইতালীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'

এই কথা বলিয়া মুসোলিনী সেই কক্ষ থেকে বাহির হইয়া গেলেন। সেইদিন সন্ধ্যা ৮টার সময় মুসোলিনী ফ্যাসিষ্ট মিলিসিয়ার ইউনিফর্ম পরিয়া অবিলম্বে মিলান

ত্যাগ করিয়া কোমো অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে মার্শাল গ্রাৎসিয়ানি, জার্মান সশস্ত্র প্রহরী এবং ১০ গাড়ী বোঝাই লোকজন।

মুসোলিনীর এক মন্ত্রী আরেক মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' উত্তরে সেই ভদ্রলোক বলিলেন 'ঈশ্বর জানেন, বোধ হয় যমপুরীতে।'

নিয়তির অনতিক্রম্য বন্ধনের মত ক্লার পেতাচ্চি (মুসোলিনীর উপপত্নী) আর একটি গাড়ীতে আসিয়া হাজির হইলেন।

* * *

কোমো হ্রদের ৫ মাইল দক্ষিণে সুবিধাবাদী মার্শাল গ্রাৎসিয়ানী মুসোলিনীর দলবল ছাড়িয়া জার্মান এস এস সীমান্ত বাহিনীর সদরে আসিয়া আশ্রয় নিলেন। আর মুসোলিনী কোমোতে পৌছিয়া তাঁর স্ত্রীকে এই মর্মে এক বার্তা পাঠাইলেন যে, তিনি তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে এবং 'বইয়ের শেষ পৃষ্টায়' পৌছিয়াছেন। সুতরাং তাঁর স্ত্রী যেন তাঁর অনিচ্ছাকৃত সমস্ত অপরাধের জন্য তাঁকে ক্ষমা করেন। আর সেই সঙ্গে মুসোলিনী তাঁর স্ত্রীকে (ডোনা র‍্যাচেলি) পরামর্শ দিলেন বাচ্চা দুইটি সহ অবিলম্বে সুইজারল্যাণ্ডে চলিয়া যাইতে এবং সেখানে গিয়া নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করিতে।...

২৬শে এপ্রিল ভোর হওয়ার আগেই মুসোলিনী তাঁর ক্ষুদ্র একটি দলসহ কোমো হ্রদের পশ্চিম তীর ধরিয়া রওনা হইলেন এবং কোমো থেকে ২৫ মাইল দূরে একজন স্থানীয় ফ্যাসিষ্ট অফিসারের গৃহে আশ্রয় নিলেন তাঁর পার্টি-সেক্রেটারি প্যাভোলিনীর ৩ হাজার কালোকুর্তা সৈন্যসহ আগমনের অপেক্ষায়। মুসোলিনী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, জাগিয়া উঠিয়া দেখিলেন তাঁর উপপত্নী ক্লারা পেতাচ্চি দুইটি বর্মাবৃত গাড়ী এবং কয়েক কোম্পানী রিপাব্লিকান সৈন্যসহ আসিয়া হাজির হইলেন কিন্তু এত বড় কনভয় সহ সেখানে অপেক্ষা করা বিপজ্জনক। সুতরাং তিনি অন্য রাস্তায় গাড়ীগুলিকে ঘুরাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং নিজে তাঁর প্রণয়িনীসহ একটি পৃথক গাড়ীতে চড়িয়া পশ্চিম দিকে সুইজারল্যাণ্ডের সীমানা অভিমুখে রওনা হইলেন। তাঁর জার্মান প্রহরী এস এস লেঃ বারজার (Birzer) এবং বাকী কনভয় তাঁর পিছু পিছু অনুসরণ করিল। রাস্তায় একটি ছোট্ট হোটেলে অবস্থান কালে মুসোলিনী রেডিও যোগে প্রচারিত এই মর্মে একটি বার্তা শুনিতে পাইলেন যে, বৃটিশ বাহিনীর লেঃ জেনারেল মার্ক ক্লার্ক ক্রমাগত জয়াভিযানে আগাইয়া আসিতেছেন এবং উত্তর ইতালীর সর্বত্র পার্টিজানদের অভ্যুত্থান ঘটিতেছে।...

মুসোলিনী সেখান থেকে সন্ধ্যাবেলাই ভ্যালটেলিনার দিকে রওনা হইতে চাহিলেন। কিন্তু জার্মান নিরাপত্তা রক্ষী লেঃ বারজার বাধা দিলেন এবং বলিলেন যে, পার্টিজানরা নিশ্চয়ই রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। তা ছাড়া তাঁর দলবলের লোকজনেরাও ক্লান্ত। সুতরাং সেই রাতে সেই স্থানীয় হোটেলে অপেক্ষা করাই ভালো। পরদিন ভোরবেলা বরং রওনা হওয়া যাইবে। মুসোলিনী রাজী হইলেন।

* * *

কার্যতঃ তখন বাকী ইতালীয় ফ্যাসিষ্টরা ও জার্মানরা উত্তর দিকে সীমান্ত অঞ্চল দিয়া পরিত্রাণের পথ খুঁজিতেছিল। পার্টিজান ও গেরিলা বাহিনীর সৈন্যেরা এজন্য

যথাসম্ভব সর্বত্র সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিল। কোমো হ্রদ অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টিজানদের ছিল আধিপত্য। তাঁদের নেতা ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশজাত কাউণ্ট পিয়ের লুইগি বেলেনি ডেলা স্টেল—সংক্ষেপে বেলেনি নামে পরিচিত। ২২ বছরের সুশিক্ষিত ও সুশ্রী যুবক। জার্মানদের হাতে এর পিতা নিহত হইয়াছিলেন। এর সহকারী ছিলেন ২০ বছরের যুবক আরবানো ল্যাজারো, কিন্তু এঁরা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না। এমন কি, কমিউনিস্টও ছিলেন না। কিন্তু একান্তরূপে জার্মান ও ফ্যাসিস্ট বিরোধী ছিলেন। বেলেনি মধ্যরাত্রে লেকের রাস্তায় ডঙ্গোর দক্ষিণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিলেন। এদিকে ফ্যাসিষ্ট পার্টির সেক্রেটারি আলেকজান্দারো প্যাভোলিনী মুসোলিনীর হোটেলে আসিয়া পৌছিলেন এবং বিরস বদনে ডুচেকে বলিলেন যে, কালোকুর্তা সৈন্যদের অধিকাংশই কোমো এলাকায় পার্টিজানদের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। মুসোলিনী তখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ভ্যালটোলিনাতে তাঁর প্রস্তাবিত লড়াইয়ের জন্য কত জন কালোকুর্তাকে তিনি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন? প্যাভোলিনী কিছুটা দ্বিধা ও সঙ্কোচের সঙ্গে জবাব দিলেন ১২ জন!

এই জবাব থেকেই বোঝা যাইবে পরিস্থিতি কিরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছিল। তথাপি মুসোলিনী ভোরবেলা লেকের রাস্তায় জার্মান কনভয়ের সঙ্গে যোগ দিলেন সীমান্ত পার হইয়া ইতালী পরিত্যাগের জন্য। এই জার্মান কনভয়তে ২৮টি ট্রাক ভর্তি জার্মান সৈন্য, একটি বর্মাবৃত গাড়ী জার্মান অধিনায়কের জন্য, আর ১০টি যানবাহন ছিল অ-সামরিক লোকজনে ভর্তি। কিন্তু কনভয়তে নানা ধরনের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ছিল। মুসোলিনী নিরাপত্তার খাতিরে আর্মার্ড কারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁর উপপত্নী ক্লারা পেতাচ্চি এবং তাঁর ভাই ও পরিবারের লোকেরাও স্পেনে যাওয়ার জন্য কনভয়ের সঙ্গে যোগ দিলেন। কিন্তু এই যাত্রাপথেই শুরু হইল ইতালীয় বিয়োগান্ত নাটকের হীরো মুসোলিনীর শেষ অঙ্ক। কাউণ্ট বেলেনির পার্টিজান সৈন্যেরা কনভয়ের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু জার্মান কনভয় সামরিক দিক থেকে এত বলশালী ছিল যে, কাউণ্ট বেলেনির সাধ্য ছিল না প্রকাশ্য যুদ্ধের দ্বারা তাদের গতিরোধ করার। সুতরাং বেলেনি চাতুর্য-নীতি অবলম্বন করিলেন এবং এমন ভঙ্গী দেখাইলেন যেন সারা অঞ্চল জুড়িয়া পার্টিজান সৈন্য ও সমরশক্তির প্রচুর দাপট রহিয়াছে। বেলেনি ও তাঁর অনুচরেরা আগে থেকেই পথে নানা রকমের রোডব্লক (প্রতিবন্ধক) সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং জার্মান কনভয়ের গতি রুদ্ধ হইল এবং বেলেনি আসিয়া জার্মান অধিনায়ক ক্যাপ্টেন অটো কিসনাটকে (Kisnatt) নানা ভাবে জেরা করিতে লাগিলেন। জেরার মুখে কিসনাট্ট স্বীকার করিলেন যে, তাঁর দলে কিছু ইতালীয়ান আছে। কিন্তু তাদের জন্য তাঁর কোন দায়িত্ব নাই। তখন বেলেনি আরও কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর এই সর্তে জার্মান কনভয়কে অগ্রসর হইতে দিলেন যে, তাদের দলের সমস্ত ইতালীয়ানকে তাঁর হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বেলেনির কানে কানে বলিল যে, মুসোলিনী এই দলে রহিয়াছে। তাঁকে যেন ছাড়িয়া দেওয়া না হয়। 'মুসোলিনী এই দলে?'—কথাটা যেন বেলেনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। সুতরাং তিনি ল্যাজারোকে তদন্ত করিতে বলিলেন। ল্যাজারোও কথাটা তেমন বিশ্বাস

করিতে পারিতেছিলেন না। তখন নেগ্রি নামক পার্টিজানদের সাহায্যকারী এক ব্যক্তি আসিয়া ল্যাজারোকে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল যে, "সেই বেজন্মাটা এখানেই আছে!'

ল্যাজারো উত্তর দিল—'তুমি কি স্বপ্ন দেখছ?'

নেগ্রি তখন দৃঢ়তার সঙ্গে বলিল—'না, না, অবিশ্বাসের কারণ নেই। লোকটা মুসোলিনীই বটে, আমি তাকে স্বচক্ষে দেখেছি।'

'কোথায়?'

'এখানে একটা ট্রাকের মধ্যে। জার্মানদের ছদ্মবেশে লুকিয়ে আছে।'

ল্যাজারোর তখনও বিশ্বাস হইতেছিল না। সুতরাং বলিলেন যে, তোমার নিশ্চয় ভুল হয়েছে।

নেগ্রি জবাব দিল, 'না, তার ভুল হয় নাই, জার্মানদের দলিলপত্র পরীক্ষা করার সময় একটা ট্রাকে কম্বল মুড়ি দেওয়া একটি লোককে আমি দেখেছি। তার পরিধানে লম্বা কোট, সেই কোটের কলারে তার কান পর্যন্ত ঢাকা এবং তার মাথায় জার্মান হেলমেট বা শিরস্ত্রাণ, সেই শিরস্ত্রাণ দিয়া তার মুখ পর্যন্ত ঢাকা। আমি তার দলিল-পত্র দেখতে চেয়েছিলাম, তখন ট্রাকের জার্মানরা আমাকে বাধা দিল এবং বোঝাল লোকটি মাতাল।...'

তখন ল্যাজারো নিজে অগ্রসর হইয়া গেলেন এবং নেগ্রির বর্ণিত ট্রাকে গিয়া ছদ্মবেশ-ধারী লোকটির শিরস্ত্রাণ টান দিয়া খুলিয়া ফেলিলেন—দেখা দিল একটা মস্ত টাক মাথা, তার চোখ থেকে সানগ্লাস খুলিয়া নিলেন এবং লম্বা কোটের কলারটা নামাইয়া দিলেন—দেখা গেল মূর্তিমান মুসোলিনী স্বয়ং তাঁর দুই হাঁটুর মধ্যে একটা 'মেসিন পিস্তল' চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া আছেন, পিস্তলের বাটটা তাঁর চিবুকের কাছ পর্যন্ত।

ল্যাজারো মুসোলিনীর পিস্তলটা কাড়িয়া নিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আরও অস্ত্র আছে কি না? মুসোলিনী বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর কোটের বোতাম খুলিয়া ফেলিয়া আর একটি স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র ল্যাজারোর হাতে দিলেন। মুসোলিনীকে ভীত দেখাইতেছিল না, কিন্তু অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাইতেছিল।

দুই চার জন করিয়া একটি ছোট্ট জনতাও সেখানে জমায়েত হইতেছিল,—স্থানটি কোমো হ্রদের ডঙ্গো শহর। ল্যাজারো তখন অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন:

"ইতালীর জনগণের নামে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।"

২৮শে এপ্রিল মুসোলিনীকে গ্রেপ্তার করিয়া প্রথমে ডোঙ্গোর টাউন হলে লইয়া যাওয়া হইল।

ক্লারা পেতাচ্চি এবং তথাকথিত স্পেনীয় পাশপোর্টধারী অন্যান্যকেও গ্রেপ্তার করা হইল। এর আগেই বেলিনিকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, মুসোলিনীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বেলিনি মুসোলিনীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, তিনি এই এলাকার কমাণ্ডার এবং তিনি কথা দিতেছেন যে, মুসোলিনীর কোন অনিষ্ট হইবে না। মুসোলিনী শুধু ক্লান্ত কণ্ঠে বলিলেন—'আপনাকে ধন্যবাদ'।

ল্যাজারো মুসোলিনীর চামড়ার প্রকাণ্ড পোর্টফোলিও ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিস তল্লাসি করিয়া কিছু গোপনীয় দলিলপত্র, ভেরোনা জেলের কাগজপত্র, হিটলারের কাছে লেখা চিঠিসমূহ এবং ১৬০টি স্বর্ণমুদ্রা ও ৫ লক্ষ লিরার (ইতালীয় টাকা) কয়েকটি চেক্ পাইলেন।

ইতিমধ্যে মুসোলিনীর 'সরকারের' অন্যান্য সদস্যরাও ধৃত হইয়াছিলেন।

বেলেনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, মুসোলিনীকে এখানে রাখা বিপজ্জনক। কেননা, জার্মানরা তাঁকে আর একবার উদ্ধারের চেষ্টা করিতে পারে। কিংবা শহরের লোকেরা তাঁকে খুন করিতে পারে। সুতরাং সেই রাত্রির জন্য মুসোলিনীকে কোন নিরাপদ গোপন স্থানে লুকাইয়া রাখিতে হইবে। পাহাড়ের উপর তিন মাইল দূরে সীমান্ত প্রহরীদের ব্যারাকে এবং সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত একটি গ্রামে—যেখানে সাধারণতঃ পার্টিজানেরা আত্মগোপন করিয়া থাকে।

*　　　*　　　*

শেষ পর্যন্ত মুসোলিনী ও তাঁর উপপত্নী ক্লারা পেতাচ্চিকে সীমান্তবর্তী গ্রামের একটি গোপন আবাসে নেওয়া হইল। বেলেনি আগাগোড়া খুব ভদ্র আচরণ করিতেছিলেন এবং মুসোলিনী ও পেতাচ্চি উভয়ের অনুরোধে পরস্পরকে একত্র মিলিত হইতে দিলেন। বেলেনিকে সহানুভূতিসম্পন্ন দেখিতে পাইয়া পেতাচ্চি কি ভাবে মুসোলিনীর প্রেমে পড়িয়াছিলেন, সেই গল্প বলিলেন। মুসোলিনীর সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হইয়াছিল ১৯২৬ সালে, তখন তাঁর বয়স মাত্র বিশ বছর এবং মুসোলিনীর বয়স দ্বিগুণেরও বেশী। কিন্তু তাঁকে দেখাইত সতেজ যুবকের মত—মুসোলিনীর সাহস, দৃঢ়তা এবং তাঁর কঠোর পুরুষোচিত ব্যক্তিত্ব পেতাচ্চিকে মুগ্ধ ও অভিভূত করিয়াছিল। অবশ্য মুসোলিনীর অনেক প্রেমিকা ও উপপত্নী ছিল। কিন্তু সেজন্য তাঁর কোন ঈর্ষা ছিল না। বরং পরবর্তী কালে মুসোলিনীর প্রেমিকাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর কাছে সাহায্যের জন্যেও আসিত। পেতাচ্চি বিনা দ্বিধায় তাদেরকে সাহায্য দিতেন। কারণ, তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল যে, মুসোলিনীর হৃদয়ের উপর একমাত্র তাঁরই আধিপত্য ছিল।...

পেতাচ্চি কথা প্রসঙ্গে এক সময় বেলেনিকে অনুরোধ করিলেন যে, মুসোলিনীকে মিত্রপক্ষের হাতে সমর্পণ করা হোক। বেলেনি উত্তরে বলিলেন যে, মিত্রপক্ষের সঙ্গে এই ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নাই। এটা সম্পূর্ণরূপেই ইতালীরই ব্যাপার।

এরপর ক্লারা পেতাচ্চি হঠাৎ একসময় কাঁদিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—'আমি বুঝেছি আপনারা তাঁকে গুলি করে মারবেন।' এই কথা বলার পর কম্পিত হস্তে চোখের জল মুছিয়া পেতাচ্চি বেলেনিকে অনুরোধ করিলেন—

"You must promise that if Mussolini is shot I can be near him until the last moment and that I shall be shot with him. Is that too much to ask ? . I want to die with him."—(৮)

'আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, মুসোলিনীকে যদি গুলি করে মারা হয়, তবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাকে তাঁর কাছে থাকতে দেওয়া হবে এবং তাঁর সঙ্গে আমাকেও গুলি করা হবে। এমন অনুরোধ করা কি আমার পক্ষে বাড়াবাড়ি ?... আমি তাঁর সঙ্গেই মরতে চাই।"

বেলেনি মুসোলিনীর প্রণয়িনীর এই গভীর আবেগের জন্য বিচলিত হইলেন এবং বলিলেন—'আমি শপথ করে বলছি যে, মুসোলিনীকে গুলি করার ইচ্ছা আমার নেই।'...

সেই রাতেই বেলিনি এবং আরও দুইজন পার্টিজান কোমো হ্রদ থেকে ১৪ মাইল

(৮) দি লাস্ট হাণ্ড্রেড ডেইজ, পৃষ্ঠা ৫৬৩

দূরে মুসোলিনী ও ক্লারা পেতাচ্চিকে সঙ্গে নিয়া গাড়ীতে রওনা হইলেন একটি গ্রামের দিকে এবং সেখান থেকে বৃষ্টির মধ্যে পায়ে হাঁটিয়া পাহাড়ের উপর এক চাষী দম্পতির তিন তলা সাদা বাড়ীতে পৌঁছিলেন। মারিয়া দম্পতি অবশ্যই জানিতেন না আশ্রয়-প্রার্থী এই দম্পতি কারা, অথচ চেহারা দেখিয়া তাদের সন্দেহ হইল পুরুষটি যেন মুসোলিনীর মত দেখিতে! কিন্তু এই সামান্য চাষীর ঘরে মুসোলিনী?—এও কি সম্ভব? সুতরাং তাঁরা ধরিয়া নিলেন পুরুষটি একজন জার্মান বন্দী। তবে, এই সুন্দরী স্ত্রীলোকটি কে? সেকথা তাঁরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

তাঁদের দুইজনের জন্য একটি পরিচ্ছন্ন শয়ন কক্ষ দেওয়া হইল। মুসোলিনী এবং ক্লারা শয়ন কক্ষ দেখিয়া খুব খুশী হইলেন এবং অতিরিক্ত আর একটি বালিশ চাহিয়া নিলেন। মুসোলিনী নাকি দুইটি বালিশ ছাড়া ঘুমাইতে পারিতেন না। দুইজন সশস্ত্র প্রহরী তাঁদের জন্য মোতায়েন করা হইল।

* * *

এদিকে মিলানে পার্টিজানদের সদর দপ্তরে স্থির হইল মুসোলিনীকে মিলানে ফিরাইয়া আনা হইবে এবং ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতা পামিরো তোগলিয়াত্তি গোপনে হুকুম পাঠাইলেন সোজাসুজি মুসোলিনী এবং তাঁর রক্ষিতা'কে মৃত্যুদণ্ড দান ও হনন করার জন্য। এই আদেশ কার্যকর করার জন্য কর্নেল ভ্যালেরিওকে ভার দেওয়া হইল। ভ্যালেরিও একজন নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট এবং স্পেনের গৃহযুদ্ধে লড়িয়াছিলেন। ২৮শে এপ্রিল ভোরবেলা তিনি রওনা হইয়া গেলেন ১৫ জন সশস্ত্র পার্টিজান সৈন্যসহ।

বেলিনির সঙ্গে যখন কর্নেল ভ্যালেরিওর দেখা হইল, তখন বন্দীদেরকে মিলানে পাঠানো নিয়ে মতবিরোধ হইল। কারণ, এঁদেরকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল বেলেনির সদর দপ্তর এলাকায়। তখন ভ্যালেরিও কঠোর স্বরে বলিলেন জাতীয় মুক্তি কমিটির সদর দপ্তর সর্বসম্মতক্রমে নির্দেশ দিয়াছেন মুসোলিনী ও তাঁর রক্ষিতাকে অবিলম্বে হনন করার জন্য এবং এই আদেশ কার্যকর করার ভার দেওয়া হইয়াছে ভ্যালেরিওর উপর "আমি এসেছি এদেরকে গুলি করে মারার জন্য।"

অপরাহ্ণ ৪টা'র সময় কর্নেল ভ্যালেরিও ও তাঁর সঙ্গীরা মুসোলিনী ও তাঁর রক্ষিতাকে মারিয়া নাম্নী কৃষক দম্পতির গ্রাম্যগৃহ থেকে বাহির করিয়া নিয়া আসিলেন। ভ্যালেরিও মুসোলিনীকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। তাঁরা একটি ভিলার লোহার গেটের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং সামনে যেন কোন বিপদের আশঙ্কা করা হইতেছে এমন ভঙ্গী দেখাইয়া মুসোলিনী ও ক্লারাকে চুপি চুপি গাড়ী থেকে নামিতে এবং গেটের কাছে লুকাইতে বলিলেন। মুসোলিনী ব্যাপারটা আন্দাজ করিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং শঙ্কিত চিত্তে গেটের কাছে গেলেন এবং ক্লারাও তাঁকে অনুসরণ করিলেন। তখন চারিদিকে যেন অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা। হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ভ্যালেরিও চীৎকার করিয়া উঠিলেন :

"স্বাধীনতাকামী স্বেচ্ছাসেবী সৈন্যদের সদর দপ্তরের নির্দেশক্রমে ইতালীর জনগণের প্রতি আমি ন্যায় বিচার করিতে বাধ্য।"

মুসোলিনী স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন। কিন্তু ক্লারা তাঁর কোমলবাহু দিয়া মুসোলিনীর কণ্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিলেন এবং চেঁচাইয়া বলিলেন—"না, তাঁকে মারিতে দেওয়া হবে না।"

ভ্যালেরিও আদেশ দিলেন—'যদি আপনিও মরতে না চান, তবে, কাছ থেকে সরে যান।'

কিন্তু ক্লারা পেতাচ্চি ডুচের ডানদিকে স্থান নিলেন। ভ্যালেরিও ১০ ফুট দূরে দাঁড়াইয়া পাঁচবার গুলী করিলেন। মুসোলিনী মাটির উপর পড়িয়া গেলেন। তাঁর উপপত্নী পেতাচ্চিকেও অনুরূপভাবে গুলী করিয়া মারা হইল। মেজেগ্রা গ্রামের প্রান্তে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিল। সেই সঙ্গে আরও কয়েকজন ফ্যাসিষ্ট বন্দীকে এবং মুসোলিনীর 'সরকারের' ১৫ জন সদস্যকে ডোঙ্গোতে গুলী করিয়া হত্যা করা হইল। ১৯৪৪ সালের ১২ই আগষ্ট মিলানের পিয়াজো লরেটোতে জার্মানরা ১৫ জন ইতালীয়ানকে হত্যা করিয়াছিল একটি জার্মান লরীর উপর বোমা নিক্ষেপের জন্য। এই হত্যাকাণ্ডগুলি ঘটিল তারই প্রতিশোধস্বরূপ।—(৯)

* * *

ইতালীতে মিত্রপক্ষের সদর দপ্তর থেকে মিলানের পার্টিজান সদর দপ্তরকে অনুরোধ করা হইয়াছিল ধৃত মুসোলিনীকে মিত্রপক্ষের হাতে অর্পণের জন্য। কিন্তু মিলানের কমিউনিষ্ট সদর দপ্তর এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া এক টেলিগ্রামে জানাইয়া দিল যে, গণ-আদালতের বিচারে মুসোলিনীর প্রাণদণ্ড বিধান এবং তা কার্যকর করা হইয়াছে।

২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৫, ভোরবেলা একটি লরীযোগে ২৩টি মৃতদেহ মিলানে আনা হইল এবং মিলানের প্রকাশ্য স্থানে পিয়াজো লরেটোতে মৃতদেহগুলি লরী থেকে খালাস করা হইল এবং সাজাইয়া রাখা হইল। ক্রমে সেখানে ভীড় জমিতে লাগিল এবং মুসোলিনী ও ক্লারা পেতাচ্চির মৃতদেহের জঘন্যতম অসম্মান ঘটিল। কসাইয়ের দোকানের মাংস ঝুলাইবার হুক দিয়া মুসোলিনী ও ক্লারার মৃতদেহ ঝুলাইয়া রাখা হইল—তাদের মাথা নীচের দিকে ও পা দুইটি উপরের দিকে ঝুলিয়া রহিল, ক্লারার স্কার্ট নীচ থেকে মাথার দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। একজন মহিলা সেটা তুলিয়া ধরিয়া বেল্ট দিয়া দুই পায়ের সঙ্গে বাঁধিয়া দিলেন। কিন্তু উল্লাসমত্ত উত্তেজিত জনতা ইতালীর 'সর্বময় প্রভুর' মৃতদেহের উপর থু থু নিক্ষেপ করিতে, জুতা দিয়া লাথি মারিতে ও অন্যান্যভাবে অপমান করিতে লাগিল। আর একজন মহিলা অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে মুসোলিনীর মৃতদেহের উপর পাঁচবার গুলী নিক্ষেপ করিলেন তাঁর পাঁচটি পুত্রের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। কিন্তু এর চেয়েও অসম্মান ঘটিল মুসোলিনীর মৃতদেহের—ভাষায় তার বর্ণনা দেওয়া কঠিন। একদা যে মুসোলিনী সুইমিং পুলে স্নান করিতে নামিলে যুবতী নারীরা উন্মত্তের মত তাঁকে ঘিরিয়া ধরিত, সেই মুসোলিনীর মুখের উপর স্ত্রীলোকেরা স্কার্ট তুলিয়া 'দেহজল' নিঃসৃত করিল!—(১০)

---

(৯) দি লাষ্ট্ ডেইজ অব্ মুসোলিনী, পৃষ্ঠা ৩২১

(১০) ডুচে—রিচার্ড কলিয়ার, পৃষ্ঠা ৩৭১

২৩ বছর আগে যে মুসোলিনী রোম নগরীতে মার্চ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং ফ্যাসিজমের ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ৬২ বছর বয়সে তাঁর সেই নাটকীয় হিংস্র জীবনের ভয়াবহ অবসান ঘটিল। জেনারেল আইজেনহাওয়ার এই সংবাদ শুনিয়া মন্তব্য করিলেন—"হা ভগবান, কি কলঙ্কজনক মৃত্যু!"......

মুসোলিনীকে এভাবে খুন করার জন্য চার্চিল ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। বিশেষভাবে একজন মহিলাকে হত্যা করার জন্য তিনি সমগ্র ব্যাপারটাকে 'কাপুরুষতা' ও 'বিশ্বাসঘাতকতা' বলিয়া নিন্দা করিলেন এবং নিজেই প্রশ্ন তুলিলেন এই মহিলা কি যুদ্ধাপরাধী ছিলেন?—(১১)

কিন্তু ইতিহাসে মুসোলিনীর মত অত্যাচারী ডিক্টেটরদের এই পরিণামই ঘটিয়া থাকে। চার্চিল এই ব্যাপারে যত ক্ষোভই করিয়া থাকুন না কেন, মুসোলিনীর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ায় ইতালীর জনগণ সর্বত্র উল্লাস প্রকাশ করিলেন।

(১১) চার্চিল, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬০

নবম পর্ব

ষষ্ঠ অধ্যায়

হিটলারের আত্মহত্যা : ইভা ব্রাউনের সহমরণ

১৫ এপ্রিল, ১৯৪৫, ইভা ব্রাউন বার্লিনে আসিলেন হিটলারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। কিন্তু কে এই ইভা ব্রাউন, যাকে আগের অধ্যায়ে হিটলারের প্রণয়িনী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যদিও ১২ বছরের অধিককাল ধরিয়া ইভা হিটলারের প্রণয়িনী ছিলেন, তবু জার্মানীর খুব কম লোকই তাঁর নাম জানিতেন এবং তার চেয়েও কম লোক হিটলারের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা জানিতেন। কারণ, ইভা সর্বদা আড়ালেই থাকিতেন এবং হিটলার তাঁকে প্রকাশ্যে আনিতেন না, কিংবা প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে দিতেন না। এবং পাঠকবর্গ জানিয়া হতাশ হইবেন যে, তিনি কোন ইতিহাসের নায়িকা ছিলেন না কিংবা যুদ্ধ ও বিপ্লবের দিনে যেমন বীর পুরুষদের নামের সঙ্গে সময় সময় খুব নাম করা সুন্দরী এবং বুদ্ধিতে ও হাস্যে লাস্যে উজ্জ্বল কোন কোন ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলার কথা শুনা যায়, ইভা ব্রাউন আদৌ সেই জাতের মেয়ে ছিলেন না। তাঁর কোন 'গ্লামার' ছিল না। কিন্তু তিনি সুশ্রী ও দীর্ঘাঙ্গী ছিলেন। তাঁর দেহ ছিল সবল সুঠাম এবং কেশ ছিল চম্পকবর্ণ। তথাপি জার্মানীর এত বড় রণপ্রভুর সঙ্গিনী হওয়ার মত যোগ্যতা বা গুণাবলীও তাঁর ছিল না। হিটলার ছিলেন তার চেয়ে ২৩ বছরের বড়। তবু আশ্চর্য এই যে, ইভা ও হিটলার পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন এবং ইভা ব্রাউনের মত একটি সাধারণ মেয়ে হিটলারের জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে সহমরণ যাত্রার সময় পর্যন্ত সর্বত্র পরিচিতি লাভ করিলেন এবং ইতিহাসে একটা স্থান করিয়াও লইলেন।

ইভা ব্রাউনের জন্ম ব্যাভেরিয়ার একটি নিম্নবিত্ত সাধারণ পরিবারে। তাঁর পিতা ছিলেন একজন স্কুল মাস্টার। কিন্তু তাঁর বাবা ও মা গোড়ার দিকে হিটলারের সঙ্গে তাঁর 'অবৈধ সম্পর্কের' ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। হোক না হিটলার জার্মানীর সর্বময় প্রভু, তবু তাঁর সঙ্গে এই ধরণের অবৈধ সম্পর্ক আপত্তিকর। মিউনিকের হেনরিক হফম্যান (Heinrich Hoffmann) ১৯২২ সাল থেকে হিটলারের প্রধান ফটোগ্রাফার ছিলেন এবং ইভা ব্রাউন তাঁর সেই ষ্টুডিওতে কাজ করিতেন। ফটোগ্রাফার হফম্যানই একদিন ফুয়ারের সঙ্গে ইভার পরিচয় করাইয়া দেন এবং ফুয়ার তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। এর আগে হিটলার গেলি রাউবল নাম্নী তাঁর ভাগ্নীর সঙ্গে 'বিষম প্রেমে' পড়িয়াছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ বিচ্ছেদ ও অন্যান্য কারণে সেই মেয়েটি আত্মহত্যা করিয়াছিল এবং এই ঘটনারই দুই এক বছর পরে ইভা ব্রাউনের সঙ্গে হিটলারের পরিচয় ঘটিয়াছিল।—(১)

---

(১) উইলিয়াম শাইরার—পৃষ্ঠা ১৩১৭

ইভা যদিও হিটলারের আলপাইন পার্বত্য নিবাসের মনোরম ভিলাতে বাস করিতেন, তবু দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইত না। কারণ, হিটলারের ছিল অত্যন্ত কর্মব্যস্ত জীবন। এই ধরণের দীর্ঘ বিচ্ছেদ মাঝে মাঝে ইভার কাছে অসহ্য মনে হইত। সুতরাং তিনিও হিটলারের আগেকার প্রণয়িনীর মত দুইবার আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অবশ্য ক্রমে ক্রমে এই দীর্ঘ বিচ্ছেদ তাঁর গা সহা হইয়া গিয়াছিল। মাসের পর মাস যুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলিতে হিটলার থাকিতেন তাঁর বিভিন্ন রণশিবিরে সেনাপতি, রাজনীতিবিদ ও অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে ব্যস্ত। সুতরাং এই সমস্ত শিবিরে বা সদর দপ্তরে তাঁর যাতায়াত ছিল নিষিদ্ধ। সুতরাং নিরুপায় ইভা ব্রাউন ওবারস্যালজবার্গের বের্গহোফ্ ভিলাতে সস্তা ও চটকদার উপন্যাস পড়িয়া কিংবা বাজে ফিল্ম দেখিয়া কিংবা সাঁতার কাটিয়া ও স্কী খেলিয়া দিন কাটাইতেন। কোন কোন সময় নৃত্যও করিতেন। কিন্তু হিটলার সেটা পছন্দ করিতেন না। বার্লিনে পর্যন্ত তাঁকে কদাচিৎ আসিতে দেওয়া হইত। সুতরাং তাঁর দীর্ঘ বিরহের দিনগুলি ছিল বিষণ্ণ। হিটলারের মোটর গাড়ীর চালক এরিক কেম্পকা (Erich Kempka) বলিতেন যে, জার্মানীতে তিনি ছিলেন সবচেয়ে অসুখী স্ত্রীলোক। তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় হিটলারের প্রতিক্ষায় কাটাইয়া দিয়াছেন। কিন্ত মার্শাল কাইটেল ন্যুরেমবার্গের আদালতে বলিয়াছিলেন যে, ইভা ব্রাউন ছিলেন পরিচ্ছন্ন, মিষ্টি স্বভাবের স্ত্রীলোক। তাঁর পা দুটি খুব সুন্দর ছিল। কিন্তু তিনি সর্বদাই আড়ালে থাকিতেন, কদাচিৎ তাঁকে বাইরে দেখা যাইত।

সুতরাং মর্যাদার দিক থেকে ইভা ব্রাউন হিটলারের পত্নীও ছিলেন না, উপপত্নীও ছিলেন না—ছিলেন দুর্লভ মুহূর্তের সঙ্গিনী। (২) ইভা কিন্তু হিটলারকে সমস্ত অন্তর দিয়া ভালোবাসিতেন এবং তাঁর অন্ধ ভক্ত ছিলেন। হিটলারের ব্যক্তিত্বের দ্বারা ইভা একেবারে আচ্ছন্ন ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে হিটলারের একজন নামজাদা মন্ত্রী আলবার্ট স্পীর লিখিয়াছিলেন যে, পুরাতন পার্টি সহচরদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের সময় ইভা ব্রাউনকে উপস্থিত দেখা যাইত বটে, কিন্তু যে মুহূর্তে রাইখের পদস্থ সম্মানভাজন ব্যক্তিগণ, যেমন ক্যাবিনেট মন্ত্রী প্রভৃতি দেখা করিতে আসিতেন, ইভা ব্রাউনকে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে হইত। এমন কি গোয়েরিং এবং তাঁর পত্নী যখন আসিতেন, তখনও ইভাকে তাঁর ঘরের মধ্যে অবস্থান করিতে হইত। অর্থাৎ হিটলার তাঁকে খুব সংকীর্ণ সামাজিক গণ্ডীর বাইরে গ্রহণ করিতে রাজী ছিলেন না। হিটলারের শয়ন কক্ষের পাশের ঘরে যেন তাঁকে আটক বন্দীর মত থাকিতে হইত। ইভা এত ভয় পাইতেন যে, সাহস করিয়া ঘরের বাইরে একটু বেড়াইতে যাইতেও পারিতেন না, হিটলার তাঁর মনোভাবের প্রতি সামান্যই সুবিবেচনার পরিচয় দিতেন। এমন কি, তাঁর উপস্থিতিকে উপেক্ষা করিয়াই হিটলার নারীজাতি সম্পর্কে মন্তব্য করিলেন :

---

(২) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা—১৩২০

"একজন প্রখর বুদ্ধিমান লোক কি কোন আদিম বোকা মেয়ে মানুষকে গ্রহণ করিতে পারে ? ভেবে দেখুন সমস্ত কিছুর উপরে যদি কোন স্ত্রীলোক আমার কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করতো ! আমার অবসর সময়ে আমি শান্তি চাই…কিন্তু বিয়ে করা কখনও আমার পোষাবে না। যদি আমার একগাদা ছেলেমেয়ে থাকতো, তা' হলে আমার কি সমস্যা দাঁড়াতো, তা' ও চিন্তা করে দেখুন।"…

"আমি অবিবাহিত, এজন্য বহু নারী আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। আমার আন্দোলনের দিনগুলিতে অবশ্য এর খুব উপযোগীতা ছিল। এ যেন সিনেমার কোন অভিনেতার বিয়ে করার মত। যে সমস্ত মেয়ে আগে তাঁকে পূজো করতো, বিয়ের পর থেকেই তাদের সেই আগ্রহ নষ্ট হয়ে যেতে থাকতো। আগের মত সে আর তাদের কাছে উপাস্য দেবতার মত থাকত না।"

আলবার্ট স্পীর বলিতেছেন—'হিটলার বিশ্বাস করিতেন যে, স্ত্রীলোকদের কাছে তাঁর খুব যৌন আবেদন আছে। কিন্তু তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না যে, তাঁর এই আবেদন চ্যান্সেলর হিসাবে কিংবা এ্যাডলফ হিটলার হিসাবে। মহিলাদের উপস্থিতিতেই তিনি রূঢ়ভাবে মন্তব্য করিতেন যে, তিনি তাঁর চারিপাশে খুব রসিকা ও বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক পছন্দ করেন না।'

ইভা ব্রাউনের রাজনীতিতে কোন আগ্রহ ছিল না এবং হিটলারের উপর তিনি কোন প্রভাব খাটাইতেও চাহিতেন না। কোন কোন সময় তরুণ সৈন্যদের সঙ্গে তিনি গভীর আগ্রহে নৃত্য করিতেন বটে, কিন্তু তিনি কোন মতেই আধুনিক পম্পাদুর (১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা পঞ্চদশ লুইয়ের উপপত্নী, প্রভাব প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক বুদ্ধিতে যিনি অসাধারণ ছিলেন) ছিলেন না। সেদিক থেকে ইতিহাসে তাঁর কোন স্থান ছিল না।—(৩)

আমাদের দেশে এবং পশ্চিমেরও কোন কোন মহলে এক কালে প্রচলিত ছিল যে, হিটলার 'ব্রহ্মচারী' গোছের মানুষ ছিলেন। তাঁর যেমন কোন নেশা ছিল না, তেমনি কোন নারীর সঙ্গে তার কোন দৈহিক সম্পর্কও ছিল না। কিন্তু এই ধারণা ভুল। মহাযুদ্ধের পর পশ্চিমের পত্র-পত্রিকায় ইভা ব্রাউনের সঙ্গে হিটলারের দৈহিক কিংবা যৌন সম্পর্কের কথা স্বীকার করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, জীবনের শেষ মুহূর্তে ইভার সঙ্গে বিবাহের কয়েক বছর আগেই এই দৈহিক সম্পর্ক ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ অবৈধ সংসর্গ ছিল।

* * *

হিটলারের নির্দেশগুলি ডোয়েনিৎস, শোয়েরনার ও কেসেলরিং এই তিন সামরিক পুরুষকে স্ব স্ব দপ্তরে পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য ২৮শে এপ্রিল রিটার ফন গ্রীম ও মহিলা পাইলট রিৎস যখন বাঙ্কার থেকে বার্লিন ত্যাগ করিয়া আকাশ পথে উড়িয়া গেলেন, তখন রুশ গোলন্দাজি আক্রমণে সেই বিমানটি 'পাখীর পালকের মত হেলিতেছিল, দুলিতেছিল।' তাঁরা ২০ হাজার ফুট উর্দ্ধে উঠিয়া গেলেন রুশ আক্রমণ

(3) Inside the Third Reich—Albert Speer P. 144-146.

এড়াইবার জন্য এবং তাঁরা নীচে তাকাইয়া দেখিলেন রাজধানী বার্লিন যেন আগুনের সমুদ্রে জ্বলিতেছে।...

বার্লিনের পূর্বদিকে জার্মানদের প্রচণ্ড প্রতিরোধ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া রুশ সৈন্যরা দুর্বার গতিতে আগাইয়া যাইতে লাগিল এবং ফুয়ারের ভূগর্ভের আশ্রয়ের উপর লালফৌজের গোলাগুলি ও বোমা পড়িতে লাগিল। তখন জার্মানীর ধ্বংস এবং নিজের আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া দেহে মনে বিধ্বস্ত হিটলার ঘোষণা করিলেন—"ইভা ব্রাউন বার্লিনে আসিয়াছেন আমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। যে নারী দীর্ঘকাল বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের পর আমার সঙ্গে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণের সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাঁকে আমি যথারীতি বিবাহ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছি। কারণ, তিনি আমার স্ত্রী হিসাবেই সহমরণে যাইতে প্রস্তুত। সুতরাং আমরা দুইজনেই চাই আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের দুইজনের দেহ যেন দাহ এবং ভস্মীভূত করা হয়।" হিটলার আরও বলিলেন যে, তিনি চান না, তাঁর দেহ জীবিত বা মৃত অবস্থায় শত্রুর হাতে পড়ুক।

যুদ্ধের অস্বাভাবিক ও বিপজ্জনক অবস্থার জন্য ২৮ এপ্রিল রাত্রি ১টা থেকে ৩টার মধ্যে (ইংরাজী মতে ২৯ এপ্রিল) হিটলার অত্যন্ত সাধারণ ও সরল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইভা ব্রাউনকে বিবাহ করিলেন। গোয়েবেলস্ ভাল্টার ভাগনার (Walter Wagner) নামে একজন সরকারী প্রশাসককে এই অভিনব বিবাহে 'পৌরহিত্য' করার জন্য ডাকিয়া আনিলেন এবং সেই বেচারা অকস্মাৎ এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলেন। তিনি ছাড়া এই বিবাহের আরও সাক্ষী ছিলেন গোয়েবেলস এবং বোরম্যান। বাঙ্কারের প্রাইভেট অংশে একটি ছোট্ট ম্যাপরুমে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হইল। বর ও কনে উভয়েই দিব্যি করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, তাঁরা সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ আর্যবংশ সম্ভূত এবং বিবাহ বাতিল হইয়া যাওয়ার মত তাঁদের কোন বংশগত রোগ নেই, তাঁরা স্বেচ্ছায় পরস্পরকে বিবাহের সম্মতি দিতেছেন। অতঃপর তাঁরা রেজিস্টারে নাম স্বাক্ষর করিলেন। কিন্তু কনে তাঁর নাম স্বাক্ষর করিতে গিয়া প্রথমে লিখিলেন 'ইভা ব্রাউন' কিন্তু পরমুহূর্তেই ভুল সংশোধনপূর্বক 'বি' অক্ষরটি কাটিয়া দিয়া লিখিলেন 'ইভা হিটলার'—জন্মগত পদবী ব্রাউন।

এতদিনে ইভা ব্রাউন জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া হিটলারের পত্নী হিসাবে আইনগত স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করিলেন। এখন থেকে তিনি হইলেন 'ফ্রাউ হিটলার'। এই সংক্ষিপ্ত বিবাহ অনুষ্ঠানের পর বিবাহ উপলক্ষে একটি ভোজের ব্যবস্থা হইল এবং সেখানে উপস্থিত ছিলেন বোরম্যান, গোয়েবেলস ও ফ্রাউ (মিসেস) গোয়েবেলস, হিটলারের দুইজন মহিলা সেক্রেটারি ও নিরামিষ রাঁধুনী এবং পরে আসিয়া যোগ দিলেন জেনারেল ক্রেবস, জেনারেল বার্গডোরফ প্রভৃতি। অতিথিরা আনুষ্ঠানিকভাবে শ্যাম্পেন পান করিলেন এবং কিছুক্ষণের জন্যে জার্মানীর ভয়াবহ অবস্থার কথা ভুলিয়া গিয়া পুরানো দিনের কিছু আনন্দের কথা নিয়া আলোচনা করিলেন। হিটলার তাঁর জীবনের কোন কাহিনী উল্লেখ করিয়া পুনরায় ঘোষণা করিলেন যে, ন্যাশনাল সোসিয়েলিজম শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁর পুরাতন বন্ধুরা তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে আর বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ

নাই। অতিথিদের কেহ কেহ এই সময় অশ্রুসিক্ত চোখে নিঃশব্দে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন হিটলারও পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন এবং তাঁর একজন সেক্রেটারি ফ্রাউ গার্টরুড জঙকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হিটলার তাঁর নিকট তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্র বা উইল ডিক্‌টেট্ করিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি দুইটি দলিল তৈয়ার করিলেন—একটি ব্যক্তিগত এবং অপরটি রাজনৈতিক। এই দলিলে মিথ্যা, অর্ধমিথ্যা, অপপ্রচার, নাৎসী মতবাদের গুণগান, ইতিহাসের বিকৃতি ইত্যাদি ঘটাইলেন এবং নিজের ব্যর্থতার জন্য অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইলেন। তথাপি ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য তিনি তাঁর 'শেষ আবেদন' রাখিয়া গেলেন।···

রাজনৈতিক দলিলের দুইটি অংশ ছিল। প্রথমটি সাধারণ রকমের এবং দ্বিতীয়টি সুনির্দিষ্ট ধরনের।

রাজনৈতিক দলিলের গোড়াতেই তিনি যুদ্ধের জন্য সমস্ত দায়িত্ব অস্বীকার করিলেন: "একথা সত্য নয় যে, আমি কিংবা জার্মানীতে অপর কেহ ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ চাহিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে প্ররোচনা দিয়াছিলেন কিংবা এই যুদ্ধ চাহিয়াছিলেন একমাত্র সেই সমস্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতিক ধুরন্ধরগণ, যাঁরা ইহুদীবংশ সম্ভূত কিংবা যাঁরা ইহুদীদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কাজ করিতেছিলেন। নিরস্ত্রীকরণের জন্য আমার সর্বপ্রকার প্রস্তাবের পর ভবিষ্যৎ বংশধরগণ নিশ্চয়ই আমার ঘাড়ে যুদ্ধের দায়িত্ব চাপাইয়া দিতে পারিবেন না।···শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইবে, আমাদের শহরগুলির ধ্বংসস্তূপ ও স্মৃতিস্তম্ভ হইতে সেই সমস্ত লোকের প্রতি ঘৃণা সর্বদাই নতুন করিয়া দেখা দিবে, যারা শেষ পর্যন্ত এর জন্য দায়ী ছিল। আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদ ও সেই মতবাদের সাহায্যকারী যারা তাদেরকে এজন্য আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

অতঃপর হিটলার পোলিশ-জার্মান যুদ্ধের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া বলিলেন যে, যুদ্ধের তিন দিন আগেও তিনি পোলিশ-জার্মান সমস্যার একট যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডের শাসকচক্র এই যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন একদিকে বাণিজ্যিক কারণে এবং অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদের প্রোপাগাণ্ডার চাপে।

যুদ্ধক্ষেত্রে এবং বোমাবিধ্বস্ত শহরগুলিতে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর জন্য এবং তাঁর নিজ হাতে ইহুদীদের হত্যাকাণ্ডের জন্য সমস্ত দায়িত্ব তিনি ইহুদীদের ঘাড়েই চাপাইয়া দিলেন। তারপর তিনি বর্ণনা করিলেন কেন তিনি বার্লিনে অবস্থানের জন্যই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন:

After six years of war, which inspite of all setbacks will one day go down in history as the most glorious and heroic manifestation of the struggle for existence of a nation, I can not forsake the city that is the Capital of this State···I wish to share my fate with that which millions of others have also taken upon themselves by staying in the town···

I have therefore decided to remain in Berlin and then to choose death voluntarily···I die with a joyful heart in the knowledge of the

immeasurable deeds and achievemeuts of our peasants and workers and of a contribution unique in history of our youth which bears my name. (8)

অর্থাৎ—"সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ৬ বছর ধরিয়া সংগ্রামের পর এই যুদ্ধ একটা জাতির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই হিসাবে নিশ্চয়ই একদিন ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবান্বিত এবং সাহসিকতাপূর্ণ বলিয়া চিহ্নিত হইবে। যে শহর এই রাষ্ট্রের রাজধানী তাকে আমি ত্যাগ করিয়া যাইতে পারি না।…যে সমস্ত লক্ষ লক্ষ লোক এই শহরে অবস্থান করিয়া নিজেদের ভাগ্যকে জড়াইয়াছেন, আমিও তাঁদের সঙ্গে সেই একই ভাগ্যের অংশীদার হইতে চাই।…

সুতরাং আমি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি বার্লিনে অবস্থানের এবং সেখানে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণের…আমি অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে মৃত্যু বরণ করিতেছি। কারণ, আমি জানি যে, আমাদের কৃষকেরা এবং শ্রমিকেরা অপরিমেয় কর্ম সম্পাদন ও উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন এবং আমার নামের সঙ্গে যুক্ত যুববাহিনী ইতিহাসে অপূর্ব অবদান রাখিয়া গিয়াছেন।"

দলিলের শেষের দিকে তিনি জার্মানদেরকে সংগ্রাম পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন এবং ভরসা দিলেন যে, জার্মান সৈন্যদের এবং তাঁর নিজের ত্যাগ স্বীকারের ফলে যে বীজ বপন করা হইল, তাতেই একদিন জাতীয় সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের এবং একটা সত্যকার ঐক্যবদ্ধ জাতির পুনর্জন্ম ঘটিবে।

বর্তমান যুদ্ধে জাতির এই বিপর্যয়ের জন্য হিটলার আর্মি এবং তার অফিসার বাহিনীকে দায়ী ও নিন্দা করিলেন এবং ভবিষ্যতের জন্য এই উপদেশ দিলেন যে, কোন ভূমি বা স্থান ত্যাগ করার চেয়ে মৃত্যুবরণ বরং বাঞ্ছনীয়।…

এই রাজনৈতিক টেষ্টামেণ্টের দ্বিতীয় অংশ প্রথম অংশের তুলনায় আরও বেশী কঠোর এবং নিন্দাত্মক ছিল। এই বিবৃতির গোড়াতেই বলা হইল :

"আমার মৃত্যুর আগে আমি পার্টি থেকে প্রাক্তন রাইখ মার্শাল হেরমন গোয়েরিংকে বিতাড়িত করছি এবং ১৯৩১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর রাইখস্ট্যাগে আমার বক্তৃতায় এবং ১৯৪১ সালের ২৯ জুন আমার এক ডিক্রির দ্বারা গোয়েরিংয়ের হাতে যে সমস্ত অধিকার অর্পণ করিয়াছিলাম, সেগুলি প্রত্যাহার করিয়া নিতেছি। তাঁর শূন্যস্থানে আমি গ্রাণ্ড অ্যাডমিরাল ডোয়েনিংসকে রাইখের প্রেসিডেণ্ট এবং সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সুপ্রীম কমাণ্ডার পদে নিয়োগ করিতেছি।"

গোয়েরিংয়ের পর হিমলারের পালা। কারণ, হিমলারও যে পশ্চিমের মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সেই সংবাদও ইতিমধ্যে হিটলারের নিকট পৌছিয়াছিল। অতএব হিমলারকেও অনুরূপভাবে পদচ্যুত ও ক্ষমতাচ্যুত করা হইল। যেহেতু রাজনীতিকরা তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, আর্মি (স্থলবাহিনী) তাঁর প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছে, এস এস বাহিনী তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, সুতরাং সেই অবস্থায় একমাত্র নৌবাহিনীর নায়ক তাঁর উত্তরাধিকার পাইবেন। যদিও নেভি বা নৌবাহিনীর কার্যকলাপ সর্বদাই খুব উচ্চস্তরের ছিল না। তথাপি অন্তত তাঁরা নাৎসীবাদের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন।

(8) Shirer, p. 1336.

"ভবিষ্যতে জার্মান আর্মি অফিসারেরা যেন নেভির মত সম্মানার্হ হইতে পারেন ...."

অর্থাৎ হিটলারের পর কে ?—উত্তরাধিকারের এই জটিল প্রশ্নটির এভাবে মীমাংসা করা হইল—নৌঅধিনায়কের হাতে ক্ষমতা অর্পণের দ্বারা। তাঁর ইচ্ছাপত্রে বা টেষ্টামেন্টে আবার ঘোষণা করা হইল :

"আমার মৃত্যুর আগে আমি হেইনরিখ হিমলারকে পার্টি থেকে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে, এস এস রাইখ ফুরারের এবং অন্যান্য সমস্ত দপ্তর থেকে বিতাড়িত করছি। তাঁর পরিবর্তে পার্টি-প্রশাসক কার্ল হ্যাঙ্কিকে (Karl Hanke) রাইখফুরার এস এস এবং জার্মান পুলিশের প্রধান পদে এবং পার্টি প্রশাসক পল গিজলারকে (Paul Giesler) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করছি।

"গায়েরিং ও হিমলার আমার অজ্ঞাতসারে এবং আমার বিনা অনুমতিতে শত্রুর সঙ্গে গোপনে আলোচনা করিয়াছেন, রাষ্ট্রের ক্ষমতা অবৈধভাবে দখলের চেষ্টা করিয়াছেন—কেবল ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় নাই, আমাদের দেশ এবং আমাদের সমগ্র জনগণের প্রতিও অপরিমিত কলঙ্কের কারণ ঘটানো হইয়াছে।"

এভাবে বিশ্বাসঘাতকদের ব্যবস্থা করিয়া এবং তাদের স্থানে নতুন উত্তরাধিকারী নিয়োগ করিয়া হিটলার তাঁর অবর্তমানে একটি নূতন গবর্ণমেণ্টও গঠন করিয়া গেলেন। জার্মান জাতি যাতে এই যুদ্ধ সর্বাত্মকভাবে চালাইয়া যাইতে পারেন, সেজন্য সম্মানার্হ লোকদের দ্বারা একটি গবর্ণমেণ্ট গঠন করা হইল এবং ১৭টি ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পদে তিনি তাঁর নিজস্ব লোকদের মনোনীত করিলেন। যদিও নিয়মানুসারে এই দায়িত্ব বর্তানো উচিত ছিল পরবর্তী গবর্ণমেণ্টের উপর, তথাপি হিটলার তাঁর পছন্দসই লোক নিয়োগ করিয়া গেলেন। ডোয়েনিৎসকে রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট, সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রীম কমাণ্ডার, যুদ্ধমন্ত্রী ও নৌ-বাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োগ করা ছাড়াও হিটলার তাঁর অন্যান্য গোঁড়া ভক্তদেরকেও নূতন ক্ষমতার পদে নিয়োগ করিলেন। যেমন, গোয়েবেলসকে করা হইল রাইখের চ্যান্সেলর, মার্টিন বোরম্যানকে পার্টি চ্যান্সেলর, অস্ট্রিয়ার কুইসলিং ও হল্যাণ্ডের পীড়নকারী সেইস-ইনকোয়ার্টকে (Seyss-Inquart) পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করা হইল। অর্থাৎ একদা হিটলার যে রিবেন্ট্রপকে জার্মানীর দ্বিতীয় বিসমার্ক (রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরের পর) নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, তাঁর সেই প্রিয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীকেও জীর্ণ-বস্ত্রের মত ত্যাগ করা হইল। আর ফিল্ড মার্শাল শোয়েরনারকে সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ করা হইল। কারণ, হিটলারের তখনও আশা ছিল যে, শোয়েরনার হয়তো বোহেমিয়ার প্রতিরক্ষার যুদ্ধে সাফল্য অর্জন করিতে পারিবেন। রিবেন্ট্রপের মত আলবার্ট স্পীয়রকেও (অস্ত্রসজ্জার মন্ত্রী) নূতন মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়া হইল।

উইলের মধ্যে হিটলার তাঁর শেষ নির্দেশ দিয়া গেলেন যে, যাঁদের উপর রাইখের নূতন ভার অর্পণ করা হইল, তারা সর্বতোভাবে নাৎসী প্রশাসন, নাৎসী যুদ্ধ এবং নাৎসীবাদকে রক্ষা করিবেনই। "সর্বোপরি তাঁরা অত্যন্ত কঠোরভাবে রক্ষা

করিবেন জাতি সংক্রান্ত আইনগুলিকে (racial laws) এবং অত্যন্ত নির্মমভাবে প্রতিহত করিবেন সারা দুনিয়ার জাতিসমূহের বিষদানকারী আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদকে।"

মৃত্যুর আগেও হিটলারের জাতিবিদ্বেষ কি ভয়ঙ্কর ছিল, উইলের এই কথাগুলি তার জলন্ত প্রমাণ।

উপরের বর্ণিত এই রাজনৈতিক উইলের পর হিটলারের ব্যক্তিগত উইল তেমন কিছু চমকপ্রদ ছিল না। এই উইলের দ্বারা তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি পার্টিকে এবং পার্টি না থাকিলে রাষ্ট্রকে দান করার নির্দেশ দিলেন। যদি রাষ্ট্রও না থাকে, তা' হলে কি হইবে, সে কথা আর তিনি উল্লেখ করিলেন না। যে সমস্ত চিত্রকলা তাঁর সংগ্রহশালায় ছিল, সেগুলির দ্বারা তিনি তাঁর জন্মভূমি লিঞ্জ (দানিয়ুব নদী তীরস্থ) শহরে একটি পিকচার গ্যালারি স্থাপনের প্রস্তাব দিলেন এবং উইলের এক্জিকিউটার হিসাবে নিযুক্ত করিলেন মার্টিন বোরম্যানকে। ইভা ব্রাউনের মাকে এবং হিটলারের ব্যক্তিগত কর্মচারী ও সহকারীদিগকে হিটলারের সম্পত্তি থেকে দান করার অধিকারও মার্টিন বোরম্যানকে দেওয়া হইল।

উইলের উপসংহারে হিটলার পুনরায় ঘোষণা করিলেন যে, আত্মসমর্পণ বা পরাজয়ের লজ্জা এড়াইবার জন্য তিনি ও তাঁর স্ত্রী স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করিতেছেন। ১২ বছর ধরিয়া তিনি যেখানে রাষ্ট্রীয় কার্যপরিচালনা করিয়াছেন, সেখানেই যেন অবিলম্বে তাঁদের দুইজনের মৃতদেহ দাহ করা হয়।

ভোর রাত্রি ৪টার সময় দলিলগুলি প্রস্তুত এবং স্বাক্ষরিত হইল। প্রত্যেকটি দলিলের তিনটি করিয়া কপি প্রস্তুত হইল। কারণ, এগুলি জার্মানীর নিকট এত মূল্যবান ছিল যে, ভবিষ্যৎ বংশধরগণ যেন এগুলি থেকে বঞ্চিত না হয়। দলিলের সাক্ষী রহিলেন গোয়েবেলস, বোরম্যান, ক্রেবস এবং বার্গডোরফ।

দলিল স্বাক্ষরের পর হিটলার বিশ্রাম করিতে গেলেন। (৫)

কিন্তু বোরম্যান ও গোয়েবেলসের বিশ্রামের অবকাশ ছিল না। কারণ, বোরম্যান অত্যন্ত ক্ষমতালোভী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোক ছিলেন। তিনি এই সুযোগে তাঁর মতলব হাসিল করিতে চাহিলেন। আর গোয়েবেলস্ হিটলারের প্রতি এত অনুরক্ত ছিলেন যে, ফুয়ারের মৃত্যুর পর তিনি আর বাঁচিয়া থাকিতে চাহিলেন না। সুতরাং দুইজনে দুই ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিলেন।

বোরম্যান বার্সেটস্‌গ্যাডেনে আগেই নির্দেশ পাঠাইয়া গোয়েরিং ও তাঁর দলবলকে এস এস বাহিনীর দ্বারা গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। এক্ষণে আর একটি রেডিও-বার্তা পাঠাইয়া তিনি এস এস সদর দপ্তরকে হুকুম দিলেন "২৩শে এপ্রিলের বিশ্বাসঘাতকদিগকে"—অর্থাৎ গোয়েরিং এবং তাঁর বিমানবাহিনীর স্টাফকে খতম করার জন্য।

কিন্তু সদর দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি বোরম্যানের এই ধরনের কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা

(৫) ট্রেভর রোপার, পৃষ্ঠা ১৮১-১৮৩

প্রয়োগের অধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করিলেন না। সুতরাং গোয়েরিং ঘাতকের হাত থেকে বাঁচিয়া গেলেন এবং বোরম্যানের মতলব ফাঁসিয়া গেল।

অপরদিকে গোয়েবেলস এবং তাঁর পত্নী আগেই স্থির করিয়াছিলেন যে, হিটলার শূন্য জার্মানীতে তাঁরা বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন না। সুতরাং হিটলারের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি ফুরারের রাজনৈতিক উইলের সঙ্গে একটি নিজস্ব পরিশিষ্ট জুড়িয়া দিলেন এবং তাতে ঘোষণা করিলেন যে, জীবনে তিনি কোন দিন ফুরারের একটি আদেশও অমান্য করেন নাই। এবং তিনি ফুরারের শেষ আদেশ অমান্য করিতে কিন্তু বাধ্য হইলেন। কেননা, ফুরারের মৃত্যুর পর তাঁর এবং তাঁর পরিবারের আর বাঁচিয়া থাকার কোন অর্থ হয় না। সুতরাং তাঁরাও বার্লিনের ভূগর্ভে থাকিয়া মৃত্যুবরণ করিবেন। ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় ডঃ গোয়েবেলস তাঁর এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দিলেন।...

২৯শে এপ্রিল বেলা ৮টার সময় তিন জন বিশেষ দূত মারফত রুশ লাইন ভেদ করিয়া হিটলারের এই মূল্যবান দলিলগুলি ফিল্ড মার্শাল শোয়েরনার এবং গ্রাণ্ড এ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎসের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল। দুপুরবেলা এই তিন জন বিশেষ দূত ভয়ঙ্কর বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়া তাঁদের গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হইয়া গেলেন। বলাবাহুল্য যে, সোভিয়েত বেষ্টনী ভেদ করিয়া তাঁদের এই দুর্গম যাত্রা অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচায়ক ছিল।

হিটলার শেষ মুহূর্তে ২৯শে এপ্রিল রাত্রে সামরিক হাইকমাণ্ডের প্রধান ফিল্ড মার্শাল কাইটেলের নিকট একটি পত্র পাঠাইবার সঙ্কল্প করিলেন। তখন সম্মিলিত জেনারেল স্টাফের সদর দপ্তর ছিল Schleswig-Holstein বা শেলসভিগ হলস্টেইন প্রদেশের প্লোয়েন (ploen) শহরে। হিটলারের নির্দেশে কর্নেল ফন বিলো (Below) কাইটেলের দপ্তরে এই চিঠি ডেলিভারি দেওয়ার জন্য বার্লিনের সেই বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যেও রওনা হইয়া গেলেন। এই শেষ চিঠিতেও হিটলার যথারীতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ করিলেন। সেনাপতি ও পদস্থ ব্যক্তিদের নিন্দা করিলেন, কিন্তু সাধারণ জার্মান সৈন্য ও জনগণের অপরিমিত ত্যাগ স্বীকারের উচ্চ প্রশংসা করিলেন। চিঠির উপসংহারে তিনি তাঁর 'মেইন ক্যাম্পফের' (আত্মজীবনী) বর্ণিত জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পুনরাবৃত্তি করিয়া লিখিলেন:

"এই যুদ্ধে জার্মান জনগণ যে অদ্ভুত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, তাতে আমি বিশ্বাস করি না যে, এই ত্যাগ স্বীকার বৃথা গিয়াছে। বরং এখনও আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত জার্মান জনগণের জন্য পূর্বদিকে ভূমি দখল করা।"—(৬)

অর্থাৎ হিটলার তাঁর জীবনের সর্বাত্মক সর্বনাশের মুখে দাঁড়াইয়াও পররাজ্য গ্রাস এবং সোভিয়েতের প্রতি বিদ্বেষ ভুলিতে পারিলেন না!

* * *

কাইটেলের উদ্দেশ্যে লেখা হিটলারের শেষ চিঠি নিয়া কর্নেল ফন বিলো যখন বার্লিনের বাঙ্কার থেকে রওনা হইয়া গেলেন, হিটলার তার আগেই জীবনের অন্তিম

(৬) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৭৫

মুহূর্তের জন্য তৈরী হইতেছিলেন। কিন্তু সেদিন ২৯শে এপ্রিল অপরাহ্নে হিটলারের নিকট আর একটি ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ পৌছিল। তাঁর এতদিনের সহযোদ্ধা ও মিত্র এবং ইটালীর প্রাক্তন ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটর বেনিটো মুসোলিনী তাঁর উপপত্নী ক্লারা পেতাচ্চিসহ উত্তর ইটালীর পার্টিজান যোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়িয়া নিহত হইয়াছেন। (পূর্ববর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। হিটলার সম্ভবতঃ মুসোলিনীর নিধন হওয়ার বিস্তৃত সংবাদ জানিতেন না। কিন্তু যতটুকু জানিলেন, ততটুকুই তাঁর আত্মনাশের ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। অপরাহ্নে তিনি তাঁর প্রিয় আ'শেসিয়ান কুকুর ব্লণ্ডিকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিলেন। অবশ্য তিনি নিজ হাতে এই কাজ করেন নাই। তাঁর এক সার্জেনকে দিয়া বিষপ্রয়োগ করিয়াছিলেন। বাঙ্কারের অন্য দুইটি কুকুরকেও গুলি করিয়া মারা হইল।

তারপর হিটলার তাঁর দুই মহিলা সেক্রেটারিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং জরুরী অবস্থায় ব্যবহারের জন্য তাঁদের দুইজনকে দুটি বিষের বড়ি দিলেন। অবশ্য ফুরার বিষণ্ণ চিত্তে মন্তব্য করিলেন যে, বিদায়লগ্নে তিনি এর চেয়ে কোন ভালো উপহার দিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখিত। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁদেরকে এই বলিয়া ধন্যবাদ দিলেন যে, তাঁর জেনারেলদের চেয়ে তাঁরা অনেক বেশি বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়াছেন।

ক্রমেই হিটলারের জীবনের শেষ সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। তিনি তাঁর সেক্রেটারি গার্টরুড জঙকে তাঁর অবশিষ্ট দলিলপত্র পোড়াইয়া ফেলিবার হুকুম দিলেন এবং সেই সঙ্গে এই নির্দেশ দিলেন যে, পরবর্তী আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত বাঙ্কারের কেউ যেন ঘুমাইতে না যান। স্বভাবতঃই সকলে ভাবিলেন যে, এবার তিনি শেষ বিদায় নিবেন, কিন্তু ৩০শে এপ্রিল রাত্রি আড়াইটার আগে তেমন কিছু ঘটিল না। প্রত্যক্ষ-দর্শীরা বলিয়াছেন যে, ফুরার ঐ সময় তাঁর প্রাইভেট কক্ষ থেকে সাধারণভোজনাগারের দিকে গেলেন। সেখানে তখন জনা কুড়ি লোক, যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন হিটলারের পার্শ্বচর ও মহিলা, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে হিটলার করমর্দন করিলেন এবং অস্পষ্ট স্বরে কিছু বলিলেন। তাঁর চোখ তখন বাষ্পার্দ্র ছিল। ফ্রাউ জঙের মতে 'হিটলারের চোখ তখন বাঙ্কারের প্রাচীর ভেদ করিয়া বহুদূরে তাকাইয়াছিল'। এর-পর হিটলার পুনরায় তাঁর কক্ষে চলিয়া গেলেন।

তখন আচম্বিতে এক তাজ্জব দৃশ্যের অবতারণা হইল। বাঙ্কারের পাতালপুরীর ক্যান্টিনে বাকী লোকগুলি জড়ো হইয়া উদ্দাম নৃত্য জুড়িয়া দিল। তারা যেন মরীয়া হইয়া উঠিল, কেননা যে কোন মুহূর্তে তারা রুশদের হাতে পড়িয়া খুন হইতে পারে। এদিকে হিটলারের বজ্রমুষ্টির শাসনও আর নাই। সুতাংব তারা যা খুশী তাই করিতে পারে। এক সময় সেই উদ্দাম উল্লাস এত বাড়িয়া উঠিল যে, ফুরারের কক্ষ থেকে সেই উল্লাস কমাইবার নির্দেশ আসিল। কিন্তু সেই নির্দেশ অগ্রাহ্য হইল এবং সারারাত্রি ধরিয়া তারা নাচিতে লাগিল।—(৭)

এদিকে বার্লিনেরও মৃত্যু ঘনাইয়া আসিল। কারণ, পরদিন রুশ সৈন্যরা চ্যান্সে-লারির মাত্র কয়েক মহল্লা দূরে আসিয়া পৌছিল। কিন্তু এই অবস্থায়ও কিছু কিছু

(৭) শাইরার-পৃষ্ঠা ১৩৪৪

সেনাপতি বাঙ্কারে আসিয়া সামরিক রিপোর্ট দিলেন—যদিও রিপোর্ট দেওয়ার কিছুই ছিল না। কারণ, বার্লিন রক্ষার আর কোন উপায়ও ছিল না। হিটলার নির্বিকার চিত্তে এই বিপর্যয়কর অবস্থার কথা শুনিলেন এবং অন্তিম লগ্নের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বেলা প্রায় ২টার সময় তিনি তাঁর লাঞ্চ খাইলেন। কিন্তু তাঁর সদ্য বিবাহিতা ইভার কোন ক্ষুধা ছিল না। সুতরাং হিটলার যথারীতি তাঁর দুই সেক্রেটারি ও পাচিকার সঙ্গে তাঁর জীবনের শেষ আহার গ্রহণ করিলেন। কোন কথাবার্তা তিনি বলিলেন না।

বেলা আড়াইটা নাগাদ হিটলারের এস এস - এ্যাডজুটান্ট চ্যান্সেলারির গ্যারেজের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ও হিটলারের ব্যক্তিগত সোফার এরিক কেম্পকাকে নির্দেশ পাঠাইলেন চ্যান্সেলারির বাগানে ২০০ লিটার পেট্রোল পাঠাইবার জন্য। এরিক কেম্পকা প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—এই নিদারুন সময়ে এত পেট্রোল পাওয়া যাইবে না। কিন্তু হুকুম আসিল যেভাবেই হোক যোগাড় করিতেই হইবে। তখন ১৮০ লিটার পেট্রোল সংগৃহীত হইল এবং বাঙ্কারের জরুরী নির্গমন পথে এই পেট্রোল রাখা হইল। যখন হিটলারের চিতাগ্নির আয়োজন করা হইতেছিল, তখন তিনি তাঁর শেষ আহার গ্রহণ করিয়া ইভা ব্রাউনকে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠতম পার্শ্বচরদের কাছ থেকে শেষ বিদায় দিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ডঃ গোয়েবেলস, জেনারেল ক্রেবস্ এবং বার্গডফ, আর সেক্রেটারিগণ ও পাচিকা। কিন্তু সুন্দরী ও ব্যক্তিত্বশালিনী মহিলা শ্রীমতী গোয়েবেলস সেই সময় উপস্থিত ছিলেন না। তিনিও ইভার মত স্বামীর সঙ্গে একত্রে মৃত্যু বরণের জন্য কৃতসঙ্কল্প ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর ৬টি নিষ্পাপ শিশু সন্তানকেও সেই সঙ্গে হত্যা করিতে হইবে, এই চিন্তায় তিনি বিচলিত ছিলেন। গত ৬ দিন যাবৎ তাঁর এই শিশু সন্তানেরা বাঙ্কারের পাতাল পুরীতে আনন্দে খেলা করিতেছিল। অবোধ শিশুরা জানিতে পারিল না তাদের অদৃষ্টে কি পরিণতি অপেক্ষা করিতেছে। কয়েকদিন আগে তিনি ক্রাউলিন হান্না রিৎসের কাছে বলিয়াছিলেন—"হান্না, যদি আমি সন্তানদের জন্য দুর্বলতায় ভেঙ্গে পড়ি, তবে, তুমি আমাকে সেই চরম মুহূর্তে সাহায্য করো। তারা তৃতীয় রাইখের এবং ফুরারের। সুতরাং তারাই যদি না থাকে, তবে, আমার সন্তানদেরও আরও বেঁচে থাকার দরকার নাই।"

মিসেস গোয়েবেলস তাঁর একলা ঘরে নিজেকে সামলাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিলেন।

কিন্তু হিটলার ও ইভার এই সমস্ত সমস্যা ছিল না। তাদের একমাত্র কাজ ছিল নিজেদের জীবন নাশ। সুতারং সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়া। তারা নিজেদের ঘরে চলিয়া গেলেন। কক্ষের বাইরে যাতায়াতের পথে ছিলেন ডঃ গোয়েবেলস, বোরম্যান এবং আরও কয়েকজন। কিছুক্ষণ পর তাঁরা একটি রিভলভারের গুলীর আওয়াজ শুনিলেন এবং আর একটি গুলীর শব্দের জন্য অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু সেই শব্দ আর পাওয়া গেল না। সুতরাং খানিকটা সময় পর তাঁরা ফুরারের আবাসকক্ষে পবেশ করিলেন। তাঁরা দেখিলেন সোফার উপর ফুরারের রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়িয়া আছে

তিনি তাঁর নিজের মুখে গুলী করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাঁর পাশেই ইভার মৃতদেহ পড়িয়া আছে। আর মেঝের উপরে দুইটি রিভলভার পড়িয়া আছে। ইভা তাঁর রিভালভার ব্যবহার করেন নাই। তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছেন।

তখন সময় অপরাহ্ণ ৩-৩০ মিনিট সোমবার, ৩০শে এপ্রিল ১৯৪৫। এ্যাডলফ হিটলারের ৫৬ তম জন্ম দিবসের ১০ দিন পর এবং তৃতীয় রাইখের ভাগ্যবিধাতা হওয়ার ১২ বছর ৩ মাস পর।

(পরবর্তীকালে রাশিয়ানরা কিন্তু প্রচার করিয়াছিলেন যে, হিটলার নিজ হাতে গুলী করিয়া 'বীরের মত' আত্মহত্যা করেন নাই। এই কাহিনী মিথ্যা। তিনিও বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। অবশ্য এই বিতর্কের কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই।)

বাঙ্কারে হিটলারের কর্মচারীরা চ্যান্সেলারির বাগানে হিটলার ও ইভার মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া গেলেন। হিটলারের মুখ চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এজন্য একটি কম্বলে তাঁর মৃতদেহ ঢাকিয়া নেওয়া হইয়াছিল। চ্যান্সেলারির বাগানে তখন রুশদের গোলা আসিয়া পড়িতেছিল এবং সেই গোলা বর্ষণের শব্দ ছাড়া এত বড় 'ঐতিহাসিক' মৃত্যুর জন্য আর কোন সাড়া শব্দ ছিল না। গোলাবর্ষণের এক ফাঁকে বিরতির সময় হিটলার ও ইভার দেহে পেট্রোল ঢালিয়া দিয়া আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইল এবং সেই প্রজ্জলিত শিখা উর্ধ্বে উঠিতে লাগিল। জরুরী প্রবেশ পথের আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া গোয়েবেল্‌স এবং বোরম্যান শবানুগামীদের ভূমিকায় এ্যাটেনশনের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং ডান হাত উর্ধ্বে তুলিয়া নাৎসী কায়দায় স্যালুইট বা অভিবাদন জানাইলেন।

তখনও লালফৌজের গোলায় চ্যান্সেলারির বাগান বিধ্বস্ত হইতেছিল এবং হিটলার ও ইভার দেহ আগুনে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইতেছিল।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়াছেন যে, দৃশ্যটা বীভৎস ছিল!—(৮)

আর চার্চিল মন্তব্য করিয়াছেন যে, রুশ কামান গর্জন ক্রমশঃ প্রবল থেকে প্রবলতর হইয়া হিটলারের চিতাবহ্নিকে এবং সেই সঙ্গে তৃতীয় রাইখের পরিণামকে ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছিল!—(৯)

(৮) ট্রেভর-রোপার—পৃষ্ঠা ২০৪

(৯) চার্চিল—ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ—৪৬৪

নবম পর্ব

সপ্তম অধ্যায়

লালফৌজের দখলে বার্লিন

খাস বার্লিন নগরী দখলের যুদ্ধ মাত্র ৭ দিন স্থায়ী হইয়াছিল। ১৯৪৫ সালের ২৬শে এপ্রিল থেকে ২রা মে-র মধ্যে বার্লিন নগরী লালফৌজ কর্তৃক বেষ্টিত এবং জার্মান-বাহিনী ধ্বংস হইল। উত্তর, উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে মার্শাল জুকোভ, মার্শাল রোকোসোভস্কি এবং মার্শাল কোনেভ বিশাল সৈন্যবাহিনী (মোট সৈন্যসংখ্যা ২৫ লক্ষ) ও প্রভূত অস্ত্রসম্ভার (জার্মানীর তুলনায় কয়েক গুণ বেশী) নিয়া জার্মানীকে তিন দিক দিয়া বেষ্টন করিল এবং ২৬ এপ্রিল থেকে বার্লিনের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে যে বেষ্টনী সৃষ্টি হইল নাৎসী বাহিনী কিছুতেই সেই বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিল না এবং ২রা মে-র মধ্যে তারা খতম হইয়া গেল। লালফৌজ বার্লিন দখল করিয়া নিল।

কিন্তু এখানে পশ্চিমের মিত্রপক্ষের তরফ থেকে এই মর্মে একটা অভিযোগ উঠিয়াছিল যে, স্ট্যালিন বা রাশিয়া মিত্রপক্ষীয় হাইকমাণ্ডের সঙ্গে চাতুরী খেলিয়াছেন। কারণ, সোভিয়েত সুপ্রীম কমাণ্ডার ইন্-চীফ ১লা এপ্রিল ১৯৪৫, মিত্রপক্ষীয় হাই কমাণ্ডকে জানাইয়া ছিলেন যে, মে মাসের দ্বিতীয় অর্ধভাগের আগে তাঁরা বার্লিনের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিতে পারিবেন না—অবশ্য যদি ইতিমধ্যে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের পক্ষে 'অন্য কোন অবস্থা' দেখা না দেয়।

একথা সত্য যে, এত বড় অভিযান সংগঠিত করার জন্য মে মাসের প্রথম অর্ধ-ভাগ কাটিয়া যাইত এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটিও অনুরূপ পরিকল্পনা করিতেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পরিস্থিতি অন্যরূপ ধারণ করিল। মিত্রপক্ষের তরফ থেকে চার্চিল বার্লিন দখলের জন্য মতলব আঁটিলেন এবং গোড়া থেকেই তিনি এই ফন্দিবাজী করিতেছিলেন। সুতরাং স্ট্যালিনকেও তাঁর আগেকার সিদ্ধান্ত পাল্টাইতে হইল।

ব্যাপারটি সংক্ষেপে এই: ইয়াল্টা সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের পর মিত্রপক্ষীয় তিন শক্তি—বৃটেন, আমেরিকা ও রাশিয়া জার্মানীতে তিনটি দখলীকৃত এলাকা স্থাপন করিবেন এবং একথা ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল যে, সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ জার্মানীর পূর্বাংশ অধিকার করিবেন। কিন্তু জার্মানীর পতনের মুখে চার্চিল বিগড়াইলেন। তাঁর চিরকালের কমিউনিষ্ট বিদ্বেষ যেন মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। তাঁর ইতিহাস পুস্তকে (ষষ্ঠ খণ্ডে) তিনি লিখিয়াছেন যে, পূর্ব রণাঙ্গনের যুদ্ধে জার্মানীর সমরশক্তি ধ্বংস হইয়া যাওয়ার ফলে "কমিউনিষ্ট রাশিয়া ও পশ্চিমের গণতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে।" সুতরাং পশ্চিমী শক্তিবর্গের উচিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা। যথা—(১) সোভিয়েত রাশিয়া মুক্ত দুনিয়ার (ফ্রী ওয়ার্ল্ড) পক্ষে মারাত্মক বিপদরূপে দেখা দিয়াছে। (২) সোভিয়েতের আরও সম্মুখদিকে আগাইয়া যাওয়ার বিরুদ্ধে অবিলম্বেই একটি নতুন রণাঙ্গন খুলিতে হইবে এবং (৩) এই রণাঙ্গন ইউরোপের যত পূর্বদিকে সম্ভব, তত দূরে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।"

তখনও প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বাঁচিয়া ছিলেন। ১লা এপ্রিল, ১৯৪৫, চার্চিল রুজভেল্টকে এই মর্মে এক তারবার্তা পাঠাইলেন "রুশরা নিঃসন্দেহে গোটা অষ্ট্রিয়া দখল কা য়া নিবে এবং ভিয়েনাতে প্রবেশ করিবে। এরপর যদি তারা বার্লিনও দখল করিয়া নেয়, তবে, ভবিষ্যতের পক্ষে ভয়ঙ্কর বিপত্তির সৃষ্টি হইবে। সুতরাং রাজনৈতিক দিক থেকে আমি মনে করি যে, জার্মানীর যত পূর্বে সম্ভব আমাদের আগাইয়া যাইতে হইবে এবং বার্লিনও আমাদের দখল করিয়া নিতে হইবে। সামরিক দিক থেকেও এটাই হইবে সার ান নীতি।"

কিন্তু চার্চিলের এই সমস্ত প্রস্তাব মার্কিন সরকারী মহল কিংবা পশ্চিম রণাঙ্গনের মিত্রপক্ষের সুপ্রীম কমাণ্ডার আইজেনহাওয়ার গ্রহণ করিলেন না এবং তিনি লালফৌজ ও সোভিয়েত রাশিয়ায় সঙ্গে সদ্ভাবের সম্পর্ক বজায় রাখিতে চাহিলেন। কারণ, সেটাই ছিল প্রেসিডেণ্টের নীতি। অপর পক্ষে রুজভেল্টের প্রধান পরামর্শদাতা হ্যারি হপকিন্স মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'যদি সম্ভব হইত, তবে আমরা বার্লিন দখল করিয়া নিতাম এবং আমাদের সৈন্যবাহিনীর পক্ষে সেটা একটা বড় জয় হইত।' (১)

চার্চিল তাঁর বইতে আরও লিখিলেন যে, তিনি লর্ড মণ্টগোমারীকে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, ধৃত জার্মান অস্ত্রশস্ত্র যেন সাবধানে রাখা হয়। কেন না, ইতালী ও ফ্রান্সের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়িতে হইতে পারে। অধিকন্তু কমিউনিষ্ট রাশিয়ার বিরুদ্ধে 'মুক্ত দুনিয়ার' পক্ষ থেকে নতুন অভিযানের জন্য জার্মানদের হাতে অস্ত্র তুলিয়া দিতেও হইতে পারে।

পাঠকবর্গের মনে রাখা দরকার, তখনও জার্মানী সরকারীভাবে আত্মসমর্পণ করে নাই। কিন্তু হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশনের অন্যতম অংশীদার সাম্রাজ্যবাদী ও কমিউনিষ্ট বিদ্বেষী চার্চিলের মনোভাব কিরূপ জঘন্য ছিল!

কিন্তু স্ট্যালিনের উপরে টেক্কা মারা চার্চিলের পক্ষেও সহজ ছিল না। তিনি ও তাঁর সহকর্মীগণ পূর্বাহ্ণেই এই সমস্ত অনুমান করিয়াছিলেন এবং মিত্রপক্ষীয় প্রতিক্রিয়াশীল মহলের মতলব সম্পর্কেও সন্দেহ করিয়াছিলেন। সুতরাং বার্লিন সম্পর্কে তাঁদের মতলব ব্যর্থ করার জন্য সোভিয়েত হাইকমাণ্ড মে মাসের দ্বিতীয় অর্ধভাগের জন্য অপেক্ষা না করিয়া এপ্রিল মাসের মধ্যভাগেই বার্লিনের দিকে অভিযান করিতে বাধ্য হইলেন—যদিও তখন পর্যন্ত প্রস্তুতি সম্পূর্ণ ছিল না। (২)

* * *

একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বার্লিন রক্ষার জন্য জার্মাণরা মরিয়া হইয়া লড়াই করিয়াছিল এবং অপরিমেয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিল। মার্শাল আইভ্যান কোনেভ লিখিয়াছেন—বার্লিনের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের বাড়ীগুলি অবরোধ যুদ্ধের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। পার্শ্বদেশ রক্ষার জন্য ৪ মিটার পুরু দেওয়াল তৈরী হইয়াছিল, যেগুলি আবার ট্যাঙ্কমারা প্রতিবন্ধকে পরিণত হইয়াছিল। বিশেষ ভাবে

(১) রবার্ট ই শেরউড—পৃষ্ঠা ৮৮৪
(২) দি গ্রেট মার্চ অব্ লিবারেশন—(জেঃ জেনারেল টেলেগিন) পৃষ্ঠা ২২৬

বার্লিনের মধ্যভাগে কংক্রীটের তৈরী অত্যন্ত শক্ত শেলটার বা আশ্রয় নির্মিত হইয়াছিল এবং বিশেষ ধরনের এমন সমস্ত বাঙ্কার তৈরী হইয়াছিল যেগুলিকে অনায়াসে বিমান, ট্যাঙ্ক ও পদাতিকদের আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাইত। প্রতিরক্ষার জন্য বার্লিনের শহর সীমানার মধ্যে প্রায় ৪০০ বাঙ্কার নির্মিত হইয়াছিল এবং কোন কোন বাঙ্কার ৬ তলা পর্যন্ত উঁচু ছিল, এই সমস্ত প্রত্যেকটি বাঙ্কারে ৩০০ থেকে হাজার সৈন্য বাধা দিয়াছিল। (৩)

২৭ এপ্রিল বার্লিন শহরের কেন্দ্রস্থলে যুদ্ধ শুরু হইল এবং শত্রুসৈন্য পূর্ব থেকে পশ্চিমে ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে আর উত্তর থেকে দক্ষিণে ২ থেকে ৫ কিলোমিটারের সঙ্কীর্ণ একফালি জমির মধ্যে আটকা পড়িল। ২৮শে এপ্রিল যে সমস্ত আহত জার্মান সৈন্য ও অফিসার এবং হাজার হাজার স্ত্রীলোক ও শিশু প্রাণভয়ে শহরের ফ্রিডরিশ ষ্ট্রাসি রেলষ্টেশনের ভূগর্ভে আশ্রয় নিয়াছিল হিটলারের আদেশে এস এস বাহিনী সেই পাতালপুরীর আশ্রয় জলপ্লাবনের দ্বারা ডুবাইয়া দিল! হিটলারের নৃশংসতার যে সীমা ছিল না, এটি তার অন্যতম দৃষ্টান্ত :...

৩০শে এপ্রিল ভোরবেলা থেকে রাইখষ্ট্যাগ দখলের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া এই হিংস্র যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল। প্রত্যেকটি মেঝে ও প্রত্যেকটি কক্ষে প্রাণঘাতী সংঘর্ষ হইল। জি কে জাগিটোভ, এ এফ লিসিমেঙ্কো, ডি এন ম্যাকোভ এবং এস পি মিনিন—কমিউনিষ্ট পার্টির এই কয়েকজন সদস্য এই আক্রমণে নেতৃত্ব দিলেন এবং সাব-মেসিনগান ও হাতবোমা হাতে নিয়া তাঁরা শত্রুর ভিতর দিয়া পথ কাটিয়া ছাদে গিয়া উঠিলেন এবং লাল পতাকা উড়াইয়া দিলেন।

আর ১লা মে ভোরবেলা ৭৫৬ তম রেজিমেণ্টের দুই জন স্কাউট এস এ ইয়েগোরোভ এবং এম ভি কান্টারিয়া সোভিয়েত রণ-পতাকা (battle banner) উড্ডীন করিলেন রাইখষ্ট্যাগের সম্মুখভাগের উপরিস্থিত ত্রিকোণ স্থানটিতে—রাইখষ্ট্যাগ দখলের এই যুদ্ধের সময় আর একদল সোভিয়েত সৈন্য গিয়া পৌঁছিল ইম্পিরিয়েল চ্যান্সেলারিতে। এই চূড়ান্ত জয়ের পর বার্লিন দখলের যুদ্ধ শেষ হইল ২রা মে।

হিটলারের 'হাজার বছরের রাইখের' উপর সেই 'বর্বর বলশেভিকদের' লাল পতাকা উড্ডীন হইল, যাদেরকে সমূলে সংহার করার জন্য হিটলার ও তাঁর নাৎসী সৈন্যবাহিনী চার বছর ধরিয়া মানুষের ইতিহাসের হিংস্রতম যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। সেই রাইখষ্ট্যাগ, সেই চ্যান্সেলারি এবং সেই বার্লিন নগরীর সুবিখ্যাত রাজপথ উন্টর-ডেন-লিন্ডেন ও টিয়ারগার্টেনসহ প্রায় ১০০ বর্গমাইল এলাকা ধরিয়া আগুন ও ধ্বংস পরিব্যাপ্ত হইল—যে বার্লিন নগরীকে হিটলারের 'অজেয় বাহিনী' পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। অবশ্য তার আগেই হিটলার চরম পরাজয় ও চূড়ান্ত অসম্মানের মধ্যে গোটা জার্মান জাতিকে ফেলিয়া রাখিয়া ভূগর্ভের নিরাপদ আশ্রয়ে প্রণয়িনীসহ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। এর চেয়ে ইতিহাসের প্রচণ্ড বিদ্রূপ আর কি হইতে পারে?

---

(৩) Secrets of the Second World War—p. 226.

যদিও বার্লিনের যুদ্ধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্যান্য ভয়াবহ রণক্ষেত্রের মতই ইতিহাসে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে, তথাপি বার্লিন বিজয়ী বীর মার্শাল জুকোভ স্বয়ং কিন্তু এই যুদ্ধকে লেনিনগ্রাদ, মস্কো বা ষ্ট্যালিনগ্রাদের ঐতিহাসিক যুদ্ধের অনুরূপ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এই প্রত্যেকটি রণক্ষেত্রেই জুকোভ অসাধারণ রণদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং অনন্য সাধারণ খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। তবে ওডের নদী তীর থেকে রাত্রিবেলা এই ধরনের যুদ্ধকে তিনি এক নতুন টেকনিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ক্রমাগত ৬ রাত্রি তিনি ঘুমাইতে পারেন নাই। (৪)

কিন্তু জুকোভের এই মতামত সত্ত্বেও মহাযুদ্ধের সোভিয়েত সরকারী ইতিহাসে বার্লিনের যুদ্ধকে অত্যন্ত গুরুতর ও জটিল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সরকারী ইতিহাসের মতে এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে মিলিয়া ৩৫ লক্ষ লোক জড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ৫০ হাজার কামান ও মর্টার, ৮০০০ ট্যাঙ্ক ও মোবাইল গান্ এবং ৯ হাজারের বেশী বিমান নিয়োগ করা হইয়াছিল। বার্লিনের এই যুদ্ধে লালফৌজ ৭০টি জার্মান পদাতিক ডিভিসন ১২ টি বর্মাবৃত এবং ১১ টি মোটরায়িত ডিভিসন ধ্বংস করিয়াছিল। ৮ই মে জার্মানীর সরকারীভাবে আত্মসমর্পণের আগে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার জার্মান সৈন্য, ১৫০০ ট্যাঙ্ক, ৪০০০ এর বেশী বিমান এবং ১০ হাজার কামান রুশদের হাতে ধরা পড়িয়াছিল। বার্লিনের বিরুদ্ধে এই রণক্রিয়ায় কেবল মার্শাল জুকোভের অধীন ১ নং বেলোরুশিয়ান ফ্রন্টই যোগ দেয় নাই, ১ নং উক্রাইনিয়ান এবং ২ নং বেলোরুশিয়ান ফ্রন্টও যোগ দিয়াছিল। কিন্তু এই রণক্রিয়ার অস্ত্রসম্ভারে রুশ বাহিনী জার্মানদের তুলনায় কয়েক গুণ বেশী শক্তিশালী ছিল। তথাপি জার্মানরা নাৎসী প্রোপাগাণ্ডার প্ররোচনায় পড়িয়া মরিয়া হইয়া একেবারে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়াছিল। ১৬ এপ্রিল থেকে ৮ই মের মধ্যে জার্মানরা রুশ বাহিনীর প্রচণ্ড ক্ষতি করিয়াছিল। বার্লিন যুদ্ধে রুশ পক্ষে হতাহত ও নিখোঁজ মিলিয়া ৩ লক্ষ ৫ হাজার সৈন্য নষ্ট হইয়াছিল—ওডের ও নেইসী নদীর ব্যূহ ভেদ করিতে গিয়া এবং বার্লিন শহরের অভ্যন্তরের যুদ্ধে এই সমস্ত ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল। ২ হাজার ট্যাঙ্ক, ১২ শত কামান ও ৫২৭ টি বিমান নষ্ট হইয়াছিল। একমাত্র বার্লিনের যুদ্ধে যখন রাশিয়ার এই ক্ষতি হইয়াছিল, তখন সারা ১৯৪৫ সালে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের ক্ষতি হইয়াছিল মাত্র ২ লক্ষ ৬০ হাজার সৈন্য। একমাত্র রাইখষ্ট্যাগ দখলের যুদ্ধেই রুশ পক্ষের কয়েক হাজার না হইলেও কয়েক শত সৈন্য নিহত হইয়াছিল।

মার্শাল জুকোভের মতে বার্লিনের রণক্রিয়ায় ৫ লক্ষ জার্মান সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। এর মধ্যে ৩ লক্ষ সৈন্য বন্দী হইয়াছিল। ১ লক্ষ ৫০ হাজার নিহত হইয়াছিল এবং বাকী সৈন্যেরা পালাইয়া গিয়াছিল। ওডের নদীর যুদ্ধেই জার্মানরা তাদের সমস্ত বিমান বিধ্বংসী কামান নিয়োগ করিয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং বার্লিনকে বিমান আক্রমণ থেকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা জার্মানদের ছিল না।—(৫)

(৪) Alexander Werth– P. 890

(৫) ঐ পুস্তক, ঐ পৃষ্ঠা

সস্ত্রীক হিটলারের আত্মঃত্যাব পর তৃতীয় রাইখের পরিচালনার কিছু কিছু দায়িত্ব মার্টিন বোরম্যান ও গোয়ে লসের ঘাড়ে আসিয়া পড়িল। ফুরার তাঁর শেষ 'ইচ্ছাপত্রে' গ্রাণ্ড এ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎসকে তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই নির্দেশপত্র তখনও বিশেষ বার্তাবাহী মারফৎ ডোয়েনিৎসের নিকট পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। বোরম্যান নিজেই ছিলেন ক্ষমতালোভী। সুতরাং চূড়ান্ত ক্ষমতা ডোয়েনিৎসের হাতে তুলিয়া দিতে তিনি তখনও কিছুটা ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। তথাপি কোন উপায় ছিল না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত রেডিওযোগে নিম্নলিখিত বার্তা তিনি পাঠাইলেন :

"গ্রাণ্ড এ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস। প্রাক্তন রাইখ মার্শাল গোয়েরিংয়ের বদলে ফুরার আপনাকে তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়াছেন। লিখিত আদেশ নিয়া বার্তাবাহী আপনার কাছে পেঁছুবার পথে। আপনি অবিলম্বে অবস্থা অনুযায়ী যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।"

লক্ষ্য করাব এই যে, এই বার্তার মধ্যে কোথাও হিটলারের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করা হইল না। ডোয়েনিৎস তখন ছিলেন উত্তর দি.কের সমস্ত জার্মান বাহিনীর অধিনায়কত্বে এবং তিনি কোনদিন ভাবেন নাই যে, তিনি হিটলারের উত্তরাধিকারী হইবেন। .স সময় তার সদর দপ্তর ছিল শ্লেসভিগের (Schelswig) প্লোয়েন শহরে এবং তাঁর ধারণা ছিল যে, হিমলার হইবেন হিটলারের উত্তরাধিকারী। সুতরাং বোরম্যান প্রেরিত রেডিওবার্তা পড়িয়া তিনি কিছুটা হতবুদ্ধি হইলেন। কিন্তু জীবনে তিনি কোন দিন হিটলারের অবাধ্য হন নাই। সুতবাং এ্যাডলফ হিটলার তখনও বাঁচিয়া আছেন, এই বিশ্বাসে তিনি ফুরাবের উদ্দেশ্যেই এই মর্মে এক বার্তা পাঠাইলেন যে, তাঁর প্রতি তিনি শর্তহীন আনুগত্য প্রকাশ করিতেছেন এবং যদি ভাগ্যবশে তিনি ফুরারের উত্তরাধিকারী রূপে রাইখ পরিচালন র দায়িত্ব পাইয়া থাকেন, তবে, তিনি যথাসম্ভব বার্লিন থেকে তাঁকে উদ্ধারের এবং জার্মান জনগণের এই অভূতপূর্ব বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ চালাইয়া যাইবেন।....

সেই রাত্রে গোয়েবেলস ও বোরম্যানের মাথায় আর একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। তাঁরা বার্লিনে রুশ পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির আলোচনা চালাইবার কথা চিন্তা করিলেন। জেনারেল ক্রেবস, যিনি আর্মি জেনারেল ষ্টাফের প্রধান ছিলেন, তিনি একদা মস্কোতে জার্মান দূতাবাসে ছিলেন এবং সোভিয়েত নেতাদের পরিচিত ছিলেন। তিনি রুশ ভাষাও জানিতেন। সুতরাং তাঁরা ক্রেবসকে রুশ শিবিরে পাঠাইয়া যুদ্ধবিরতির আলোচনা যেমন চালাইতে চাহিলেন, তেমনি ডোয়েনিৎসের গবর্নমেণ্টে যোগদানের জন্য যাতায়াতের নিরাপত্তার প্রস্তাবও করিলেন। যদি রুশ পক্ষ এটা মানিয়া লন, তবে বিনিময়ে তাঁরা বার্লিনশহরকে রুশদের হাতে সমর্পণ করিবেন।

সুতরাং ৩০শে এপ্রিল মধ্যরাত্রির পর (ইংরাজী মতে ১লা মে) জেনারেল ক্রে'স সোভিয়েত সেনাপতি জেনারেল চুইকোভের দপ্তরে গেলেন একজন অফিসারসহ সাদা পতাকা উড়াইয়া এবং অবিচলিত কণ্ঠে যেভাবে কথাবার্তা শুরু করিলেন, নিঃসন্দেহে তা অভিনব :

"ক্রেবস্—আজ ১লা মে, আমাদের দু'দেশের পক্ষেই মহাছুটির দিন !

(ইউরোপে ১লা মে তারিখটি আন্তর্জাতিক শ্রমদিবসরূপে পালিত হইয়া থাকে।)

চুইকোভ—আমাদের দেশে অবশ্যই আজ মহাছুটির দিন। তবে, আপনাদের ওখানে অবস্থা কি রকম, বলা বড় কঠিন।"(৬)

যে জার্মান সৈন্য ও সেনাপতিরা রাশিয়ার অভ্যন্তরে অত্যাচারের চূড়ান্ত করিয়াছে, তাদের পক্ষ থেকে রুশ পক্ষের সেনাপতি চুইকোভের সঙ্গে এভাবে যুদ্ধবিরতির কথা-বার্তা আরম্ভ করা একটা অদ্ভুত ব্যাপার ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া আলোচনা করা সত্ত্বেও ক্রেবস্ সুবিধা করিতে পারিলেন না কারণ, সোভিয়েত পক্ষ ফুয়ারের বাঙ্কার ও সমগ্র বার্লিনের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবি করিলেন।...

ক্রেবসের প্রত্যাবর্তনে দেরী দেখিয়া বোরম্যান ও গোয়েবেলস অত্যন্ত অস্থির বোধ করিতেছিলেন। বিশেষতঃ গোয়েবেলসের তখন সপরিবারে আত্মহত্যার সময় নিকটবর্তী হইতেছিল। সুতরাং বার্লিনের অবরুদ্ধ বাঙ্কার থেকে গোয়েবেলস্ অপরাহ্ণ ৩.১৫ মিনিটের (১লা মে) সময় শেষ রেডিও বার্তা এ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎসের নিকট পাঠাইলেন এবং তাঁকে "খুব গোপনে" জানাইয়া দিলেন যে, "ফুয়ার গতকল্য অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটায় মারা গিয়াছেন এবং ১৯শে এপ্রিলের টেষ্টামেণ্টের দ্বারা আপনাকে রাইখের প্রেসিডেণ্টের পদে নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। আপনি আপনার ইচ্ছানুযায়ী সমগ্র সৈন্যবাহিনী ও সংবাদপত্রের নিকট এই ঘোষণা প্রকাশ করিবেন।"

এই রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের পর গোয়েবেলস দম্পতী ১লা মে সন্ধ্যায় আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ফুয়ারের কুকুরগুলিকে যে ডাক্তার বিষযোগে হত্যা করিয়াছিলেন, সেই চিকিৎসকই গোয়েবেলসের ৬টি নিরপরাধ শিশু সন্তানকে (বয়স ১২, ১১, ৯, ৭, ৫ এবং ৩) বিষপ্রয়োগে নিধন করিলেন। সেই শিশুরা তখন নিশ্চিন্ত মনে বাঙ্কারের প্রাঙ্গণে খেলা করিতেছিল ! তারপর গোয়েবেলস্ দম্পতি বাঙ্কারের বাকী লোকজনদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী গোয়েবেলসের নির্দেশক্রমে বাঙ্কারের বাগানে এস এস বাহিনীর একজন সান্ত্রী পিছন দিক থেকে মাথায় গুলী করিয়া গোয়েবেলস্ দম্পতিকে হত্যা করিলেন। অতঃপর মৃতদেহ গুলির উপর পেট্রোল ঢালিয়া দিয়া এগুলিকে দাহ করার চেষ্টা করা হইল। কিন্তু দাহ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই রুশ সৈন্যেরা বাঙ্কার দখল করিয়া নিল এবং হিটলারের ভুবনবিখ্যাত প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলসের ও তাঁর পরিবারের দগ্ধ দেহাবশেষ তাদের হাতে ধরা পড়িল, যাদের সাবাড় করা সম্পর্কে গোয়েবেলস্ চার বছর ধরিয়া এত ক্রূর প্রোপাগাণ্ডা চালাইয়াছিলেন।......

১লা মে রাত্রিবেলা ফুয়ারের বাঙ্কারে যখন আগুন ধরিয়া গেল, তখন বাকী ৫।৬ শত (অধিকাংশই এস এস বাহিনীর) লোক সেই ভূগর্ভ থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করিল। মার্টিন বোরম্যান তখন 'চাচা আপন বাঁচা' নীতি অনুসারে বাঙ্কার থেকে মুক্ত হইয়া পালাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু হিটলারের ড্রাইভার কেম্পকার বিবৃতি অনুসারে দেখা যায় যে, বোরম্যান রুশদের নিক্ষিপ্ত গোলায় গুরুতর আহত

(৬) উইলিয়াম শাইরার, পৃষ্ঠা ১৩৪৮

হইয়া রাস্তার একটি সেতুর নীচে মরিয়া পড়িয়াছিলেন। (কিন্তু যুদ্ধের পর বোরম্যান সম্পর্কে দীর্ঘকাল এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, তিনি পালাইয়া দক্ষিণ আমেরিকায় চলিয়া গিয়াছিলেন।)

এদিকে জেনারেল ক্রেবসও চুইকোভের সঙ্গে আলোচনায় ব্যর্থ হইয়া অপরাহ্নে বাঙ্কারে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং তিনি ও জেনারেল বার্গডোর্ফ (হিটলারের পার্শ্বচর) পালাইবার চেষ্টা না করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।......

এভাবে হিটলারী জার্মানীর নেতৃত্ব হত্যায়, আত্মহত্যায়, অপমৃত্যুতে, পলায়নে, পরাজয়ে এবং হতাশায় ও বিদ্বেষে ছত্রভঙ্গ হইল এবং ভাঙ্গিয়া পড়িল কিন্তু তখনও সরকারীভাবে মিত্রপক্ষের নিকট জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ বাকী ছিল।

* * *

যুদ্ধ, চিরকালই নিষ্ঠুর, নির্মম এবং বর্বর। তবু, যুদ্ধ পরিচালনার নেতৃত্বের মধ্যে যদি কিছুটা আদর্শ, নীতিবোধ এবং ন্যায়ধর্ম থাকে, তবে বিজিত দেশের উপর অত্যাচার ও অনাচারের মাত্রা অনেকটা কম হইয়া থাকে। কিন্তু ফ্যাসিষ্ট যুদ্ধযাত্রায় নীতি ও নিয়মকানুনের বালাই মাত্র ছিল না। ফলে হিটলারী ফ্যাসিষ্টচক্র পোলাণ্ডে, সোভিয়েত রাশিয়ায় এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধে (অন্যান্য দেশেও বটে) যে অমানুষিক এবং জঘন্যতম অপরাধ ও অত্যাচার করিয়াছিল ইতিহাসে তার কোন তুলনা ছিল না। লালফৌজকে এই নিদারুণ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া আসিতে হইয়াছিল। সুতরাং ১৯৪৫ সালে পতনোন্মুখ জার্মান ভূমিতে লাল ফৌজের প্রবেশের আগে সোভিয়েত নেতৃত্বকে এই দিকটা বিশেষ ভাবে চিন্তা করিতে হইয়াছিল। সোভিয়েত বাহিনীর অন্যতম খ্যাতিমান এবং প্রতিভাবান সেনাপতি মার্শাল রকোসোভস্কি লিখিয়াছেন যে, তাঁর ফ্রন্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মিলিটারি কাউন্সিল উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সোভিয়েত রাশিয়ার অধিকৃত এলাকাগুলিতে নাৎসী সৈন্যদের ভয়াবহ অত্যাচারের জন্য লালফৌজের সৈন্যেরা স্বভাবতঃই ক্রুদ্ধ এবং প্রতিশোধ গ্রহণে উন্মুখ ছিল। কিন্তু এই ক্রোধ ও ঘৃণা যাতে সমগ্র জার্মান জাতির বিরুদ্ধে অন্ধ বিদ্বেষ ও প্রতিশোধে পরিণত না হয়, সেদিকে নজর দিতে হইবে। সুতরাং আমাদের প্রচার করিতে হইল যে, 'আমাদের যুদ্ধ হিটলারের আর্মির বিরুদ্ধে, জার্মানীর সমস্ত অ-সামরিক জনগণের বিরুদ্ধে নয়। এবং যখন আমাদের সৈন্যেরা জার্মানীর সীমান্ত অতিক্রম করিল, তখন ফ্রন্টের মিলিটারি কাউন্সিল সৈন্য ও সেনাপতিদের উদ্দেশ্যে এক অভিনন্দন বাণীতে এই নির্দেশনামা জারী করিলেন যে, জার্মানীতেও আমরা মুক্তিফৌজ হিসাবে প্রবেশ করিতেছি। রেড আর্মি জার্মানীতে আসিয়াছে জার্মান জনগণকে নাৎসী চক্রান্ত ও বিষদুষ্ট প্রোপাগাণ্ডা থেকে উদ্ধারের জন্য। সুতরাং মিলিটারি কাউন্সিল সমস্ত সেনাপতি ও সৈন্যদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানাইতেছেন সোভিয়েত বাহিনীর উচ্চতম শৃঙ্খলা ও মর্যাদা রক্ষা করার জন্য।"(৭)

(৭) A Soldier's Duty—Rokossovosk y. Moscow, 1970, P. 288

রকোসোভোস্কি অতঃপর লিখিয়াছেন যে, আমাদের সৈন্যদের নিকট এই 'মুক্তি মিশনের' (Mission of liberation) উদ্দেশ্য অনবরত প্রচার ও ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছিল এবং 'আমি অবশ্যই স্বীকার করিব যে, আমাদের সৈন্যেরা জার্মান ভূমিতে সত্যকার মানবিক দয়া ও উদারতা দেখাইয়াছিলেন।'

অবশ্য মস্কোর খাস সদর দপ্তর হইতেও সৈন্য ও সেনাপতিদের উপর এই মর্মে এক নির্দেশ আসিল যে, জার্মান জনগণের সঙ্গে মানবিক আচরণ করিতে হইবে। এবং ওডের ও নেইসী নদীর পশ্চিমে জার্মানদের দ্বারা পরিচালিত সরকারের প্রতিষ্ঠা দিতে হইবে। (৮)

এখানে আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সোভিয়েত সাহিত্যিক ইলিয়া এরেনবুর্গ এবং অন্যান্য কয়েকজন লেখক জার্মানদের পাশবিকতার বিরুদ্ধে নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য যে নিদারুণ উত্তেজনাপূর্ণ প্রোপাগাণ্ডা চালাইয়া আসিতেছিলেন, উচ্চতর কর্তৃপক্ষের আদেশে ১৪ই এপ্রিল থেকে তা'ও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং এরেনবুর্গের এই সমস্ত লেখা নিয়ে তীব্র বিতর্কেরও সৃষ্টি হইয়াছিল।

বলাৎকারের কাহিনী

কিন্তু সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর মর্যাদা, নৈতিক মান এবং উচ্চতম শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সামরিক কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে যত উপদেশ ও নির্দেশই দেওয়া হইয়া থাকুক না কেন, জার্মান ভূমিতে প্রবেশের প্রথম উত্তেজনায় রুশ সৈন্যদের অনেকেই সেই সমস্ত উপদেশ ও নির্দেশ ভুলিয়া গেলেন এবং জার্মান সৈন্যেরা রাশিয়াতে ও অন্যত্র যে সমস্ত ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিয়াছিল, সেগুলি তাঁরা স্মরণ করিলেন। ফলে, জার্মান ভূমিতে আক্রমণের গোড়ার দিকে তাঁরা কোন কোন এলাকার ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি, এমন কি গোটা শহর পর্যন্ত জ্বালাইয়া দিলেন ও লুটপাট করিলেন। আর বহু নারীর উপর বলাৎকার এবং অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।—এই সমস্ত কথা লিখিয়াছেন স্বয়ং আলেকজান্দার ওয়ার্থ, রুশ-জার্মান যুদ্ধে যাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল অপরিসীম এবং যাঁর পুস্তক নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণিক। (৯)

মিঃ ওয়ার্থের নিকট একজন রাশিয়ান মেজর স্বীকার করিয়াছেন যে, অনেক জার্মান স্ত্রীলোকের উপর রুশ সৈন্যেরা বলাৎকার করিয়াছিল ঠিকই, তবে একথাও সত্য যে, জার্মান মেয়েদের অনেকেই ধরিয়া লইয়াছিল যে, 'এবার রুশদের পালা", সুতরাং বাধা দিয়া কোন লাভ নাই! বরং তারা যেন এজন্য প্রস্তুতই ছিল। প্রায় চার বছর ধরিয়া রেড আর্মির লোকেরা যৌন ক্ষুধায় কাতর ছিল। অবশ্য অফিসারদের, বিশেষ ভাবে ফিল্ড-অফিসারদের তেমন কোন অসুবিধা ছিল না। কেন না, তাঁদের হাতের কাছেই কোনও না কোন 'ফিল্ড-ওয়াইফ'—যেমন সেক্রেটারি, টাইপিষ্ট বা নার্স ইত্যাদি সহজলভ্য ছিল। কিন্তু সাধারণ সৈন্যদের তেমন সুযোগ ছিল না।...

---

(৮) গ্রেট প্যাট্রিয়টিক ওয়ার অব্ দি সোভিয়েত ইউনিয়ন—পৃষ্ঠা ৫৮৩

(৯) Russia At War (1941—1945)—Alexander Werth. Pan Books Ltd, 1965, London—p. 863

এমন ঘটনাও ঘটেছে যেখানে আমাদের যৌন উপবাসী সৈন্যেরা ৬০।৭০ বছরের বৃদ্ধাদের উপরেও বলাৎকার করিয়াছে। এ বিষয়ে কাজাক ও অন্যান্য এশিয় টিক্ সৈন্যদের রেকর্ড' সবচেয়ে খারাপ। (১০)

পরে এই সমস্ত বিষয় নিয়া মিঃ আলেকজান্দার ওয়ার্থ যখন মার্শাল শোকোলো ভস্কির মত পদস্থ সামরিক নেতার সঙ্গে আলোচনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি জবাব দিয়াছিলেন—"হাঁ, অনেক নোংরা জিনিস ঘটেছিল। কিন্তু আপনারা কি আশা করেন?- আপনি নিশ্চয়ই জানেন জার্মানরা রুশ যুদ্ধবন্দীদের উপর কি কাণ্ড করেছিল, কি ভাবে আমাদের দেশকে ধ্বংস ও লুঠ এবং লোকজনকে হত্যা ও মেয়েদের উপর বলাৎকার করেছিল? মৈদানেক কিংবা আউশেভিৎস বন্দীশিবিরগুলি কি আপনি দেখেছেন? আমাদের প্রত্যেকটি সৈন্যের ডজন ডজন কমরেড মারা পড়েছে। সুতরাং তাদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগতভাবে জার্মানদের সঙ্গে কিছু হিসাব নিকাশ মিটাবার দরকার ছিল। অতএব জয়লাভের প্রথম উল্লাসে আমাদের সৈন্যরা কিছু কিছু জার্মান নারীর জীবন উত্যক্ত করে তোলার মধ্যে কিছুটা আত্মতৃপ্তি খুঁজে পেয়েছিল। তবে, এখন (অর্থাৎ জুন, ১৯৪৫) আর সেই অবস্থা নেই এবং একথাও সত্য যে, জার্মান স্ত্রীলোকদের সকলেই অক্ষতযোনী কুমারী ছিল না।" (১১)

পশ্চিমের আরও কোন কোন লেখক অধিকৃত বার্লিন ও জার্মানীতে এবং অন্যত্র রুশসৈন্যদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ও অনাচারের কথা বিশেষ জোরের সঙ্গেই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এদের লেখার মধ্যে অতিরঞ্জনের বিশেষ সম্ভাবনা। কেননা, এরা প্রায় সকলেই সোভিয়েত-বিরোধী এবং বার্লিন লালফৌজের দখলে যাওয়ায় এদের ক্ষোভেরও সীমা ছিল না। সুতরাং বিজয়ী সোভিয়েত রাশিয়ার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার জন্য এরা বেশ কৌশলে নিন্দা রটনা করিয়াছেন। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট লেখক কর্নেলিয়াস রায়ান তাঁর একটি জনপ্রিয় সামরিক গ্রন্থের গোড়াতেই লিখিয়াছেন:

"প্রায় ছয় বছর যুদ্ধের পর বার্লিন মূলতঃ নারীপ্রধান শহরে পরিণত হইয়াছিল এবং এই শহরের উপর যৌন আক্রমণের আশঙ্কা কালোছায়া বিস্তার করিয়া রহিল।"

অর্থাৎ লেখক কৌশলে সোভিয়েতের সুনাম হ্রাস করার জন্য বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, বার্লিনের উপর লালফৌজের আক্রমণ যেন "যৌন আক্রমণের" সমান বিপজ্জনক

অতঃপর মিঃ রায়ান উল্লেখ করিয়াছেন যে, ১৯৩৯ সালে যুদ্ধারম্ভের সময় বার্লিনের লোক সংখ্যা ছিল ৪৩ লক্ষ ২১ হাজার। কিন্তু যুদ্ধের জন্য সেই সংখ্যা কমিতে কমিতে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াইল ২৭ লক্ষে এবং এর মধ্যে ২০ লক্ষই ছিল স্ত্রীলোক। অপর

(১০) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৮৬৩
(১১) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৮৮১

পক্ষে পূর্বদিক থেকে দলে দলে—মোট প্রায় ৫ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী সোভিয়েত অধিকৃত এলাকাগুলি থেকে বার্লিনের দিকে পালাইয়া আসিতেছিল এবং তাদের অধিকাংশই বার্লিন ছাড়িয়া পশ্চিম দিকে ছুটিতেছিল। এই সমস্ত উদ্বাস্তু নরনারী সোভিয়েতের বিরুদ্ধে ভয়াবহ কাহিনী ও গুজব প্রচার করিতে লাগিল এবং সেই সমস্ত গুজব মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িলে বার্লিনে ত্রাসের সৃষ্টি হইল। (১২)

অবশ্য রুশ সৈন্য সম্পর্কে এই ত্রাস সৃষ্টির জন্য তিনি রাশিয়াতে এবং বিভিন্ন বন্দী-নিবাসে জার্মানদের ভয়াবহ অত্যাচারকেও দায়ী করিয়াছেন। মিঃ রায়ান লিখিয়াছেন :

Their terror of the Russians was often intensified by a certain guilty knowledge. Some Germans, at least, knew all about the way German troops had behaved on Soviet soil, and about the terrible and secret atrocities committed by the Third Reich in concentration Camps. Over Berlin, as the Russians drew closer, hang a night-marish fear unlike that experienced by any city since the razing of Carthage. (১৩)

সোভিয়েত-বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও মিঃ রায়ান জার্মানদের ভয়াবহ অত্যাচার, এবং রুশদের উপর তার প্রতিক্রিয়ার কথা কিংবা "জার্মানদের অপরাধ বোধের" কথা গোপন করিতে পারেন নাই। তবু তিনি তাঁর পুস্তকের বহু জায়গায় রুশ সৈন্য কর্তৃক জার্মান নারীদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বহু কাহিনী (৪৫৩ থেকে ৪৬৩ পৃষ্ঠা) বর্ণনা করিয়াছেন এবং পুস্তকের একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় নিজেই প্রশ্ন করিয়াছেন—কত নারীর উপর বলাৎকার করা হইয়াছিল এবং নিজেই জবাব দিয়াছেন যে, নির্দিষ্ট সংখ্যা কেউ বলিতে পারে না। ডাক্তারদের মতে ২০ হাজারও হইতে পারে, আবার এক লক্ষও হইতে পারে।

মিঃ রায়ান তাঁর ঘটনাবলীর বর্ণনায় আত্মপক্ষ সমর্থনে ৪৬৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় সোভিয়েত মতামত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁর মতে সোভিয়েত ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করিয়াছেন যে, বার্লিনের পতনের সময় রুশ সৈন্যেরা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলিয়া গিয়াছিল এবং বলাৎকার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ওডের নদী পর্যন্ত সোভিয়েত বাহিনীর অগ্রগতির পথে যে সমস্ত বন্দীশিবির মুক্ত করা হইয়াছিল, প্রাক্তন যুদ্ধ-বন্দীরা তাদের উপর অত্যাচারের বদলা নিয়াছিল। সামরিক বাহিনীর পত্রিকা 'রেড ষ্টার'-এর সম্পাদক স্বয়ং গ্রন্থকারের নিকট স্বীকার করিয়াছেন যে, আমাদের সৈন্যেরা শতকরা ১০০ ভাগ ভদ্রলোক হইতে পারেন নাই স্বাভাবিক কারণেই। কারণ,

(১২) The last Battle—Cornelius Ryan, Pocket Books.New York, 1967, p. 15

(১৩) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা, ৩২৮

আমরা এত বেশী অত্যাচার দেখিয়াছিলাম যে, তা অবর্ণনীয়। সোভিয়েতের অপর একজন সাময়িক পত্র সম্পাদক বলিয়াছেন যে, জার্মানরা রাশিয়াতে যে বর্বরতা করিয়াছিল, তার তুলনায় আমরা কিছুই করি নাই! যুগোশ্লাভিয়ায় লালফৌজের সৈন্যদের অত্যাচার নিয়া যুগোশ্লাভ মিলিটারি প্রতিনিধি মিলোভান জিলাস (Milovan Djilas) স্ট্যালিনের নিকট অভিযোগ করিলে স্ট্যালিন নাকি জবাব দিয়াছিলেন: 'আপনারা এটা কেন বুঝতে পারেন না যে, যদি কোন সৈন্যকে হাজার হাজার কিলোমিটার রক্ত ও আগুনের ভিতর দিয়া যেতে হয়, তবে, সে কোনস্ত্রীলোক নিয়া মজা করবে, এটা এমন কি গুরুতর ব্যাপার?'

অপর পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর একজন জগদ্বিখ্যাত সামরিক গ্রন্থকার উইলিয়ম শাইরার তাঁর 'এণ্ড অব এ বার্লিন ডাইরি' নামক পুস্তকে এই বিষয় নিয়া তেমন কিছু গুরুত্ব আরোপ করেন নাই—যদিও তিনি ওয়াশিংটনে, নিউইয়র্কে, লণ্ডনে এবং প্যারিসে রুশসৈন্যদের বলাৎকারের অনেক গল্প শুনিয়াছিলেন। পরে তিনি ইউরোপে গিয়া নিজে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, বুদাপেষ্টে বেশ কিছু সংখ্যক খারাপ কাজ ঘটিয়াছিল। কিন্তু বার্লিনে তেমন কিছু গুরুতর ঘটিয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। তবে যে কোন দেশেই সৈন্যেরা যুদ্ধ জয় করিলে কিছু কিছু বলাৎকার ঘটিয়া থাকে। 'আমাদের নিজেদের (অর্থাৎ আমেরিকার) সৈন্যেরাও কোন কোন সময় তেমন কাজ করিয়াছে।' কিন্তু জার্মানরা সোভিয়েত রাশিয়াতে যে ভয়াবহ কাণ্ড করিয়াছে, রুশ সৈন্যদের পক্ষে সেটা সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাওয়া কঠিন। ক্রমাগত দুই তিন বছর ধরিয়া যারা রণক্ষেত্রে লড়াই করিয়াছে এবং বহু জীবনের মূল্যে যারা বার্লিন দখল করিয়াছে তাদের সম্পর্কে এ কথা মনে রাখিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, রুশ সৈন্যদের দ্বারা অনুষ্ঠিত বলাৎকারের সংখ্যা সাধারণ গড়পড়তা হিসাবের উর্ধ্বে ছিল না।

মিঃ শাইরার অতঃপর লিখিয়াছেন যে, তাঁর সঙ্গে মাত্র একজন জার্মান স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং সে নিজেই বলাৎকারের কথা স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু তার জন্য সে খুব দুঃখিত বলিয়া মনে হইল না! (১৪)

এই সমস্ত মন্তব্য থেকে বুঝা যাইতেছে যে, যাঁরা ঘোরতর সোভিয়েত-বিরোধী তাঁরাই লালফৌজের বিরুদ্ধে বেশী নিন্দা রটনার চেষ্টা করিয়াছেন।

*　　*　　*

বার্লিন ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। শহরে খাদ্য, বিদ্যুৎ, উত্তাপ, জল ও গ্যাস এবং রেলওয়ে ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদি কিছুই ছিল না। অপর পক্ষে মৃত মানুষ ও মৃত পশুর দুর্গন্ধে আবহাওয়া ভারী ছিল। উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থারও অত্যন্ত অভাব ছিল। কিন্তু সেই শোচনীয় অবস্থার মধ্যেও সোভিয়েত মিলিটারি কর্তৃপক্ষ যথাসম্ভব জার্মান নাগরিকদের জন্য খাদ্য ও সেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। (১৫)

(১৪) End of a Berlin Diary—William L Shirer, p. 139.

(১৫) দি গ্রেট মার্চ অব লিবারেশন, পৃষ্ঠা ২৭৭

বৃটিশ সামরিক লেখক ও গ্রন্থকার মেজর জেনারেল স্যার চার্লস গাইন (Charles Gwynn) বার্লিন যুদ্ধে সোভিয়েত সেনাপতি ও সৈন্যদের রণকৌশল ও রণনীতির উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, ওডের নদীতীর থেকে মার্শাল জুকোভ যেরূপ দ্রুতগতিতে বার্লিনের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তা' বিস্ময়কর। ২৫শে এপ্রিলের মধ্যে জুকোভ ও মার্শাল কোনিয়েভ পটসডামের উত্তর-পশ্চিমে পরস্পরের সহিত হাত মিলাইলেন এবং বার্লিনকে সম্পূর্ণ ঘিরিয়া ফেলিলেন। মিত্রপক্ষের সঙ্গে সোভিয়েত বাহিনীর পূর্ব-পশ্চিমে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। উত্তর দিকে মার্শাল রকোসোভস্কিও দ্রুত জয়লাভের দ্বারা আগাইয়া যাইতেছিলেন এবং পলায়মান জার্মান সৈন্যেরা রুশদের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে জেনারেল মণ্টগোমারীর অফিসারদের কাছে গিয়া আত্মসমর্পণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু বৃটিশপক্ষ রাজী হইলেন না।...

বার্লিন যুদ্ধে মার্শাল জুকোভের অধীন রেড আর্মি মার্শাল কোনিয়েভের সহযোগিতায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ২রা মে মার্শাল স্ট্যালিন মস্কো থেকে প্রচারিত এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করিলেন—"জার্মানীর রাজধানী ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদের মর্মকেন্দ্র এবং জার্মান আক্রমণের উৎস বার্লিনের সম্পূর্ণ পতন ঘটিয়াছে। বার্লিন দুর্গের জার্মান অধিনায়ক ও গোলন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি জেনারেল উইডলিং (Weidling) তাঁর ষ্টাফসহ অপরাহ্ন ৩টায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। রাত্রি ৯টার মধ্যে আমাদের সৈন্যেরা বার্লিনে ৭০ হাজার জার্মান সৈন্যকে বন্দী করিয়াছেন। তার আগেই আরও লক্ষাধিক সৈন্য বার্লিন যুদ্ধে ধরা পড়িয়াছে।" ...মার্শাল স্ট্যালিন ও মার্শাল জুকোভের কাছে এটা ব্যক্তিগত জয়ের মত। কিন্তু রাশিয়ার জনগণের কাছে, যাদের দেশ ধ্বংস এবং অজস্র পরিবার নিশ্চিহ্ন বা বন্দী হইয়াছিল, তাদের কাছে বার্লিনের এই পতন আরও অনেক বেশী গুরুত্বব্যঞ্জক ছিল। (১৬)

কিন্তু বার্লিনের এই চূড়ান্ত যুদ্ধে সামরিক ও অ-সামরিক কত লোক বিনষ্ট হইয়াছিল?—মার্কিন গ্রন্থকার কর্নেলিয়াস রায়ান বলিয়াছেন যে, এর সঠিক জবাব দেওয়া কঠিন। কারণ, যুদ্ধাবসানের বিশ বছর পরেও ধ্বংসস্তূপ, বাগান ও পার্কের ভূগর্ভ থেকে মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইতেছে। তবে, সমস্ত সংখ্যাতত্ত্বের হিসাব মিলাইয়া মনে হয় যে, বার্লিনের যুদ্ধে প্রায় এক লক্ষ সিভিলিয়ান বা অ-সামরিক ব্যক্তি প্রাণ হারাইয়াছিল। অন্ততঃ ২০ হাজার লোক হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা পড়িয়াছিল। প্রায় ৬ হাজার লোক আত্মহত্যা করিয়াছিল। বাকীরা গোলাগুলির বর্ষণে সোজা নিহত কিংবা রাস্তার লড়াইতে আহত হইয়া মারা পড়িয়াছিল। শেষের দিনগুলিতে বার্লিন থেকে যারা পালাইয়া গিয়াছিল, কিংবা জার্মানীর অন্যত্র মারা পড়িয়াছিল তাদের সঠিক সংখ্যা পাওয়াও কঠিন। একমাত্র বোমাবর্ষণেই ৫২ হাজার লোক নিহত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান। যদি এই সংখ্যা ঠিক হইয়া থাকে, তবে, অ-সামরিক নিহতের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫০ হাজারের বেশী। কিন্তু বার্লিনের যুদ্ধে জার্মানীর সামরিক হতাহতের সংখ্যা নির্ণয় করা আরও কঠিন। কারণ এই সংখ্যাটি জার্মানীর

(১৬) The Second Great War—Vol. 9. p, 3722

যুদ্ধের সমগ্র হতাহতের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তবে বার্লিন যুদ্ধে জুকোভ ও কোনিয়েভের মিলিত বাহিনীর নিহতের সংখ্যা অন্ততঃ ১ লক্ষ।—(১৭)

কিন্তু সোভিয়েত পক্ষের মতে বার্লিন যুদ্ধে তিন ফ্রন্টের (জুকোভ, কোনিয়েভ ও রকোসোভস্কি) একত্রে মোট ৩,০৪,৮৮৭ জন সৈন্য হতাহত ও নিখোঁজ হইয়াছিল—নিখোঁজ হইয়াছিল তারা, যারা বাড়ীঘরের ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়িয়াছিল কিংবা নদী পার হইতে গিয়া ডুবিয়া মরিয়াছিল। জার্মানরা রুশদের ২,১৫৬টি ট্যাঙ্ক ও ট্যাঙ্কের স্বয়ংচালিত কামান জখম বা ধ্বংস করিয়াছিল। ১,২২০টি কামান ও মর্টার চূর্ণ এবং ৫২৭টি বিমান খতম করিয়াছিল।

অত্যন্ত সাহসিকতাপূর্ণ এবং প্রভূত রক্তক্ষয়ী এই যুদ্ধে লালফৌজের সৈন্যেরা দগ্ধ বার্লিন নগরীতে অনেক মনুষ্যত্বেরও পরিচয় দিয়াছিলেন। একটি চারতলা জ্বলন্ত অট্টালিকার মধ্যে শিশুদের আর্ত ক্রন্দন শুনিতে পাইয়া কয়েক জন রুশসৈন্য তাঁদের জীবন বিপন্ন করিয়া সেই শিশুদেরকে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। (১৮)

অর্থাৎ যে বার্লিনে ফ্যাসিষ্টরা মনুষ্যত্বের চরম সমাধি: ঘটাইয়াছিল, সেখানে বিজয়ী লালফৌজ মানবতার ও জীবনের নতুন প্রতিষ্ঠা দিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

(১৭) The Last Battle, p. 490.

(১৮) The Great March of Liberation, p.272 73

নবম পর্ব

অষ্টম অধ্যায়

জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ

একমাত্র ১৯৪৫ সালের কয়েক মাসেই সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে জার্মান বাহিনীর ১০ লক্ষেরও অধিক সৈন্য নিহত হইল। লালফৌজ ৭৮ ডিভিসন শত্রুসৈন্য ধ্বংস করিল এবং বন্দী করিল ৬ ডিভিসন, যখন যুদ্ধবিরতি ঘটিল তখন আরও ৯৩ ডিভিসন সৈন্য আত্মসমর্পণ করিল। প্রবল পরাক্রমশালী নাৎসী বাহিনীর সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ এভাবে নষ্ট হইয়া গেল; নাৎসী জার্মানীর বিশাল সামরিক সংগঠন, গবর্ণমেন্ট এবং পার্টি অচল অবস্থায় পড়িল।

হিটলারের উত্তরাধিকারী ডোয়েনিৎস সরকার নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ এড়াইবার এবং পশ্চিমদিকে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের নিকট যত বেশী সম্ভব জার্মান সৈন্যের আত্মসমর্পণ ঘটাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্যর্থ হইল।

উত্তর ইতালীতে ২৯ এপ্রিল, ১৯৪৫, জার্মান বাহিনী আত্মসমর্পণ করিল। অন্যান্য রণাঙ্গনের আগেই শত্রুবাহিনী এখানে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল উত্তর ইতালীর পার্টিজান ও ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী মুক্তিকামী জনগণের তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য—যাঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন কমিউনিষ্টরা। (১)

চার্চিলের বিবরণীতে প্রকাশ যে, উত্তর ইতালীতে এপ্রিল মাসে জার্মান বাহিনীর অবস্থান খুব খারাপ হইয়া পড়িল এবং ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর—বিশেষভাবে ফিল্ড মার্শাল আলেকজান্ডারের বৃটিশ সৈন্যদলের জয়যাত্রা শুরু হইল। ২৯ এপ্রিল, ১৯৪৫, বলোগনার (Bologna) পতন হইল এবং পো নদীর যুদ্ধে জার্মানীর বিপর্যয় ঘটিল। তখন উত্তর ইতালীর জার্মান সৈন্যেরা যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু মিত্রপক্ষ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবি করিলেন। জার্মান বাহিনীর পক্ষ থেকে দুইজন প্রতিনিধি তাতে সাড়া দিলেন এবং ২৯শে এপ্রিল তারিখ বৃটিশ সদর দপ্তরে ইঙ্গ-মার্কিন ও সোভিয়েত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে জার্মান পক্ষ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর দিলেন। প্রায় ১০ লক্ষ জার্মান সৈন্য ধরা পড়িল এবং ইতালীয় যুদ্ধে শেষ হইয়া গেল। (চার্চিল, ষষ্ঠ খণ্ড)।

* * *

১লা মে, ১৯৪৫, জার্মানীর হাম্বুর্গ রেডিও থেকে অর্ধসত্য ও অর্ধমিথ্যা মিশানো এই মর্মে একটি বিবৃতি প্রচার করা হইল যে, "আমাদের ফুয়ার এ্যাডলফ হিটলার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বলশেভিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া আজ অপরাহ্নে রাইখ চ্যান্সেলারির সামরিক সদর দপ্তরে জার্মানীর জন্য জীবন বিসর্জন দিয়াছেন। (অথচ হিটলার কিন্তু আগের দিন ৩০শে এপ্রিল তাঁর ভূগর্ভের বাঙ্কারে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। এ কথাটি হাম্বুর্গ রেডিওতে গোপন করা হইল।)

এরপর এ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস জার্মান নরনারী এবং সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর

(১) Great Patriotic war of the Soviet Union, p 392.

উদ্দেশ্যে ঘোষণা করিলেন—"আমাদের ফুয়ার এ্যাডলফ হিটলার তাঁর জীবনদান করেছেন। জার্মান জনগণ গভীরতম শোকে ও শ্রদ্ধায় তাঁর উদ্দেশ্যে মাথা নত করেছেন···ফুয়ার আমাকে তাঁর উত্তরাধিকারী পদে নিয়োগ করে গেছেন। যে বিপুল দায়িত্ব আমার ঘাড়ে এলো, সে সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন হয়ে আমি জার্মান জাতির এই সন্ধিক্ষণে তাঁদের নেতৃত্ব গ্রহণ করছি।···"

ঐ দিনই জার্মান সশস্ত্রবাহিনীর উদ্দেশ্যে এক নির্দেশনামায় এ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস আবার ঘোষণা করিলেন—

"ফুয়ার আমাকে রাষ্ট্রের প্রধান নায়ক ও সুপ্রীম কমাণ্ডারের পদে নিয়োগ করেছেন।···আমি বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে কৃতসংকল্প। যতদিন পর্যন্ত বলশেভিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ আমাকে বাধা দেবেন, ততদিন তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেও আমি বাধ্য। ফুয়ারের নিকট আপনাদের প্রত্যেকের যে শপথ ছিল, ফুয়ারের নিযুক্ত তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে এখন থেকে সেই শপথ সোজাসুজি ব্যক্তিগতভাবে আমার উপর বর্তাবে।

'জার্মান সৈনিকবৃন্দ, আপনাদের কর্তব্য পালন করুন! আমাদের জাতির অস্তিত্ব এখন বিপন্ন।'

এ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস পরাজয়ের সেই অন্ধকারেও সোভিয়েত-বিদ্বেষ ভুলিতে পারেন নাই এবং তখনও তিনি অন্যান্য জার্মান নেতাদের মতই মিত্রপক্ষ ও রাশিয়ার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছিলেন। ২রা মে, ১৯৪৫, ডোয়েনিৎস তাঁর তথাকথিত গবর্নমেণ্ট ও সদর দপ্তর প্লোন (Plon) থেকে জার্মান-ডেনমার্ক সীমান্তবর্তী পুরাতন শহর ফ্লেন্সবুর্গে স্থানান্তরিত করিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, চার্চিল ও বৃটিশ পক্ষ ফ্লেন্সবুর্গের এই নাৎসী 'গবর্নমেণ্টকে' কয়েক দিনের জন্য পৃষ্ঠপোষকতাও করিয়াছিলেন। কারণ, যুদ্ধ যতই সরকারীভাবে সমাপ্তির দিকে যাইতেছিল রাশিয়ার প্রতি চার্চিলের বিরূপতাও ততই প্রকাশ পাইতেছিল। সোভিয়েত পক্ষ স্বভাবতই এজন্য খুব ক্ষুব্ধ ছিলেন। এই ক্ষোভ একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না। কেন না, নাৎসী নেতাদের মত মিত্রপক্ষের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীও জার্মানীর বিরুদ্ধে রাশিয়ার এই জয়লাভে অত্যন্ত অপ্রসন্ন ছিলেন এবং ইউরোপের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও মিত্রপক্ষের দিক থেকে জার্মানীর সঙ্গে পৃথক সন্ধি স্বাক্ষরের কোন অনুকূল অবস্থা ছিল না। কেননা, ১৯৪৫ সালের বসন্ত কালে রুজভেল্টের সঙ্গে জেনারেল আইজেনহাওয়ারের যে সমস্ত 'গোপন চিঠির' বিনিময় হইয়াছিল, তাতে আইজেনহাওয়ার লিখিয়াছিলেন যে, পশ্চিমের সৈন্যবাহিনীর তুলনায় সোভিয়েত সশস্ত্রবাহিনী অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। সুতরাং রাশিয়াকে বাদ দিয়া জার্মানীর সঙ্গে পৃথক চুক্তি স্বাক্ষরের প্রশ্ন উঠে না। ওদিকে বৃটিশ পক্ষের জেনারেল মণ্টগোমারীও আইজেনহাওয়ারের অনুরূপ মত পোষণ করিতেন। (মণ্টগোমারীর স্মৃতিকথার ৩৮০ পৃষ্ঠায় এর স্বীকৃতি আছে)। তারপর আমেরিকার পক্ষে আর একটি গুরুতর প্রশ্ন ছিল। কেননা, জাপানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধ তখনও বাকী ছিল এবং সেই যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার সহ যাগিতার প্রয়োজন ছিল (২)

(২) The Anti-Hitler Coalitioz—p. 377.

২রা মে, ১৯৪৫, ডোয়েনিৎস তাঁর নূতন দপ্তর থেকে এ্যাডমিরাল ফ্রাইডবুর্গকে (Friedeburg) ফিল্ড মার্শাল বার্নার্ড মণ্টগোমারীর নিকট যুদ্ধ বিরতির আলোচনার জন্য পাঠাইলেন এবং এই মর্মে এক প্রস্তাব পেশ করিলেন যে, পশ্চিম দিকে জার্মানী আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু পূর্ব দিকে যথারীতি যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া হইবে।

মণ্টগোমারী এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। অধিকন্তু সমস্ত ফ্রণ্টে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবি করিলেন। তবে, ৪মে তারিখে একটি চুক্তি অনুসারে নেদারল্যাণ্ডস, উত্তর-পশ্চিম জার্মানী, শ্লেসভিগ, হলস্টিন এবং ডেনমার্কের জার্মান সৈন্যেরা বৃটিশ সৈন্য বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করিল এবং ব্যাভেরিয়ার দিকেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটিল।

অতঃপর ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের যবনিকাপাত আরও ঘনাইয়া আসিল। ৭মে, ১৯৩৫ রাত্রি ২টা ৪১ মিনিটের সময় ডোয়েনিৎস সরকার প্রেরিত জার্মান প্রতিনিধিগণ মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে যুদ্ধাবসানের এক প্রাথমিক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিলেন। পশ্চিমের সুপ্রীম কমাণ্ডার জেনারেল আইজেনহাওয়ারের রেইমস্ (ফ্রান্স) শহরস্থিত সদর কার্যালয়ে একটি সাধারণ কালো রঙের টেবিলের একপাশে সামরিক ইউনিফর্ম পরিহিত তিনজন জার্মান প্রতিনিধি নাৎসী নৌবহরের প্রধান সেনাপতি এ্যাডমিরাল ফ্রাইডবুর্গ, জার্মান জেনারেল ষ্টাফের প্রধান ফিল্ডমার্শাল আলফ্রেড জড্‌ল (হিটলারের ঘনিষ্ঠতম সহযোগীদের অন্যতম) এবং তাঁর সহকারী মেজর-জেনারেল উইলহেলম অক্সেনিয়াস (Oxenius) আসন গ্রহণ করিলেন।

আর মিত্রপক্ষের তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন বৃটেনের লেঃ জেনারেল স্যার ফ্রেডরিক মরগ্যান, ফ্রান্সের জেনারেল ফ্রাঁকয় সেভেজ (Francois Sevez), মিত্র নৌবহরের প্রধান এ্যাডমিরাল স্যার এইচ এম বারোঘ (Burrough), আইজেনহাওয়ারের প্রতিনিধি লেঃ জেনারেল বেডেল স্মিথ, মার্কিন বিমান বহরের জেনারেল কার্ল স্পাজ (Carl Spaatz) এবং সোভিয়েত পক্ষের লেঃ জেনারেল আইভ্যান চেরমিয়েভ এবং জেনারেল আইভ্যান সুশলাপ্যারোভ।

কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই অনুষ্ঠানে আইজেনহাওয়ার স্বয়ং কিংবা তাঁর ডেপুটি এয়ার চীফ মার্শাল স্যার আর্থার টেডার উপস্থিত ছিলেন না। তাঁরা তখন অন্য একটি অফিসে ছিলেন।

বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও রাশিয়া এই চতুঃশক্তির পক্ষ থেকে চারটি পৃথক দলিল তৈরী হইয়াছিল এবং দলিল চারটি চার মিনিটের মধ্যে স্বাক্ষরিত হইয়া গেল। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ দলিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সোজা ভাষায় লেখা ছিল :

"আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিগণ জার্মান হাইকমাণ্ডের কাছ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া এতদ্বারা মিত্রপক্ষীয় অভিযাত্রী বাহিনীর সুপ্রীম কমাণ্ডার এবং সেই একই সঙ্গে সোভিয়েত হাই কমাণ্ডের নিকট জল, স্থল ও বিমানবাহিনী সহ (যারা এই মুহূর্তে জার্মানীর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রহিয়াছে) নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করিতেছি।"

দলিল স্বাক্ষরের পর ফিল্ড মার্শাল আলফ্রেড জড্‌ল জার্মানদের পক্ষ থেকে কিছু বলিবার জন্য অনুমতি চাহিলেন এবং লেঃ জেনারেল বেডেল স্মিথ মাথা নাড়িয়া অনুমতি দিলে জড্‌ল প্রায় কান্নার সুরে বলিলেন।

"এই দলিল স্বাক্ষরের দ্বারা জার্মান জনগণ ও সশস্ত্রবাহিনী, ভালো হোক বা মন্দ হোক, বিজয়ী পক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। পাঁচ বছরের অধিক কাল যে যুদ্ধ চলিয়াছিল, সেই যুদ্ধে উভয় পক্ষ সম্ভবত পৃথিবীর অন্য যে কোন জাতির তুলনায় যেমন বেশী অভীষ্ট সাধন করিয়াছে, তেমন বেশী দুঃখভোগও করিয়াছে। এই মুহূর্তে আমি শুধু এই আশাই করিতে পারি যে, বিজয়ীপক্ষ তাদের সঙ্গে উদারভাবে ব্যবহার করিবেন।"

কিন্তু মিত্রপক্ষের গম্ভীর বদন প্রতিনিধিরা জার্মান প্রতিনিধিদের এই করুণ আবেদনে সম্পূর্ণ নিঃশব্দ রহিলেন। সম্ভবত কিছুক্ষণ আগে তাঁরা জার্মান বন্দীনিবাসগুলির যে-সমস্ত বীভৎসতা দেখিয়া আসিয়াছিলেন, তারই প্রতিক্রিয়ায় তাঁরা চুপ করিয়া রহিলেন।

অতঃপর জার্মান প্রতিনিধিগণকে সুপ্রীম কমাণ্ডার আইজেনহাওয়ারের কক্ষে লইয়া যাওয়া হইল এবং সেখানে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, বার্লিনে সোভিয়েত হাইকমাণ্ডের নিকট গিয়া জার্মান প্রতিনিধিগণকে যথারীতি আত্মসমর্পণ এবং দলিলে স্বাক্ষর করিতে হইবে।

জডল অভিবাদন করিয়া সঙ্গীদের সহ নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং সেদিন রাত্রেই ডোয়েনিৎসেব পক্ষ থেকে সমস্ত সশস্ত্রবাহিনীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করা হইল। (৩)

কিন্তু ৭ই মে গভীর রাতে রেইমসে যে আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, সেই সংবাদ মস্কোতে প্রকাশিত হইল না। কারণ, তখনও বার্লিনের প্রধান অনুষ্ঠান বাকী ছিল এবং রেইমসের অনুষ্ঠান ছিল প্রাথমিক পর্যায়ের মাত্র—যদিও পশ্চিমের নিকট ওটাই প্রধান ছিল। ৮ই মে রাত্রি ১২টার একটু আগে সোভিয়েত রাশিয়া ও সমগ্র মিত্রপক্ষের নিকট জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত এবং অনুমোদিত (ratified) হইল। ৯ই মে সকালে মস্কো বেতার থেকে নিম্নলিখিত মর্মে এক বিবৃতি প্রচারিত হইল :

বার্লিনের উপকণ্ঠে একটি প্রাক্তন মিলিটারি টেকনিক্যাল কলেজ ভবনে জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের ঐতিহাসিক ঘটনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। চারটি রাষ্ট্রের—সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের জাতীয় পতাকা হলটির শোভাবর্ধন করিতেছিল। রাত্রি বারোটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে মার্শাল জুকোভ, বৃটিশ সুপ্রীম কমাণ্ডের মার্শাল টেডার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল কার্ল স্পাজ (Spaatz), এবং ফরাসী প্রতিনিধি জেনারেল দ্য লাত্রে দ্য টাসিনি প্রভৃতি উপস্থিত হইলেন। তাঁদের সকলের প্রতি সাদর সম্বর্ধনা জানাইয়া মার্শাল জুকোভ বলেন যে, 'মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিগণ জার্মানীর বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ গ্রহণের জন্য এখানে সমবেত হইয়াছেন। আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, এখন কাজ আরম্ভ করা হোক এবং জার্মান প্রতিনিধিদের আহ্বান করা হোক'।

এরপর জার্মাণ হাইকমাণ্ডের ফিল্ড মার্শাল কাইটেল, অ্যাডমিরাল ফ্রেডবুর্গ,

(৩) স্নাইডার, পৃষ্ঠা ৫৪০-৪১

কর্নেল জেনারেল ষ্টাম্ফ—অর্থাৎ স্থল, জল ও বিমানবাহিনীর নায়কগণ সেই কক্ষে প্রবেশ করেন এবং সম্পূর্ণ নীরবে আসন গ্রহণ করেন।

মার্শাল জুকোভ পুনরায় বলেন—"মহাশয়গণ, বিনা শর্তে আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের সময় আসন্ন। আমি জার্মান হাইকমাণ্ডের প্রতিনিধিদের জিজ্ঞাসা করিতে চাই, তাঁরা কি উক্ত চুক্তিপত্র পাইয়াছেন এবং তা পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন? তাঁরা কি এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে সম্মত? ফিল্ড মার্শাল টেডারও অনুরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন।

ফিল্ড মার্শাল কাইটেল জার্মানদের পক্ষ থেকে অতি নিম্নস্বরে জবাব দেন—'হাঁ, আমি সম্মত'।—এই বলিয়া তিনি মার্শাল জুকোভের হাতে গ্রাণ্ড অ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি দলিল অর্পণ করেন। এই দলিলে জার্মান প্রতিনিধিদেরকে সোভিয়েত এবং মিত্রবাহিনীর সুপ্রীম কমাণ্ডের নিকট জার্মানীর পক্ষ থেকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছিল।

আনুষ্ঠানিক নিয়মকানুন সম্পন্ন হইলে মার্শাল জুকোভ প্রস্তাব করেন—'জার্মান হাইকমাণ্ডের প্রতিনিধিরা এখন টেবিলে আসিয়া চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিতে পারেন।'

জার্মান প্রতিনিধিরা একে একে আসিয়া চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন। এদিকে ক্যামেরাগুলি তাঁদের ছবি লইতে থাকে। রাত্রি পৌনে একটার সময় চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইলে মার্শাল জুকোভ ঘোষণা করেন—'জার্মান প্রতিনিধিদল এখন যাইতে পারেন।'

বার্লিনে জার্মান প্রতিনিধিদল কর্তৃক এই আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের পর ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া গেল।

'আধুনিক ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম একটা জাতির সমগ্র সৈন্যবাহিনী ও সেনাপতিমণ্ডলী প্রতিপক্ষের হাতে বন্দী হইল।'—এই মন্তব্য করিয়াছেন মার্কিন ঐতিহাসিক স্নাইডার। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, রুশ পক্ষ এই আত্মসমর্পণের একটি বিস্তৃত ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈয়ার করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পরে জেনারেল আইজেনহাওয়ার যখন মস্কো পরিদর্শনে গিয়াছিলেন, তখন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন যে, উক্ত ফিল্মে তাঁর সদর দপ্তর রেইমসে জার্মানদের প্রথম আত্মসমর্পণের ঘটনা কিছুই দেখানো হয় নাই।

অর্থাৎ ইউরোপে পশ্চিমের বিজয় দিবস (V E Day) হইল একদিন আগে এবং পূর্বের বা সোভিয়েতের বিজয় দিবস হইল একদিন পর। যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশন যখন ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং মিত্রপক্ষের দুই তরফের মধ্যে নানা প্রশ্ন (যেমন, বন্দীশালা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের স্বদেশে ফেরৎ পাঠানো) নিয়া মনোমালিন্য দেখা দিল, তখন বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের সামান্য তারিখটাও মতান্তরের অন্যতম বিষয় ছিল।

ইউরোপের সর্বত্র জার্মান সৈন্যেরা আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল এবং ৯ মে থেকে ১৭ মে-র মধ্যে একমাত্র লালফৌজের নিকটই মোট ১৩ লক্ষ, ৯০ হাজার ৯৭৮ জন

জার্মান সৈন্য ও অফিসার এবং ১০১ জন জেনারেল আত্মসমর্পণ করিলেন। আর ওদিকে পশ্চিমের ইঙ্গ মার্কিন পক্ষের নিকট তো জার্মানদের আত্মসমর্পণের ধুম পড়িয়া গেল। কেননা, বলশেভিক রাশিয়ার তুলনায় ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষকেই তারা বেশী 'আপন' বলিয়া মনে করিয়াছিল। ১২ বছর ধরিয়া একচ্ছত্র নাৎসী রাজত্ব ও প্রোপাগাণ্ডার ফলে 'বলশেভিক' শব্দটাই যেন জার্মানদের নিকট আতঙ্কের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল!

কিন্তু হিটলারী জার্মানীর পতন এবং ইউরোপে যুদ্ধাবসানের জন্য সর্বত্র জনগণের মধ্যে আনন্দের বান ডাকিলেও চার্চিল মনে মনে খুব প্রসন্ন ছিলেন না। কারণ, বার্লিন, ভিয়েনা ও প্রাগ যে তিনটি কেন্দ্রবিন্দুকে তিনি ইউরোপীয় ভারসাম্য রক্ষার পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া মনে করিতেন এবং এই মর্মকেন্দ্রগুলি যাতে সম্পূর্ণরূপে রাশিয়ার দখলে চলিয়া না যায়, তার জন্য প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং তাঁর মৃত্যুর পর প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের কাছে পর্যন্ত আবেদন জানাইয়াছিলেন। সেই কেন্দ্রগুলির একটিও ইঙ্গ-মার্কিনের দখলে আসিল না। ১৩ এপ্রিল সোভিয়েত বাহিনী ভিয়েনা দখল করিয়া নিল এবং ২রা মে লালফৌজের হাতে বার্লিনের পতন ঘটিল। আর মে মাসের গোড়ার দিকে চেকোশ্লভাকিয়ার পশ্চিম সীমান্তের দিকে অগ্রসরমান জেনারেল প্যাটনের মার্কিন বাহিনী, যাঁদের লক্ষ্য ছিল প্রাগ দখল করা, তাঁরাও থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কেননা, সোভিয়েত হাইকমাণ্ড জেনারেল আইজেনহাওয়ারকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, পশ্চিম চেক সীমান্তে ইতিপূর্বেই সোভিয়েত ও মার্কিন বাহিনীর অগ্রগতির যে সীমারেখা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তা লঙ্ঘন করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। জেনারেল আইজেনহাওয়ার মানুষ হিসাবে খুব ভদ্র ছিলেন এবং সৈনিক হিসাবে রাজনীতি নিয়া মাথা ঘামাইতেন না। সুতরাং সোভিয়েত হাইকমাণ্ডের অনুরোধে তিনি সাড়া দিলেন। অথচ কিন্তু মার্শাল শোয়েরনারের (Schoerner) অধীনে প্রচুর অস্ত্রসম্ভার সহ প্রায় ৯ লক্ষ জার্মান সৈন্য চেকোশ্লভাকিয়া দখল করিয়া রাখিয়াছিল—যদিও এই দখলদারির বিরুদ্ধে পার্টিজানরা লড়াই চালাইতেছিলেন। খাস জার্মানীর পতন একান্ত সন্নিকট হওয়া সত্ত্বেও এই অঞ্চলের জার্মানরা আত্মসমর্পণে অস্বীকৃত ছিল। সুতরাং ৬ মে তারিখ থেকে সোভিয়েত বাহিনীর তীব্র আক্রমণ শুরু হইল এবং ১০-১১ মে তারিখের মধ্যে চেকোশ্লভাকিয়ায় জার্মান সমরশক্তি চূর্ণ হইল। ৭ লক্ষ ৮০ হাজার নাৎসী সৈন্য ও অফিসার এবং ৩৫ জন জেনারেল বেষ্টিত হইয়া ধরা পড়িল। ৯ মে প্রাগ লালফৌজের দখলে গেল, যদিও প্রভূত প্রাণের বিনিময়ে—১ লক্ষ ৪০ হাজার সোভিয়েত সৈন্য ও অফিসার নিহত হইলেন। কিন্তু বলকান ও পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরজা খুলিয়া গেল।

সুতরাং ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের যেভাবে অবসান হইল, তাতে চার্চিল এবং বৃটেনে ও আমেরিকায় চার্চিলপন্থীদের মহলে তেমন আনন্দের বান ডাকিবার কথা ছিল না। বিশেষতঃ আমেরিকার নিকট তখনও জাপানের সমস্যা ছিল।

* * *

৮-৯ মে, ১৯৪৫, রাত্রি ১২-১ মিনিটের সময় ইউরোপীয় রণক্ষেত্রের কামান গর্জন স্তব্ধ হইল। ৫ বছর ৮ মাস ৭ দিন ধরিয়া ভয়াবহ রক্তাক্ত সংঘর্ষের পর যে যুদ্ধের

শেষ হইল, তার ফলে ইউরোপে এবং মিত্রপক্ষের সমস্ত দেশে অগণিত নরনারী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বিশেষভাবে মস্কো, লণ্ডন এবং ওয়াশিংটনে তো বটেই একমাত্র জাপান ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র অগণিত মানুষ রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল এবং আনন্দ উৎসবে মত্ত হইল। অনেক ক্ষেত্রে নর-নারীর মধ্যে সামাজিক নিয়ম-কানুনের বাঁধ ভাঙিয়া গেল এবং আলিঙ্গন ও চুম্বনের রোমাঞ্চকর দৃশ্যের অবতারণা হইল। ১৯১৪-১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম মহাযুদ্ধ অবসানের পর লণ্ডনের রাস্তায় আনন্দমত্ত নর-নারীর যে মিলন দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছিল, আমাদের দেশের পরলোকগত বিখ্যাত সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সেই দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বৃটিশ সরকারের আমন্ত্রণে তিনি তখন লণ্ডনে ছিলেন এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সেই অভিনব অভিজ্ঞতার এক নাটকীয় বর্ণনা দিয়াছিলেন, যে বর্ণনা পাঠকদের চিত্তে গভীর কৌতুক ও কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছিল। কেননা, আমাদের দেশের সামাজিক প্রথায় প্রকাশ্য রাস্তায় এই ধরনের ঘটনা তখনও সম্ভব ছিল না এবং আজও সম্ভব নয়।…

মার্শাল ষ্ট্যালিন, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এবং প্রধানমন্ত্রী চার্চিল মিত্রপক্ষের এই তিন শীর্ষ নেতা পরস্পরের প্রতি অভিনন্দনজ্ঞাপক তারবার্তা বিনিময় করিলেন এবং প্রত্যেকেই মিত্রবাহিনীর সৈন্য ও জনগণের বীরত্ব, ত্যাগস্বীকার ও রণনৈপুণ্যের উচ্চ প্রশংসা করিলেন। অধিকৃত ইউরোপের মুক্তি এবং ফ্যাসিজম ও সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত পরাজয়ের জন্য বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কথা যেমন এই সমস্ত অভিনন্দনবার্তায় উল্লেখ করা হইল, তেমনি আগামী দিনের পৃথিবীতে শান্তি রক্ষার জন্য এই তিন শক্তির মধ্যে বন্ধুতাপূর্ণ সম্পর্কের যে প্রয়োজন সে কথার উপরও জোর দেওয়া হইল। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান তাঁর বার্তায় সংক্ষেপে বলিলেন :

We fully appreciate the magnificient contribution made by the mighty Soviet Union to the cause of civilization and liberty.

আর ষ্ট্যালিনের বার্তায় সংক্ষেপে বলা হইল :

The joint effort of the Soviet, U. S and Britist Armed Forces against the Germam invaders, which has culminated in the latter's complete rout and defeat, will go down in history as a model military alliance between our peoples. (৪)

অর্থাৎ ট্রুম্যান ষ্ট্যালিনের উদ্দেশ্যে লিখিলেন যে সভ্যতা ও স্বাধীনতার আদর্শ রক্ষায় মহাপরাক্রমশালী সোভিয়েত রাশিয়া যে অপূর্ব অবদান রাখিয়াছেন আমরা তা পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করি।

নিম্নলিখিত ষ্ট্যালিন লিখিলেন ট্রুম্যানের উদ্দেশ্যে :

মতান্তরে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটিশ সশস্ত্র ইউরোপে মিলিত প্রচেষ্টার ফলে জার্মানীর যে পূর্ণ পরাজয় ঘটিয়াছে, আমাদের তিন

১৭ মে-র ম-

orrespondence, p. 230-31.

দেশের জনগণের সামাজিক মৈত্রীর আদর্শ হিসাবে ইতিহাসে তা চিহ্নিত হইয়া থাকিবে।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনষ্টোন চার্চিলের অভিনন্দনবার্তায় ষ্ট্যালিন ও লালফৌজের অকৃত্রিম প্রশংসার পর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লেখা হইয়াছিল :

It is my firm belief that on the friendship and understanding between the British and Russian peoples depends the future of mankind.

অর্থাৎ আমার একান্ত বিশ্বাস যে, বৃটিশ ও রুশ জনগণের পারস্পরিক বন্ধুত্ব এবং বোঝাপড়ার উপরই মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।(৫)

(দুর্ভাগ্যক্রমে তিন বিশ্বনেতার এই পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সদিচ্ছাপূর্ণ অভিনন্দন-বার্তা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা প্রকাশ সত্ত্বেও মহাযুদ্ধ অবসানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মহামৈত্রীরও অবসান হইল এবং বিভেদ ও বিরোধ দেখা দিতে লাগিল)।

* * *

মস্কোতে সোভিয়েত সভাপতিমণ্ডলীর এক ডিক্রি অনুসারে ৯ মে বিজয় দিবস হিসাবে ঘোষিত হইল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। লালফৌজের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন জানানো হইল জনগণের পক্ষ থেকে। পৃথিবীর নানা দেশ থেকেও বিজয়ী সোভিয়েত রাশিয়ার উদ্দেশ্যে অভিনন্দনবার্তা আসিল। সর্বাপেক্ষা বেশী উন্মাদনার সৃষ্টি হইল রাজধানী মস্কোতে। সেখানে হাজার হাজার নর-নারী রাস্তায় ভিড় জমাইতে লাগিল। সন্ধ্যাবেলা এক হাজার কামান থেকে লালফৌজ ও নৌ-বাহিনীর উদ্দেশ্যে ত্রিশবার তোপ ধ্বনির দ্বারা অভিবাদন জানানো হইল। ১৯৪১-১৯৪৫-এর স্বদেশাত্মক যুদ্ধে জার্মানীকে পরাজিত করার জন্য এক বিশেষ পদক ও মেডেল তৈয়ারী হইল এবং ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৬০ হাজার সৈন্যকে সেই পদক উপহারের দ্বারা সম্মানিত করা হইল। ২৪ মে, ১৯৪৫, সোভিয়েত গবর্নমেণ্ট ক্রেমলিন প্রাসাদে এক বিরাট ভোজ উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন রেড আর্মির সেনাপতিদের সম্মানের জন্য এবং এই উৎসবে কমিউনিস্ট পার্টির নায়কবৃন্দ থেকে শুরু করিয়া সোভিয়েত সমাজের সর্বস্তরের—সাহিত্যিক ও শিল্পীদের এবং শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিনিধিদের পর্যন্ত আপ্যায়িত করা হইল। আর এক মাস পর ২৪ জুন তারিখে রেড স্কোয়ারে ঐতিহাসিক জয়লাভের জন্য যে প্যারেড অনুষ্ঠিত হইল, তাতে সৈন্য ও অফিসারগণ পতাকা সহ মার্চ করিলেন এবং পরাজিত জার্মান বাহিনীর দুইশত রণপতাকা লেনিনের স্মৃতিসৌধের পদে দেশে নিক্ষেপ করিলেন।

এদিকে ৮মে, ১৯৪৫ বিজয় দিবস উপলক্ষে পশ্চিমের মিত্রপক্ষের সুপ্রীম কমাণ্ডার জেনারেল আইজেনহাওয়ার যুদ্ধে যোগদানকারী সমস্ত জাতির সৈন্যদের বীরত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য প্রশংসা জানাইলেন এবং বলিলেন, এই জয় কোন একটা বিশেষ দেশের নয়—প্রকৃতপক্ষে মিত্রপক্ষের প্রত্যেকটি নর-নারীই এই যুদ্ধজয়ে

(৫) চার্চিল—ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭৭

সহায়তা করিয়াছেন। যাঁরা এই মহান কর্তব্য পালনের জন্য মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, জেনারেল আইজেনহাওয়ার তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন।

* * *

হিটলারের উত্তরাধিকারীরূপে গ্রাণ্ড অ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস ফ্লেন্সবুর্গে যে 'গবর্নমেণ্ট' স্থাপন করিয়াছিলেন, মিত্র শক্তিবর্গ কখনও সেই গবর্নমেণ্টকে স্বীকৃতি দেন নাই। ২৩ মে তারিখ মিত্রশক্তির সুপ্রীম কমাণ্ডারের এক আদেশবলে সেই গবর্নমেণ্টের উচ্ছেদ ঘটানো হইল এবং ডোয়েনিৎস ও তাঁর সরকারের সমস্ত সদস্য ও জার্মান হাইকমাণ্ডের নেতাদেরকে গ্রেপ্তার করা হইল। যখন মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা অ্যাডমিরাল ফ্রাইড্‌বুর্গকে (যিনি রেইমস ও বার্লিনে জার্মানীর আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিয়াছিলেন) গ্রেপ্তারের জন্যে তাঁর আবাসে হানা দিল, তখন তিনি তাঁর কিছু জামাকাপড সংগ্রহের নাম করিয়া বাথরুমে ঢুকিলেন এবং ভিতর থেকে বাথরুমের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন- ফ্রাইডবুর্গ সেখানে বিষপানে আত্মহত্যা করিলেন।

বড় বড় নাৎসী নেতা ও সামরিক চাঁইদের গ্রেপ্তার করা হইল। গ্রাণ্ড অ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস ছাড়াও কয়েকজন নামজাদা ফিল্ড মার্শালকে গ্রেপ্তার করা হইল, যথা— হিটলারের 'সারমেয় সদৃশ ভক্ত' উইলহেলম কাইটেল, ফন্ ক্লাইষ্ট (যিনি ১৯৪০ সালে ফ্রান্সের যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন), পশ্চিম রণাঙ্গনের শেষ জার্মান সেনাপতি আলবার্ট কেসেলরিং (যিনি পূর্বে ইতালীতে ছিলেন), কার্ডিনাণ্ড ফন্ শোয়েরনার, সিগমুণ্ড উইলহেলম লিষ্ট প্রভৃতি। 'প্যারিসের জল্লাদ' নামে কুখ্যাত এস এস জেনারেল কার্ল ওবার্গ এবং বড় বড় নাৎসী রাজনৈতিক নেতারাও ধৃত হইলেন। জার্মান লেবর ফ্রণ্টের নেতা (দাস-শ্রমিক সংগ্রহে যিনি ওস্তাদ ছিলেন) ডঃ রবার্ট লে, কুখ্যাত ইহুদী হত্যাকারী জুলিয়াস ষ্ট্রেইচার, পোলাণ্ডের অত্যাচারী গবর্নর হান্স ফ্রাঙ্ক, নাৎসী তাত্ত্বিক দার্শনিক আলফ্রেড রোজেনবার্গ, কূটনীতিবিদ ফন্ প্যাপেন এবং আরও ছোট বড় অনেক নেতা ধরা পড়িলেন। এঁদের সঙ্গে জলে প্রেরিত হইলেন উইলিয়াম জয়েস, যিনি লর্ড 'Haw-Haw' নামে নাৎসী রেডিওর প্রচারক-রূপে পরিচিত ছিলেন। (তিনি জাতিতে ইংরাজ ছিলেন, তিনি ধৃত হইয়া লণ্ডনে প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং দেশদ্রোহিতার অপরাধে লণ্ডনের এক কারাগারে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল।) (৬)

নাৎসী জার্মানীর ইতিহাসে হিটলারের পরেই যে দুই ব্যক্তি অত্যন্ত দাপটের সঙ্গে ক্ষমতা জাহির করিয়া আসিতেছিলেন, সেই গোয়েরিং ও হিমলারের অদৃষ্টেও দুর্দিন ঘনাইয়া আসিল। ৮ মে, ১৯৪৫, অস্ট্রিয়ার একটি শহরে রাইখ মার্শাল গোয়েরিং নিজেই আত্মসমর্পণ করিলেন। লুফৎভাপে বা জার্মান বিমানবাহিনীর একচ্ছত্র অধিপতি জাঁদরেল গোয়েরিং মার্কিন বাহিনীর নিকট ধরা দিলেন এবং ধরা পড়ার পরেই তিনি উপযুক্ত খাদ্য ও মর্যাদার দাবি করিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উচ্চস্বরে হিটলারকে 'একজন সঙ্কীর্ণচিত্ত অজ্ঞ লোক' বলিয়া নিন্দা করিলেন

(৬) এণ্ড অব্ এ বার্লিন ডায়েরী—শাইরার, পৃষ্ঠা ৩৪১

এবং রিবেন্ট্রপের উদ্দেশ্যে গালাগালি দিয়া বলিলেন—'ওটা একটা নির্ভেজাল বদমাস বা স্কাউন্ড্রেল।' তিনি আমেরিকানদের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য আরও বলিলেন যে, তিনি নিজ হাতে জার্মান রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া ফুরার তাঁর প্রতি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দিয়াছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত কথায় 'চিঁড়া ভিজিল না'। তাঁকে গ্রেপ্তার করিয়া নুরেমবার্গের আদালতে বিচারের অপেক্ষায় রাখা হইল।

ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর খুনী এবং সবচেয়ে নৃশংস গণ-হত্যাকারী গেষ্টাপো (রাজনৈতিক পুলিশ) গুণ্ডা বাহিনীর সর্বোচ্চ সর্দার এবং ইহুদীদের সংহারকারী ও লিডিস্ (চেকোশ্লভাকিয়া) গ্রামের নিশ্চিহ্নকারী হাইনরিখ হিমলার ২০ মে, ১৯৪৫, মিত্রপক্ষের হাতে ধরা পড়িলেন। সারা জার্মানীর লোক এই ব্যক্তিকে যমের মত ভয় করিত। বার্সেটসগাডেনের নিকট একটি গোলাবাড়ীতে এই ব্যক্তির লুকানো যে ১০ লক্ষ ডলার ছিল, মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের অনুসন্ধানের ফলে সেই বিপুল পরিমাণ মুদ্রাও ধরা পড়িয়াছিল। অথচ বাইরে হিমলার এমন ভড়ং দেখাইতেন যে, তিনি একজন অতি সহজ সরল সাধু প্রকৃতির লোক—মদ, স্ত্রীলোক ও তাম্রকূট স্পর্শও করেন না। অথচ তাঁর দুইটি রক্ষিতা ছিল। মাত্র ১৯ বছর বয়সে সে একজন বেশ্যার সঙ্গে বাস করিত। এই বেশ্যাটির নাম ছিল ফ্রাইডা ভাগনার (Frieda Wagner) এবং সে আবার হিমলারের চেয়ে সাত বছরের বড় ছিল। কিন্তু একদিন এই গণিকাটিকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন হত্যার অভিযোগে হিমলারকে আদালতে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু উপযুক্ত সাক্ষ্যের অভাবে সে আদালত থেকে মুক্তি লাভ করে। এরপর হিমলার তার চেয়ে ৭ বছরের বড় একজন নার্সকে বিবাহ করে এবং তাঁর টাকা দিয়া মিউনিকের নিকট একটি মুর্গীর কারবার খোলে। কিন্তু এই কারবার ফেল পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত বিবাহও ব্যর্থ হয়। এদিকে তাঁর একজন ব্যক্তিগত মহিলা সেক্রেটারি ছিল। হিমলার তার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতাই শুরু করিলেন যে, সেক্রেটারি মহোদয়া দুইবার গর্ভবতী হইলেন—একটি ছেলে ও একটি মেয়ে তিনি প্রসব করিলেন। হিমলারের কিন্তু তখনও বৈধ স্ত্রী বর্তমান ছিল।(৭)

এহেন ভণ্ড ও অসৎ প্রকৃতির লোক হিমলার কার্যত হিটলারের পরেই জার্মানীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন। কিন্তু জার্মানীর পতনের পর হিমলার শত্রুপক্ষের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে আত্মগোপন করিলেন—গোঁফ কামাইয়া ফেলিলেন এবং ডান দিকের চোখের উপর এক পোচ কালো কালির রঙ লাগাইলেন। তিনি সিভিলিয়ানের বা অ-সামরিক ব্যক্তির পোশাকে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া যখন হ্যাম্বুর্গের নিকট একটি সেতু পার হইতেছিলেন, তখন বৃটিশ সৈন্যেরা তাঁকে ধরিয়া ফেলে। তিনি তাঁর গ্রেপ্তারি এড়াইবার জন্য জাল কাগজপত্র দেখাইলেন। তাতে তাঁর পরিচয় লেখা ছিল নিৎজিঙ্গার (Nitzinger)—জার্মান সিকিউরিটি পুলিশের একজন পদচ্যুত ব্যক্তি। কিন্তু গ্রেপ্তারকারীরা তাতে ভুলিলেন না। তাঁর দেহ তল্লাসী করা হইল এবং একজন

(৭) দি লাষ্ট হাণ্ড্রেড্ ডেইজ, জন টোলাণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৫

ডাক্তার ডাকিয়া যখন তাঁর মুখ খুলিবার চেষ্টা হইল, তখন গেষ্টাপো সর্দার তাঁর মুখের মধ্যে লুকানো নীলরংয়ের বিষের ছোট্ট শিশিটি দাঁত দিয়া ভাঙ্গিয়া খাইয়া ফেলিলেন। হিমলার দুই মিনিটের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন। 'গণ-হত্যাকারীর জীবনের এটাই বোধ হয় ছিল সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন কাজ'—মন্তব্য করিয়াছেন মার্কিন ঐতিহাসিক স্নাইডার। পাইনের জঙ্গলের মধ্যে তাঁর মৃতদেহ একটা গর্তের মধ্যে গোর দেওয়া হইল এবং তাঁর এই বিদঘুটে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে একজন গোরা সৈন্য বলিয়া উঠিলেন :

'Let the worm go to the worms' !

অর্থাৎ 'ঘৃণ্য কীটকে কীটের দলেই যেতে দাও।'

* * *

নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের ফলে জার্মান রাষ্ট্র ও গবর্নমেণ্টের সমস্ত ক্ষমতা বিজয়ীপক্ষ বা দখলকারী শক্তিবর্গের হাতে চলিয়া গেল এবং ৫ই জুন, ১৯৪৫ জার্মানীর পরাজয়ের ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হইল। সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স—এই চতুঃশক্তি জার্মানীর সরকার ও হাইকমাণ্ডের এবং জার্মানীর অভ্যন্তরস্থ সমস্ত অঞ্চল ও পৌর এলাকার সর্বপ্রকার ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিলেন। জার্মানীর সমস্ত স্থল-বাহিনী ও নৌ-বাহিনীকে নিরস্ত্র করার নির্দেশ দেওয়া হইল এবং সমগ্র জার্মানীকে ভবিষ্যৎ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে নিরস্ত্র করার অধিকার ও মিত্রপক্ষ নিজেদের হাতে রাখিলেন। জার্মানীর হাতে মিত্রপক্ষের যে সমস্ত যুদ্ধবন্দী ছিল, তাদের সকলকে ফেরত দেওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হইল। প্রধান নাৎসী নেতাদেরকে এবং যারা যুদ্ধাপরাধী বলিয়া সন্দেহ হইল, তাদের সকলকে গ্রেপ্তার করা হইল।

মিত্রপক্ষের মধ্যে চুক্তি অনুসারে সমগ্র জার্মানী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্রান্স—এই চার শক্তির মধ্যে বিভক্ত হইল। নিখিল জার্মানীর শাসন ও নিয়ন্ত্রণের ভার একটি কণ্ট্রোল কাউন্সিলের হাতে অর্পণ করা হইল এবং কাউন্সিল দখলদার বাহিনীর চারজন প্রধান সেনাপতিকে নিয়া গঠিত হইল। কিন্তু কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হওয়ার নিয়ম ছিল। কিন্তু জার্মানীর রাজধানী বার্লিন সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইল। কারণ, বার্লিন ছিল পূর্ব জার্মানীর সোভিয়েত অধিকৃত এলাকার মধ্যে। অথচ চতুঃশক্তির কণ্ট্রোল কাউন্সিলের সদর দপ্তরও প্রতিষ্ঠিত হইল বার্লিনে। সুতরাং বৃহত্তর বার্লিনও দখলদার চতুঃশক্তির মধ্যে চারটি সেক্টরে কিংবা খণ্ডাংশে বিভক্ত হইল এবং প্রত্যেকটি খণ্ডাংশ এক-একজন কমাণ্ডারের পরিচালনাধীনে আনা হইল। এই চারটি অংশের সাধারণ সমস্যাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য একটি 'Inter-Allied Kommandatura' (এই শব্দটি রাশিয়ান) গঠিত হইল। কিন্তু সাধারণভাবে এই 'কম্যাণ্ডাটুরা' কণ্ট্রোল কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। বলা বাহুল্য যে, নাৎসী পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হইল।

কিন্তু খাস জার্মানী রণক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার ফলে উহার বিস্তীর্ণ অংশ এবং

শহর জনপদ ইত্যাদি ভয়াবহরূপে ধ্বংস হইয়াছিল। পলায়মান জার্মান সৈন্যেরা হিটলারের নির্দেশে বহুস্থানে .পোড়ামাটির নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। ফলে খাদ্য ও জীবনধারণের দৈনন্দিন বস্তু এবং যানবাহন ইত্যাদির প্রচণ্ড অভাব ঘটিল। জনসাধারণের দুর্গতি ও দুর্ভোগের কোন সীমা ছিল না। তথাপি মিত্রপক্ষ এই অবস্থায় জার্মান জনগণকে খাদ্য ও সাহায্য দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

সোভিয়েত অধিকৃত জার্মা-নীর পূর্বাংশে এবং পূর্ব বার্লিনের বড় বড় রাস্তায় ও রাস্তার মোড়ে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ এই মর্মে নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি টানাইয়া দিলেন :

'Hitlers come and go, but the German people and German state go on—STALIN'

অর্থাৎ "হিটলারেরা যায় এবং আসে। কিন্তু জার্মান জাতি ও রাষ্ট্র চিরকাল থাকিবে—ইতি, ষ্ট্যালিন।"

নোটিশে জার্মান ষ্টেট বা রাষ্ট্র শব্দটি উল্লেখ থাকায় অনেকে ভাবিয়াছিলেন যে, একটি কেন্দ্রীয় জার্মান সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় নাই। তবে, পূর্ব জার্মানীর কোন কোন অংশে সোভিয়েত সৈন্যদের সঙ্গে জার্মান তরুণ-তরুনীদের বেশ 'ভাব' হইয়াছিল এবং রুশরা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সহায়তা দানেরও চেষ্টা করিতেন (৮)

*   *   *

অধিকৃত জার্মানীতে 'গুপ্তধনে'রও সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। মার্কিন বাহিনীর বিশিষ্ট সেনাপতি জেনারেল প্যাটন যখন ফ্রাঙ্কফুর্ট অন্ মেইন অঞ্চলের দিকে অভিযান করিয়াছিলেন, তখন ৭৫ মাইল উত্তর-পূর্বে (বিমানপথে) অকস্মাৎ দুইটি জার্মান স্ত্রীলোকের কথাবার্তা থেকে মার্কার্স (Merkers) লবণখনির নিকট এই গুপ্তধনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। এই খবর অনুসারে খনির ভূগর্ভে জার্মান সরকারের লুকানো ২০ কোটি ডলার মূল্যের স্বর্ণভাণ্ডার (অর্থাৎ জার্মানীর মজুত সোনার একটা মোটা অংশ) আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে পাওয়া গিয়াছিল ২৭৫ কোটি রাইখমার্ক, ডলারের হিসাবে যার মূল্য ছিল ৮ কোটি ৪০ লক্ষ। এই বিপুল পরিমাণ অর্থসম্পদ ছাড়াও খনিগর্ভের ২১০০ ফুট নীচে একটি ভল্টের মধ্যে বার্লিনের একটি নামকরা মিউজিয়মের প্রচুর চিত্রকলা পাওয়া গিয়াছিল, যার মূল্য ছিল অপরিসীম।(৯)

এখানে আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মার্কিন ঐতিহাসিক উইলিয়ম শাইরারের মতে হিটলার-গোয়েরিং নাৎসীচক্র অধিকৃত ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে এত ধনসম্পদ স্বর্ণ খাদ্য এবং কলকারখানা-জাত উৎপন্ন দ্রব্য ও চিত্রকলা ইত্যাদি লুণ্ঠনপূর্বক জার্মানীতে আনিয়াছিলেন যে, কোন মুদ্রার অঙ্কেই তার সুনির্দিষ্ট হিসাব (হাজার হাজার কোটি ডলারের) করা সম্ভব ছিল না। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে 'ক্রেডিট্' হিসাবেও অজস্র মুদ্রা আদায় করা হইয়াছিল। অধিকন্তু দখলদার সৈন্য

(৮) আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থ, পৃষ্ঠা ৮৮৪

(৯) দি লাষ্ট্ হাণ্ড্রেড ডেইজ, পৃষ্ঠা ৪০২

বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ ও ক্ষতিপূরণের নাম করিয়া এক একটা দেশকে শোষণপূর্বক প্রায় রক্তশূন্য করা হইয়াছিল। অর্থাৎ জার্মান লুঠের কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না।(১০)

সুতরাং নাৎসী জার্মানীর পরাজয় ও আত্মসমর্পণ ইউরোপকে যে অধিকতর সর্বনাশ থেকে রক্ষা করিয়াছে, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

(১০) শাইরার, পৃষ্ঠা ১১২২-২৩

নবম পর্ব

নবম অধ্যায়

রাষ্ট্রসংঘের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা ঃ স্যানফ্রানসিস্কোর সম্মেলন

ইউরোপে যখন প্রচণ্ড বেগে যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন থেকেই মিত্রশক্তির নেতারা মহাযুদ্ধের শেষে ভবিষ্যৎ বিশ্বশান্তি রক্ষা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার কথা ভাবিতেছিলেন। ১৯৪৩ সালের ১৯ থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত মস্কোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনের ভবিষ্যৎ শান্তি রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে বিস্তৃত আলোচনার পর যে সাত দফা চুক্তি সম্বলিত ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছিল, তাতে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার প্রস্তাব ছিল এবং এই ইস্তাহারে চীনের রাষ্ট্রদূতও স্বাক্ষর দিয়াছিলেন। সুতরাং কার্যত এটি ছিল চতুঃশক্তির ঘোষণাপত্র (১)

মিত্রশক্তির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এই প্রস্তাব অনুযায়ী ২১ আগষ্ট থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪, ওয়াশিংটনের ডাম্বারটন ওকস্ ভবনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের প্রতিনিধিদের যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাতে পুনরায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি "বিশ্ব সংগঠন" গড়িয়া তোলা এবং একটি সিকিউরিটি কাউন্সিল গঠনসহ চার দফা প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। ডাম্বারটন ওকসের এই সমস্ত প্রস্তাব অনুযায়ীই ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রসংঘের কাঠামো তৈয়ারির সূত্রপাত হইয়াছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইয়াল্টাতে (ক্রিমিয়া) তিন বিশ্বনেতা মার্শাল স্ট্যালিন, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং প্রধানমন্ত্রী চার্চিল যে ঐতিহাসিক বৈঠকে মিলিত হইয়াছিলেন, সেই বৈঠকে মহাযুদ্ধের শেষে অবিলম্বেই আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্বস্তি রক্ষার জন্য একটি সংগঠন স্থাপনের কথা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হইয়াছিল। কেননা, তখন জার্মানীর আসন্ন পরাজয় ও পতন সম্পর্কে আর কাহারও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এই প্রকার মহাবিপর্যয়ের যাতে আর পুনরাবৃত্তি না ঘটিতে পারে, সেজন্য তিন বিশ্বনেতাই অত্যন্ত উদগ্রীব ছিলেন। সুতরাং ইয়াল্টা সম্মেলনে সিদ্ধান্ত করা হইল যে, ডাম্বারটন ওকসের প্রস্তাব অনুযায়ী আগামী ২৫ এপ্রিল, ১৯৪৫, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত স্যানফ্রানসিস্কোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি সম্মেলন আহ্বান করা হইবে এবং সেখানে প্রস্তাবিত রাষ্ট্রসংঘের একটি চার্টার বা সনদ রচিত হইবে। এই বিষয়ে চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্ট্যালিন একমত ছিলেন এবং যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থাতেই তাঁরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তান্বিত ছিলেন। তাঁরা একথাও

(1) Historic Documents of World War II, p 92

উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশনের তিন বৃহৎ শক্তির মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা না থাকিলে আগামী দিনের পৃথিবীতে শান্তি ও স্বস্তি রক্ষা করা যাইবে না। চার্চিল সেই সময় এমন মনোভাবও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সোভিয়েত রাশিয়া কমিউনিস্ট রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও তার সঙ্গে পারস্পরিক ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষার পক্ষে কোন অসুবিধা হইবে না। আর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫, লিখিয়াছিলেন—"আমরা তিন রাষ্ট্র যেমন যুদ্ধের সময় সহযোগিতা করিতে পারিয়াছি, তেমনি শান্তির সময়েও সহযোগিতা করিতে পারিব।"(২)

ইয়াল্টা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৫ এপ্রিল, ১৯৪৫ স্যানফ্রান্সিস্কো শহরে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু হইল, কূটনীতির ইতিহাসে সেটা ছিল অন্যতম বৃহত্তম সম্মেলন এবং সেই ২৫ এপ্রিল তারিখটিও ছিল গভীর তাৎপর্যব্যঞ্জক। কারণ, ওই দিন জার্মানীর অভ্যন্তরে এলবে নদীর ধারে টোরগাউতে সোভিয়েত ও ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলাইয়াছিলেন। সেই সময় মিত্রপক্ষের অনেকের নিকট এই মিলন এবং স্যানফ্রানসিস্কোর সম্মেলন ভবিষ্যতের শান্তি রক্ষার জন্য বৃহৎ শক্তিবর্গের ঐক্য ও সহযোগিতার প্রতীক রূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল। সম্মেলন ভবনে বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকা পরলোকগত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে অর্ধনমিত করা হইয়াছিল এবং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টই যে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর শান্তি রক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশী আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং স্ট্যালিন তথা সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাতেও কোন সন্দেহ নাই।

সেই সময় স্যানফ্রানসিস্কো ছিল আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধযাত্রার সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। সুতরাং এই কর্মব্যস্ত ও জনাকীর্ণ শহরে ৪৬টি (পরে আরও ৪টি) জাতির হাজার হাজার প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ ও কর্মচারী যখন আসিয়া হাজির হইলেন প্লেন ও ট্রেনযোগে তখন এতগুলি লোকের জন্য আতিথেয়তার প্রশ্নটাও সহজ ছিল না। অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়ম, বলিভিয়া ও "ভারত" (অবশ্যই বৃটিশ সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি) থেকে শুরু করিয়া যুগোস্লাভিয়া পর্যন্ত ৪৬টি জাতি (পরে বেলোরুশিয়া, উক্রাইন এবং ডেনমার্ক ও আর্জেন্টিনা—এই চারটি দেশের প্রতিনিধিরাও যোগ দিয়েছিলেন) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ হিসাবে সম্মেলনে যোগ দিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর জেনেভাতে যে লীগ অব্ নেশন্স গঠিত হইয়াছিল এবং যদিও সেই সংগঠনেরও উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর শান্তি রক্ষা, তবু শেষ পর্যন্ত সেটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল এবং তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসন পশ্চিম ইউরোপীয় কূটনৈতিক নেতাদের চালবাজিতে বিরক্ত ও হতাশ হইয়াছিলেন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই রাষ্ট্রসংঘে কখনও যোগ দেন নাই)। সেই ব্যর্থতার ইতিহাস থেকে এবারের মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও মিত্রপক্ষের নেতারা সাবধান হইয়াছিলেন। সেবার লীগ অব্ নেশন্স বা বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ গঠিত হইয়াছিল মহাযুদ্ধের অবসানের পর এবং সেই সময় মিত্রপক্ষীয় নেতারা বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বদলে পরাজিত

(২) প্যাট্রিয়টিক ওয়ার অব দি সোভিয়েত ইউনিয়ন, পৃষ্ঠা ৩২৬

জার্মানীকে একটা শান্তিসন্ধি মারফৎ কত বেশী জব্দ করা যায়, যেন সেদিকেই বেশী মনোযোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু এবার তার বিপরীত দৃশ্য দেখা গেল। এবার জার্মানি বা ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গের চূড়ান্ত পরাজয় কিংবা যুদ্ধাবসানের অনেক আগে থেকেই, এমন কি বলা যাইতে পারে যে, ১৯৪১ সালের ১৪ই আগস্ট চার্চিল-রুজভেল্ট ঘোষিত অতলান্তিক সনদের অনুচ্ছেদগুলির মধ্যেই ভাবী পৃথিবীর শান্তি রক্ষার বীজ উপ্ত করা হইয়াছিল এবং ১৯৪৩ সালের মস্কোতে পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠক থেকে শুরু করিয়া ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ইয়াল্টাতে মিত্রপক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলন পর্যন্ত বারবার এই প্রশ্নটি নিয়া আলোচনা করা হইয়াছিল। সুতরাং প্রথম মহাযুদ্ধের তুলনায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তিন প্রধান নেতা রুজভেল্ট চার্চিল স্ট্যালিন অনেক বেশী বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন।

১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারি ইউনাইটেড নেশন্স বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণায় যে সমস্ত রাষ্ট্র স্বাক্ষর দিয়াছিলেন কিংবা পরে যারা এই ঘোষণার শর্ত মানিয়া লইয়া ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। তারা সকলেই স্যানফ্রানসিস্কো সম্মেলনে যোগ দিয়াছিল, কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের তুলনায় এবারের মহাযুদ্ধের রাজনৈতিক চরিত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। কেন না, এবারের মহাযুদ্ধে পৃথিবীর একমাত্র সোসিয়েলিষ্ট রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ার প্রাধান্য ছিল। ফলে, হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে যোগদানকারী মিত্রপুঞ্জের শাসকমহলে যারা প্রতিক্রিয়াপন্থী ছিল, তারা নানা ছুতায় ও কৌশলে রাশিয়ার বিরুদ্ধাচরণের সুযোগ খুঁজিত। স্যানফ্রানসিস্কো সম্মেলনেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নাই। যে ৪০টি রাষ্ট্র বৃহৎ চতুঃশক্তি কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে ১৯টি ছিল লাতিন আমেরিকার দেশ এবং ৫টি ছিল বৃটিশ ডোমিনিয়ন। সুতরাং জাতিপুঞ্জের বা রাষ্ট্রসংঘের সংগঠনে বৃটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেজরিটি সুনিশ্চিত হইল। এই দেশগুলি ছাড়া তথাকথিত নিরপেক্ষ দেশ, যেমন—আয়ার, আইসল্যাণ্ড, পর্তুগাল ও সুইডেন আমন্ত্রিত হইল এবং ডেনমার্ক, অষ্ট্রিয়া ও শ্যামও বাদ গেল না—যদিও তখন পর্যন্ত এগুলির সকলেই সম্পূর্ণরূপে ফ্যাসিষ্ট বাহুমুক্ত ছিল না। অপর পক্ষে আলবানিয়া, পোল্যাণ্ড ও মঙ্গোলিয়ান প্রজাতন্ত্রকে ইঙ্গ মার্কিন পক্ষ আমন্ত্রণ জানাইতে অস্বীকৃত হইলেন। কেননা, এই রাষ্ট্র গুলিকে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখনও কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেন নাই। প্রাক্তন শত্রুরাষ্ট্র ইতালী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী এবং ফিনল্যাণ্ড'কও সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয় নাই। ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃক স্বীকৃতি অস্বীকৃতির প্রশ্নে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আমন্ত্রিত ৪২টি রাষ্ট্রের সকলের সঙ্গেই সোভিয়েত রাশিয়ারও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। তবু রাশিয়া এদের উপস্থিতি মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু আর্জেন্টিনার প্রশ্নে সোভিয়েত প্রতিনিধি মলোটভ তীব্র আপত্তি জানাইলেন। কারণ, যুদ্ধের সময় আর্জেন্টিনা সরকার শত্রুপক্ষকে সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাঁর সমর্থকগণ আর্জেন্টিনাকে গ্রহণের জন্য জিদ করিলেন। সুতরাং ৩০ এপ্রিল আর্জেন্টিনাকে সম্মেলনে যোগদানের জন্য আহ্বান জানানো হইল। যে পাঁচটি বৃটিশ ডোমিনিয়ন সম্মেলনে যোগদানের জন্যে আমন্ত্রিত হইল, সেগুলি নিশ্চয়ই স্বাধীন

সার্বভৌম রাষ্ট্র ছিল না। কিন্তু তারা শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে, এই যুক্তিতে সম্মেলনে আহূত হইল।

অপর পক্ষে ইয়াল্টাতে প্রস্তাবিত রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে স্ট্যালিন রুজভেল্টের নিকট ১৬টি অতিরিক্ত ভোটের দাবি জানাইয়াছিলেন। কেননা, সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৬টি প্রজাতন্ত্র বা স্বাধীন অঙ্গরাজ্য নিয়া গঠিত। সুতরাং এদের প্রত্যেকের একটি করিয়া ভোটদানের অধিকার থাকা উচিত। এর জবাবে রুজভেল্ট বলিলেন যে, তাঁরও অতিরিক্ত ৪৮টি ভোটের দরকার। কেননা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৪৮টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র নিয়া গঠিত। সুতরাং তাঁরও অনুরূপ সংখ্যক ভোট চাই। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁর আত্মস্মৃতিতে লিখিয়াছেন যে, রুজভেল্টের কাছ থেকে তুড়ুক জবাব পাইয়া স্ট্যালিন একেবারে চুপ করিয়া যান। তিনি আর ১৬টি ভোটের নামগন্ধও করিলেন না। তবে, সোভিয়েত ইউনিয়নের ২টি রিপাব্লিককে—উক্রাইন ও বেলোরুশিয়াকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছিল। চার্চিল ও রুজভেল্ট ইয়াল্টাতেই স্ট্যালিনের এই প্রস্তাবে রাজী হইয়াছিলেন (৩)

(আসলে পাঁচটি বৃটিশ ডোমিনিয়নের ভোটাধিকার লাভের জন্যই চার্চিল স্ট্যালিনের প্রস্তাব মানিয়া নিয়াছিলেন।)

সুতরাং স্যানফ্রানসিস্কো সম্মেলনে সোভিয়েত রাশিয়ার ২টি অতিরিক্ত সদস্য-পদের দাবি মঞ্জুর হইল। কিন্তু সোভিয়েত-প্রভাবিত পোল্যাণ্ডকে কিছুতেই গ্রহণ করা হইল না।

* * *

অধিবেশনের প্রথম দিনে বৃহৎ চতুঃশক্তির অর্থাৎ বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণ আগামী দিনের পৃথিবীতে যুদ্ধ নিবারণ এবং নিরাপত্তা বিধানের জন্য জাতিপুঞ্জের পক্ষ থেকে একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যে গড়িয়া তোলা দরকার, এই তথ্যের উপর বিশেষ জোর দিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশনের মধ্যে যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঐক্যের প্রয়োজন সোভিয়েত প্রতিনিধির বক্তৃতায় সেই দিকটা খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিল। বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ইডেন তাঁর বক্তৃতায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিলেন যে, যদি ভবিষ্যতে শান্তি রক্ষা করিতে না পারা যায় এবং আর একটি বিশ্বযুদ্ধ লাগে, তবে সমগ্র মনুষ্যসভ্যতা ধ্বংস হইয়া যাইবে।

সাধারণত ডাম্বারটন ওকসের গৃহীত প্রস্তাবাবলীর উপর ভিত্তি করিয়াই সম্মেলনের মূল কর্মসূচী অনুসৃত হইতেছিল বটে, কিন্তু সেই বৈঠক আসলে সীমাবদ্ধ ছিল মাত্র চারটি বৃহৎ শক্তির মধ্যে। সুতরাং এবারের বৃহত্তর সম্মেলনে ছোট ছোট শক্তির পক্ষ থেকে কতকগুলি গুরুতর বিষয়ে যেমন বিতর্কের অনুষ্ঠান হইল, তেমনি কোন কোন প্রস্তাবের সংশোধনেরও চেষ্টা হইল। এই সমস্ত বিতর্কের উদ্যোক্তা ছিলেন

(৩) Memoirs by Harry S. Truman—Vol I, Signet Book, 1965, p. 3:2

অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ ইভাট্। তিনি প্রস্তাবিত সিকিউরিটি কাউন্সিলের সমালোচনা করিয়া বলিলেন যে, এই পরিষদের হাতে এত ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে যে, সমগ্র সংগঠনের উপর পরিষদের (কাউন্সিলের) ডিক্টেটরি প্রতিষ্ঠিত হইবে। বৃটেন, সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ফ্রান্স এই পঞ্চশক্তিই সিকিউরিটি কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্য। এঁরা ছাড়া জেনারেল এসেম্বলি কর্তৃক আরও ৬টি জাতির প্রতিনিধি সদস্যপদে নির্বাচিত হইবেন—প্রত্যেকে দুই বছরের জন্য। অর্থাৎ স্থায়ী ও অস্থায়ী সহ সিকিউরিটি কাউন্সিল মোট ১১ জন সদস্য নিয়া গঠিত হইবে। কিন্তু সম্মেলনে দিনের পর দিন গভীর বিতর্ক চলিল সিকিউরিটি কাউন্সিলের ভোটদানের অধিকার ও পদ্ধতি নিয়া এবং যুদ্ধ নিবারণের জন্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের মূলনীতি ও সনদ বা চার্টার রচনা নিয়া। সমস্ত আন্তর্জাতিক বিরোধের ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সিকিউরিটি কাউন্সিলের স্থায়ী পাঁচ সদস্যকে এক মত হইতে হইবে, অন্যথা সেই সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাব বাতিল হইয়া যাইবে। বৃহৎ শক্তিবর্গের এই ভিটো প্রয়োগের অধিকার নিয়া ছোট ছোট শক্তিসমূহ তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃহৎ পঞ্চশক্তির ভিটো প্রয়োগের অধিকার মানিয়া লওয়া হইল। কেননা বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা ছাড়া শান্তিরক্ষা করা কিংবা কোন বিরোধের মীমাংসা করা যে সম্ভব নয়—এই বাস্তব সত্যটা সম্মেলনে স্বীকার করিয়া নেওয়া হইল। সেই সঙ্গে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে এটাও স্থির হইল যে, "সিকিউরিটি কাউন্সিলে কোন বিরোধের আলোচনা উত্থাপনে কোন একটি মাত্র রাষ্ট্র বাধা দিয়া রাখিতে পারিবে না।"(৭)

আগামী দিনের পৃথিবীকে যুদ্ধ, আগ্রাসন বা বলপ্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন থেকে রক্ষা করার জন্য সম্মেলনে উপস্থিত ছোটবড় কোন দেশের প্রতিনিধিরই আগ্রহের অভাব ছিল না এবং বহু তর্ক-বিতর্ক ও সংশোধনের পর ডাম্বারটন ওকসের গৃহীত প্রস্তাব ও মূলনীতির উপর সনদ রচনায়ও কোন বাধা রহিল না।

২৬শে জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নূতন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান অধিবেশনের উপসংহার বক্তৃতায় বলিলেন :

"এই সনদ কোন একটি মাত্র জাতির কিংবা ছোট বড় কোন জাতিগোষ্ঠীর রচিত নয়। এই সনদ রচনা সম্ভব হইয়াছে পরস্পরের দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে এবং অপরের মতামত ও স্বার্থের প্রতি সহনশীলতার গুণে। এর দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, সাধারণ মানুষের মত জাতি সমূহও তাঁদের মত বৈষম্য প্রকাশ করিতে, সেগুলির মুখোমুখি দাঁড়াইতে এবং মীমাংসার জন্য একটি সাধারণ ভিত্তিভূমি খুঁজিয়া পাইতে পারেন। গণতন্ত্রের এটাই সারবস্তু এবং ভবিষ্যৎ শান্তি রক্ষারও এটাই মূল মন্ত্র।"

পৃথিবীর জনগণের পাঁচভাগের মধ্যে চারভাগের প্রতিনিধি তুল্য মোট ৫০টি জাতি ভবিষ্যৎ মনুষ্যজাতির বহু সমস্যার মীমাংসায় একত্র একাজ করিতে সম্মত হইলেন এবং ৫০টি জাতির প্রতিনিধিরা এই নূতন সনদে বা চার্টারে স্বাক্ষর দিলেন।

---

(৪) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩২০

চূড়ান্তভাবে গৃহীত সনদের মুখবন্ধে (কিন্তু মার্শাল স্মার্টসের রচিত) ঘোষণা করা হইল ;

We, the peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war...to reaffirm faith in fundamental human rights . to establish conditions under which jus.ice can he maintained...to promote social progress and better standards of life in larger freedom...to practise tolerance and live together in peace with one another, as good neighbours ..to unite our strength to maintain international peace and security...have resolved to combine our efforts to accomplish these aims ..." (৫)

এই সনদের বলে যে আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে, তার সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের সমান সার্বভৌম অধিকার স্বীকার করা হইবে এবং এই সমস্ত সদস্য-রাষ্ট্র হইতেছেন তাঁরা (অন্তত আপাতত সাময়িকভাবে) যাঁরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তাঁরা সমস্ত আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করিবেন, অন্য কোন রাষ্ট্রকে ভীতিপ্রদর্শন কিংবা বলপ্রয়োগ থেকে ক্ষান্ত থাকিবেন। যদি এই আন্তর্জাতিক সংগঠন সনদের গৃহীত মূলনীতি বিরোধী কার্যকলাপের জন্য কোন রাষ্ট্রের (সদস্য হোক বা নাই হোক) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য হয়, তবে, সদস্য রাষ্ট্রগণ সর্বতোভাবে সংগঠনকে সাহায্য দিবেন।

এই বিশ্ব সংগঠনের পাঁচটি প্রধান অঙ্গ বা সেক্রেটারিয়েট থাকিবে এবং সনদ অনুযায়ী প্রত্যেকের সুনির্দিষ্ট কর্তব্য থাকিবে। সমস্ত সদস্য রাষ্ট্র নিয়া একটি জেনারেল এসেম্বলি গঠিত হইবে এবং সেখানে যে কোন সদস্য যে কোন বিষয় নিয়া (চার্টারের বর্ণিত বিষয় অনুযায়ী) আলোচনা উত্থাপন করিতে পারিবেন। আর সিকিউরিটি কাউন্সিল আগ্রাসন বা যুদ্ধ নিবারণের জন্য সামরিক সহায়তা পাইবেন এবং এই সাহায্য দেওয়ার জন্য একটি মিলিটারি ষ্টাফ কমিটি গঠিত হইবে। তবে আগ্রাসন বা যুদ্ধ নিবারণের ক্ষেত্রে সিকিউরিটি কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্যসহ ৭ জন সদস্যকেই একমত হইতে হইবে।

সনদের নিয়মানুযায়ী ১৫ জন সদস্য নিয়া একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয়ও গঠিত হইল এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে অনুশীলন ও রিপোর্ট করার জন্য একটি সোস্যাল অ্যাণ্ড ইকোনোমিক কাউন্সিল গঠিত হইল। পৃথিবীব্যাপী জনগণের পূর্ণ জীবিকার ব্যবস্থা ও জীবনের মান উন্নয়নের উদ্দেশ্য নিয়াই এই সমস্ত সংস্থা গঠিত হইল।

এগুলি ছাড়াও প্রথম মহাযুদ্ধের জের স্বরূপ যে-সমস্ত ভূমিখণ্ড, অঞ্চল ও দ্বীপপুঞ্জ পরাধীন কিংবা লীগের ম্যাণ্ডেট্ অনুযায়ী ইজারাভুক্ত ছিল—বিশেষত প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের পরিচালনাধীন ছিল, সেই সমস্ত দ্বীপ ও এলাকা নূতন করিয়া বিলিব্যবস্থার প্রশ্ন উঠিল। কারণ, জাপানের দখলদারি বা ইজারা থেকে এই সমস্ত

(৫) The Second Great War—Vol. 9, p. 3935.

অঞ্চল ও দ্বীপগুলিকে মুক্তি দেওয়া হইবে, এই নীতি আগেই মিত্রপক্ষের তরফ থেকে ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু সদ্য গৃহীত রাষ্ট্রসংঘের চার্টার অনুযায়ী এগুলির বিলি-ব্যবস্থা করিতে গিয়া দেখা গেল যে, সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রসমূহ এই বিষয়ে খুব উৎসাহী নন। অথচ সনদ অনুযায়ী সকলের সমান অধিকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা ঘোষিত হইয়াছিল। এদিক দিয়া সোভিয়েত রাশিয়ার বিবেকবুদ্ধি ও নীতি পরিষ্কার ছিল। কারণ, তাঁরা সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতার বিরোধী ছিলেন। পরলোকগত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টও উপনিবেশের বিরোধী ছিলেন এবং যদিও তাঁর উত্তরাধিকারী প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান মুখে অনুরূপ কথা বলিতেন, তথাপি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার বিপুল ঔপনিবেশিক স্বার্থের (গুয়াম, ফিলিপিন্স ইত্যাদি) কথা মার্কিন প্রতিনিধিরা ভুলিতে পারিলেন না। বিশেষত মার্শাল, ম্যারিয়ানা ও ক্যারোলাইন দ্বীপপুঞ্জ ও অন্যান্য দ্বীপ, যেগুলি জাপানের শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হইয়াছিল, সেগুলির বিষয়ে মার্কিন নিরাপত্তার প্রশ্ন উঠিল। এছাড়া বৃটিশ ও ওলন্দাজদের সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের প্রশ্ন তো ছিলই। (৬)

সুতরাং এই সমস্ত দ্বীপ, ভূখণ্ড ও অঞ্চল সম্পর্কে সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত পশ্চিমী মিত্রবর্গের মতভেদ দেখা দিল এবং রাষ্ট্রসংঘের ট্রাস্টিশিপ বা অছিগিরির অধীন আনয়নের প্রশ্নে বিতণ্ডার সৃষ্টি হইল। অবশেষে উভয় পক্ষের মতামতের মধ্যে আপোসরফা হিসাবে স্থির হইল যে, ট্রাষ্ট-এলাকাভুক্ত অঞ্চলগুলির জনগণকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত উন্নয়নের প্রশ্নে সহায়তা দেওয়া হইবে এবং ধাপে ধাপে স্বাধীনতা বা স্বাধিকার অর্জনের সুযোগ দেওয়া হইবে।

সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, স্যানফ্রানসিস্কো সম্মেলনে গৃহীত রাষ্ট্রসংঘের (ইউ. এন.) সনদে সমস্ত জাতির সমান অধিকার, আন্তর্জাতিক সহ-যোগিতা, অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা এবং সমস্ত আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করার সুমহৎ ঘোষণা প্রচারিত হইল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারস্পরিক সহযোগিতার ফলেই যে ইউনাইটেড নেশন্স অর্গেনাইজেশন (ইউ. এন. ও) গঠিত হইতে পারিয়াছিল এবং রাজনৈতিক ফলাফলের দিক থেকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার এটি অন্যতম ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। (৭)

১১১টি অনুচ্ছেদে পূর্ণ এই দীর্ঘ দলিলে স্বাক্ষর দিয়া বিজয়ীপক্ষের নেতা ও সমর্থক-গণ মনে করিলেন যে, আগামী দিনের পৃথিবী যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা পাইল। সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ দাঁড়াইয়া উঠিয়া এই দলিলের প্রতি সর্বসম্মত সমর্থন জানাইলেন। (৮)

(৬) Memoirs by Harry S. Truman, p. 305

(৭) অ্যান্টি-হিটলার কোয়ালিশন, পৃষ্ঠা ৩৮৭-৮৯

(৮) দি সেকেণ্ড গ্রেট ওয়ার, ৯ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৩৬।

দশম পর্ব

প্রথম অধ্যায়

মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে মতবিরোধ ঃ
হপকিন্সের পুনরায় মস্কোযাত্রা

পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে মিত্রশক্তি কর্তৃক আক্রমণের ফলে জার্মানী যখন গভীর সঙ্কটে পড়িল, তখন সেনাপতিদেরকে চাঙ্গা করিয়া তোলার জন্য ৩১ আগষ্ট, ১৯৪৪, হিটলার তাঁর সদর দপ্তরে বলিয়াছিলেন :

'একটা সময় আসিবে যখন মিত্রশক্তিদের মধ্যে বিরোধ এমন প্রচণ্ড হইবে যে, তাদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরিবে। ইতিহাসে দেখা যায় যে, সমস্ত কোয়ালিশনই কিছুদিন আগে কিংবা পরে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সুতরাং ধৈর্য ধরিয়া উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করা উচিত।...'

এর তিন মাস পর পশ্চিম রণাঙ্গনে পাল্টা আক্রমণের (আর্দেনেসের যুদ্ধ) আগে ১২ ডিসেম্বর, ১৯৪৪, হিটলার পুনরায় তাঁর সেনাপতিদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক বিষয়ের অবতারণা করিয়া বলিলেন :

'ইতিহাসে আমাদের শত্রুদের মত এমন বিচিত্র পাঁচমেশালি এবং নানা উদ্দেশ্য নিয়া গঠিত কোয়ালিশন আর কখনও দেখা যায় নি। একদিকে অতি-ধনিক রাষ্ট্র এবং অন্যদিকে অতি-মার্কসবাদী রাষ্ট্র। একদিকে একটা মুমূর্ষু সাম্রাজ্য বৃটেন, অন্য দিকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভের জন্য একটা কলোনী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই কোয়ালিশনের প্রত্যেকটি অংশীদারের রয়েছে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের অভিলাষ...আমেরিকা চাইছে ইংলণ্ডের উত্তরাধিকার লাভের জন্যে, ইংলণ্ড চাইছে তার উপনিবেশগুলি ও ভূমধ্যসাগরে প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্যে...এদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে।' (১)

হিটলার যতই দুশমন হোন এবং এই কথাগুলি যে উদ্দেশ্যেই বলিয়া থাকুন না কেন, তাঁর মন্তব্যের মধ্যে কিন্তু গভীর সত্য নিহিত ছিল। কারণ, মহাযুদ্ধ যতই শেষ হইয়া আসিতেছিল, ততই সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন—এই ঐতিহাসিক কোয়ালিশনের মধ্যে ভাঙ্গন ধরিতেছিল এবং এই তিন পক্ষের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন মিল ছিল না—একমাত্র নাৎসী জার্মানীকে পরাজিত করা ছাড়া। কিন্তু যখন এই তিনপক্ষের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ ও ভাঙ্গন দেখা দিল, তখন হিটলার মুসোলিনী গতায়ু এবং ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গ চূর্ণ। ভাগ্যক্রমে মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে মহামৈত্রী শেষ হইয়া যায় নাই। এর জন্যে সর্বাধিক প্রশংসা প্রাপ্য বোধ হয় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ধৈর্য ও উদারতার এবং ষ্ট্যালিনের সঙ্গে তাঁর মিত্রজনোচিত মনোভাবের দৃঢ়তার। যদিও ইয়াল্টা সম্মেলনে ষ্ট্যালিন চার্চিলকে 'পৃথিবীর

(১) উইলিয়াম শাইরারপৃষ্ঠা ১২৯১ এবং ১২৯৭

সবচেয়ে সাহসী সরকারী পুরুষ' বলিয়া উচ্ছ্বাসপূর্ণ স্তুতিবাদ করিয়াছিলেন, তথাপি স্ট্যালিন কিন্তু রুজভেল্টের প্রতিই বেশী অনুরাগসম্পন্ন ছিলেন এবং তিনি যথার্থই অনুমান করিয়াছিলেন যে, মহাযুদ্ধের শেষে এমন সমস্ত কঠিন সমস্যা দেখা দিবে, যার জন্য তিন বৃহৎ শক্তির যুদ্ধের সময়কার মতই ঐক্য ও সহযোগীতার দরকার হইবে। কিন্তু যুদ্ধের অন্তিম লগ্নেই ঐক্যের মধ্যে ভাঙ্গন ধরিল—বিশেষ ভাবে রুজভেল্টের মৃত্যুর প ।

মার্কিন সামরিক লেখকগণ ইয়াল্টা চুক্তির প্রতি ষ্ট্যালিনের 'বিশ্বাসঘাতকতা'র বহু অভিযোগ করিয়াছেন। কাহারও কাহারও অনুমান এই যে, সোভিয়েত পলিট্‌ব্যুরোর চরমবাদী নেতাদের বিপ্লবী তত্ত্বের চাপের ফলেই ষ্ট্যালিনের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল—যদিও এর 'বোধগম্য কোন প্রমাণ নেই'। তবে ইয়াল্টার পর সোভিয়েত রাশিয়ার নীতি পরিবর্তনের অন্য কারণও থাকিতে পারে। যুদ্ধের পর ইউরোপে মার্কিন সৈন্যেরা দুই বছরের বেশী অবস্থান করিবে না, রুজভেল্টের এই মন্তব্যের তাৎপর্য হয়তো ষ্ট্যালিন উপলব্ধি করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ ইয়াল্টার পর রুশরা পোল্যাণ্ডে যে তীব্র ও তিক্ত শত্রুভাব সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তার জন্য ষ্ট্যালিন হয়তো সেখানে কিংবা পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে আর কোন 'চান্স্' না নিতে হয়, সেজন্য দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ ছিলেন। তাঁর কঠোরতাব মূলে এই সমস্ত কারণও থাকিতে পারে। (২)

অপর দিকে ফ্যাসিস্ট জার্মানীর আক্রমণের ফলে সোভিয়েত রাশিয়া চার বছর ধরিয়া বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং ১৯৪৫ সালে নিদারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়িয়াছিল। কৃষিকার্য ও কলকারখানার উৎপাদনকার্য থেকে অধিকাংশ পুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে যোগদান করিয়াছিল। সুতরাং দেশের সমস্ত কৃষিকার্য একমাত্র মেয়েদের চালাইতে হইয়াছিল—এই রেকর্ডের গৌরব একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়ার। অধিকন্তু যুদ্ধের সময় কলকারখানার শ্রমিকদেরও শতকরা ৫১ ভাগ ছিল স্ত্রীলোক। কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও জনগণের অভাব-অনটনের সীমা ছিল না। বিশেষভাবে খাদ্যের অভাবে তাদের অধিকাংশই ক্ষুধার্ত ছিল। সুতরাং স্বভাবতই যুদ্ধের পর এই ভয়াবহ ক্ষতির জন্য সমস্ত দেশের পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত নেতারা মিত্র আমেরিকার কাছ থেকে ঋণের আকারে সাহায্যের প্রত্যাশা করিতেছিলেন। কিন্তু মার্চ ও এপ্রিল মাসে (যখন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিতেছিল) মার্কিন সরকারী মহল থেকে এই বিষয়ে বাধা আসিল এবং ঠিক এই সময় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট হঠাৎ মারা গেলেন—১২ এপ্রিল, ১৯৪৫। রুজভেল্টের মৃত্যুতে সোভিয়েত রাশিয়ার জনগণ ও নেতৃবৃন্দ কেবল গভীরভাবে শোকাহত হইলেন না, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিতও হইলেন। কেন না, রাশিয়ার প্রতি রুজভেল্টের যে সদিচ্ছা ছিল এবং তিনি যে সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখিতে উৎসুক ছিলেন, সে বিষয়ে রুশ জনগণও অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। কিন্তু রুজভেল্টের মৃত্যুর পর মার্কিন মিত্রতার নীতি অব্যাহত থাকিবে কিনা, সেই বিষয়ে রাশিয়ার মনে সংশয়

(২) আলেকজাণ্ডার ওয়ার্থ, পৃষ্ঠা ৮৭৩-৮৭৭

ও শঙ্কা দেখা দিল এবং সেই শঙ্কা একেবারে হাতে হাতে ফলিয়া গেল। কেন না, রুজভেল্টের শূন্যপদে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান যখন প্রেসিডেণ্টের গদীতে অভিষিক্ত হইলেন, তখন তিনি তাঁর 'সোভিয়েত নীতিব বোধন' করিলেন ইউরোপীয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেণ্ড ও লীজ বা কর্জ ও ইজারা আইন অনুযায়ী সাহায্য দেওয়া বন্ধ করার দ্বারা। স্বভাবতই ষ্ট্যালিন এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এমন কি, কর্জ ও ইজারা ব্যবস্থার যিনি মার্কিন বড়কর্তা ছিলেন, সেই ষ্টেটিনিয়াস পর্যন্ত এটাকে 'অসময়োচিত' এবং 'অবিশ্বাস্য ব্যবস্থা' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন। (৩)

অবশ্য যুদ্ধে জয়লাভেব দ্বারা রুশদের মধ্যে জাতীয় গর্বও বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং তাদের মধ্যে অনেকেই মনে করিত যে, তারা একাই জার্মানীকে হারাইয়া দিতে ও ইউরোপ দখল করিয়া নিতে পারিত (যদিও ষ্ট্যালিন তা' কখনও মনে করিতেন না)। এজন্য বার্লিনে মিত্রপক্ষের উপস্থিতি ও অবস্থান অনেক রুশ সৈন্যের অপছন্দের কারণ ছিল। এই সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার নিয়াও দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধের উত্তেজনা সঞ্চারিত হইয়াছিল।

অবশ্য উচ্চতর স্তরে সেনাপতিবৃন্দের মহলে সদ্ভাব ও সৌজন্যবোধের কোন অভাব ছিল না। যেমন, মার্শাল জুকোভ জেনারেল আইজেনহাওয়ার ও ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারীকে 'অর্ডার অব্ ভিক্টোরি' উপাধিতে ভূষিত করিলেন এবং পাল্টা বৃটিশ পক্ষ থেকে মণ্টগোমারী জুকোভকে জি. সি. বি, রকসোভোস্কিকে কে. সি বি, শকোলোভস্কিকে ও. বি. ই এবং অন্যান্যকেও অনুরূপ উপাধির দ্বারা সম্মানিত করিলেন। কিন্তু এর বিপরীত চিত্রও আছে। যেমন, মার্শাল টিটো। টিটো আড্রিয়াতিক উপসাগরের কূলে ট্রিষ্ট্ (Trieste) বন্দর দখলের চেষ্টা করিলে ভূমধ্যসাগরীয় প্রধান বৃটিশ সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল আলেকজাণ্ডার চার্চিলের নির্দেশে যুগোশ্লাভদের প্রতি যে 'উদ্ধত' ও 'অসম্মানজনক' ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাতে সোভিয়েত সংবাদপত্রগুলি তাঁর তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। গ্রীসে বৃটিশ দমননীতিও (স্থানীয় কমিউনিষ্ট পার্টিজানদের বিরুদ্ধে) রুশ সংবাদপত্রগুলির উষ্মার কারণ হইয়াছিল। উত্তর ইতালীতে কমিউনিষ্ট পার্টি নেতা নেন্নি (Nenni) এবং তোগলিয়াত্তিকে (Togliatti) বৃটিশ পক্ষ সাময়িকভাবে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। এই সমস্ত নানা ঘটনা নিয়া পশ্চিমের মিত্রপক্ষ ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে মাঝে মাঝে বিরোধ লাগিয়াই ছিল।

* * *

কিন্তু বিরোধের আরও গুরুতর কারণ ঘটিয়াছিল। যখন বার্লিন ও হিটলারী জার্মানীর পতনে সারা বিশ্বের স্বাধীনতাকামী ও গণতন্ত্রীবাদী মহলে আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখা দিয়াছিল এবং বিশেষভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি জনগণের প্রীতিপূর্ণ মনোভাব আত্মপ্রকাশ করিতেছিল, তখন লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের

(৩) ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা ৮৭৭

প্রতিক্রিয়াশীল মহল সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি চাপ সৃষ্টির কৌশল খুঁজিতেছিলেন। ১৯৪৫-এর এপ্রিল-মে মাসে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে গিয়া ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্য-বাহিনী জার্মানীর সেই সমস্ত অঞ্চলে ঢুকিয়া পড়িল সে অঞ্চলগুলি রাশিয়া, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে সোভিয়েত অধিকৃত এলাকারূপে বিবেচিত হওয়ার কথা। এই এলাকাগুলির মধ্যে ছিল লাইপজিগ, এরফুর্ট, প্লাউয়েন ও ম্যাগডেবুর্গ। সামরিক প্রয়োজনে এবং রণক্রিয়ার জন্য মিত্রবাহিনীর এই সমস্ত অঞ্চলে প্রবেশে রাশিয়ার আপত্তি ছিল না। কিন্তু এই সামরিক প্রয়োজনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে খাটাইবার জন্য বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ইঙ্গ মার্কিন বাহিনীকে প্রস্তাবিত সোভিয়েত অধিকৃত এলাকা থেকে সরাইয়া দিতে টালবাহনা করিতে লাগিলেন। কারণ, চার্চিল তাঁর 'বলকান রণনীতি' খাটাইতে ইতিপূর্বেই ব্যর্থ হইয়াছিলেন এবং তারপর বার্লিন, প্রাগ ও ভিয়েনা দখল করিতেও পারিলেন না—এগুলি সব লালফোজকর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। সুতরাং ক্রুদ্ধ চার্চিল সোভিয়েত রাশিয়াকে একটা আপোস মীমাংসায় বাধ্য করার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী মারফৎ চাপ সৃষ্টি করিতে চাহিলেন। তিনি বলিলেন—'আমাদের হাতে এমন কতকগুলি লাভজনক অস্ত্র আছে, যেগুলির দ্বারা আমরা (রাশিয়ার সহিত) একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় পৌছুতে পারি। যেমন, প্রথমত পোল্যাণ্ডের ব্যাপারে সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত জার্মানীতে আমাদের প্রস্তাবিত দখলীকৃত এলাকায় আমরা ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যবাহিনীকে বর্তমান অবস্থান থেকে প্রত্যাহার করিয়া নিতে পারি না। তারপর আমাদের দেখিতে হইবে জার্মানীতে রুশ অধিকৃত এলাকার চরিত্র কি, কিংবা দানিয়ুব উপত্যকায় রুশ নিয়ন্ত্রণ বা রুশীকৃত অঞ্চলগুলি, বিশেষভাবে অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লাভাকিয়া ও বলকানে রাশিয়া কি মূর্তি ধারণ করে, সেটাও আমাদের দেখিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, আমরা বাল্টিক সাগর বা কৃষ্ণসাগর দিয়া রাশিয়ার বহির্গমন সম্পর্কে একটা সন্তোষজনক ব্যবস্থা করিতে পারি।' (৪)

৬ মে তারিখ চার্চিল তাঁর এই সমস্ত মতামত প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকেও লিখিয়া পাঠাইলেন। "যুগোশ্লাভিয়া, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়াতে এবং ডেনমার্কসহ লুবেক পর্যন্ত আমাদের ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী যে 'পজিশন' দখল করিয়া আছে, সেগুলি আমাদের কঠোরভাবে অব্যাহত রাখা উচিত।"

একই সময়ে জেনারেল ইসমেকে (Ismay) নির্দেশ দিলেন যে, সম্মিলিত সেনানী-মণ্ডলীর প্রধানগণ, যেন ইউরোপের মিত্রবাহিনীর সেনাপতিদিগকে ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যদল প্রত্যাহার না করার জন্য উপদেশ দেন।

কিন্তু চার্চিল এখানেই থামিয়া থাকিলেন না। যখন মিত্রবাহিনী জার্মানীকে চারিদিক থেকে আঘাতের পর আঘাত হানিয়া জর্জর করিতেছিলেন এবং হিটলারের শেষ সৈন্যদলের 'দফা নিকাশ' করিতেছিল, তখন তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি মণ্টগোমারীকে এই মর্মে এক টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিল যে, "জার্মান অস্ত্রশস্ত্র যেন এমনভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা হয় যাতে সোভিয়েতের অগ্রাভিযান

(৪) উইনষ্টোন চার্চিল, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৯

প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য আমরা ওই সমস্ত অস্ত্র সহজেই তাদের হাতে তুলিয়া দিতে পারি।" (৫)

এদিকে পোল্যাণ্ড নিয়া রাশিয়া ও পশ্চিমীদের সঙ্গে তীব্র মতবিরোধ চলিতেছিল এবং এই বিরোধ কঠোর রূপ ধারণ করিল ১৯৪৫ এর গ্রীষ্মকালের প্রথম ভাগে, যখন লণ্ডনে আশ্রয়প্রাপ্ত পোলিশদের গুপ্ত এজেন্টরা এবং জনগণের একাংশ রুশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরেই গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ চালাইল এবং লুবলিন গবর্নমেণ্টের (সোভিয়েত সমর্থিত) প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধেও আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইল। তখন সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ পোলিশ সন্ত্রাসবাদী দলের (যারা আণ্ডারগ্রাউণ্ডে কাজ করিত) ১৫।১৬ জন সদস্যকে গ্রেপ্তার করিলেন। স্বভাবতই চার্চিল এই সংবাদে অত্যন্ত বিচলিত হইলেন এবং ২৮ এপ্রিল এই বিষয়ে ষ্ট্যালিনকে এক পত্র দিলেন। কিন্তু ষ্ট্যালিন নরম হওয়ার পাত্র ছিলেন না। তিনি ৪ মে চার্চিলকে এক জবাবে জানাইয়া দিলেন যে, ধৃত পোলিশ সদস্যরা লালফৌজের বিরুদ্ধে সাবোতাজ ও সন্ত্রাসমূলক কাজের জন্য দায়ী। অতএব এদেরকে আদালতে অভিযুক্ত এবং বিচার করা হইবে।

আদালতে এদের ধৃত নেতা ওকুলিসকি (Okulicki) স্বীকার করিলেন যে, সোভিয়েত সরকারকে অবিশ্বাস করিয়া তাঁরা ভুল করিয়াছিলেন। তবে, মনে রাখিতে হইবে জারের রাশিয়া ১২৩ বছর ধরিয়া পোল্যাণ্ডে অত্যাচার করিয়াছে। তথাপি লণ্ডনস্থিত পোলিশ সরকারকে তাঁদের বিশ্বাস করা উচিত হয় নাই এবং এই সরকারের পাল্লায় পড়িয়াই তাঁরা পোল্যাণ্ডে আত্মগোপনপূর্বক রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত আত্মস্বীকৃতির ফলে রুশরা মনে করিলেন যে, লণ্ডনস্থিত পোলিশ সরকারের আসল চেহারা চার্চিলের নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। এজন্য ষ্ট্যালিন খুশী হইয়াছিলেন। ফলে, ধৃত ও অভিযুক্ত পোলিশদের লঘুদণ্ড দেওয়া হইল, এমন কি নেতৃস্থানীয় ওকুলিসকিকে প্রাণদণ্ডের বদলে মাত্র ১০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হইল।

* * *

হ্যারি এস ট্রুম্যান হোয়াইট হাউসে নতুন গদীয়ান হইলেন। কিন্তু তিনি যখন সেনেটর ছিলেন, তখন থেকেই সোভিয়েত বিরোধী ছিলেন। এখন অবশ্য রুজভেল্টের শূন্য সিংহাসনে অভিষিক্ত হওয়ায় তাঁর দায়িত্ব শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু বিশ্বব্যাপী এই দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া তিনি গোড়াতেই এক কাণ্ড বাধাইলেন। জার্মানীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি রুজভেল্ট প্রবর্তিত বিখ্যাত লেণ্ড লীজ অনুযায়ী রাশিয়াসহ মিত্রশক্তিবর্গকে সাহায্যদানের ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দিলেন— একথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বিষয়ে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের নিজস্ব বক্তব্য নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য এবং সেই বক্তব্য অত্যন্ত কৌতূহলকর। তিনি তাঁর

(৫) প্রাভদা, ২৫ নভেম্বর, ১৯৫৪

আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে, বৈদেশিক অর্থনীতির নিয়ামক বা প্রধান লিও ক্রোলে (Crowley) এবং অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী যোসেফ গ্রু (Grew) ৮ মে তারিখ তাঁর নিকট আসিয়া বলিলেন যে, লেণ্ড লীজ সম্পর্কে একটি নতুন দলিল প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট অনুমোদন করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু স্বাক্ষর দিয়ে যান নাই। তাঁরা বলিলেন যে জার্মানীর আত্মসমর্পণের পর লেণ্ড লীজ কমাইয়া দেওয়া উচিত। 'তাঁরা আমাকে এই নতুন দলিল স্বাক্ষর করিতে বলিলেন। আমিও হাত বাড়াইয়া কলমটা নিলাম এবং দলিলটি না পড়িয়াই স্বাক্ষর করিয়া দিলাম।'

ট্রুম্যান স্বীকার করিয়াছেন যে, এই দলিল স্বাক্ষরের পর যেন একটা ঝড় ভাঙ্গিয়া পড়িল। রাশিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে এই দলিলে স্বাক্ষরের দ্বারা কার্যত সমস্ত সরবরাহ পাঠানো বন্ধ হইয়া গেল। বৃটেনও দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া মনে করিল যে, এই আদেশ বিশেষভাবে তাদের বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য। প্রচুর খাদ্য, যন্ত্র, জামাকাপড় এই সরবরাহের ফলে রাশিয়া পাইতেছিল। কিন্তু সেখানে যেন ভীমরুলের চাকে খোঁচা পড়িল এবং রুশরা এই কার্যকে 'অমিত্রজনোচিত' বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিল। যে সমস্ত জাহাজ সমুদ্রবক্ষে ছিল এই নতুন আদেশের ফলে সেগুলি মাল খালাস করার জন্য আমেরিকার বন্দরে ফিরিয়া আসিতে লাগিল 'আমরা যেন অনিচ্ছাকৃতভাবে ষ্ট্যালিনের হাতে বিরোধের একটা অস্ত্র তুলিয়া দিলাম।' (৬)

ফলে, শেষ পর্যন্ত ট্রুম্যান এই আদেশ বাতিল করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এত বড় ক্ষমতাবান এবং দায়িত্বশীল প্রেসিডেণ্ট এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা দলিল না পড়িয়াই সই করিয়া দিলেন, এটা কি একটা তাজ্জব ব্যাপার নয়? অথচ তিনি নিজেই বলিতেছেন যে, ইয়াল্টাতে রুশদের সঙ্গে আমাদের এই মর্মে একটা চুক্তি হইয়াছিল যে, জার্মানীর পরাজয়ের তিন মাস পরেই রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে এবং এই সময় মার্কিন জনমতও রাশিয়ার খুব অনুকূলে ছিল। কারণ, রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের দ্বারা বহু আমেরিকান প্রাণও বাঁচাইয়া দিয়াছিল। অপর পক্ষে চীনে তখন দশ লক্ষাধিক জাপানী সৈন্য ছিল এবং তারা অনির্দিষ্টকালপর্যন্ত যুদ্ধ চালাইতে প্রস্তুত ছিল। 'সুতরাং আমরা জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে যুদ্ধে নামাইতে খুব ব্যগ্র ছিলাম। কেন না, রাশিয়ার সহিত চীনের সীমান্তের যোগ রহিয়াছে, আর ইউরোপের সঙ্গে রহিয়াছে রেলপথের যোগাযোগ। অন্যদিকে জাপান ভাইরেন থেকে শুরু করিয়া হংকং পর্যন্ত চীনের সমস্ত সমুদ্র-বন্দর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখিয়াছিল।'

অতএব জাপানী যুদ্ধের কথা মনে রাখিয়া ট্রুম্যান মার্কিন সরকারী নীতির নূতন ব্যাখ্যা করিয়া এই আশ্বাস দিলেন যে, আগেকার সমস্ত চুক্তি ও শর্ত অনুসারে রাশিয়াকে সমস্ত সরবরাহ জোগান দেওয়া হইবে।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলও উদ্বিগ্ন হইয়া ব্যক্তিগতভাবে এক টেলিগ্রাম পাঠাইয়া-

---

(৬) 1945—Year of Decisions, Truman, p. 254-55

ছিলেন এবং রাশিয়ার মত বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও নেদারল্যাণ্ডসকেও সরবরাহের আশ্বাস দেওয়া হইল।

কর্জ ও ইজারা আইন অনুসারে মিত্রপক্ষীয় শক্তিগুলিকে সাহায্যদান প্রসঙ্গে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের অসামান্য প্রতিভার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন :

'The story of Land-Lease is a monument to the genius of Franklin Roosevelt. A President could no more get the Congres to make an outright loan of forty-two billion dollars to foreign countries, even to win a war, than he could fly to the moon, but Roosevelt accomplished the same thing through the idea of Land-Lease.'

অর্থাৎ কর্জ ও ইজারার কাহিনী ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের অসামান্য প্রতিভার স্মৃতিস্তম্ভের মত. এমন কি কোন যুদ্ধজয়ের জন্যও কংগ্রেসকে দিয়া সোজাসুজি চার হাজার দুইশত কোটি ডলার মঞ্জুর করানোর চেয়ে বরং চাঁদে উড়িয়া যাওয়া সহজ ছিল। কিন্তু কর্জ ও ইজারার ব্যবস্থার মারফৎ রুজভেল্ট সেই অসাধ্য সাধন করিলেন। (৭)

ট্রুম্যান তাঁর আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে, যুদ্ধের শেষে ইউরোপে বহু জটিল সমস্যা দেখা দিল। গোড়ার দিকে জার্মানী ও অস্ট্রিয়া দখল নিয়া চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি হইল এবং উভয় স্থানেই বৃহৎ সমস্যা দেখা দিল কণ্ট্রোল মেসিনারি বা উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপন এবং মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদিগকে স্ব স্ব নির্দিষ্ট এলাকায় (zone) প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া সম্পর্কে। অবশ্য এ জন্যে ইউরোপীয় এ্যাডভাইসরি কমিশন গঠিত হইয়াছিল এবং স্থির হইয়াছিল যে, মিত্রপক্ষীয় শক্তিবর্গের স্ব স্ব দখলদারি এলাকা নির্দিষ্ট হওয়ার পর বৃটিশ, মার্কিন, ফরাসী ও সোভিয়েত—এই চতুঃশক্তির প্রধান সেনাপতিদেরকে নিয়া সমগ্র জার্মানীর পরিচালনার জন্য একটি কণ্ট্রোল কাউন্সিল গঠিত হইবে।...

১১ মে প্রধানমন্ত্রী চার্চিল প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানকে এই মর্মে টেলিগ্রাম করিলেন—"আমাদের সৈন্যদিগকে যেন অগ্রগতির চরম সীমানা পর্যন্ত অবস্থান করিতে দেওয়া হয়।' যদিও চার্চিল দখলীকৃত এলাকা সম্পর্কে একমত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি তাগিদ দিতে লাগিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত রাশিয়ানরা পোল্যাণ্ড ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মিত্র সৈন্যদের 'পজিশন ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসা উচিত হইবে না।'

কিন্তু ট্রুম্যান এর জবাবে চার্চিলকে জানাইয়া দিলেন যে, তারা দখলীকৃত এলাকা ভাগ করা সম্পর্কে আগে যে সমস্ত কথা দিয়াছেন, সে কথা এখন খেলাপ করিতে পারেন না। বিশেষতঃ গুরুতর সামরিক প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে।

চার্চিল ও ট্রুম্যানের মধ্যে এই সমস্ত বিষয় নিয়া কয়েকটি বার্তা বিনিময় হইল এবং প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের একটি তারের জবাবে ষ্ট্যালিন জানাইয়া দিলেন (১৮ মে) যে, অস্ট্রিয়া ও ভিয়েনা সম্পর্কে চার্চিল ও রুজভেল্টের সঙ্গে কথা অনুসারে 'ইউরোপীয় পরামর্শদাতা কমিশনের' সিদ্ধান্তই মানিয়া লওয়া হইবে।...

(৭) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৬২

১৬ মে তারিখে চার্চিল ও জেনারেল আইজেনহাওয়ারের মধ্যে যে সমস্ত আলোচনা হইয়াছিল, তাতে দেখা যায় যে, চার্চিল মিত্রপক্ষকে সমগ্র জার্মানীর দায়িত্ব নিতে নিষেধ করিতেছেন। মিত্রপক্ষের কেবল এইটুকুই দেখা উচিত যে, জার্মানী যেন আর একটা যুদ্ধ বাধাইতে না পারে। কিন্তু তার চেয়ে বেশী কিছু করা ঠিক হইবে না। জার্মানদের ভাগ্য জার্মানীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত এবং যে সমস্ত জার্মান সেনাপতি মিত্রপক্ষের হাতে আটক আছেন, তাঁদেরকে জার্মানী শাসনের জন্য নিযুক্ত করা উচিত।

৪ জুন চার্চিল পুনরায় ট্রুম্যানকে তাগিদ দিলেন যে, আমেরিকান সৈন্যদেরকে যেন দখলীকৃত এলাকায় প্রত্যাহার করিয়া আনা না হয়। কারণ, অন্যথা সোভিয়েত সামরিক শক্তি পশ্চিম ইউরোপের মর্মকেন্দ্রে আসিয়া প্রবেশ করিবে এবং পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে লৌহ যবনিকার সৃষ্টি হইবে।

* * *

সাম্রাজ্যবাদী চার্চিলের কমিউনিজম ও সোভিয়েত-বিরোধিতা সর্বজনবিদিত। কিন্তু প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের গোঁড়ামি ছিল না। তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে, সোভিয়েত রাশিয়ার মত বৃহৎ শক্তির সঙ্গে সদ্ভাব ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত না হইলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্বস্তি রক্ষা কঠিন হইবে। এজন্য রুজভেল্ট আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার পরেই সোভিয়েত রাশিয়াকে স্বীকৃতি দিলেন এবং রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিলেন। তারপর থেকেই কিংবা তৃতীয় দশক থেকেই সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্ক সহৃদয়তাপূর্ণ ছিল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও গভীর হইল। হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে রুজভেল্ট-ষ্ট্যালিন-চার্চিল মহাজোট বা গ্রেট কোয়ালিশন ইতিহাসের নতুন অধ্যায় রচনা করিল এবং তেহরাণ ও ইয়াল্টার শীর্ষ সম্মেলনগুলিতে তিনশক্তির মৈত্রী ও সহযোগিতা ঘনিষ্ঠতর হইল এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীর শান্তি রক্ষার জন্য 'ইউনাইটেড নেশন্স অর্গেনাইজেশন'-এর ভিত্তি স্থাপিত হইল এবং রুজভেল্ট বিশ্বাস করিতেন যে, সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের সময় যে সহযোগিতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার জন্য সেই সম্পর্ক গাঢ়তর হইবে। কিন্তু যুদ্ধের চূড়ান্ত জয় বা জার্মানীর আত্মসমর্পণের পূর্বেই রুজভেল্ট মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ফলে, লণ্ডনের এবং ওয়াশিংটনের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী যেন একটা 'সুযোগ' পাইয়া গেলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এঁদের মধ্যে যাঁরা প্রধান ছিলেন তাঁরা—যেমন, আর্থার ভ্যানডেনবুর্গ, জন ফস্টার ডালেস, জেমস এ ফরেস্টার (নৌসচিব) প্রভৃতি সরকারী মহলের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি 'কঠোর নীতি' অবলম্বনের জন্য চাপ দিলেন।

এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নূতন প্রেসিডেন্ট ট্রুমান সম্পর্কে স্মরণ রাখা উচিত যে, হিটলার কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পরেই তিনি (তখন তিনি সেনেটর) প্রকাশ্যে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, রাশিয়া ও জার্মানী পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দ্বারা ধ্বংস হোক, এটাই তাঁরা দেখিতে চান। সুতরাং ট্রুম্যান প্রেসিডেন্ট

পদে বৃত হওয়ার পরেই এতদিনকার রুজভেল্টের নীতির পুনর্মূল্যায়ন করিতে চাহিলেন। ২৩শে এপ্রিল এজন্য তিনি হোয়াইট হাউজে বিশিষ্ট মার্কিন নেতাদের একটি সম্মেলন আহ্বান করিলেন সোভিয়েত সম্পর্কে মার্কিন নীতি নির্ধারণের জন্য। ওয়াশিংটনের অনেক দায়িত্বশীল শীর্ষস্থানীয় নেতা এই বৈঠকে যোগ দিলেন। যেমন—পররাষ্ট্রমন্ত্রী ষ্টেটিনিয়াস, সমরসচিব ষ্টিমসন, নৌ-সচিব ফরেষ্টার, এ্যাডমিরাল কিং, এ্যাডমিরাল লীহাই, জেনারেল মার্শাল, জেনারেল ডীন, রাষ্ট্রদূত হ্যারিম্যান এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের বিশিষ্ট কয়েকজন অফিসার। নতুন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্ক এবং দুই গবর্নমেন্টের মধ্যে যে সমস্ত প্রশ্ন ও সমস্যা নিয়া মতভেদ দেখা দিয়াছে, সে বিষয়ে তাঁদের মতামত আহ্বান করিলেন। বিশেষভাবে পোল্যাণ্ড সম্পর্কেই তাঁদের মাথাব্যথা বেশী ছিল। কিন্তু উপস্থিত সকলেই সোভিয়েত বিরোধী ছিলেন না। যেমন, সমরসচিব ষ্টিমসন বলিলেন—"এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের ধীরে সুস্থেই চলা উচিত এবং সম্পর্ক যাতে ছিন্ন না হয়, তেমন নীতিই অনুসরণ করা উচিত। রুশরা তাঁদের যুদ্ধের দায়িত্ব এবং সামরিক অভিযান অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে চালাইয়াছেন। সুতরাং এই একটি ঘটনা (পোল্যাণ্ড) উপলক্ষে তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইবে। কিন্তু নৌ-সচিব ফরেষ্টার সোভিয়েতের প্রতি মার্কিন নীতির পুনর্মূল্যায়নের উপর জোর দিলেন। এ্যাডমিরাল লীহাই ষ্টিমসনের মতামত সমর্থন করিলেন। কিন্তু হ্যারিম্যান ফরেষ্টারের মতামতের প্রতি সমর্থন জানাইলেন। সভার শেষে স্বয়ং ট্রুম্যান রাশিয়ার প্রতি 'শক্তনীতি' অনুসরণের পক্ষে মত দিলেন। (৮)

এদিকে অতলান্তিকের ওপারে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং তাঁর সমর্থকরা জার্মান সামরিক শক্তির বিনষ্টি এবং সোভিয়েত রাশিয়ার জয়লাভের জন্য শঙ্কিত হইলেন। চার্চিল আন্তর্জাতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া নতুন রণনীতি ও রাজনৈতিক নীতি 'বাস্তবতার' ভিত্তিতে বিচারপূর্বক ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির উদ্দেশ্যে সাত দফা নীতির কথা ঘোষণা করিলেন। যথা—

(১) সোভিয়েত রাশিয়া মুক্ত দুনিয়ার পক্ষে ভীষণ বিপদস্বরূপ দেখা দিয়াছে।

(২) তার অগ্রগতির পথ রোধ করার জন্য অবশ্যই অবিলম্বে একটি নতুন ফ্রন্ট খুলিতে হইবে।

(৩) ইউরোপে এই নতুন ফ্রন্ট যতটা সম্ভব পূর্বদিকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(৪) ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যবাহিনীর পক্ষে বার্লিনই হইতেছে সবচেয়ে বড় লক্ষ্য।

(৫) চেকোশ্লভাকিয়ার মুক্তিবিধানে এবং প্রাগে মার্কিন সৈন্যের প্রবেশ ফলাফলের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইবে।

(৬) ভিয়েনা ও অষ্ট্রিয়াকে অবশ্যই পশ্চিমী শক্তিবর্গের নিয়ন্ত্রণাধীন আনিতে হইবে। অন্ততঃ সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত সমান অধিকারের ভিত্তিতে।...

(৭) গণতান্ত্রিক শক্তিবর্গের সৈন্যবাহিনীগুলি বিলুপ্ত হওয়ার আগে পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে সমস্ত প্রধান সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে এবং এই মীমাংসার

---

(৮) দি অ্যান্টি-হিটলার কোয়ালিশন, পৃষ্ঠা ৩৭৩

আগে অধিকৃত জার্মানীর কোন অংশ কিংবা টোটালিটারিয়ান্ অত্যাচার থেকে মুক্ত কোন এলাকা পশ্চিমী মিত্রবর্গ কর্তৃক ছাড়িয়া দেওয়া চলিবে না। (৯)

বলা বাহুল্য যে, এই নীতিগুলি যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ঘাড়ে চাপাইবারও চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ইঙ্গ-মার্কিন-সোভিয়েতের সহযোগিতা ও শান্তিরক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া রুজভেল্ট এগুলি অনুমোদনে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু রুজভেল্টের মৃত্যুর পর প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের 'শক্তনীতির' সুযোগ নিতে চাহিলেন চার্চিল

* * *

৫ জুন বার্লিনে চতুঃশক্তির সেনাপতিরা জার্মানীর পরাজয় সম্পর্কে একটি ঘোষণা-পত্রে স্বাক্ষর দিলেন। সেনাপতিদের এই বৈঠকে রুশ পক্ষ যাঁর যাঁর অধিকৃত এলাকায় সৈন্য সরাইয়া নিতে অনুরোধ জানাইলেন। অন্যথা কণ্ট্রোল কাউন্সিলের কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি হইবে বলিয়া তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন।

এদিকে ট্রুম্যান চার্চিলের মতামত ও অনুরোধ মানিতে রাজী হইলেন না; কারণ, তাঁর মতে জার্মানীর অধিকৃত অঞ্চল সম্পর্কে রুজভেল্ট চার্চিল-ষ্ট্যালিনের আগেকার চুক্তি মান্য করিয়াই চলিতে হইবে। 'অন্যান্য সমস্যার মীমাংসার দাবিতে এই বিষয় নিয়া রাশিয়ার উপর চাপ দেওয়া ঠিক হইবে না'

অপরপক্ষে জেনারেল আইজেনহাওয়ারও রুশ অধিকৃত এলাকায় মার্কিন সৈন্যের অবস্থান বজায় রাখিতে রাজী হইলেন না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে জার্মানীর পরাজয়ের পর সোভিয়েত রাশিয়াকে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য চার্চিল চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু এই বিষয়ে মার্কিন শীর্ষ নেতাদের কাছ থেকে তেমন কোন সমর্থন পাওয়া গেল না। বরং ষ্ট্যালিনের প্রস্তাব অনুসারে স্থির হইল যে, ১লা জুলাই থেকে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদিগকে স্ব স্ব নির্ধারিত এলাকায় প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া হইবে। অবশ্য ট্রুম্যান আগে স্থির করিয়াছিলেন যে, রুশ অধিকৃত অঞ্চল থেকে ২১ জুন মিত্র সৈন্যদেরকে সরাইয়া আনা হইবে এবং চার্চিলও ট্রুম্যানের এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছিলেন। কিন্তু ষ্ট্যালিন জানাইলেন যে, ওই তারিখের মধ্যে সোভিয়েত সেনাপতি মার্শাল জুকোভ বার্লিনে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। সুতরাং ১লা জুলাই থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তাব গৃহীত হইল। (১০)

* * *

জার্মানীর পতন এবং ইউরোপের মুক্তির পর যে সমস্ত জটিল সমস্যা দেখা দিল তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান স্বভাবতই বিব্রত বোধ করিলেন। এজন্য তিনি মে মাসের শেষের দিকে হ্যারি হপকিন্সের সহিত পরামর্শ এবং তাঁর সাহায্য গ্রহণে উৎসুক হইলেন—যদিও তিনি রুজভেল্টের মৃত্যুর পর সরকারী পদে ইস্তফা দিয়াছিলেন। এদিকে তাঁর স্বাস্থ্যও আগের মতই অত্যন্ত খারাপ ছিল। কিন্তু

(৯) উইনস্টোন চার্চিল, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪০

(১০) ট্রুম্যান পৃষ্ঠা, ৩৩৬-৩৩৭

ট্রুম্যান জানিতেন যে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ষ্ট্যালিন এবং যুদ্ধসংক্রান্ত নানাপ্রশ্নে হপকিন্সের প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল এবং সেই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত মূল্যবান। সুতরাং যুদ্ধ শেষের এই জটিল পরিস্থিতিতে ষ্ট্যালিনের মনোভাব কি, তা জানিবার জন্য তিনি হপকিন্সকে মস্কো যাওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেন। অবশ্য ট্রুম্যানের সঙ্গে হপকিন্সের আগেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং অতীতে একসঙ্গে কিছু কাজও করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁর স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ থাকা সত্ত্বেও ট্রুম্যানের অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ট্রুম্যানও হপকিন্সের গভীর দেশপ্রেম এবং তাঁর আত্মত্যাগ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। অধিকন্তু ট্রুম্যান উপলব্ধি করিলেন যে, রাশিয়া সম্পর্কে তিনি যতই 'শক্তিনীতির' কথা ভাবিয়া থাকুন না কেন, পরলোকগত রুজভেল্টের যে নীতি এতদিন ধরিয়া আমেরিকায় এবং আমেরিকার বাহিরের পৃথিবীতে জনসমর্থন লাভ করিয়া আসিতেছিল, সেই নীতি সহসা পরিত্যক্ত হইলে তাঁর পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়া যাইতে পারে। সুতরাং সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্ক যাতে সহসা ভাঙ্গিয়া না যায় এবং আগেকার মত সদ্ভাব বজায় থাকে, সেই লক্ষ্য নিয়াই ট্রুম্যান ষ্ট্যালিনের মতামত জানিবার জন্য হপকিন্সকে মস্কো পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করিলেন। কারণ, তিনি একথাও জানিতেন যে, এই বিষয়ে হপকিন্সের চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তিও আর কেহ নাই।...

আশ্চর্য লোক এই হপকিন্স। নাৎসী জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর জুলাই মাসের শেষে হ্যারি হপকিন্স (তখন ও পীড়িত) ওয়াশিংটন থেকে লণ্ডন এবং লণ্ডন থেকে অত্যন্ত দুঃসাহসের সঙ্গে একটি বোমারু বিমানে চড়িয়া উত্তরতম রাশিয়াতে পৌছিয়াছিলেন এবং সেখান থেকে মস্কো। মস্কোতে ষ্ট্যালিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ এবং আলোচনা ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছিল। এমন কি বলা যাইতে পারে যে, ইঙ্গ-মার্কিন-সোভিয়েতের যে মহাজোট গড়িয়া উঠিয়াছিল, তার প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল হপকিন্সের এই দুঃসাহসিক মস্কো যাত্রা থেকে। কারণ, রাশিয়ার সেই ঘোরতর দুর্দিনেও তিনি রাশিয়ার আত্মরক্ষা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিকট অনুকূল রিপোর্ট দিয়াছিলেন।

এবার আর যুদ্ধ ছিল না। সুতরাং অসুস্থ হপকিন্সের সঙ্গিনী ও সহযাত্রী হইলেন তাঁর স্ত্রী। ২৩ মে তিনি ওয়াশিংটন ত্যাগ করিলেন এবং ২৫ মে সন্ধ্যায় মস্কোতে পৌছিলেন। পরদিন রাত্রি ৮টায় ক্রেমলিনে তিনি ষ্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। প্রারম্ভিক শিষ্টাচার বিনিময়ের পর হপকিন্স ষ্ট্যালিনকে বলিলেন যে, ইয়াল্টা সম্মেলন থেকে ফেরার পথে অসুস্থ ও রুগ্ন রুজভেল্ট ষ্ট্যালিনের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীর শান্তি রক্ষার জন্য সোভিয়েত-মার্কিন সহযোগিতার উপর জোর দিয়াছিলেন। তাঁর আশা ছিল যে, যুদ্ধান্তে তিনি বার্লিনে আবার ষ্ট্যালিনের সঙ্গে মিলিত হইতে পারিবেন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর জন্য তাঁর সেই আশা পূর্ণ হইতে পারিল না। কিন্তু রুজভেল্টের নীতির প্রতি মার্কিন জনগণের যেমন আস্থা ছিল, তেমনি যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার অদ্ভুত সাফল্যের জন্য রাশিয়ার প্রতিও তাঁদের মনোভাব আগের মতই অত্যন্ত অনুকূল। অবশ্য আমেরিকায় একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী আছে যারা রুজভেল্ট ও রাশিয়ার বিরোধী।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের প্রতিনিধিরূপে তিনি ষ্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন রুশ-মার্কিন মৌলিক সম্পর্ক আলোচনার জন্য, যে সম্পর্কের ইদানীং অবনতি ঘটিয়াছে। কিন্তু একথাও সত্য যে, রুজভেল্টের সমর্থকদের সহযোগিতা ছাড়া প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের পক্ষে রুশ-মার্কিন সহযোগিতার নীতি সার্থক করাও সম্ভব নয়।—(১১)

এই আলোচনা বৈঠকে সেদিন সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন ষ্ট্যালিন, মলোটোভ, প্যাভ্‌লাভ (দোভাষী) এবং হপকিন্স, হ্যারিম্যান ও বোলেন (Bohlen—দোভাষী)।

* * *

এখানে হপকিন্সের মস্কো মিশন এবং ষ্ট্যালিনের সঙ্গে তাঁর বিস্তৃত আলোচনার বর্ণনা দেওয়া অনাবশ্যক। ২৬ মে তারিখ থেকে ৬ জুন পর্যন্ত ক্রেমলিনে পর পর ৬ বার যে সমস্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাতে প্রধানতঃ আলোচিত হইয়াছিল—(১) পোলিশ সমস্যা (২) কর্জ ও ইজারার প্রশ্ন (৩) আর্জেন্টিনা (স্যানফ্রান্সিস্কো সম্মেলন) (৪) জার্মান নৌবহর ও বাণিজ্য বহরের ভাগ বাঁটোয়ারা (৫) বার্লিনে (পটসডাম) শীর্ষসম্মেলনের প্রস্তাব (৬) জার্মানীর জন্য কন্ট্রোল কাউন্সিল এবং (৭) প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ এবং চীন-মার্কিন-সোভিয়েত সম্পর্ক।

এই সমস্ত সমস্যার আলোচনায় হপকিন্স ও ষ্ট্যালিন রুশ-মার্কিন মতবৈষম্যের মধ্যে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য বিধানের এবং আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আলোচ্য বিষয়ের অন্যতম প্রধান প্রশ্ন পোল্যাণ্ড সম্পর্কে ষ্ট্যালিন বলিয়াছিলেন, পোল্যাণ্ড সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা না হওয়ার কারণ চার্চিল ও বৃটিশ রক্ষণশীলেরা রাশিয়ার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন কোন পোল্যাণ্ড চাহেন না। বরং আগের মত রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটা 'স্বাস্থ্যরক্ষার বেষ্টনী' সৃষ্টি করিয়া রাখিতে চান।

কর্জ-ইজারা সাহায্যের প্রসঙ্গে হপকিন্স ষ্ট্যালিনকে বলিয়াছিলেন যে, এই সাহায্যদানের জন্যই রাশিয়া জয়লাভ করিয়াছে, একথা সত্য নয়। রুশ সৈন্যদের অপূর্ব লড়াইয়ের জন্যই রাশিয়া জয়ী হইয়াছে এবং সরকারী মহলে আইনগত কিছু ভুল-ভ্রান্তির জন্য যে সরবরাহ প্রেরণ বন্ধ হইয়াছে সেটা আবার শুরু করা হইবে। হপকিন্সের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ষ্ট্যালিনের তখনও ধারণা ছিল যে, বার্লিনের যুদ্ধ ও পতন সত্বেও হিটলার, বোরম্যান, গোয়েবেলস এবং ক্রেবস্ জীবিত আছেন এবং তাঁরা পলাইয়া গিয়াছেন। (১২)

ষ্ট্যালিন হপকিন্সের নিকট আমেরিকার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ছাড়া যেমন প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষ জয়ী হইতে পারিতেন না, তেমনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও আমেরিকার যোগদান ছাড়া জার্মানীর পরাজয় হইত না।...

ষ্ট্যালিন হপকিন্সের নিকট কথা দিলেন যে, ৮ আগষ্ট সোভিয়েত বাহিনী

---

(১১) রবার্ট ই শেরউড্, পৃষ্ঠা ৮৮৭

(১২) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৮৯২

মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকিবে এবং ট্রুম্যানের প্রস্তাব অনুসারে বার্লিনে (পটসডামে) জুলাই মাসের মধ্যভাগে বৃটিশ-মার্কিন-সোভিয়েত শীর্ষবৈঠকের অনুষ্ঠান হইবে। আসলে এই বৈঠকের প্রস্তাব পাকা করার জন্যই হপকিন্সের মস্কো আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

জার্মানীকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে যে কণ্ট্রোল কাউন্সিল গঠিত হইয়াছিল, তাতে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিনিধিরূপে মার্শাল জুকোভকে নিযুক্ত করা হইল—ষ্ট্যালিন একথা হপকিন্সকে জানাইয়া দিলেন এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করিলেন যে, এই বিষয়ে ইয়াল্টা চুক্তি পুরাপুরি মানিয়া চলা হইবে এবং জেনারেল চিয়াং কাইসেকের নেতৃত্বে সমগ্র চীনের ঐক্য, সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তেমন নীতিই অনুসরণ করা হইবে। কিন্তু জাপানী সমরবাদকে ধ্বংস করার জন্য তিনি জাপানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পন দাবির উপর জোর দিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করিলেন যে, জাপানী সমরশক্তি যদি ধ্বংস করা না হয়, তবে, অনতিদূর ভবিষ্যতেই জাপান পুনরায় প্রতিশোধাত্মক যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারে।...

* * *

জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আলোচনা প্রসঙ্গেই পরাজিত জার্মানীকে নিয়া যে অজস্র সমস্যা দেখা দিয়াছে, হপকিন্স ষ্ট্যালিনের নিকট সে কথাও উল্লেখ করিলেন এবং তাঁকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, কিছু দিন আগে তিনি (ষ্ট্যালিন) একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, তিনি জার্মানীকে খণ্ডনের (dismemberment) পক্ষপাতী নন। কিন্তু তেহরাণ ও ইয়াল্টার শীর্ষ সম্মেলনে ষ্ট্যালিন জার্মানী সম্পর্কে যে সমস্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাঁর অধুনাতন বক্তৃতা কিন্তু সেগুলির বিপরীত। জবাবে ষ্ট্যালিন তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে, ইয়াল্টা বৈঠকে জার্মানী সম্পর্কে তাঁর সুপারিশ অগ্রাহ্য করা হইয়াছিল। বিশেষতঃ বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইডেন বলিয়াছিলেন যে, যখন আর কোন উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, একমাত্র তখনই শেষ পন্থা হিসাবে জার্মানীকে খণ্ডন করা হইবে। অবশ্য এই আলোচনা হইয়াছিল লণ্ডনে এবং সেখানে তখন মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ উইনাণ্টও উপস্থিত ছিলেন। তিনিও ইডেনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি তোলেন নাই। সুতরাং ষ্ট্যালিনের ধারণা হইয়াছিল যে, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই জার্মানীকে খণ্ডনের বিরোধী। হপকিন্স এর জবাবে ষ্ট্যালিনকে বুঝাইলেন যে, এই ব্যাপারটা সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রশ্নটিকে খোলা রাখিয়াছেন। তিন প্রধানের আগামী বৈঠকে নিশ্চয়ই এই বিষয়টি আলোচিত হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে ষ্ট্যালিনের এমন ধারণা করা উচিত নয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীকে খণ্ডনের বিরোধী। বরং অবস্থাটা বিপরীত হইতে পারে। তিন মিত্রশক্তি আগামী শীর্ষ বৈঠকে জার্মানীর সমস্যা ও খণ্ডনের বিষয় নিয়া নিশ্চয়ই নিজেদের মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসায় পৌঁছিবেন—এই আশা ব্যক্ত করিলেন হপকিন্স। যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে মার্শাল ষ্ট্যালিন

বলিলেন যে, তিনি ঠিক সুনির্দিষ্টভাবে অবগত নন। তবে, তাঁর ধারণা রাশিয়ার হাতে প্রায় ২৫ লক্ষ যুদ্ধবন্দী আছে। এর মধ্যে ১৭ লক্ষ জার্মান, আর বাকী সব রুমেনিয়, ইতালীয়, হাঙ্গেরীয় প্রভৃতি। (১৩)

*　　　*　　　*

হপকিন্সের মস্কো পরিদর্শন ও ষ্ট্যালিনের সঙ্গে আলোচনা মোটামুটি সার্থক হইয়াছিল এবং তখনকার মত রুশ-মার্কিন সমঝোতার পক্ষে সহায়ক হইয়াছিল। কারণ, মোটামুটি এই আলোচনার উপর ভিত্তি করিয়াই জুলাই মাসের মধ্যভাগে পটসডাম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১২ জুন হপকিন্স ওয়াশিংটনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পরদিন তিনি সকালে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সঙ্গে প্রাতরাশের টেবিলে যোগ দিলেন এবং ট্রুম্যান তাঁকে মস্কোর সাফল্যের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাইলেন এবং পটসডামের আসন্ন সম্মেলনে যোগদানের জন্য তাঁকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু হপকিন্স নানা কারণে রাজী হইতে পারিলেন না।

হপকিন্সের এই সমস্ত কূটনৈতিক সাফল্য ও রুজভেল্টের সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য অনেকেই তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন এবং সমালোচকেরা তাঁকে 'হোয়াইট হাউজের রাসপুটিন' বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। কিন্তু সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্কের ইতিহাসে তিনি রুজভেল্টের পরেই স্মরণীয় কীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে সমর-সচিব হেনরি স্টিমসন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্ডেল হালের সহযোগীতাও উল্লেখযোগ্য ছিল।

(১৩) শেরউড, পৃষ্ঠা ৯০৪-৫

দশম পর্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়

পটসডাম সম্মেলন—(১)

ইউরোপীয় কূটনৈতিক পটভূমিকায়

মিত্রপক্ষের তিন শীর্ষস্থানীয় নেতার মধ্যে পটসডাম কিংবা বার্লিন সম্মেলন সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। ১৭ জুলাই থেকে ২ আগস্ট, ১৯৪৫, পর্যন্ত এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং অজস্র সমস্যা নিয়া আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু বিখ্যাত মার্কিন ঐতিহাসিক হার্বার্ট ফীজ তাঁর পটসডাম সম্মেলন সংক্রান্ত পুস্তকে (পৃষ্ঠা ১৬৩) লিখিয়াছেন যে, এই সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল ১৬ই জুলাই। কিন্তু ষ্ট্যালিন 'মৃদু হৃদরোগে' আক্রান্ত হওয়ায় সম্মেলন একদিনের জন্য পিছাইয়া গিয়াছিল। ষ্ট্যালিন এজন্য প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সঙ্গে দেখা করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, তাঁর চিকিৎসকরা তাঁকে আকাশপথে উড়িতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তাঁর 'লাংসের দুর্বলতার জন্য'। 'কিন্তু আসলে তিনি হৃদরোগে ভুগিতেছিলেন।'

মহাযুদ্ধের কূটনৈতিক ইতিহাসে পটসডাম সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। কারণ, অন্যান্য বহু প্রশ্নের মধ্যে এই সম্মেলনে জার্মানী, পোল্যাণ্ড, পূর্ব ইউরোপ, জাপান ও এ্যাটম্ বোমা এবং জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তাব ইত্যাদি প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল।...

রাজধানী বার্লিনের অনতিদূরে (মাইল ২০।২৫ দূর) পটসডাম কেবল অভিজাত শহর নয়, জার্মান সামরিক শক্তির অন্যতম উৎসস্বরূপ। অর্থাৎ ইম্পিরীয়েল জার্মানীর কাইজারের আমল থেকে তার খ্যাতি। এই শহরের বিখ্যাত সিসিলিয়েনহোফ প্রাসাদে (Cecilienhof Palace) সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রধানগণ যে আলোচনা সভায় মিলিত হইয়াছিলেন, তার দূরপ্রসারী ফলাফল মহাযুদ্ধের পরবর্তী কাল পর্যন্ত প্রতিফলিত হইয়াছিল।*

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কাইজার (জার্মান সম্রাট) দ্বিতীয় উইলহেলম তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী যুবরাজ বা ক্রাউন প্রিন্সের জন্য এই সিসিলিয়েনহোফ প্রাসাদ তৈরী করিয়াছিলেন ১৯১৩ থেকে ১৯১৬ সালে। কাইজারের রাজদরবারের একজন খ্যাতনামা স্থপতি-শিল্পী ইংলণ্ডের পল্লীভবনের (ইংলিশ কান্ট্রি হাউজ) কায়দায় বা স্টাইলে এই নয়নলোভন এবং ঐশ্বর্যশালী আরামদায়ক প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেই প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যখন আজিকার তুলনায় জিনিসপত্রের দাম ছিল অত্যন্ত সস্তা, তখন এই প্রাসাদ নির্মাণে ও সজ্জীকরণে খরচ পড়িয়াছিল ৮০ লক্ষ স্বর্ণ মার্ক। এই প্রাসাদে ১৭৬টি কক্ষ বা রুম আছে এবং এর প্রত্যেকটির অভ্যন্তর

---

*১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে গ্রন্থকার কর্তৃক দ্বিতীয়বার জার্মান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা জি ডি আর পরিভ্রমণের সময় পটসডামের সেই বিখ্যাত সম্মেলন-স্থান সস্ত্রীক পরিদর্শনের সুযোগ হইয়াছিল।—লেখক।

ভাগই রাজকীয় সাজসজ্জায় ও বর্ণাঢ্য সুষমায় অপূর্ব ছিল। যুবরাজ উইলহেলম ফন হোহেনজোলার্নের বসবাসের জন্য এই পল্লী প্রাসাদপুরীর উদ্বোধন হইয়াছিল ১৯১৭ সালের শরৎকালে—যখন মহাযুদ্ধের ফলে সাধারণ প্রজাপুঞ্জের কষ্টের সীমা ছিল না। ১৯১৮ সালের নভেম্বর বিপ্লবের পর পটসডামের এই রাজপ্রাসাদকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২৬ সালে পুনরায় সম্রাট পরিবার বা রাজবংশের সম্পত্তিগুলি এক বিশেষ আইন বলে হোহেনজোলার্ন পরিবারের হাতে ফেরৎ দেওয়া হইল। একদিন প্রিন্স বা যুবরাজের পরিবারবর্গ ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে এই সুরম্য প্রাসাদ থেকে যাবতীয় মূল্যবান এবং অস্থাবর সম্পত্তি ও দ্রব্যাদিসহ পশ্চিম জার্মানীতে চলিয়া যান।*

সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর যুদ্ধবাজ শক্তির শেষ 'রাজকীয় প্রতিনিধি' যে সেসিলিয়েন-হোফ প্রাসাদে এতদিন সাড়ম্বরে বাস করিতেছিলেন, বার্লিনের পতনের পর সেই প্রাসাদেরই কক্ষে পরাজিত জার্মানীর ভাগ্য নির্ধারণের জন্য বিজয়ী শক্তিবর্গের তিন প্রতিনিধির ঐতিহাসিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হইল। সুতরাং নিঃসন্দেহে এটা ছিল নাৎসী-বাদ ও সামরিকবাদের আত্মসমর্পণের প্রতীকের মত।...

পটসডাম সম্মেলন সরকারী দলিলপত্রে অনেক সময় বার্লিন কনফারেন্স নামেও অভিহিত হইয়াছে। প্রাসাদের লাল কার্পেটপাতা সুবৃহৎ কক্ষে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। একটি বৃহৎ গোল টেবিলের উপর তিন প্রধান মিত্রশক্তির তিনটি রাষ্ট্রীয় পতাকা একটি শ্বেত পাথরের স্ট্যাণ্ডে সজ্জিত ছিল। এই পতাকাগুলি যেভাবে সজ্জিত ছিল, তিন প্রধানের নেতারা স্ব স্ব ডেলিগেশনের নায়করূপে গোল টেবিলের চারপাশে সেভাবেই আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। টেবিলের ডানপাশে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন সোভিয়েত নেতা জে ভি ষ্ট্যালিন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভি এম মলোটোভ। বাঁ দিকে ছিলেন বৃটিশ ডেলিগেশনের পক্ষে প্রধান মন্ত্রী চার্চিল ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইডেন—১৭ই জুলাই থেকে ২৫ জুলাই পর্যন্ত মোট ৯টি অধিবেশনে। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় রক্ষণশীল দল পরাজিত হইয়াছিল (যদিও চার্চিল এবং ষ্ট্যালিন উভয়েই জয়ের আশা করিয়াছিলেন)। সুতরাং চার্চিলের বদলে নেতারূপে যোগ দিলেন শ্রমিক দলভুক্ত প্রধানমন্ত্রী এ্যাট্লি ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী বেভিন। তাঁরা ২৮ জুলাই থেকে ২ আগস্ট পর্যন্ত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য সম্মেলনের গোড়া থেকেই শ্রমিক দলনেতা এ্যাট্লি বিরোধী পক্ষের নায়করূপে চার্চিলের সঙ্গে "পর্যবেক্ষক" হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান প্রবেশ পথের বিপরীত দিকে টেবিলের সামনে বসিয়াছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেলিগেশনের নায়ক প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী বার্নস্। এঁরা ছিলেন ষ্ট্যালিনের ডান দিকে।

এর আগে ইয়াল্টাতে তিন প্রধানের (ষ্ট্যালিন, চার্চিল ও রুজভেল্ট) চুক্তি অনুসারে ফ্রান্সকেও জার্মানীর অংশবিশেষ দখল ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। সেই চুক্তি অনুসারে ফরাসী সরকারের প্রতিনিধিরূপে মরিস ডিজেঁ (Maurice Dejean) এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

---

* জি ডি আর কর্তৃক প্রকাশিত পটসডাম সংক্রান্ত পুস্তিকা থেকে।

এই সম্মেলনের রিপোর্টিং সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ তথ্য এই যে, পরবর্তীকালে যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টরূপে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, সেই পরলোকগত (আততায়ীর গুলীতে নিহত) জন এফ কেনেডি এবং বিখ্যাত সোভিয়েত লেখক বোরিস পলেভয় স্পেশাল রিপোর্টার হিসাবে পটসডামে উপস্থিত ছিলেন। সময় সময় ৫০ জন পর্যন্ত বৈদেশিক সাংবাদিক এই সম্মেলনের রিপোর্ট করার জন্য উপস্থিত থাকিতেন এবং তাঁরা অবস্থান করিতেন উপরের দ্বিতল কক্ষের অর্কেস্ট্রা রুমে।

তখন সবেমাত্র যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। সুতরাং ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ডের মধ্যে বাসস্থানের খুব অসুবিধা ছিল। এজন্য কনফারেন্সের প্রতিনিধি দল বার্লিন-পটসডামের মধ্যবর্তী ১২ মাইল দূরে ব্যাবেলসবার্গের ওয়েইটি ভিলাতে বাস করিতেন। কিন্তু স্থানীয় হেভেল নদীর উপর অবস্থিত সমস্ত সেতু ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। এজন্য সোভিয়েত বাহিনীর ইঞ্জিনীয়াররা এই সম্মেলনের জন্য তাড়াহুড়া করিয়া পণ্টুন ব্রীজ তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন বিভিন্ন ডেলিগেশনের সেসিলিয়েনহোফ প্রাসাদে যাতায়াতের জন্য ...

পটসডাম সম্মেলনে যোগদানের জন্য মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের ওয়াশিংটন-বার্লিন যাতায়াতের জন্য কী বিপুল আড়ম্বরপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, সেকথা ট্রুম্যান তাঁর আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডে (২১ তম অধ্যায়) অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে বর্ণনা করিয়াছেন। (বোধ হয় প্রেসিডেন্ট হিসাবে নূতন অভিজ্ঞতার জন্যই তিনি এত উল্লসিত হইয়াছিলেন।) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট যখন ওয়াশিংটনের বাইরে যান, তখন সাধারণ অবস্থাতেই তাঁর নিরাপত্তা ও কাজকর্মের জন্য বিশেষ ধরনের অনেক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। সুতরাং তিনি যখন বিভিন্ন রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য—বিশেষভাবে যুদ্ধকালীন অবস্থায় আমেরিকার বাইরে যান, তখন তাঁর গমনপথ ও গন্তব্যস্থলের জন্য এমন সমস্ত ব্যাপক ও অদ্ভুত ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে যে, তার বর্ণনা দেওয়া কঠিন ট্রুম্যান স্বয়ং লিখিয়াছেন :

'It is hard to picture all that is involved in getting a President off to a conference such as the one I was about to attend in Potsdam. The fact that this was to be a meeting with heads of other governments called for extraordinary planning of transportation, housing, protection and security, communications protocol and staffs.'

প্রেসিডেন্ট যেখানেই যান কিংবা যেখানেই থাকুন না কেন, হোয়াইট হাউজের সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। বহু সরকারী কর্মচারী ও অফিসারের কর্মব্যস্ততা তুঙ্গে উঠিয়া থাকে। পটসডাম সম্মেলনের জন্য ক্যাবিনেট অফিসার ও রাষ্ট্রদূতবৃন্দ, সেনানীমণ্ডলীর প্রধানগণ, হোয়াইট হাউজের স্টাফ এবং পররাষ্ট্র, আর্মি, নেভি ও বিমানবাহিনীর প্রধানগণ, ট্রেজারি ও গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীগণ প্রমুখ সকলকেই অংশ গ্রহণ করতে হইয়াছিল। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, সম্মেলনের স্থায়িত্বকালের জন্য একটি ছোটখাটো 'হোয়াইট হাউজ' গড়িয়া

তুলিতে হইয়াছিল। গোয়েন্দা বিভাগের কিংবা সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরা সমস্ত রাস্তা, যানবাহন এবং প্রেসিডেন্টের অবাসস্থল ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। লণ্ডন, মস্কো এবং ওয়াশিংটনের সঙ্গে যাতে অবিচ্ছিন্নভাবে এবং অবিলম্বে দ্রুততম যোগাযোগ ও বার্তা আদান-প্রদান ঘটানো যাইতে পারে, তেমন বন্দোবস্ত করা হইয়া থাকে। অধিকন্তু প্রেসিডেন্টের সরকারী কাজকর্ম পরিচালনায় যাতে বিন্দুমাত্র বিঘ্নও না ঘটিতে পারে, তেমন নিখুঁত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। জার্মানীর রুশ অধিকৃত এলাকায় এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছিল। (১)

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এবং তাঁর দলবল [illegible] যুদ্ধজাহাজে আমেরিকা থেকে অতলান্তিক মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়া ইউরোপের এন্টোয়ার্প বন্দরে পৌঁছিলেন ৩৮৮৭ মাইল অতিক্রমণের পর। বলা বাহুল্য যে, প্রেসিডেন্টের বৃহৎ রণতরী 'আগষ্টা'তে বহিঃপৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের এবং সম্মেলন সংক্রান্ত কাজকর্ম পরিচালনার সমস্ত ব্যবস্থাই ছিল। তাঁর এই সমুদ্র পাড়ি দিয়া এন্টোয়ার্পে পৌঁছিতে ৯ দিন সময় লাগিয়াছিল। (সমুদ্রযাত্রার কিছু পথ ইউরোপের নিকটবর্তী এলাকায় মাইনের ভয়ে খুব ধীর গতিতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল) সেখান থেকে তিনি বিমানযোগে বার্লিন ও পটসডাম পৌঁছিলেন। বিভিন্ন ডেলিগেশনের অবস্থানের সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল বার্লিনের দক্ষিণ-পূর্বে ব্যাবেলসবার্গ শহরে। সোভিয়েত বাহিনী এবং নিরাপত্তা রক্ষীদলের পক্ষ থেকে শীর্ষনেতা ও তাদের সহকর্মীদের রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত প্রকার ব্যবস্থাই অবলম্বিত হইয়াছিল। আমন্ত্রক হিসাবে এজন্যে সোভিয়েত রাশিয়াকে গভীর দায়িত্ব বহন করিতে হইয়াছিল। শীর্ষনেতা ও তাদের সহকর্মীদের জন্য ইয়াল্টা সম্মেলনের অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল।

* * *

১৭ জুলাই, ১৯৪৫, অপরাহ্ণে সিসিলিয়েনহোফ প্রাসাদে পটসডাম সম্মেলনের অধিবেশন শুরু হইল। স্ট্যালিনের প্রস্তাবক্রমে ও চার্চিলের সমর্থনে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তিনি মার্কিন প্রতিনিধি মণ্ডলীর পক্ষ থেকে যে কর্মসূচী পেশ করিলেন, তার মর্ম এই—(১) প্রাক্তন শত্রু রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে শান্তিসন্ধির খসড়া রচনার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের একটি কাউন্সিল গঠন। (২) জার্মানী সম্পর্কে মিত্রপক্ষের পলিসি নির্ধারণের জন্য মূলনীতি স্থিরীকরণ। (৩) মুক্তিপ্রাপ্ত ইউরোপ সম্পর্কে ইয়াল্টা সম্মেলনের ঘোষণা কার্যক্ষেত্রে রূপায়ন। (৪) ইতালীর সঙ্গে যুদ্ধবিরতির সর্ত সহজতর করণ এবং ইতালীকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সংগঠনের সদস্যরূপে গ্রহণ।

সোভিয়েত ডেলিগেশনের পক্ষ থেকে (১) জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবি সম্পর্কে আলোচনার প্রস্তাব করা হইল। (২) জার্মানীর প্রাক্তন তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় স্থাপনের (৩) সিরিয়া ও লেবানন সমস্যার এবং (৪) ফ্রাঙ্কোর স্পেন ও অন্যান্য প্রশ্নের মীমাংসায় দাবি করা হইল।

বৃটিশ ডেলিগেশন তাঁদের কর্মসূচীতে পোল্যাণ্ড ও যুগোশ্লাভিয়ার সমস্যার মীমাংসা দাবি করিলেন।

---

(১) ট্রুম্যান—প্রথম খণ্ড, ৩৬৭-৬৮ পৃষ্ঠা

এই সমস্ত কর্মসূচীর সংশ্লিষ্ট বহু প্রশ্ন নিয়া পটসডাম সম্মেলনে বহু তর্কবিতর্ক ও বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছিল। তবে, অধিবেশনের গোড়াতেই মার্কিন প্রস্তাব অনুযায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের যে কাউন্সিল গঠিত হইল, সেই কাজটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীর অন্যতম। কেননা, যুদ্ধের শেষে ইউরোপীয় মহাদেশে অনেক জটিল প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছিল এবং এজন্য শান্তিসন্ধির খসড়া রচনার প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। প্রধান পঞ্চশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ও চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের নিয়া যে কাউন্সিল গঠিত হইল, তার উপর দায়িত্ব দেওয়া হইল ইতালী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি ও ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে শান্তিসন্ধির খসড়া রচনা ও রাষ্ট্রসংঘে তা পেশ করার জন্য। যদি জার্মানীর জন্য কোন উপযুক্ত গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয়, তবে সেই গবর্ণমেণ্টের জন্যও শান্তিসন্ধির একটা খসড়া রচনার প্রস্তাব করা হইল।

পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের এই কাউন্সিল যুদ্ধোত্তর ইউরোপের অনেক সমস্যা মীমাংসার পক্ষে খুব সহায়ক হইয়াছিল। অবশ্য এই কাউন্সিল গঠনের আগে 'ইউরোপীয় পরামর্শদাতা কমিটি'র কার্যকলাপও বিবেচনা করা হইয়াছিল। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত এই কমিটি অনেক মূল্যবান কাজ করিয়াছিল—যেমন, ১২টি চুক্তিপত্রের খসড়া তৈরী করা হইয়াছিল, জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের প্রস্তাব রচনা করিয়াছিল এবং জার্মানীতে ও অষ্ট্রিয়ায় মিত্রপক্ষের দখলদারির এলাকা নির্দিষ্ট করিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে মিত্রপক্ষের তরফ থেকে এই দুই দেশের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা খাটাইবার জন্যও একটি সংস্থা গঠন করা হইয়াছিল।

ইউরোপীয় পরামর্শদাতা কমিটির এই সমস্ত কাজ মিত্রপক্ষের নেতাদের নিকট সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। অতঃপর বার্লিন ও ভিয়েনার জন্য নতুন কাউন্সিল ও কমিশন গঠিত হওয়ায় ইউরোপীয় পরামর্শদাতা কমিটি বাতিল করিয়া দেওয়া হইল।

* * *

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পটসডামে সবচেয়ে দীর্ঘ কূটনৈতিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল এবং যদিও তিন প্রধান শক্তির মধ্যে বাহ্যতঃ একটা ঐক্যের রূপ রাখা হইয়াছিল, তথাপি বিরোধ ও মতান্তর হইয়াছিল যথেষ্ট এবং এই দীর্ঘতম সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ও ছিল অনেক রকমের। সম্মেলনের শেষে ২০ পৃষ্ঠাব্যাপী যে দীর্ঘ ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই দলিলটি ১৫টি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। যথা—(১) মুখবন্ধ বা প্রস্তাবনা (২) পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের কাউন্সিল গঠন (৩) জার্মানী (৪) জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ (৫) জার্মানীর নৌবহর ও বাণিজ্যবহর (৬) কোনিসবার্গ (৭) যুদ্ধাপরাধীদের প্রশ্ন (৮) অষ্ট্রিয়া (৯) পোল্যাণ্ড (১০) শান্তিসন্ধিগুলির খসড়া এবং ইউ এন ও'র সদস্যপদ (১১) ট্রাষ্টিশিপ বা অছিগিরির অধীন ভূখণ্ডসমূহ (১২) রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরীর মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পদ্ধতির সংশোধন। (১৩) জার্মান বাসিন্দাদের অপসারণ (১৪) সম্মেলনের মিত্রপক্ষীয় সেনানীমণ্ডলীর প্রধানগণের আলোচ্য সামরিক সমস্যাসমূহ এবং (১৫) প্রতিনিধিমণ্ডলীর তালিকা।

পটসডাম সম্মেলনের মোট ১৩টি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন হইয়াছিল এবং উপরে বর্ণিত বিষয়গুলির দীর্ঘ তালিকা ছাড়াও কতকগুলি কমিটি ও সাবকমিটিতে আরও বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ জাপানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে দীর্ঘ ইস্তাহারে কিছু উল্লেখ ছিল না। কারণ, সোভিয়েত রাশিয়া তখনও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল না। এবং সামরিক গোপনীয়তা রক্ষার খাতিরে পারমাণবিক বোমা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও ছিল না। ..

সম্মেলনে জার্মানীর সমস্যা স্বভাবতঃই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বার্লিনে ৫ই জুনের স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী পরাজিত জার্মানীর শাসন ও পরিচালন কিংবা বিলি ব্যবস্থা সংক্রান্ত সর্বময়ক্ষমতা দখলকারী চার শক্তির হাতে অর্পিত হইল। কিন্তু এই চূড়ান্ত ক্ষমতা সত্ত্বেও অধিকৃত জার্মানী মিত্রশক্তিবর্গের কাহারও রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল না। কিন্তু জার্মানী চতুঃশক্তির দখলদারির মধ্যে বিভক্ত হইল এবং সোভিয়েত দখলীকৃত এলাকা থেকে ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হইল।

যদিও লালফৌজের হাতে বার্লিনের পরাজয় ও পতন ঘটিয়াছিল, তথাপি শহরতলীসহ বৃহত্তর বার্লিনও চতুঃশক্তির দখলে গেল এবং দখলদারি শক্তিগুলির মধ্যে বার্লিন পূর্বে ও পশ্চিমে বিভক্ত হইল। অবশ্য বার্লিন একান্তরূপে পূর্ব জার্মানীর (বর্তমান জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বা জি ডি আর) ভৌগোলিক সীমানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পশ্চিম জার্মানীর সীমানা থেকে তার দূরত্ব ছিল ১১০ মাইল। কিন্তু জার্মানীর শাসন ও পরিচালনার জন্য চতুঃশক্তির সেনাপতিদেরকে নিয়া যে কন্ট্রোল কাউন্সিল গঠিত হইয়াছিল, তার সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হইল বার্লিনে এবং মার্কিন, বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যেরাও পশ্চিম বার্লিনে ঘাঁটি স্থাপন করিল—যেমন, পূর্ব বার্লিনে লালফৌজের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হইল। জার্মানীকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সমস্ত প্রকার হিটলারী ও নাৎসী সংগঠন, নানা প্রকার নামধারী আধা-সামরিক সংস্থা, গেষ্টাপো ও অন্যান্য গোয়েন্দাচক্র, মিলিটারি স্কুল, নাৎসী পার্টি এবং জেনারেল স্টাফ বা সেনানীমণ্ডলী ও সামরিক সংস্থা প্রভৃতি বাতিল ও বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইল। সম্মেলনের শেষে প্রচারিত ইস্তাহারে আরও বলা হইল যে, জার্মানী থেকে সামরিকবাদ ও নাৎসীবাদের সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ ঘটানো হইবে এবং ভবিষ্যতে আর কোনদিন জার্মানী যাতে কোন প্রতিবেশীকে আক্রমণ ও পৃথিবীব্যাপী শান্তি নষ্ট করিতে না পারে, তার জন্য যে কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। তবে, জার্মানীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমস্ত গণতান্ত্রিক পার্টিগুলিকে সভাসমিতি করার অধিকার দেওয়া হইবে। কিন্তু মনোপলি, ট্রাষ্ট, সিণ্ডিকেট ইত্যাদির মারফৎ যে অর্থনৈতিক শক্তি এতদিন কেন্দ্রীভূত ছিল সেগুলি ভাজিয়া দেওয়া হইবে। (২)

কিন্তু জার্মানীকে চতুঃশক্তির দখলদারিতে পরিণত করার প্রস্তাব সত্ত্বেও প্রকাশিত ইস্তাহারে কিন্তু জার্মানীর পার্টিশনের বা বিভক্তকরণের কোন উল্লেখ ছিল না।

(১) দি এ্যান্টি-হিটলার কোয়ালিশন, পৃষ্ঠা ৪০৪-৪০৫

There was no mention of any partition of Germany, but the communiqe stated that, for the present, no central German Government would be formed. There would, however, be certain central German administrative departments, acting under the guidance of the Allied Control Council.—(৩)

অর্থাৎ জার্মানীকে বিভক্তকরণের যেমন উল্লেখ ছিল না, তেমনি কোন কেন্দ্রীয় জার্মান সরকার গঠনের প্রশ্নও ছিল না। তবে, মিত্রশক্তিবর্গের কণ্ট্রোল কাউন্সিলের অধীনে জার্মানীর কিছু কিছু কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক বিভাগ বজায় রাখার কথা হইয়াছিল।

কিন্তু জার্মানীকে খণ্ডন করা না করা সম্পর্কে মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে নানা বৈঠকে নানা ধরনের প্রস্তাব ও বিতর্ক হইয়াছিল এবং মিত্রশক্তির শীর্ষ নেতারা চার্চিল, রুজভেল্ট (পরবর্তী কালে ট্রুম্যান) ও ষ্ট্যালিন নিজেদের মধ্যে সর্বসম্মত কোন প্রস্তাব বা পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এজন্য যুদ্ধ সংক্রান্ত নানা পুস্তকে নেতৃবৃন্দের মধ্যে মত সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায়। মহাযুদ্ধের সময় ষ্ট্যালিন তাঁর একাধিক বিবৃতিতে এবং তারপর পটসডাম সম্মেলনে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন যে, নাৎসীবাদকে নিশ্চয়ই ধ্বংস করিতে হইবে; কিন্তু জার্মান জাতিকে নয়। জার্মান জাতির অখণ্ডতা রক্ষার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তেহরাণ সম্মেলনের (১৯৪৩ সালের ২৮ নভেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বর) প্রস্তাব অনুযায়ী জার্মানীকে পাঁচটি অংশে বিভক্ত করার পরিকল্পনা হইয়াছিল। এই পাঁচটি অংশ ছাড়াও হামবুর্গ ও কিয়েল-খাল অঞ্চলকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বা চতুঃশক্তির শাসনাধীনে আনার এবং অনুরূপভাবে রুড় ও সার অঞ্চলকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে আনার প্রস্তাব হইয়াছিল। এছাড়া ১৯৪৪ সালে ইঙ্গ-মার্কিন কুইবেক কনফারেন্সে মার্কিন ট্রেজারি সচিব হেনরি মর্গেনথো (Morgenthau—জুনিয়ার) জার্মানীকে দুই অংশে ভাগ করিয়া পশ্চিমাংশে আর একটি পৃথক আন্তর্জাতিক এলাকা সৃষ্টির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। এছাড়া সার সহ রাইন নদীর বাঁ দিকের অঞ্চল ফ্রান্সকে দেওয়ার এবং কলকারখানা ধ্বংস করার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল 'নখদন্তহীন' জার্মানীর খণ্ডিত অংশগুলিকে কৃষি-প্রধান এলাকায় পরিণত করা। অবশ্য ষ্ট্যালিনের মত রুজভেল্টও এই উদ্ভট পরিকল্পনা বাতিল করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে চার্চিলও জার্মানীকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া এবং কয়েকটি অংশ নিয়া একটি 'দানিয়ুব ফেডারেশন' গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। ষ্ট্যালিন এই সমস্ত প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন।

কিন্তু পটসডাম সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান জার্মানীকে উত্তরে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে বিভক্ত করার প্রস্তাব আনিয়াছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভিয়েনাকে রাজধানীর মর্যাদা দিয়া দক্ষিণ জার্মান ষ্টেট্ গড়ার যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তা ছিল যুদ্ধোত্তর স্বাধীন অষ্ট্রিয়ার সার্বভৌমত্বের বিরোধী এবং ট্রুম্যানও শেষ পর্যন্ত এই সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া নিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পটসডাম সম্মেলনের পর ২ আগষ্ট, ১৯৪৫, ট্রুম্যান-ষ্ট্যালিন

(৩) Alexander Werth. p. 912.

এ্যাটলি কর্তৃক স্বাক্ষরিত ইস্তাহারে জার্মানীকে পার্টিশান বা বিভক্ত করার কোন প্রস্তাব ছিল না।

তথাপি কার্যতঃ জার্মানী খণ্ডিত বা পার্টিশান হইল কি ভাবে? এর মূল রহিয়াছে জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবির মধ্যে। ইয়াল্টাতে ত্রিশক্তির শীর্ষ সম্মেলনে সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে ষ্ট্যালিন ২০ হাজার মিলিয়ন ডলার (বা দুই হাজার কোটি ডলার) ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায়ের দাবি তুলিয়াছিলেন। এই বিশ হাজার মিলিয়ন ডলারের অর্ধেক পাইবেন মিত্রশক্তি এবং বাকী অর্ধেক বা শতকরা ৫০ ভাগ পাইবে সোভিয়েত রাশিয়া এবং সোভিয়েত রাশিয়ার অংশ থেকেই পোল্যাণ্ডের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। (পোল্যাণ্ডের ধ্বংস ছিল অবর্ণনীয় এবং জনসংখ্যার বিচারে সবচেয়ে বেশী। অতএব ক্ষতিপূরণ লাভের যোগ্যতাও তার ছিল অনেক বেশী।) যদিও ক্ষতিপূরণ অংকের তীব্র বিরোধিতা করিয়াছিলেন বৃটিশ ও মার্কিন মহল এবং বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ অঙ্কের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত আমেরিকার ঘাড়ে এই দায় দায়িত্ব বর্তাইয়াছিল জার্মানীকে সহায়তা দান করিতে গিয়া, তথাপি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ইয়াল্টা বৈঠকে ক্ষতিপূরণের মূল নীতি মানিয়া নিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে বিবেচনার কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু পটসডাম বৈঠকে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও মার্কিন প্রতিনিধিগণ জার্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ২ হাজার কোটি ডলার আদায়ের এই অঙ্ককে 'সম্পূর্ণ অবাস্তব' বলিয়া অগ্রাহ্য করিলেন। এই প্রস্তাব নিয়া বহু তর্ক বিতর্কের শেষে স্থির হইল যে, দখলদার চতুঃশক্তি তাঁদের নিজ নিজ অধিকৃত এলাকা (zone) থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ কলকারখানার যন্ত্রপাতি, চলতি উৎপন্ন দ্রব্য এবং অন্যান্য মালপত্র অপসারণ করিতে পারিবেন। আর বিদেশে, যেমন বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, ফিনল্যাণ্ড এবং পূর্ব অস্ট্রিয়াতে জার্মানী যে সমস্ত মূলধন (সম্পত্তি) নিয়োগ করিয়াছিল, সেগুলি থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারিবেন। পশ্চিমী মিত্র-পক্ষীয়রাও তাঁদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ অনুরূপভাবে আদায় করিতে পারিবেন। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ একদিক দিয়া লাভবান ছিলেন, তাঁদের হাতে জার্মানীর প্রচুর সোনা ধরা পরিয়াছিল। কিন্তু রাশিয়া এই সোনার কোন অংশ দাবি করে নাই। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়াতে হিটলারের জার্মানী যে সীমাহীন ধ্বংসকার্য চালাইয়াছিল, সেই ভয়াবহ ক্ষতির কথা বিবেচনা করিয়া সোভিয়েত গবর্ণমেণ্ট পশ্চিমীদের অধিকৃত এলাকা থেকে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন মহল থেকে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি তোলা হইল। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিমী এলাকা থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ কলকারখানার যন্ত্রপাতির শতকরা ১৫ ভাগ পাইবে। কিন্তু এর পরিবর্তে সোভিয়েত অধিকৃত এলাকা থেকে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য বস্তু দিতে হইবে। কারণ, পশ্চিমাংশে খাদ্যদ্রব্যের অত্যন্ত অভাব ছিল। জার্মানীর কাছ থেকে এই ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রসঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়া জার্মানীর বিখ্যাত রুড় অঞ্চলের শিল্পসমৃদ্ধ এলাকার উপর

অন্যান্য পশ্চিমী শক্তির সঙ্গে নিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করিয়াছিলেন। কিন্তু এই দাবী বৃটিশ ও মার্কিন পক্ষ সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিলেন। (৪)

চতুঃশক্তির মধ্যে ক্ষতিপূরণের এই বণ্টনব্যবস্থা থেকেই মূলতঃ প্রত্যেকটি দখলিকৃত এলাকা স্বতন্ত্র অংশে পরিণত হইয়াছিল এবং জার্মানী চতুঃশক্তির মধ্যে খণ্ডিত হইল। চার্চিল-ষ্ট্যালিনের প্রস্তাব অনুসারে এই খণ্ডনের ভিত্তি ধরা হইল জার্মানীর ১৯৩৭ সালের ভৌগোলিক সীমানা। ফলে, পশ্চিম থেকে সোভিয়েত রাশিয়া পূর্বদিকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল এবং পূর্ব জার্মানী ও পূর্ব ইউরোপের উপর তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ ঘটিল। পরবর্তী কালের ঠাণ্ডা যুদ্ধের মূল উৎসও ছিল এখানে।...

পটসডাম সম্মেলনে সোভিয়েত ডেলিগেশনের প্রস্তাব অনুসারে জার্মানীর নৌবহর ও বাণিজ্যবহরগুলির বণ্টনেরও একটা সুব্যবস্থা হইল। অর্থাৎ বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে সমভাবে বণ্টনের প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং জার্মান সাবমেরিণগুলির অধিকাংশই ডুবাইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত হ'ল।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল প্রধান প্রধান যুদ্ধাপরাধীদের আন্তর্জাতিক আদালতে (ন্যুরেমবার্গ) অভিযুক্ত ও বিচার করার সম্পর্কে। এই বিষয়ে তিন প্রধান শক্তিই একমত হইয়া ঘোষণা করিলেন এবং স্থির হইল যে, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫, তারিখের মধ্যে যুদ্ধাপরাধীদের প্রথম তালিকা প্রকাশ করা হইবে।

কোনিসবার্গ এবং পূর্ব প্রুশিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন জানাইলেন।

কিন্তু পোল্যাণ্ড ও পূর্ব ইউরোপ নিয়া পশ্চিমী মিত্রপক্ষের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরোধ পটসডাম সম্মেলনে তীব্র উত্তাপের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই বিষয়ে ইঙ্গ-মার্কিন মহল 'কঠোর নীতি' অনুসরণ করিলেন এবং স্পষ্ট বলিলেন যে, ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব ইউরোপীয় গবর্নমেন্টগুলির পুনর্গঠন না হইলে এই সমস্ত সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়া হইবে না এবং তাদের সঙ্গে কোন শান্তিসন্ধিও স্বাক্ষরিত হইবে না। বিগত ইয়াল্টা বৈঠকে তিন প্রধানের পক্ষ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ইউরোপে গণতন্ত্র ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, সেগুলি হাতে-কলমে প্রয়োগ করিতে হইবে। অথচ ইতিমধ্যে এই সমস্ত দেশে 'জনগণের ইচ্ছানুযায়ী' নূতন গবর্নমেণ্ট গঠিত হইয়াছিল এবং উপরের তলার যে সমস্ত লোক নাৎসীদের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছিল, তারা অপসারিত হইয়াছিল। অথচ ষ্ট্যালিন কিন্তু অনেকটা আন্তরিকতার সঙ্গেই পশ্চিমের মিত্রপক্ষীয় নেতাদের সঙ্গে গণতন্ত্র ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের নীতি মানিয়া লইয়াছিলেন। তিনি স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ইতালীকে স্বীকৃতি দিতে ও রাষ্ট্র-সংঘের সদস্যপদে গ্রহণ করিতে মিত্রপক্ষের উৎসাহের কোন অভাব ছিল না। তবে, অন্যের বেলা এই আপত্তি কেন?

আসলে মুস্কিল বাধিল গণতন্ত্র ও নির্বাচনের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য নিয়া।

(৪) দি এ্যান্টি হিটলার কোয়ালিশন—পৃষ্ঠা ৪০৬-৭

অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত ইউরোপে গণতন্ত্র ও অবাধ নির্বাচন অর্থে পশ্চিমীরা 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র' এবং সেই গণতন্ত্রের সমর্থক নির্বাচকমণ্ডলীর কথা ধরিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং ক্যাপিটালিষ্ট যেঁ'যা এই গণতন্ত্রের পক্ষে স্বভাবতই সোভিয়েতের বিরোধী হওয়ার কথা। কিন্তু ষ্ট্যালিন গণতন্ত্র অর্থে নাৎসীবিরোধী এবং সোভিয়েতের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন জনগণের গবর্ণমেন্টের কথা ভাবিয়াছিলেন। অথচ পশ্চিমী মিত্রপক্ষ ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, 'কার্জন লাইন' (পোল্যাণ্ড) ও বেসারাবিয়ার সীমানা (রুমানিয়া) পর্যন্ত পশ্চিমী ধনতন্ত্রবাদী গণতন্ত্র ও অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা হইবে—পরবর্তী কালে ৫ই মার্চ, ১৯৪০ নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকার এই মন্তব্যই ছিল সমীচীন। (৫)

পটসডাম বৈঠকে এই সমস্ত প্রশ্ন নিয়া উভয় শিবিরের প্রতিনিধিদের মধ্যে বহু বাগবিতণ্ডার পর স্থির হইল যে, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে শান্তিসন্ধি স্বাক্ষরিত এবং তাদেরকে রাষ্ট্রসংঘে গ্রহণ করা হইবে।

অপরদিকে পটসডাম কনফারেন্সের আগেই সোভিয়েত রাশিয়া পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমানা স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। রাশিয়া পোল্যাণ্ডের যে সমস্ত ভূমি দখল করিয়া নিয়াছিল (পূর্বদিকে) তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ জার্মানী থেকে পোল্যাণ্ডকে উপযুক্ত পরিমাণ জমি দেওয়া হইবে। যেমন—পূর্ব প্রুশিয়ার তিন-চতুর্থাংশ, সাইলেশিয়ার (শ্রমসমৃদ্ধ অঞ্চল) বাকী অংশ, পোমেরানিয়া এবং ব্রাণ্ডেনবুর্গের এক টুকরো—অর্থাৎ নেইসী ও ওডের নদী পর্যন্ত সমস্ত জমি এবং ওডের নদীর অপর তীরস্থ ষ্টেটিন সহর পর্যন্ত। এই সমস্ত মূল্যবান জার্মান ভূমি পোল্যাণ্ডের শাসনাধীনে অর্পিত হইল এবং পূর্ব ইউরোপে যে ৯০ লক্ষ জার্মান বাসিন্দা ছিল, তাদের মধ্যে ২০ লক্ষ ছাড়া বাকী সকলেই পলায়নপর জার্মানবাহিনীর সঙ্গে পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিল। (৬)

বাকী জার্মান বাসিন্দাগণকে 'মানবতাবোধ ও শৃঙ্খলার সঙ্গে' অপসারণের প্রস্তাব গৃহীত হইল। এই সমস্ত জার্মানদের বাসভূমি ছিল পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরীতে।

'জাতীয় ঐক্যের অস্থায়ী পোলিশ সরকার' গঠিত হইয়াছিল ২৮ জুন, ১৯৪৫, এবং মিত্রপক্ষের দিক থেকে এই ব্যবস্থা স্বীকার না করিয়া উপায় ছিল না। সুতরাং ৫ জুলাই বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের গবর্নমেন্ট এই নূতন সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিলেন। ফলে, বৃটেন ও আমেরিকার পৃষ্ঠপোষিত লণ্ডনের 'দেশান্তরিত' পোলিশ সরকার বাতিল হইয়া গেল। অর্থাৎ যে পোল্যাণ্ড নিয়া ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ শুরু হইয়াছিল, সেই পোল্যাণ্ডের 'নবতম সংস্করণ' নিয়া মহাযুদ্ধের অবসান হইল এবং নূতন পোল্যাণ্ড 'সোভিয়েতের বন্ধুরূপে' প্রতিষ্ঠিত হইল।

* * *

ইতিমধ্যে বৃটেনে নতুন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল। চার্চিলের রক্ষণশীল দল

(৫) দি কোল্ড ওয়ার—১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৫
(৬) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৪০

পরাজিত ও শ্রমিকদল বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হইল। (একথা গোড়াতেই উল্লেখ করা হইয়াছে।) চার্চিলের পরাজয়ে যদিও সোভিয়েত রাশিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল এবং ২৮শে জুলাই থেকে চার্চিল পটসডাম সম্মেলন থেকে বাদ গেলেন, তবু রুশ প্রতিনিধিরা শ্রমিক নেতাদের নিয়া যেন ছুঁচো গেলার অবস্থায় পড়িলেন। কারণ, প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলি এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেভিন রক্ষণশীল দলের চেয়েও রুশ বিরোধিতায় বেশী উৎসাহ দেখাইলেন। এ্যাটলি ও বেভিন জার্মানী, পোল্যাণ্ড ও সোভিয়েত রাশিয়ার নতুন সীমানা নিয়া তীব্র বিরোধিতা করিলেন।…

ইতিমধ্যে আমেরিকার যুগান্তকারী অ্যাটম্ বোমা পরীক্ষিত ও আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং সেই সংবাদ অত্যন্ত 'অস্পষ্টভাবে' ষ্ট্যালিনকে দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু ষ্ট্যালিন তার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে ব্যর্থ হইলেন। পটসডাম সম্মেলনে পারমাণবিক বোমার কূটনৈতিক প্রতিক্রিয়া এবং জাপানের প্রতি চরমপত্র নিয়া পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

দশম পর্ব

তৃতীয় অধ্যায়

পটসডাম—(২) এ্যাটম বোমার পটভূমিকায়

আগের অধ্যায়ে পটসডাম (বার্লিন) সম্মেলন সম্পর্কে প্রধানতঃ ইউরোপীয় কূটনৈতিক পটভূমিকায় একটি সাধারণ রেখাচিত্র দেওয়া হইয়াছে এবং মোটামুটি মিত্র-পক্ষীয় তিন শীর্ষনেতার মধ্যে আপোষরফামূলক প্রস্তাবগুলির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবতঃ আপোষমূলক প্রস্তাবগুলির অন্তরালে তিন পক্ষের মধ্যে - বিশেষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার যে মতবিরোধ ঘটিয়াছিল এবং এ্যাটম বোমার সাফল্যজনক পরীক্ষার পর প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও তাঁর পরামর্শদাতাগণ রাশিয়ার প্রতি যে কঠোর মনোভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, মহাযুদ্ধের ইতিহাসে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি মহাযুদ্ধের পরবর্তী আন্তর্জাতিক জগতে ১৯৫০ -১৯৬০-এর দশকে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সঙ্গে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শিবিরের যে নিদারুণ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সংঘর্ষ হইয়াছিল, তারও মূল ছিল এখানে—বিশেষভাবে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে। সুতরাং কোন কোন ঐতিহাসিক এর নাম দিয়াছেন 'এ্যাটোমিক ডিপ্লোমাসি' বা পারমাণবিক কূটনীতি, যে কূটনীতি ভিতরে ভিতরে পটসডাম সম্মেলনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ প্রায় একজোট হইয়া রাশিয়াকে কোণঠাসা করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল। এই পারমাণবিক কূটনীতির সামরিক লক্ষ্য কেবল জাপান ছিল না ছিল সোভিয়েত রাশিয়াও. সুতরাং ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সবিশেষ আলোচনা প্রয়োজন। এখানে স্মরণীয় যে, হ্যারী ট্রুম্যান ব্যক্তিগতভাবে কখনো সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না, বরং অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। ১৯৪১ সালে হিটলার কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট যখন কর্জ-ইজারা আইন অনুসারে সোভিয়েতকে সাহায্যদানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন সেনেটর ট্রুম্যান মন্তব্য করিয়াছিলেন—"যদি আমরা দেখি যে, যুদ্ধে জার্মানী জয়লাভ করছে, তা' হলে আমাদের উচিত হবে রাশিয়াকে সাহায্য দেওয়া। অপর পক্ষে যদি দেখা যায় যে, রাশিয়া জয়লাভ করছে, তাহলে আমাদের উচিত হবে জার্মানীকে সাহায্য দেওয়া এবং এভাবে দু' পক্ষকে কাটাকাটি করে মরতে দেওয়া উচিত" সুতরাং এহেন ট্রুম্যান যখন রুজভেণ্টের মৃত্যুর পর প্রেসিডেণ্টের গদীতে আসীন হইলেন, তখন রুশ-মার্কিন সম্পর্কের যে অবনতি ঘটিবে, সেটা আর আশ্চর্য কি ?...

রুশ-মার্কিন সম্পর্কের এই অবস্থা সম্পর্কে একজন মার্কিন বিশেষজ্ঞ—ডঃ গ্যার আলপেরোভিৎস (Gar Alperovitz) তাঁর পুস্তকে পারমাণবিক কূটনীতির বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও তাঁর উপদেষ্টাগণ পটসডাম সম্মেলনে তিন রকম কূটনৈতিক রণনীতি অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। যথা—

(ক) অবিলম্বেই রাশিয়ার প্রতি শক্তি প্রদর্শন বা 'শো ডাউন'।

(খ) বিলম্বিত শক্তি প্রদর্শন।

(গ) শেষ পর্যন্ত ষ্ট্যালিনের মুখোমুখি হওয়ার বা কনফনট্রেশনের রণনীতি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত।

পটসডাম সম্মেলনে আমেরিকার পক্ষ থেকে এই তিন প্রকার কূটনীতির রণ-কৌশলই দেখা গিয়াছিল এবং এই সমস্তই ঘটিয়াছিল এ্যাটম বোমার পরীক্ষা ও বিস্ফোরণের পটভূমিকায়।

*   *   *

অবশ্য হারবার্ট ফীজের মত (Herbert Feis) বিখ্যাত মার্কিনবিশেষজ্ঞ (সোভিয়েত বিরোধী) বলিয়াছিলেন যে, ট্রুম্যান পরলোকগত রুজভেল্টের নীতির প্রতি পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিতে চাহেন নাই। কিন্তু ডঃ আলপেরোভিৎস তাঁর পুস্তকে এই মতবাদের খণ্ডন করিয়াছেন এবং পটসডাম সংক্রান্ত দলিলপত্র ইত্যাদি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পারমাণবিক শক্তি পরীক্ষার পটভূমিকায় প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান রুজভেল্টের নীতির বদলে রাশিয়ার প্রতি কঠোর নীতি অনুসরণ করিতে এবং ইউরোপে সোভিয়েত প্রভাব হ্রাস বা দূর করিতে চাহিয়াছিলেন রুজভেল্টের মৃত্যুর (১২ এপ্রিল ১৯৪৫) মাত্র ১১ দিন পরে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এক 'শক্তিশালী' মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির প্রয়োগ করিতে চাহিলেন এবং ২৩ এপ্রিল ট্রুম্যান নবগঠিত পোলিশ সরকারের (সোভিয়েত পক্ষপাতী) পুনর্গঠন দাবী করিয়া সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটোভকে কর্কশ ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, রুশরা যদি এই বিষয়ে সহযোগিতা করিতে না চায়, তবে তারা গোল্লায় যাউক! জবাবে মলোটোভ মন্তব্য করিয়াছিলেন 'আমার জীবনে আমার সঙ্গে কেউ কখনও এমনভাবে কথা বলেন নি।'

ট্রুম্যান ফোড়ন কাটিলেন—'আপনাদের চুক্তি আপনারা পালন করুন, তা' হলে আর এই ধরনের কথা শুনিতে হবে না।'—(১)

অথচ ইয়াল্টা বৈঠকে চার্চিল-রুজভেল্ট 'সোভিয়েতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন' পোলিশ সরকার গঠনের মূল নীতি মানিয়া লইয়াছিলেন এবং পটসডাম বৈঠকে ষ্ট্যালিন আপোষ মীমাংসার উদ্দেশ্যে মধ্যপন্থা অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং যুগোশ্লাভিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তিনি ওয়ারশ'র (পোল্যাণ্ড) মন্ত্রিসভার প্রতি চারজন মন্ত্রী পিছু একজন করিয়া নূতন মন্ত্রী গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ট্রুম্যান সোভিয়েত পক্ষপাতী পোলদের শক্তিবৃদ্ধির প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। ট্রুম্যানের এই মনোভাব দেখিয়া চার্চিল পর্যন্ত অবাক হইয়াছিলেন- যদিও তিনি মনে মনে ট্রুম্যানের তারিফ করিলেন। আসলে পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে রাশিয়ার কর্তৃত্ব বিস্তার নীতির বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ড নিয়া ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের এই বাধা দান ছিল একটা প্রতীকী বা 'সিম্বলের' মত। রুজভেল্টের মৃত্যুর পর কিভাবে মার্কিন নীতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তার অন্যতম প্রমাণ এই যে, মস্কোস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আভেরেল হ্যারিম্যান পর্যন্ত ট্রুম্যানকে পরামর্শ দিলেন যে, তাঁর বিশ্বাস রাশিয়া তবল নীতি

---

(১) Atomic Diplomacy: Hiroshima and Potsdam—Gar Alperovitz, Vintage Books, New York, 1967, P. 19, P. 23.

অনুসরণ করিতেছে—একদিকে ইঙ্গ-মার্কিনের সঙ্গে সহযোগীতা, কিন্তু অন্যদিকে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির উপর প্রভাব বিস্তার। তাঁর বিশ্বাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'ইউরোপে বর্বরতার আক্রমণের সম্মুখীন।'

যেখানে দায়িত্বশীল এবং অভিজ্ঞ মার্কিন কূটনীতিকদের মনোভাব এই, সেখানে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নবাগত প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের পক্ষে কঠোর নীতির দিকে ঝুঁকিয়া পড়া খুব অভিনব ছিল না। কিন্তু একটা প্রশ্ন বিবেচনার ছিল : স্যানফ্রান্সিস্কোতে রাষ্ট্রসংঘের সনদ গ্রহণ সম্মেলনের তারিখ ছিল ২৫ এপ্রিল। যদি এই সময় রাশিয়ার প্রতি কঠোর নীতি অনুসৃত হয়, তা হলে সোভিয়েত সরকারের অসহযোগিতার ফলে সেই ঐতিহাসিক সম্মেলন পণ্ড হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু অপর পক্ষে হ্যারিম্যানের যুক্তি ছিল এই যে, যুদ্ধবিধ্বস্ত রাশিয়ারও আমেরিকার কাছে ঠেকা আছে। কারণ অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য আমেরিকার কাছ থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার ৬০০ কোটি ডলার ঋণের দরকার হইতে পারে।...

ট্রুম্যান পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে প্রায় আনাড়ি ছিলেন বলিলে অতিরঞ্জিত করা হইবে না। ফলে, অস্থায়ী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোসেফ সি গ্রু (Grew) ছিলেন তাঁর একজন পরামর্শদাতা এবং গ্রু ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল ও সোভিয়েত বিরোধী। (রুজভেল্টের পক্ষপাতী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ষ্টেটিনিয়াস সেই সময় ওয়াশিংটনের বাইরে ছিলেন এবং তাঁর কার্যকালও শেষ হইয়া আসিয়াছিল।) ট্রুম্যান এই সমস্ত ব্যক্তির পরামর্শে স্থির করিলেন যে, সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার এ পর্যন্ত একতরফা নীতি চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং এই সম্পর্ককে নূতন ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে হইবে। কিন্তু তখন আর একটি প্রশ্ন দেখা দিল। জাপানের বিরুদ্ধে তখনও যুদ্ধ শেষ হয় নাই এবং এই যুদ্ধে রাশিয়ার সহযোগিতা দরকার। সুতরাং 'কঠোর নীতি' অনুসরণ করিলে রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে কোন সাহায্য নাও দিতে পারে। কিন্তু এপ্রিলের মধ্যভাগে মার্কিন সেনানীমণ্ডলী দেখিলেন যে, জাপানী সমুদ্রের উপর মার্কিন নৌ-আধিপত্য এতটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, চীন বা মাঞ্চুরিয়া থেকে জাপানী সৈন্যবাহিনীকে খাস জাপানে অপসারণ করা সম্ভব নয়। অতএব রুশ সাহায্য না পাইলেও ক্ষতি নাই এবং তাঁদের পরামর্শক্রমে জয়েন্ট চীফস্ অব্ ষ্টাফ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন যে, খাস জাপানী ভূমি আক্রমণের জন্য রাশিয়ার সহযোগিতার দরকার নাই। সুতরাং ট্রুম্যান শক্ত হইলেন এবং স্যানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে ওয়ারশ' সরকারকে মানিয়া নিতে অস্বীকৃত হইলেন। এমন কি, বর্তমান ওয়ারশ' সরকারের ভিত্তিতে পোলিশ গবর্নমেণ্টের পুনর্গঠনেও মার্কিন সরকার রাজী ছিলেন না। সুতরাং ১০ মে ষ্ট্যালিন ট্রুম্যানকে জানাইয়া দিলেন যে, এই অবস্থায় পোলিশ সমস্যার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়!

অতএব "অবিলম্বে শক্তি প্রদর্শনের" ট্রুম্যানীয় নীতি ব্যর্থ হইল। কারণ, ষ্ট্যালিন নত বা নরম হইলেন না।

এই সময় ১৪ মে বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইডেন ট্রুম্যানকে জানাইলেন যে, তিন প্রধানের বৈঠক ছাড়া পোলিশ সমস্যার কোন মীমাংসা হইবে না। অপরপক্ষে বৃটিশ ইম্পিরীয়েল জেনারেল ষ্টাফের প্রধান জেনারেল ইজমে (Ismay) জার্মানীর

রুশ অধিকৃত এলাকা থেকে মিত্রসৈন্য অপসারণ না করার সমালোচনা করিলেন। কেন না, এর দ্বারা মিত্রপক্ষের মধ্যে স্বীকৃত চুক্তির অমর্যাদা করা হইতেছিল এবং এই বিষয়ে মার্কিন সেনাপতি জেনারেল আইজেনহাওয়ারও অনুরূপ অভিমত পোষণ করিতেন। তথাপি ২৩ এপ্রিলের (১৯৪৫) পর ট্রুম্যান ও চার্চিল যেন একজোট হইয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করিতে উদ্যত হইলেন এবং যদিও হার্বার্ট ফীজ লিখিয়াছেন যে, 'রাশিয়ার সঙ্গে রুজভেল্টের সমস্ত চুক্তি ট্রুম্যান যত্নের সঙ্গে পালন করিয়াছিলেন,' তথাপি এ কথা সত্য নয়—অন্ততঃ ডঃ আলপেরোভিৎসের এই অভিমত। তিনি তাঁর বইতে ট্রুম্যানের ২৭শে এপ্রিল তারিখের বার্তা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, অষ্ট্রিয়ায় ও ভিয়েনায় দখলীকৃত এলাকাগুলি এবং অষ্ট্রিয়ার পরিচালনা সম্পর্কে একটি সুমীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত জার্মানীর সোভিয়েত এলাকা থেকে সৈন্য অপসারণ করিতে ট্রুম্যান অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। (২)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমরসচিব ষ্টিমসন রক্ষণশীল হইলেও অত্যন্ত বাস্তববাদী ছিলেন। তিনি পোল্যাণ্ড, মধ্য ইউরোপ এবং সোভিয়েত রাশিয়ার পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি সম্পর্কে রুশনীতির সারবত্তা উপলব্ধি করিলেন এবং 'অবিলম্বেই শক্তি প্রদর্শনের' ট্রুম্যানীয় নীতির বিরোধিতা করিলেন। পরপর দুটি মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝা গিয়াছিল যে, ইউরোপীয় শান্তির উপর আমেরিকার নিরাপত্তাও নির্ভরশীল। সুতরাং ষ্টিমসনের মতে বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা কিংবা ইউরোপের স্থায়িত্ব বিধান করিতে হইলে রুশ-মার্কিন সহযোগিতা প্রয়োজন।

সমরসচিব হিসাবে মার্কিন মহলে ষ্টিমসনের 'পজিশনের' গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। কারণ, পারমাণবিক বোমার গোপনীয়তার সমস্ত খবর ছিল তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাঁর মতে আর চার মাসের মধ্যেই এ্যাটম বোমার পরীক্ষা শেষ হইয়া যাইবে এবং এই বোমা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে মার্কিন সম্পর্কের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে। সুতরাং জুলাই মাসের প্রথম ভাগে এই বোমার পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত তিনি ট্রুম্যানকে অপেক্ষা করিতে এবং তিন প্রধানের বৈঠক স্থগিত রাখিতে পরামর্শ দিলেন। বিশেষতঃ ইউরোপে তখন মিত্রপক্ষের ৩০ লক্ষ সৈন্য ছিল এবং গ্রীষ্মকালের শেষে মাসে ৫০ হাজারের বেশী সৈন্য অপসারিত হইবে না। অতএব 'বিলম্বিত শক্তি প্রদর্শনের' নীতিতে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। ষ্টিমসনের এই সমস্ত মতামতের ফল ফলিল। কারণ, চার্চিলের একটি তারের জবাবে ট্রুম্যান ১৪ই মে জানাইলেন যে, তিন শীর্ষ নেতার বৈঠক প্রয়োজন বটে, কিন্তু আগামী দুইমাস তিনি এত ব্যস্ত থাকিবেন যে, ওয়াশিংটনের বাইরে যাইতে পারিবেন না। অর্থাৎ জুলাই মাসের প্রথম ভাগের আগে নয়। কারণ, ঐ সময় পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরীক্ষা হওয়ার কথা।

সুতরাং ট্রুম্যানের তিন নম্বর নীতি—অর্থাৎ ষ্ট্যালিনের মুখোমুখি হওয়ার বা

---

(২) এ্যাটোমিক ডিপ্লোমাসি পৃষ্ঠা ৪৫, পাদটীকা।

'কনক্রনটেনশনের' নীতি ইতিমধ্যে পরিত্যক্ত হইল। এটাই ছিল ট্রুম্যানের পক্ষে ১৯৪৫ সালের বসন্ত কালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। (৩)

এই পরিস্থিতির মধ্যেই রুশ ও বৃটিশ মনোভাব বুঝিবার জন্য ট্রুম্যান হপকিন্সকে মস্কোতে এবং জোসেফ ডেভিসকে (মস্কোর প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত) লণ্ডনে পাঠাইবার মতলব করিলেন। কিন্তু এই দুই মিশনের ব্যবস্থা 'অত্যন্ত গোপনে' অনুষ্ঠিত হইল। এমন কি পররাষ্ট্র দপ্তরের কাউকেও পর্যন্ত জানানো হইল না—এক মাস পর যাত্রার ঠিক পূর্বাহ্নে ছাড়া।

'This unusual secrecy is further indirect evidence of the relationship of the trips to the secret atomic project; it would have been in conceivable, except in extraordinary circumstances, for Truman to send Hopkins to discuss the most important outstanding diplomatic questions without consulting, or at least notifying, the Sec etary of State' - (৪)

সহজ কথায়, অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সমস্যাগুলির আলোচনার জন্য পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে বিন্দুমাত্র আলোচনা না করিয়া কিংবা পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে না জানাইয়া এভাবে হপকিন্সকে পাঠানো এবং সেজন্য অভূতপূর্ব গোপনীয়তার অবলম্বন—এর দ্বারাই গোপনীয় পারমাণবিক প্রকল্পের সঙ্গে এই মস্কোযাত্রার অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কারণ, সাধারণ অবস্থায় এ কথা কল্পনা করাও যাইত না।

হপকিন্সের মস্কোযাত্রার সাফল্যের কিংবা পোল্যাণ্ড ইত্যাদি সমস্যার আপোস মীমাংসার কথা আগের অধ্যায়েই বর্ণনা করা হইয়াছে। আসলে সমরসচিব ষ্টিমসনের নীতিও এই মীমাংসা চেষ্টার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে এবং সেই মীমাংসার সূত্র ছিল চার রকম। যথা—

(১) পারমাণবিক পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ষ্ট্যালিনের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার নীতি স্থগিত রাখা।

(২) পোল্যাণ্ড সম্পর্কে রাশিয়ার অধিকাংশ প্রস্তাব মানিয়া লওয়া।

(৩) চার্চিলের নীতি ও ব্যাক্তিত্ব থেকে মার্কিন নীতিকে বিচ্ছিন্ন করা এবং মধ্য ইউরোপ সম্পর্কে রাশিয়ার সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসা।

আপোস-মীমাংসার বাহ্যিক মনোভাবের প্রমাণস্বরূপ ট্রুম্যান সোভিয়েত সরকারকে ১০০ কোটি ডলার ঋণদানেরও প্রস্তাব করিয়াছিলেন। অপরপক্ষে এ্যাটম্ বোমার পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত দূরপ্রাচ্য বা জাপান সম্পর্কেও 'বিলম্বিত রণনীতি'র কৌশল অবলম্বিত হইল।

এদিকে ট্রুম্যান ষ্ট্যালিনের নিকট ১৫ জুলাই থেকে পটসডাম সম্মেলন আরম্ভ করার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন এবং যদিও চার্চিল চাহিয়াছিলেন জুন মাসের মাঝামাঝি তারিখ, তথাপি ট্রুম্যান তাতে রাজী হইলেন না। কারণ, জুলাই মাসের

(৩) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৬৮

(৪) পূর্বোক্ত পুস্তক (আলপেরোভিৎস), পৃষ্ঠা ৭১

আগে পারমাণবিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। সেই সময় ষ্ট্যালিন অবশ্য এই সমস্ত গোপন রহস্যের কথা জানিতেন না। সুতরাং পটসডাম সম্মেলন সম্পর্কে ট্রুম্যানের প্রস্তাবিত তারিখই মানিয়া লওয়া হইল।

কিন্তু পটসডাম সম্মেলনের আগেই ২৮ মে তারিখ প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের পক্ষ থেকে হপকিন্স ও হ্যারিম্যান ষ্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া চীন, মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়া সম্পর্কে এই আশ্বাস আদায় করিলেন যে, চিয়াং কাইসেকের নেতৃত্বেই চীনের ঐক্য ও সংহতি মানিয়া লওয়া হইবে। তাঁর মতে চীনে এমন কোন কমিউনিষ্ট নেতা নাই, যিনি চীনের ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা রাখেন। ষ্ট্যালিন আরও বলিলেন যে, চীনের বিরুদ্ধে তাঁর কোন ভূমিগত দাবি নাই এবং সিনকিয়াং ও মাঞ্চুরিয়া সম্পর্কে চীনের সার্বভৌমত্বই স্বীকার করা হইবে। রুশসৈন্যের মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করিলে চিয়াং কাইসেকের প্রতিনিধিরা তাঁদের সঙ্গে অনুগমন করিতে পারিবেন। চীনে আমেরিকার 'খোলা দরজার' নীতি মানিয়া লওয়া হইবে এবং কোরিয়ার জন্য ট্রাষ্টিশিপ গঠন করা হইবে। (৫)

চীন সম্পর্কে ষ্ট্যালিনের সঙ্গে আলোচনার জন্য ট্রুম্যান চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী টি. ভি সুংকে (Soong) জুলাই মাস আরম্ভ হওয়ার আগেই মস্কোতে পাঠাইতে সম্মত হইলেন। আর জুলাই মাসে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার পর ট্রুম্যান মনে করিলেন যে, পূর্বদিকে জাপান আর পশ্চিমে ইউরোপ সমস্ত সমস্যার মীমাংসা সহজতর হইবে। সুতরাং ট্রুম্যানের বিলম্বিত রণনীতির আসল ভিত্তি ছিল পারমাণবিক বিস্ফোরণের সাফল্য। অবশ্য ট্রুম্যান আগেই মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, রণক্ষেত্রে এ্যাটম বোমার পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত ষ্ট্যালিনের কাছে কোন গুপ্ত কথা ফাঁস করা হইবে না এবং এই বিষয়ে চার্চিলও একমত ছিলেন।

* * *

চার্চিল-রুজভেল্ট ষ্ট্যালিন এতদিন পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে যে নীতি ইয়াল্টা পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন, সেটাকে পাল্টে দেওয়ার মনস্থ করিয়া প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান 'কর্কশ ভাষায় রচিত' একটি দলিলের খসড়া নিয়া পটসডাম যাত্রা করিয়াছিলেন। এর ফলে গোড়ার দিকে বৃটিশ ডেলিগেশন পটসডামে মার্কিন মনোভাব নিয়া বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়াছিলেন, যতক্ষণ না তাঁরা জানিতে পারিয়া ছিলেন অ্যাটম বোমার কথা, কারণ, সম্মেলনে উত্থাপিত প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান প্রস্তাবই আমেরিকার পক্ষ থেকে স্থগিত রাখার চেষ্টা হইতেছিল। ট্রুম্যান ১৫ই জুলাই অপরাহ্নে পটসডামে পৌছিয়াছিলেন এবং পরদিন ১৬ই জুলাই নিউ মেক্সিকোর আলামোগোরডো থেকে প্রথম পারমানবিক বিস্ফোরণের সাফল্যের সংবাদ সাঙ্কেতিক ভাষায় পৌছিল মার্কিন সমরসচিব ষ্টিমসনের কাছে এবং তিনি

(৫) মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের রিপোর্ট থেকে (এ্যাটমিক ডিপ্লোম্যাসি, পৃষ্ঠা, ১০২)

তৎক্ষণাৎ সেই সংবাদ জানাইলেন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী বার্নসকে (Byrnes)। যদিও এই প্রাথমিক সংবাদ খুব সুনির্দিষ্ট রকমের ছিল না, তবু দুই মার্কিন রাষ্ট্রনেতাই গভীর ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। কিন্তু আসল সংবাদ পাওয়া গেল পরদিন ১৭ই জুলাই পটসডাম সম্মেলন আরম্ভের দিন।

চার্চিল তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"১৭ ই জুলাই সেই বিশ্ব-কম্পনকারী সংবাদ এলো। অপরাহ্নে মার্কিন সমরসচিব ষ্টিমসন আমার বাস ভবনে এলেন এবং আমার সম্মুখে একটি কাগজের শীট মেলে ধরলেন, যার মধ্যে সাংকেতিক ভাষায় লেখা ছিল—

'Babies satisfactorily born, অর্থাৎ 'শিশুরা সন্তোষজনক ভাবেই জন্ম গ্রহণ করেছে।' ষ্টিমসনের ভাবভঙ্গী দেখে আমার মনে হল যে, অসাধারণ কিছু ঘটে গেছে। তিনি ব্যাখ্যা করে আমাকে বুঝালেন যে, মেক্সিকোর মরুভূমিতে পরীক্ষা সফল হয়েছে—'The atomic bomb is a reality' অর্থাৎ পারমাণবিক বোমা এখন বাস্তব সত্য।

"যদিও কিছু কিছু টুকরো খবর আমরা আগেই জানতাম, তথাপি চূড়ান্ত পরীক্ষার তারিখ আমাদের জানা ছিল না। এক্ষণে বুঝতে পারছি—শিশুরা সন্তোষজনক ভাবেই জন্মেছে" (৬)

পরদিন প্লেনযোগে আরও বিস্তৃত খবর আসিল। মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম এবং ভয়ঙ্করতম বিস্ফোরণ সম্পর্কে বলা হইল যে, ৫০ মাইল দূর থেকে এই বিস্ফোরণের শব্দ শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল এবং ২৫০ মাইল দূর থেকে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।…

তৃতীয় কিস্তির রিপোর্টে পারমাণবিক প্রকল্পের ডাইরেকটর জেনারেল লেসলি গ্রোভস যে বিস্তৃত তথ্য জানাইলেন, তার সার কথা এই যে, নিউ মেক্সিকোর আলামোগোরডোর বিমানঘাঁটির এক দূরবর্তী অংশে পারমাণবিক বোমার পুরাপুরি পরীক্ষা করা হইয়াছে :

"For the first time in history there was a nuclear explosion…The test was successful beyond the most optimistic expectations of any one…I estimate the energy generated to be in excess of the equivalent of 15,000 to 20,000 tons of T N T; and this is a conservative estimate…

The feeling of the entire assembly was…profound awe…"

অর্থাৎ 'ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিল। যাঁরা চরমতম আশাবাদী ছিলেন, তাঁদের প্রত্যাশাকেও এই পরীক্ষা ছাড়াইয়া গেল। আমার হিসাবে যে শক্তি এই বোমা বিস্ফোরণে উদ্গত হইয়াছিল, তাহা ১৫ হাজার থেকে ২০ হাজার টন টি-এন-টি বা অতি বিস্ফোরককেও ছাড়াইয়া গিয়াছে এবং এই হিসাবও ন্যূনতম পরিমাণে ধরা হইয়াছে। যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা এর ভীষণতায় হতবাক হইয়া গিয়াছিলেন।' (৭)

(৬) চার্চিল, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫১-৫২

(৭) এ্যাটোমিক ডিপ্লোম্যাসি, পৃষ্ঠা ১৫০

২১ শে জুলাইয়ের এই রিপোর্ট পাওয়ার পরেই পটসডাম সম্মেলনের মনস্তাত্ত্বিক আবহাওয়া ঘুরিয়া গেল এবং ষ্টিমসনের মতে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান যেন এক নতুন আত্মবিশ্বাসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইলেন এবং তিনি এমন এক শক্তির অধিকারী হইয়াছেন বলিয়া মনে করিলেন, যার দ্বারা তাঁর কূটনৈতিক উদ্দেশ্যগুলি পূরণ করা সহজ হইবে। এর প্রমাণ এই যে, এই রিপোর্ট পাওয়ার পর ট্রুম্যান সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ষ্ট্যালিন কর্তৃক উত্থাপিত বলকান সমস্যার জবাবে সাফ ঘোষণা করিলেন যে, এই সমস্ত তাঁবেদার রাষ্ট্রের গবর্ণমেন্টগুলির গঠনের পরিবর্তন করা না হইলে মার্কিন সরকার এই সমস্ত গবর্নমেন্ট মানিয়া লইবেন না…এই বিষয়ে তিনি নিশ্চয়ই সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে একমত হইবেন না। বরং তিনি অন্য কোন বিষয় নিয়া আলোচনা করিতে রাজী আছেন।

চার্চিল পর্যন্ত ট্রুম্যানের এই নূতন ভঙ্গী ও আত্মবিশ্বাস দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ষ্টিমসন বলিয়াছেন যে, এই রিপোর্ট পাওয়ার পর ট্রুম্যান যেন এক 'পরিবর্তিত মানুষে' পরিণত হইয়াছিলেন। (৮)

* * *

বলা বাহুল্য যে, ট্রুম্যানের চেয়ে চার্চিলের আনন্দ কম ছিল না। বিশেষভাবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা নিয়া ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ যে দুশ্চিন্তায় ছিলেন, এই ব্রহ্মাস্ত্র আবিষ্কারের ফলে তাঁরা সেই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাইলেন। ট্রুম্যানের সঙ্গে চার্চিল অবিলম্বেই পরামর্শ বৈঠকে মিলিত হইলেন। এতদিন পর্যন্ত ইঙ্গ মার্কিন পক্ষের ধারণা ছিল যে, জাপানকে হারাইতে গেলে ক্রমাগত বোমাবর্ষণ এবং প্রচুর সৈন্যসহ জাপানী দ্বীপ আক্রমণ করিতে হইবে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে অজস্র প্রাণবলির দরকার হইবে। কেন না, সাম্প্রতিক কালের (এপ্রিল ১৯৪৫) ওকিনাওয়া দ্বীপ দখলের যুদ্ধে যে তীব্র ও তিক্ত অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, তাতে দেখা গিয়াছে যে, হাজার হাজার জাপানী সৈন্য এবং তাদের সেনাপতিরা পর্যন্ত হারিকিরি করিবে, তবু হার মানিবে না কিংবা যুদ্ধেও ক্ষান্ত দিবে না। এই মৃত্যুপণ লড়াইয়ের ভয়ঙ্কর বাধা অতিক্রম করিয়া যদি জাপানের প্রতি ইঞ্চি জমি দখল করিতে হয়, তবে চার্চিলের মতে আমেরিকার ১০ লক্ষ সৈন্য এবং বৃটেনের তার অর্ধেক বা ৫ লক্ষ সৈন্য বলি দিতে হইবে। কিন্তু এই অভূতপূর্ব প্রাণ হননের আর দরকার হইবে না। বিভীষিকাপূর্ণ দুঃস্বপ্ন যেন কাটিয়া গেল—যেন একটা 'মিরাক্যল' বা অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়া গেল। পারমাণবিক বোমার একটি বা দুইটি ভয়ঙ্কর আঘাতেই সমগ্র জাপানী যুদ্ধ খতম্ হইয়া যাইবে, আর রাশিয়ারও সংযোগিতা বা সাহায্যের দরকার হইবে না। আমেরিকা নিশ্চয়ই আর রুশ সাহায্যের ভরসায় থাকিবে না।

(৮) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩৫১

ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের আগে যাতে সোভিয়েত রাশিয়া চীনের বা মাঞ্চুরিয়ার কিংবা জাপানের কোন অংশ দখল করিয়া নিতে না পারে কিংবা আগেই আক্রমণ করিতে না পারে পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের নেতারা তেমন জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলেন। স্বয়ং ট্রুম্যান মনে করিলেন এতদিন পর রুজভেল্টের রাশিয়া সংক্রান্ত নীতি পরিবর্তনের শক্তি তিনি অর্জন করিয়াছেন এবং পটসডাম বৈঠকে ২১ জুলাইয়ের পর কোন সমস্যা নিয়া আপোষ-মীমাংসার জন্য রাশিয়ার উপর আর চাপ দেওয়ারও দরকার নাই। কিন্তু ষ্ট্যালিনও নরম হইলেন না এবং বলকান সমস্যার কোন মার্কিনী ফয়সালাও হইল না। তখন ২৪ জুলাই ট্রুম্যান সমর-সচিব ষ্টিমসনকে বলিলেন যে, তিনি কনফারেন্স বন্ধ করিয়া দিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে রাজী আছেন। আর এদিকে উল্লসিত চার্চিল অনুভব করিলেন যে, তাঁরা 'অপ্রতিরোধ্য শক্তি'র অধিকারী হইয়াছেন। সুতরাং বলকান নিয়া তিনি আগে ষ্ট্যালিনের সঙ্গে যে ভাগাভাগির চুক্তি করিয়াছিলেন, তিনি নিজের সেই চুক্তি নিজেই ভঙ্গ করিতে উৎসুক হইলেন। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই সময় চার্চিলের বলকান নীতির বিরোধী ছিলেন। কিন্তু এবার ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়া গেল এবং ট্রুম্যান চার্চিলের দলে আসিলেন। আর লর্ড এ্যালান ব্রুকের মতে চার্চিল এতদূর পর্যন্ত মনে করিলেন যে, সমস্ত রুশ শিল্পকেন্দ্র ও জনগণকে সাবাড় করার এবং ষ্ট্যালিনের উপর ডিক্টেটরি করার শক্তি তাঁর হাতের মুঠোয় আসিয়া গিয়াছে!

কিন্তু আমেরিকার পারমাণবিক বিজ্ঞানীরা জাপানের বিরুদ্ধে এর ব্যবহার নিষেধ করিয়াছিলেন এবং সোভিয়েত রাশিয়াকে এই বোমার অস্তিত্ব জানাইবার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। কারণ, অন্যথা আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতা বিপন্ন হইতে পারে।

এমন কি পটসডামে জেনারেল আইজেনহাওয়ারও পর্যন্ত জাপানের বিরুদ্ধে পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। কারণ, তাঁর মতে জাপান ইতিমধ্যেই পরাজিত হইয়াছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত নয় এভাবে বিশ্বজনমতকে গভীরভাবে আহত করা। (১)

* * *

তখন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখা দিল চার্চিল-ট্রুম্যানের কাছে—ষ্ট্যালিনকে আদৌ এই নতুন অস্ত্র এ্যাটম বোমার সংবাদ দেওয়া হইবে কিনা এবং দেওয়া হইলে কতটুকু দেওয়া হইবে? অথবা সমগ্র ব্যাপারটাই ষ্ট্যালিনের কাছ থেকে গোপন করা হইবে? যদি তাঁকে সংবাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়, তবে লিখিতভাবে দেওয়া হইবে কিংবা মৌখিক ভাবে? চার্চিল লিখিয়াছেন যে, তিনি ও ট্রুম্যান এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন যে, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্যের আর কোন প্রয়োজন নাই। বিগত ইয়াল্টা বৈঠকে তাঁদের অবস্থান ছিল দুর্বল এবং রাশিয়া ছিল শক্তিশালী। সুতরাং ইয়াল্টাতে রাশিয়া আমেরিকানদের কাছ থেকে যথেষ্ট সুবিধা আদায় করিয়া নিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু পটসডাম বৈঠকে ইঙ্গ-মার্কিন

(১) এ্যাটোমিক ডিপ্লোম্যাসি—পৃষ্ঠা—১৫৪-৫৫

পক্ষের অবস্থানই ছিল অধিকতর শক্তিশালী। সুতরাং রাশিয়াকে আর আগের মত খাতির না করিলেও চলিবে। তথাপি চার্চিল মনে করেন যে, হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়া ছিল এক বিরাট শক্তিশালী মিত্রপক্ষ। সুতরাং এই নূতন অস্ত্রের কথা সম্পূর্ণ চাপিয়া যাওয়া ঠিক হইবে না, তবে, বিস্তৃত কোন খবরও দেওয়া হইবে না। ট্রুম্যান ও চার্চিল পারস্পরিক পরামর্শক্রমে স্থির করিলেন যে, কোনও একটি বৈঠকের শেষে ট্রুম্যান কথায় কথায় ষ্ট্যালিনকে এই নূতন অস্ত্রের কথা বলিবেন বটে, তবে পারমাণবিক বোমা সম্পর্কে কোন তথ্য দিবেন না। কিন্তু একথা বলা হইবে যে, একটা নতুন ধরনের অসাধারণ শক্তিশালী বোমা প্রস্তুত হইয়াছে, যার ফলে জাপানের পক্ষ থেকে যুদ্ধ চালাইবার শক্তি চূড়ান্তরূপে ব্যাহত হইবে। (১০)

ট্রুম্যান চার্চিলের সঙ্গে একমত হইলেন এবং ২৪ জুলাই, ১৯৪৫, যখন তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কনফারেন্স বন্ধ করিয়া দিয়া বাড়ী ফিরিতে রাজী ছিলেন, সেই সময় একটি বৈঠকের শেষে তিনি কথায় কথায় ষ্ট্যালিনকে বলিলেন যে, তাঁরা একটি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন নূতন অস্ত্র তৈয়ার করিয়াছেন। তবে তিনি 'নিউক্লিয়ার' বা 'এ্যাটোমিক'—এই দুইটি শব্দের একটিও ব্যবহার করেন নাই। চার্চিল অবশ্য অদূরে দাঁড়াইয়া সকৌতুকে এবং গভীর আগ্রহভরে ব্যাপারটা লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি (চার্চিল) পরে বলিয়াছেন যে, তিনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, ট্রুম্যানের বক্তব্যের আসল তাৎপর্য ষ্ট্যালিন বুঝিতে পারেন নাই—

'Churchill was sure that Stalin had no idea of what he was being told.'

ট্রুম্যান ষ্ট্যালিনের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর মুহূর্তেই চার্চিলের কাছে আসিয়া গর্বভাবে মন্তব্য করিলেন, 'ষ্ট্যালিন কোন প্রশ্ন করেন নাই।' (১১)

অর্থাৎ চার্চিল ও ট্রুম্যান চাতুর্য নীতি অবলম্বন করিলেন। তাঁরা তাঁদের সমর-সঙ্গী ও মিত্র ষ্ট্যালিনের কাছ থেকে সমস্ত কিছু গোপন করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে এমন অভিযোগ যাতে না উঠে, এজন্য কৌশলপূর্বক একটা 'অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন নূতন অস্ত্র সম্পর্কে' ইঙ্গিত দিলেন বটে, কিন্তু অস্ত্রটা যে এ্যাটম বোমা, সেই আসল কথাটাই চাপিয়া গেলেন। পটসডামে ট্রুম্যান ও চার্চিল রাশিয়ার প্রতি বিরূপ মনোবৃত্তি নিয়াই ষ্ট্যালিনের কাছ থেকে পারমাণবিক অস্ত্রের কথা গোপন করিয়া রাখিলেন। অন্যথা এমন আচরণের অর্থ কি এবং উদ্দেশ্যই বা কি ?

* * *

পারমাণবিক শক্তি করায়ত্ত হওয়ার পর ট্রুম্যান সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি কড়া নীতি অবলম্বন করিলেন এবং রুড়ের শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল কিংবা রাশিয়ার ক্ষতিপূরণ দাবী অথবা বলকান বা পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ কিংবা ভবিষ্যৎ জার্মানীর সামরিক পুনরভ্যুত্থান, অথবা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় রাশিয়ার সহযোগিতা ইত্যাদি কোন বৃহৎ প্রশ্নেই ট্রুম্যান রাশিয়াকে কোন 'কনসেশন' দিতে কিংবা কোন আপোষ

(১০) চার্চিল—ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৪

(১১) এ্যাটোমিক ডিপ্লোম্যাসি—পৃষ্ঠা ১৫৬

মীমাংসা করিতে রাজী ছিলেন না। যদি মীমাংসা করিতে হয়, তবে আমেরিকার দাবী অনুসারেই করিতে হইবে। অথবা সমস্তাগুলি ভবিষ্যৎ বিবেচনার জন্য স্থগিত রাখিতে হইবে—অন্যথা তিনি সম্মেলন বন্ধ রাখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে প্রস্তুত আছেন! ট্রুম্যান বারবার এই ভয় দেখাইতে লাগিলেন।

পটসডাম সম্মেলনে পারমাণবিক কূটনীতির এই পরোক্ষ বা অন্তরালবর্তী প্রভাব সত্ত্বেও সোভিয়েত পক্ষ কিন্তু তাঁদের পত্র-পত্রিকায় পটসডামের সাফল্য সম্পর্কে উচ্চাশা প্রকাশ করিলেন। অপর পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধিরাও দাবী করিলেন যে, পটসডামে আমেরিকাই সাফল্য অর্জন করিয়াছে!

আসলে পটসডামে একমাত্র সেই সমস্ত বিষয়েরই মীমাংসা হইয়াছিল যেগুলি সম্পর্কে মূলনীতিঘটিত কোন বিরোধ ছিল না। যেমন, যুদ্ধোত্তর জার্মানী সম্পর্কে মূল রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণ। কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে বিতর্কিত অনেক প্রশ্নেরই কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই।

* * *

এদিকে ষ্ট্যালিন পটসডাম বৈঠকে মিত্রপক্ষের শীর্ষ নেতৃদ্বয়কে জানাইলেন যে, মস্কোস্থিত জাপানী রাষ্ট্রদূতের মারফৎ জাপানের সম্রাটের পক্ষ থেকে সোভিয়েত সরকারের নিকট শান্তি প্রস্তাব পাঠানো হইয়াছে মিত্রপক্ষের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই প্রস্তাবে জাপানের পক্ষ থেকে বলা হইয়াছে যে, তাঁরা 'নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে' রাজী নন, তবে অন্য কোন শর্তে আপোষ মীমাংসা করিতে রাজী আছেন। কিন্তু ষ্ট্যালিন ইতিমধ্যেই এই ধরনের অস্পষ্ট প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেন।...

জাপানী শান্তি প্রস্তাবের এই পটভূমিকায় ট্রুম্যান ও চার্চিলের মধ্যে জাপানের নূতনতম পরিস্থিতি নিয়া আলোচনা ও পরামর্শ হইল এবং ইঙ্গ-মার্কিন নেতারা উপলব্ধি করিলেন যে, জাপানের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল। কিন্তু মুষ্টিমেয় জঙ্গীবাদী একটি গোষ্ঠী এখনও জাপানে ক্ষমতা দখল করিয়া আছে। এরা ছাড়া আর বাকী সকলেই এই আত্মঘাতী যুদ্ধ বন্ধ করিতে ইচ্ছুক। সুতরাং স্থির হইল জাপানের উদ্দেশ্যে একটি চরমপত্র দেওয়া হইবে এবং সেটা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হইবে। এই চরমপত্রে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবী করা হইবে। ইঙ্গ মার্কিন মহলের এই পরামর্শ অনুসারে অবিলম্বে যুদ্ধে ক্ষান্ত দেওয়া এবং নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবী জানাইয়া ২৬ জুলাই জাপানের উদ্দেশ্যে একটি চরমপত্র প্রচার করা হইল। আশ্চর্য এই যে, পটসডাম থেকেই এই চরমপত্র প্রচার করা হইল বটে, কিন্তু তার আগে ষ্ট্যালিনকে একবার জিজ্ঞাসা করাও হইল না। অবশ্য অজুহাত স্বরূপ পরে একথা বলা হইয়াছিল যে, রাশিয়াতো তখন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল না।

১৩ দফা শর্ত সম্বলিত এই চরমপত্র ঘোষণা করা হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, রিপাব্লিক চীনের জাতীয় সরকারের প্রেসিডেন্ট এবং গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে এবং এই চরমপত্রে জাপানী গবর্নমেন্ট ও জাপানের সৈন্যবাহিনীদিগকে অবিলম্বে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণের জন্য আহ্বান জানানো হইল।

২৬ জুলাই, ১৯৪৫, তারিখে প্রচারিত এই গুরুত্বপূর্ণ চরমপত্রের মর্ম ছিল এই :

১। আমরা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও বৃটেনের তিন রাষ্ট্রনায়ক) আমাদের কোটি কোটি দেশবাসীর পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরূপে ঘোষণা করিতে চাই যে, যুদ্ধ শেষ করার জন্য জাপানকে একবার সুযোগ দেওয়া উচিত।

২। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ সাম্রাজ্য এবং চীনের জল, স্থল ও বিমানবাহিনীর বহুগুণ শক্তিবৃদ্ধি ঘটিয়াছে এবং এই বর্ধিত শক্তি লইয়া আমরা জাপানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি। সমগ্র মিত্রশক্তি সামরিক বল ও সুদৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে, যতক্ষণ না জাপান রণে ক্ষান্ত দেয়।

৩। জাপানের জনগণ যেন জার্মানীর দৃষ্টান্তের কথা স্মরণ রাখে। কেননা, সারা পৃথিবীর স্বাধীন জাতিসমূহের বিরুদ্ধে নির্বোধের মত শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ চালাইতে গিয়া জার্মানী শেষ হইয়া গেল।

এই দৃষ্টান্তের পরেও জাপান যদি জার্মানীর মত নিজ বাসভূমে প্রতিরোধ চালাইতে চায়, তবে জার্মানীর মত জাপানেরও কলকারখানা, ভূমি ও জনগণের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং সৈন্যবাহিনী চূর্ণ হইবে।

৪। জাপানের পক্ষে এখন চিন্তা করার সময় আসিয়াছে যে, মুষ্টিমেয় জঙ্গীবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া তারা জাপানী সাম্রাজ্যকে যেভাবে ধ্বংসের মুখে আনিয়া ফেলিয়াছে, সেই যুদ্ধ তারা চালাইবে কিংবা যুক্তির পথ ধরিবে।

৫। নীচে আমাদের শর্তগুলি উল্লেখ করিতেছি। এই সমস্ত শর্ত থেকে আমরা বিচ্যুত হইব না এবং এগুলির কোন বিকল্পও নাই। আর আমরা বিলম্বও সহ্য করিব না।

৬। জাপানের জনগণকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করিয়া যারা পৃথিবী জয় করার দুরাকাঙ্ক্ষায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, সেই সমস্ত লোকের কর্তৃত্ব ও প্রভাব নিশ্চিতরূপেই চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইবে। কারণ, এই বিষয়ে আমরা নিশ্চিত যে, দায়িত্বজ্ঞানহীন জঙ্গীবাদ যতক্ষণ পৃথিবী থেকে দূর না হইতেছে, ততক্ষণ জনগণের জন্য শান্তি নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করা অসম্ভব হইবে।

৭। যতক্ষণ পর্যন্ত জাপানের যুদ্ধ চালাইবার ক্ষমতা ধ্বংস না হইতেছে এবং যতক্ষণ নূতন নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, ততক্ষণ মিত্র শক্তিবর্গ জাপানের অভ্যন্তরে কেন্দ্রস্থলগুলি দখল করিয়া রাখিবে এই সমস্ত মৌলিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য।

৮। কাইরো থেকে প্রদত্ত ঘোষণার শর্তগুলি কার্যক্ষেত্রে পালন করা হইবে এবং জাপানের সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র হোনেশু, হোক্কাইডু, কিয়ুসু, শিকোকিউ এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যে আমাদের বিবেচনা অনুসারে সীমাবদ্ধ রাখা হইবে।

৯। জাপানের সৈন্যবাহিনীগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র করা হইবে এবং তাদেরকে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হইবে শান্তিপূর্ণ ও ফলপ্রসূ জীবন যাপনের জন্য।

১০। জাপানের জনগণকে আমারা নিশ্চয়ই দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ রাখিতে চাই না কিংবা জাতি হিসাবেও তাদেরকে ধ্বংস করিতে চাই না। কিন্তু যারা আমাদের

বন্দীদের উপর নিষ্ঠুরতা করিয়াছে, তাদেরকে এবং যুদ্ধ-অপরাধীদেরকে যথোপযুক্ত বিচার ও দণ্ড দেওয়া হইবে। ধর্ম, চিন্তা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং মৌলিক মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

১১। যে সমস্ত শ্রমশিল্প জাপানের অর্থনৈতিক জীবনের পক্ষে প্রয়োজন, সেগুলি বজায় রাখা হইবে। কিন্তু যুদ্ধের উপকরণ ও অস্ত্রাদি তৈয়ারির কারখানা রাখিতে দেওয়া হইবে না। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণও দ্রব্যমূল্যে আদায় করা হইবে।

১২। এই সমস্ত উদ্দেশ্য যখন পূর্ণ হইবে, তখন মিত্রপক্ষের দখলদার বাহিনীগুলি প্রত্যাহার করা হইবে এবং জাপানী জনগণের স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী শান্তিকামী দায়িত্বশীল গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে দেওয়া হইবে।

১৩। আমরা এক্ষণে জাপানের গবর্নমেণ্টকে তাদের সমস্ত সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ঘোষণ করার জন্য আহ্বান জানাইতেছি এবং তাদের সদিচ্ছা প্রমাণের জন্য দাবী করিতেছি। এর বিকল্প হইতেছে জাপানের সম্পূর্ণ এবং সর্বাত্মক ধ্বংস।…

কিন্তু জাপানের সামরিক শাসকেরা এই চরমপত্র অগ্রাহ্য করিলেন। সুতরাং পরিকল্পনা অনুযায়ী মার্কিন বিমানবাহিনী হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা বর্ষণের সিদ্ধান্ত করিলেন। (১২)

পটসডাম সম্মেলনে পারমাণবিক কূটনীতি ও রণনীতির এই সমস্ত ফলাফল ভাবী ইতিহাসের পক্ষেও গুরুতর ছিল। কেন না, সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা ও সম্ভাব রক্ষা করিয়া পৃথিবীর শান্তি সুনিশ্চিত করার যে উদার ও মানবিকনীতি রুজভেল্ট অনুসরণ করিতেছিলেন, ট্রুম্যানের এ্যাটম্ বোমা তার অবসান ঘটাইল এবং পটসডাম সম্মেলনে তার ভূমিকা রচিত হইল।

(১২) চার্চিল—ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৫৫৬ ৫৫৭

দশম পর্ব

চতুর্থ অধ্যায়

পতনের মুখে জাপান

হিটলারী জার্মানীর পতনের পর জাপানেরও আয়ু শেষ হইয়া আসিতেছিল— যদিও টোকিওর সংবাদপত্রগুলিতে তখনও জাপানের বীরত্ব ও জয়গৌরবের গাথা প্রচারিত হইতেছিল। কিন্তু রাস্তার লোকেরা এবং শহরবাসীরা দেখিতেছিল যে, তাদের দেশের জনপদ ও নগরগুলি শত্রুপক্ষের নিদারুণ বোমাবর্ষণে একে একে ধ্বংস হইয়া যাইতেছিল এবং দলে দলে লোক শহর ছাড়িয়া দূরবর্তী গ্রাম দেশে পলায়ন করিতেছিল। আর চাষীরা ভবিষ্যতের আশঙ্কায় চাউল মজুত করিতেছিল এবং শহরবাসীরা ক্রমশ উপবাসের মুখে পড়িতেছিল……

জাপানীরা এত দ্রুত এত বিশাল সাম্রাজ্য দখল করিয়াছিল যে, ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে আমেরিকার পাল্টা অভিযান শুরু হওয়ার পর জাপান আর তাল সামলাইতে পারিতেছিল না। অতিরিক্ত ভোজন করিলে যেমন ঔদরিক পীড়ায় আক্রান্ত হইতে হয়; জাপানেরও প্রায় সেই দশা হইয়াছিল। ১৯৪৫-এর প্রথম ভাগ থেকে তার আর যুদ্ধ চালাইবার কিংবা চার হাজার মাইল দীর্ঘ পেরিমিটার বা পরিসীমা পাহারা দেওয়ার ক্ষমতা অব্যাহত থাকিতেছিল না। কারণ, আকাশপথে ও সমুদ্রপথে মার্কিন সামরিক শক্তির ক্রমাগত প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে জাপান একে একে তাঁর ঘাঁটিগুলি ও অধিকৃত দ্বীপসমূহ হারাইতেছিল এবং আকাশ ও সমুদ্রপথের যোগাযোগ বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল।

রণশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ ক্যাপ্টেন লীডেল হার্ট বলিয়াছেন যে, সমুদ্র ও আকাশ, এই দুই পথের আক্রমণই জাপানের পতনের অন্যতম মূল কারণ। কারণ, মূলতঃ জাপানী সাম্রাজ্য ছিল 'সামুদ্রিক সাম্রাজ্য' (সী এম্পায়ার)—বৃটিশ সাম্রাজ্যের চেয়েও সে বেশী নির্ভরশীল ছিল বৈদেশিক সরবরাহের উপর। কিন্তু তার বাণিজ্যিক নৌবহরের শক্তি বৃটেনের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশেরও কম ছিল। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধারম্ভের সময় বৃটেনের বাণিজ্যিক নৌবহরে জাহাজের সংখ্যা যখন ছিল প্রায় ৩,৫০০ কিংবা ২ কোটি ১০ লক্ষ টনের, তখন জাপানের বাণিজ্যপোত ছিল মোট ৬০ লক্ষ টনের। অথচ দুই বছর সময় হাতে পাইয়াও জাপান তার সমুদ্রপথের নৌবহর ও বাণিজ্যবহর রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা—যেমন, কনভয় প্রথা এবং পাহারাদার বিমানবাহী জাহাজের শক্তি উপযুক্তভাবে গড়িয়া তোলে নাই। অথচ যুদ্ধ চালাইবার জন্য জাপানকে বিদেশ থেকে পেট্রোল, আকরিক লোহা, বক্সাইট, কোক কয়লা, নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ, এলুমিনিয়াম, এবং টিন, কোবাল্ট, দস্তা, ফসফেট, গ্রাফাইট্, পটাশ, কার্পাস, লবণ ও রবার আমদানি করিতে হইত। এগুলি ছাড়া তাদের খাদ্যদ্রব্যেরও একটা বড় অংশ সমুদ্র পারবর্তী দেশগুলি থেকে আনিতে হইত। কিন্তু সমুদ্র পথের উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও পাহারাদারির অভাবে প্রশান্ত মহাসমুদ্রে জাপান মার্কিন প্লেন, টর্পেডো ও সাবমেরিণের সহজ শিকারে পরিণত হইল।

কিন্তু তার জাহাজী শক্তি যখন প্রচণ্ড রকমে ক্ষয় পাইয়া গেল, তখন সে প্রাণপণে চেষ্টা করিল এই জাহাজী ক্ষতিপূরণের জন্য। প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে জাপানের যে ৮০ লক্ষ টনের জাহাজী শক্তি নষ্ট হইয়াছিল, তার ৬০ ভাগ শক্তি নষ্ট হইয়াছিল একমাত্র মার্কিন সাবমেরিনের দ্বারা। (১)

মিত্রশক্তি কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে অবরোধ সৃষ্টির ফলে সমুদ্র পথের যোগাযোগ বিপর্যস্ত হইয়া গেল। দক্ষিণ চীন সমুদ্র থেকে জাপানী কনভয় অদৃশ্য হইয়া গেল এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে টোকিও যাওয়ার সেই বিখ্যাত জলপথে সিঙ্গাপুরের ঘাঁটি আর কোন কাজে লাগিল না। অবশ্য জাপানের সৈন্যশক্তি তখন প্রায় অটুট ছিল—মোট ৬০ লক্ষ সৈন্যের অধিকাংশই ছিল জাপানী দ্বীপে। কিন্তু প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বিভিন্ন দ্বীপে ও দ্বীপপুঞ্জে আরও প্রচুর জাপানী সৈন্য অবস্থান করিতেছিল। মার্কিন বাহিনী এই সমস্ত দ্বীপকে এড়াইয়া কিংবা এগুলির পার্শ্ব কাটাইয়া খাস জাপানের নিকটবর্তী দ্বীপগুলির দিকে আগাইয়া যাইতেছিল সংক্ষিপ্ততম পথে আক্রমণের আশায়। ফলে, বিভিন্ন দ্বীপে, যেমন—নিউগিনি ও সলোমোন দ্বীপপুঞ্জে ১ লক্ষ, ক্যারোলাইনস্ দ্বীপে ৮০ হাজার, পলায়ুস্ দ্বীপে ৩০ হাজার, মার্শাল দ্বীপে ১৫ হাজার, মার্কাস ও ওয়েক দ্বীপে ১০ হাজার এবং নায়ুরু দ্বীপে ৪ হাজার জাপানী সৈন্য আটকা পড়িয়াছিল এবং তারা উদ্ধারলাভের আশায় দিন গণিতেছিল। কিন্তু এই উদ্ধারলাভ তাদের অদৃষ্টে আর ঘটিল না। কারণ, জাপানী নৌ ও বিমান শক্তি ততদিনে প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু এখানে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। যুদ্ধের শেষদিকে জাপানী সৈন্য-সংখ্যা এবং তাদের অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন পুস্তকে বিভিন্ন রকমের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। যেমন, মার্কিন ঐতিহাসিক স্নাইডার বলিয়াছেন মোট জাপানী সৈন্য-সংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষ (উপরে উদ্ধৃত)। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বলিয়াছেন চীন ও জাপান ইত্যাদি সহ ৪০ লক্ষাধিক। বিখ্যাত মার্কিন লেখক হার্বার্ট ফীজ বলিয়াছেন জাপানের হোম আর্মিতে বা স্বদেশের সৈন্যবাহিনীতে ১৫ লক্ষাধিক। ইংরাজ লেখক বসিল কোলিয়ারের মতে ১৯৪৪ সালের আগষ্ট মাসে প্রধান প্রধান সংগঠনের মোট জাপানী সৈন্য ছিল ১০১ ডিভিসন এবং বিমান সৈন্য ৩১ ডিভিসন। আর মস্কো থেকে প্রকাশিত (১৯৭০ সালে) একটি নূতন গ্রন্থে 'সক্রিয়' জাপানী সৈন্যের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে ৭০ লক্ষ এবং ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের ১৮ লক্ষ। আর স্যার জন হ্যামারটন সম্পাদিত গ্রন্থে (নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৩৩) বলা হইয়াছে যে, জাপানের বাইরে অধিকৃত দেশ বা স্থানগুলিতে ১লা সেপ্টেম্বর তারিখ জাপানী স্থল ও নৌ-সৈন্যের মোট সংখ্যা ছিল ৩৪ লক্ষ, যাদের দেশে ফিরিয়া যাওয়ার কোন সুযোগ ছিল না এবং খাস জাপানে মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষ। স্বয়ং মার্কিন সমরসচিব ষ্টিমসন অনুমান করিয়াছিলেন যে, ৫০ লক্ষ জাপানী সৈন্য তখনও অপরাজিত ছিল এবং এর মধ্যে চীনের মূল ভূখণ্ডে ছিল ২০ লক্ষ।

বিভিন্ন বিখ্যাত লেখকগণের পুস্তকে জাপানী সৈন্য সংখ্যার এই তারতম্য সত্ত্বেও

(১) History of the Second World War—Liddell Hart, p. 682-83.

একটি কথা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, জাপানী নৌ ও বিমান বল প্রচণ্ডভাবে ক্ষয় পাওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যায়ে জাপানের মোট 'সক্রিয়' সৈন্যসংখ্যা বোধ হয় ৭০ লক্ষের কম ছিল না।

*   *   *

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের খ্যাতিমান মার্কিন সেনাপতি জেনারেল ডগলাস ম্যাক-আর্থার তাঁর স্মৃতি-পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, ৮ই এপ্রিল প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মার্কিন সৈন্যবাহিনীগুলির পুনর্গঠন করা হইল। ম্যাক-আর্থারকে দেওয়া হইল সমস্ত স্থলবাহিনীর অধিনায়কত্ব এবং এ্যাডমিরাল নিমিৎস (Nimitz) নিযুক্ত হইলেন সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবাহিনীর প্রধান নায়কের পদে। আর জেনারেল এইচ্ এইচ্ আর্নল্ড ভার পাইলেন ২০ নং বিমান বাহিনীর—কার্যতঃ 'অর্ধেক পৃথিবীর দূরত্ব' বা ওয়াশিংটন থেকে তিনি এই রণনৈতিক বিমান কমাণ্ড চালাইতেন। তখন থেকে তিনটি পৃথক বিমান বাহিনী গঠিত হইল প্রশান্ত মহাসাগরের একই অঞ্চলে রণক্রিয়ার জন্য। অথচ উচিত ছিল প্রশান্ত মহাসাগরের এই সমস্ত রণক্রিয়ার জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ সৈনাপত্য গঠন করা এবং একজন সুপ্রীম কমাণ্ডার নিযুক্ত করা। কিন্তু কার্যতঃ তা সম্ভব হইল না। তবে, ম্যানিলার (ফিলিপিন্স) পতনের অল্প কিছু কাল পরেই মধ্য প্রশান্ত মহাসাগর থেকে দুইটি সোজাসুজি আক্রমণ ঘটা না হইল—প্রথমতঃ আইও জিমা (Iwo Jima) এবং দ্বিতীয়তঃ ওকিনাওয়ার (Okinawa) দিকে। এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ দখল করিতে মার্কিন বাহিনীকে প্রচুর খেসারৎ দিতে হইয়াছিল ···

ম্যাক-আর্থার বলিয়াছেন যে তিন বছর ধরিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে জাপানের ৮টি আর্মি খতম্ কিংবা অকেজো হইয়া গিয়াছিল এবং খাস জাপানী দ্বীপের বিরুদ্ধে অভিযানের পথ উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আর একটি অভিনব দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছিল। লক্ষ লক্ষ জাপানী সৈন্য বিভিন্ন দ্বীপে আটকা পড়িয়াছিল এবং তারা পশ্চাতেও হটিতে পারিতেছিল না, কিংবা অন্তর্ব্যূহের দিকে সরিয়া গিয়া খাস জাপানের প্রতিরক্ষায়ও যোগ দিতে পারিতেছিল না।

'It was a situation unique in modern war. Never had such a large number of troops been so outmaneuvered, separated from each other, and left tactically impotent to take an active part in the final battle for their homeland.' (২)

'আধুনিক যুদ্ধের ইতিহাসে এমন পরিস্থিতি অভূতপূর্ব, সন্দেহ নাই।'—মন্তব্য করিয়াছেন ম্যাক-আর্থার।

*   *   *

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের নিউগিনি থেকে জাপান পর্যন্ত দ্বীপ থেকে

(২) **Reminiscences—Douglas MacArthur, Jaico Publishing House, Bombay, 1968, p 368-70.**

দ্বীপান্তরের যুদ্ধে শেষ দুই ঘাঁটি বা দ্বীপ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—আক্রমণ বা আত্মরক্ষা উভয় প্রশ্নে। আইওজিমা এবং ওকিনাওয়া (অষ্টম পর্বের সপ্তম অধ্যায়ে খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে)—এই দ্বীপ দুইটি ছিল জাপানের খুব কাছাকাছি। আইওজিমা টোকিও থেকে ৭৫০ মাইল এবং ওকিনাওয়া জাপান থেকে মাত্র ৩৬২ মাইল। সুতরাং মার্কিন বোমারু অভিযানের পক্ষে এই দ্বীপ দুইটি দখল করা ছিল অপরিহার্য যেমন অপরিহার্য ছিল জাপানের পক্ষেও আত্মরক্ষার জন্য।

যদিও আইওজিমা ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র দ্বীপ, মাত্র ৮ বর্গমাইল আয়তন, তবু এর রণনৈতিক অবস্থান ছিল জাপানের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান আর পাহাড়, আগ্নেয়গিরি ও জঙ্গলের জন্য এর স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা যেমন অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল, তেমনি জাপানীরা ম্যাজিনো লাইনের (ফ্রান্স) ধরনে এই ক্ষুদ্র দ্বীপটিকে যেন একটি দুর্ভেদ্য কেল্লায় পরিণত করিল। লেঃ জেনারেল টাডা মিচি কুরিবায়াশির নেতৃত্বে ২৩ হাজার উৎকৃষ্ট জাপানী সৈন্য মার্কিন আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত ছিল। মার্কিন নৌ ও বিমানবহর ক্রমাগত ৭৪ দিন ধরিয়া এই ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর বোমা ও গোলাবর্ষণ করিল। ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে আক্রমণের আয়োজন হইল এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫, ৬টি যুদ্ধ জাহাজ (ব্যাটলশিপ) ও কয়েকটি ক্রুজার এবং ডেষ্ট্রয়ার নিয়া যে টাস্ক ফোর্স গঠিত হইল, সেগুলি যেন এই ক্ষুদ্র দ্বীপটিকে ঘিরিয়া ধরিল। মেজর-জেনারেল হ্যারি স্মিড্ট্ (Schmidt) ৩০ হাজার নৌ-সৈনা নিয়া ১৯শে ফেব্রুয়ারী দ্বীপটিকে আক্রমণ করিলেন। এখানকার এক নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি জাপানী সৈন্যদের প্রতিরক্ষার প্রধান দুর্গে পরিণত হইল এবং ২৬ দিন ধরিয়া ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর দ্বীপটি আমেরিকানদের দখলে গেল। মার্কিন পক্ষে হতাহত হইল ২০১৯৬ জন সৈন্য (এর মধ্যে নিহত ৪১৮৯) আর মৃত্যুপণ লড়াইতে জাপানীদের নিহত হইল ২১ হাজার, আহত অনেক, কিন্তু বন্দী হইল মাত্র দুই শতের কিছু বেশী। একজন মার্কিন সাংবাদিক এর্নি পাইল (Ernie Pyl) এই যুদ্ধে রিপোর্ট করিতে গিয়া নিহত হইয়াছিলেন। তিনি সৈন্যদের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। এজন্য তাঁর মৃত্যুর স্থানে একটি স্মৃতিফলকও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (৩)

আইওজিমা আমেরিকানদের দখলে যাওয়ায় জাপানের বিপর্যয় আরও ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। কারণ, এর পর ওকিনাওয়ার পালা কিন্তু জাপানী সৈন্যেরা আত্মহত্যা করিবে, তবু যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবে না কিংবা আত্মসমর্পণ করিবে না। এজন্য জঙ্গীবাদীরা মধ্যযুগের এক 'দিব্য তুফান' বা 'কামিকেজে'র (Kamikaze) কাহিনী প্রচার করিল। ১২৮১ খৃষ্টাব্দে দুর্ধর্ষ মোঙ্গল দিগ্বিজয়ী কুবলাই খান এক বিরাট নৌবহর নিয়া জাপান আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু সেই সময় জাপানের সূর্য দেবতা এক 'দিব্য তুফান' বা 'কামিকেজের' সৃষ্টি করিলেন এবং কুবলাই খানের আগ্রাসী নৌবহরকে ধ্বংস করিয়া দিলেন। কামিকেজের এই 'দিব্য তুফান'-এর কাহিনী অবলম্বন করিয়া সেদিনের যুদ্ধোন্মাদ জাপানে সৃষ্টি হইল শত্রুকে বাধা দেওয়ার জন্য একদল আত্মহত্যাকারী বিমান যোদ্ধা—অবশ্যই দেশ ও সম্রাটের

(৩) লুই স্নাইডার—পৃষ্ঠা ৫৭৮, ৫৮১

প্রতি অনুরাগ প্রকাশের জন্য। এই আত্মহননকারী সৈন্যদের রণসঙ্গীতও ছিল উল্লেখযোগ্য—যার ইংরাজী ভাষ্য নিম্নরূপ :

"In Serving on the seas, be a Corpse
Saturated with water.
In Serving on land, be a corpse
Covered with weeds.
In Serving the sky, be a
corpse that challenges the clouds.
Let us all die close by the
Side of our Sovereign."

এই সমস্ত সৈন্য স্বগৃহেও এই মর্মে চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন, "আমাদের মৃত্যু বসন্ত কালের চেরীফুলের ঝরে পড়ার মত সুন্দর ও নির্মল হোক!" (৪)

এই প্রকার বে-পরোয়া এবং মৃত্যুভয়হীন জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া নিঃসন্দেহে কঠিন ছিল। ইতিহাসে এই প্রথম আত্মহত্যাকে একটা সরকারী সামরিক অস্ত্রে পরিণত করা হইল—'For the first time in history a nation at war used suicide as an official military weapon and called upon its warriors to go in to combat with the prospect of certain death' (৫)

ওকিনাওয়া যুদ্ধের পূর্বাহ্ণে জাপানের প্রধানমন্ত্রী কুনিয়াকি কয়সো (Kuniaki Koiso) এই মর্মে সতর্ক বাণী প্রচার করিলেন,—"হে আমার দশ কোটি দেশবাসী, শত্রু ঘরের দুয়ারে এসে পৌঁছেছে। আমাদের দেশের ইতিহাসে এমন বিপদের মুহূর্ত আর আসে নাই!" (৬)

কিন্তু সেই মুহূর্তে আর একটা বিপদ ঘটিল। সোভিয়েত রাশিয়া জাপানের সঙ্গে ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে স্বাক্ষরিত নিরপেক্ষতার চুক্তি বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিল। ফলে, ৫ই এপ্রিল ১৯৪৫, কয়সো মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিলেন এবং প্রিভি কাউন্সিলের সভাপতি এ্যাডমিরাল সুজুকি প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি বৃদ্ধ হইলেও সাহসী, দুর্ধর্ষ এবং সোজাসুজি ধরনের মানুষ ছিলেন। সম্রাট তাঁকে পছন্দ করিতেন এবং যদিও স্বয়ং সম্রাটও অনুভব করিতেছিলেন যে, পরাজয় বরণ করা ছাড়া আর উপায় নাই, তথাপি অন্তত ওকিনাওয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলে সম্ভবতঃ 'নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ' দাবির কিছুটা সংশোধন হইতে পারে—এমন চিন্তা তাঁর মাথায় ঘুরিতেছিল। (৭)

এজন্যই ওকিনাওয়াতে মার্কিন আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বেপরোয়া পন্থা অবলম্বিত হইল। আত্মবিনাশী জাপানী পাইলট বোমাভর্তি ছোট ছোট প্লেন নিয়া

(৪) লুই স্নাইডার—পৃষ্ঠা, ৫৮৫
(৫-৬) লুই স্নাইডার—পৃষ্ঠা, ৫৮২
(৭) A Historv of Modern Japan—Richard Storry, p. 226.

মার্কিন জাহাজগুলির উপর ঝাঁপ দিয়া মরিবার এবং মারিবার জন্ম প্রস্তুত হইল। এই রণক্রিয়াকেই 'কামিকেজ' নামে সামরিক ইতিহাসে অভিহিত করা হইয়াছে।

সম্ভবতঃ একমাত্র জাপানীরা ছাড়া এমন আত্মবিনাশী যুদ্ধ আর কোন শক্তি চালাইতে পারিত না।

এই আত্মবিনাশী জাপানী সৈন্তেরা আইও জিমার যুদ্ধে মার্কিন নৌবাহিনীর প্রচুর ক্ষতিসাধন করিয়াছিল। ৩৪টি মার্কিন জাহাজ নিমজ্জিত, ২৮৮টি জখম হইয়াছিল। এর মধ্যে ৩৬টি বিমানবাহী জাহাজ, ১৫টি যুদ্ধজাহাজ, আর ৮৭টি ডেষ্ট্রয়ার। সুতরাং জাপানী বেপরোয়া যুদ্ধের ফলাফল কম মারাত্মক ছিল না—যদিও জাপানীদেরও ক্ষতি হইয়াছিল প্রচুর প্লেন ও পাইলট, অনুমান ১২ শত থেকে ৪ হাজারের মধ্যে।

* * *

জাপানের প্রায় দ্বারদেশে অবস্থিত ওকিনাওয়া দ্বীপের রণনৈতিক গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। কারণ, এই দ্বীপ অধিকৃত হইলে জাপানে প্রবেশের পথ খুলিয়া যাইবে এবং রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত এই দ্বীপটি ছিল সর্ববৃহৎ—৬৭ মাইল লম্বা এবং ৩ থেকে ২০ মাইল চওড়া। কিন্তু এই দ্বীপের কর্কশ পাহাড়িয়া ভূমিতে জনবসতি ছিল সবচেয়ে ঘন। ম্যালেরিয়ার উৎপাত সত্বেও ৫ লক্ষ লোক এখানে বাস করিত। আইও জিমা দখল হওয়ার আগেই ওকিনাওয়া অভিযানের জন্ম আমেরিকা প্রস্তুত হইতেছিল এবং এই অভিযানের সাঙ্কেতিক নাম রাখা হইয়াছিল 'অপারেশন আইসবার্গ'। এই দ্বীপের অবস্থান ছিল ফরমোজা ও জাপানের ঠিক মধ্যস্থলে এবং চীন উপকূল থেকেও মাত্র ৩৬০ মাইল দূরে। সুতরাং এই দ্বীপ আমেরিকানদের হাতে আসিলে কার্যতঃ তিনটি লক্ষ্য বস্তুই মার্কিন আক্রমণের পাল্লার মধ্যে আসিবে। কর্কশভূমি, জঙ্গল ও শৈলশিরার জন্ম দ্বীপটি স্বাভাবিক আত্মরক্ষার পক্ষে জাপানের খুব অনুকূল ছিল। তবে, দক্ষিণ দিকের খানিকটা অংশ খোলা ছিল এবং সেখানে ছিল বিমান ঘাঁটি, আর সমুদ্রের ধারে ছিল দ্বীপের রাজধানী নাহা। জাপানীরা প্রাকৃতিক বিঘ্নের সঙ্গে দ্বীপটির প্রতিরক্ষার জন্ম দুর্ভেদ্য কেল্লা তৈয়ার করিল। জেনারেল উসিজিমার (Ushijima) অধীন ৩২ নং আর্মির ৭৭ হাজার লড়িয়ে সৈন্তের সঙ্গে যুক্ত হইল ২০ হাজার সার্ভিস বা সেবক সৈন্য—মোট প্রায় এক লক্ষ। আর সেই সঙ্গে ৫০০ গোলন্দাজী কামান।

মার্কিন হাইকমাণ্ড পূর্বাহ্ণেই অনুমান করিয়াছিলেন যে, ওকিনাওয়াতে জাপানীদের পরাজিত করা আদৌ সহজ হইবে না। সুতরাং প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বৃহত্তম নৌ-যুদ্ধের তারা আয়োজন করিলেন—১৫০০ যুদ্ধজাহাজ ও লক্ষাধিক সৈন্ত প্রস্তুত হইল। কারণ, সংখ্যাশক্তিতে অনেক বেশী শ্রেষ্ঠতা অর্জন করিতে না পারিলে এই দ্বীপে অবতরণ ও যুদ্ধ চালানো যাইবে না। লেঃ জেনারেল বাকনারের অধীনে ১ লক্ষ ১৬ হাজার সৈন্ত প্রথম অবতরণের জন্ম প্রস্তুত হইল এবং ক্রমে এই শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া স্থল ও নৌ-সৈন্তসহ লড়িয়ে সৈন্তের সংখ্যা দাঁড়াইল ১ লক্ষ ৭০ হাজার, আর সার্ভিস বা সেবক সৈন্তের সংখ্যা দাঁড়াইল ১ লক্ষ ১৫ হাজার। এ্যাডমিরাল টার্নার সমগ্র ওকিনাওয়া বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক পদে নিযুক্ত হইলেন। ১লা

এপ্রিল ইষ্টার দিবসে সমুদ্র ও আকাশ থেকে ক্রমাগত তিন ঘণ্টা ধরিয়া প্রচুর গোলাগুলি ও বোমা বর্ষণের পর মার্কিন বাহিনীর তীরে অবতরণ শুরু হইল এবং প্রায় বিনা বাধায় ৬০ হাজার মার্কিন সৈন্য তীরভূমির ৯ মাইল এলাকা দখল করিল।…

জাপান তার বৃহত্তম যুদ্ধজাহাজ বা ব্যাট্‌লশিপ 'ইয়ামাতো'কে নিয়োগ করিল এই মার্কিন অভিযানে বাধা দেওয়ার জন্য। কিন্তু বিচিত্র এই যে, এই বিরাট যুদ্ধজাহাজকে পাহারা দেওয়ার জন্য কোন বিমানবহর নিয়োগ করা হইল না। সুতরাং ঘটনাটা জাপানীদের পক্ষে প্রায় আত্মহত্যার তুল্য ছিল। কেন না, ৭ই এপ্রিল দুপুর বেলা মার্কিন বিমানবাহী জাহাজ থেকে ২৮০টি বোমারু ইয়ামাতোকে আক্রমণ করিল এবং টর্পেডো ও বোমার দ্বারা দুই ঘণ্টা ধরিয়া যুদ্ধ ও আঘাত হানার পর ইয়ামাতো বহু সৈন্য ও লস্করসহ মহাসমুদ্রের গর্ভে ডুবিয়া গেল। এর বড় বড় কামান থেকে জাপানীরা শত্রুর বিরুদ্ধে আঘাত হানার জন্য একটা গোলা নিক্ষেপেরও সুযোগ পাইল না। জাপানী যুদ্ধজাহাজের ইতিহাসে এত বড় ট্রাজেডি খুব কমই হইয়াছে। (৮)

তথাপি ওকিনাওয়া দ্বীপের স্থলভাগে প্রচণ্ড ও তিক্ত লড়াই চলিল সুরক্ষিত ঘাঁটি ও পাহাড়ের গুহা থেকে দুই মাস (লীডেল হার্টের মতে মোট ৩ মাস) ধরিয়া এবং শেষ পর্যন্ত এই ভয়াবহ রক্তস্রাবী যুদ্ধে জাপানীরা পরাজিত (আত্মবিনাশী জাপানী বৈমানিকদের বেপরোয়া আক্রমণ সত্ত্বেও) হইল—ওকিনাওয়া দ্বীপ আমেরিকার দখলে চলিয়া গেল। কিন্তু দ্বীপ দখলীকৃত হওয়ার আগে ১১ই জুন মার্কিন সেনাপতি জেনারেল বাকনার একটি প্রবাল পাহাড়ের চূড়ায় বসিয়া যখন সহাস্যমুখে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ একটি গোলা আসিয়া তাঁকে মারাত্মক আঘাত করিল। কিন্তু সেই অবস্থায়ও এবং মৃত্যুমুখে পড়িয়াও তাঁর মুখের হাসি লাগিয়াই ছিল।

এদিকে ২২শে জুন, ১৯৪৫, যখন দেখা গেল যে, যুদ্ধজয়ের আর আশা নাই, তখন জাপানী সৈন্যদের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি লেঃ জেনারেল উঁসিজিমা এবং লেঃ জেনারেল ইসামা চো তাঁদের সৈনাপত্যের সমস্ত সাজপোশাক বা ইউনিফর্ম এবং পদক ও পদমর্যাদার স্মারকচিহ্নগুলি ধারণ করিয়া তাঁদের সহকর্মী ও সহচরদের সঙ্গে সদর দপ্তরের গুহায় আসিয়া হাজির হইলেন। বেলা তখন ৩-৪০ মিঃ, তাঁদের হাঁটু গাড়িয়া বসিবার স্থানে মৃত্যুর প্রতীকস্বরূপ সাদা কাপড় বিছাইয়া দেওয়া হইল এবং তাঁরা সামুরাই ঐতিহ্য অনুসারে আত্মহত্যার জন্য নিজেদের উদর কাটিয়া (হারিকিরি) ফেলিলেন। তখন একজন পদস্থ সৈনিক তরোয়াল দিয়া তাঁদের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় মার্কিন সৈন্যেরা তাদের 'শৃগালগর্তে' মাত্র ১০০ গজ দূরে ছিল। জাপানী যুদ্ধের এই সামরিক ঐতিহ্য ভয়াবহ সন্দেহ নাই।…

সারা প্রশান্ত মহাসাগরের ওকিনাওয়ার যুদ্ধ প্রাণনাশের দিক থেকে আমেরিকানদের কাছে সবচেয়ে গুরুতর ছিল। আমেরিকার ক্ষতি হইয়াছিল ৪৯ হাজার সৈন্য (নিহত ১২ হাজার ৫ শত) এবং জাপানীদের ১ লক্ষ ১০ হাজার সৈন্য। শত শত

---

(৮) লীডেল হার্ট, পৃষ্ঠা ৬৮৪-৮৫

আত্মবিনাশী জাপানী সৈন্য বা 'কামিকাজ' আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যে বেপরোয়া আক্রমণ চালাইয়াছিল, তার ফলে ৩৪টি নৌ-তরী নিমজ্জিত এবং ৩৬৮টি জখম হইয়াছিল। এই নিদারুণ এবং রক্তসিক্ত অভিজ্ঞতার পর মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষ খাস জাপান আক্রমণের জন্য কী মূল্য দিতে হইবে, সে কথা চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। (৯)

কিন্তু ওকিনাওয়া দ্বীপের যুদ্ধে প্রচুর রক্তের মূল্য দিতে হইলেও আমেরিকানদের পক্ষে খাস জাপান আক্রমণের দরজা খুলিয়া গেল এবং ১৯৪৫ এর নভেম্বর মাসে জাপান আক্রমণের পরিকল্পনাও স্থির হইয়াছিল, যদিও তার আগেই জাপানী যুদ্ধ খতম্ হইয়াছিল।...

কিন্তু জাপানের উপর পারমাণবিক বোমা বর্ষিত হওয়ার আগেই জাপানের দুর্গতি নেমে উঠিতেছিল। কারণ, ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে অধিকৃত ম্যারিয়ানা দ্বীপের ঘাঁটি হইতে জাপানের বিরুদ্ধে রণনৈতিক বোমাবর্ষণ (ষ্ট্র্যাটেজিক বম্বিং) আরম্ভ করা হইয়াছিল। এই অভিযানের প্রধান অস্ত্র ছিল বোয়িং বি ২৯ সুপার ফোর্টরেস বোমারু—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বৃহত্তম বোমারু—যেগুলির প্রত্যেকটি বহন করিতে পারিত প্রায় ৮ টনের কাছাকাছি পরিমাণ বোমা। এগুলির গতি ছিল ঘণ্টায় ৩৫০ মাইল। ৩৫ হাজার ফুট উর্ধ্ব আকাশ দিয়া উড়িতে পারিত এবং একটানা ৪ হাজার মাইলের বেশী চলিতে পারিত। এগুলি বর্ম আচ্ছাদনের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল এবং ১৩টি মেসিনগানও বহন করিতে পারিত। সোজাকথায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এগুলি ছিল রাক্ষুসে ধরনের বোমারু এবং জাপানের বিভিন্ন শহরে বন্দরে ও জনপদে এগুলি হানা দিতে লাগিল।

কিন্তু ১৯৪৫-এর মার্চ মাসে মার্কিন বিমানবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল কার্টিস লিমে (Curtis Le May) সাধারণ বিস্ফোরক বোমার বদলে আগুনে বোমা বর্ষণ শুরু করিলেন। ৯ই মার্চ তারিখ ২৭৯ খানা বি ২৯ বোমারু টোকিওর উপর আগুনে বোমা নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং টোকিও শহরের ১৬ বর্গমাইল এলাকা ধরিয়া যেন 'লঙ্কাদহন' পর্ব অনুষ্ঠিত হইল। শহরের প্রকাণ্ড অংশ একেবারে জ্বলিয়া গেল। ২ লক্ষ ১৭ হাজার গৃহ দগ্ধ হইল। প্রায় ১ লক্ষ ৮৫ হাজার অ-সামরিক লোক হতাহত হইল এবং অন্যান্য শহরও অনুরূপভাবে আক্রান্ত হইল। ১০ দিনে ১০ হাজার টন আগুনে বোমা নিক্ষিপ্ত হইল, ফলে আগুনে বোমার ষ্টক ফুরাইয়া গেল।

টোকিওর এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর জনগণের নৈতিক শক্তি ভাঙিয়া গেল এবং ৮৫ লক্ষ নরনারী শহর ছাড়িয়া গ্রামের অভ্যন্তরে পলাইয়া গেল। ৬০০ বৃহৎ যুদ্ধাস্ত্রের কারখানা ধ্বংস হইয়া গেল। ফলে, জাপানের শ্রমশিল্পের উৎপাদন শতকরা ৬০ ৭০ থেকে ৮০ ভাগের অধিক পর্যন্ত কমিয়া গেল। এই অবস্থায় একমাত্র যুদ্ধোন্মাদ ছাড়া আর সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, আত্মসমর্পণ ছাড়া জাপানের আর রক্ষা পাওয়ার উপায় নাই। (১০)

(৯) লীডেল হার্ট, পৃষ্ঠা ৬৮৬
(১০) লীডেল হার্ট, পৃষ্ঠা ৬৯০-৯১

মধ্য প্রশান্ত মহাসমুদ্রে জাপানের বিরুদ্ধে যখন দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরের এই সমস্ত যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইতেছিল, তখনও এ্যাটম বোমার ব্রহ্মাস্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং আইও জিমা ও ওকিনাওয়া দ্বীপ দখলের অভিজ্ঞতায় (এপ্রিল-মে-জুন, ১৯৪৫) প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান উপলব্ধি করিলেন যে, জাপানের যত কাছে অগ্রসর হওয়া যাইবে, জাপানীদের বাধাদানের তীব্রতাও তত বৃদ্ধি পাইবে। যদিও এই সমস্ত দ্বীপ থেকে জাপানের উপর সরাসরি আক্রমণ চালানো যাইবে, কিন্তু অত্যধিক প্রাণের মূল্য দিতে হইবে। কারণ প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের মতে তখনও জাপানী দ্বীপ, মাঞ্চুরিয়া এবং উত্তর চীনে জাপানীদের ৪০ লক্ষের বেশী সৈন্য ছিল। এছাড়া খাস জাপানের শেষ আত্মরক্ষার জন্য 'জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' গঠিত হইবে। সুতরাং ট্রুম্যান অনুভব করিলেন যে, মার্কিন সৈন্যেরা প্রশান্ত মহাসমুদ্রের পথে যতই জাপানের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, ততই লক্ষ লক্ষ আমেরিকান সৈন্যের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার যুদ্ধে যোগদানের প্রশ্ন জরুরী হইয়া উঠিতেছিল। মার্কিন সেনানীমণ্ডলীরও এই মত। ট্রুম্যান লিখিয়াছেন :

'There was no way for us to get troops into China to drive the Japanese fro_ the Chinese mainland. Our hope always was to get enough Russian troops into Manchuria to push the Japanese out. That was the only way it could be done at this time.'

অর্থাৎ 'চীনের অভ্যন্তরে সৈন্য পাঠাইয়া চীনের মূল ভূমি থেকে জাপানীদেরকে বিতাড়নের কোন উপায় আমাদের হাতে ছিল না। সুতরাং আমাদের সর্বদাই আশা ছিল মাঞ্চুরিয়াতে প্রচুর পরিমাণ রুশসৈন্য পাঠাইয়া জাপানীদেরকে বহিষ্কার করা হইবে। এই সময় একমাত্র এই পন্থা অনুসরণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।' (১১)

কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য গ্রহণ ছাড়াও আমেরিকার পক্ষে আর একটা উদ্বেগের প্রশ্ন ছিল কুওমিণ্টাং বা জাতীয়তাবাদী চীনের নায়ক জেনারেল চিয়াং কাইসেকের সঙ্গে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির বিরোধ ও সংঘাত। ট্রুম্যান তাঁর স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন যে, যুদ্ধ চলাকালীন সমগ্র সময়টিতেই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল জাপানের বিরুদ্ধে চীনের জনগণের ঐক্য রক্ষা করা। ২০শে মে চীনের মার্কিন রাষ্ট্রদূত হারলি (Hurley) প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানকে জানাইলেন যে, আমেরিকানদের চেষ্টার ফলে চিয়াং কাইশেক গবর্নমেণ্ট সশস্ত্র কমিউনিষ্ট পার্টিকে একটা রাজনৈতিক পার্টি হিসেবে স্বীকার করিয়া নিয়াছেন এবং একজন চীনা কমিউনিষ্টকে জাতীয় গবর্নমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে স্যানফ্রান্সিসকোতে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং কমিউনিষ্ট পার্টিও এই নিয়োগ মানিয়া লইয়া জাতীয় গবর্নমেণ্টকে স্বীকার করিয়াছেন।

ট্রুম্যানের মতে চীনের জাতীয় গবর্নমেণ্ট ও কমিউনিষ্ট পার্টির বিরোধে মার্কিন সরকার দুটি নীতিকে প্রাধান্য দিয়াছিলেন :

(১১) ট্রুম্যানের স্মৃতিকথা (ইং), প্রথমখণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৯

(১) যে গৃহযুদ্ধ একেবারে আসন্ন বলিয়া মনে হইতেছিল, সেটা এড়ানো।

(২) জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য কমিউনিষ্ট ও ন্যাশনাল গবর্নমেণ্টের সৈন্যবাহিনীদিগকে একজন অধিনায়কের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করা।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে ট্রুম্যান উপলব্ধি করিলেন যে, চীন ও রাশিয়ার মধ্যে আলোচনার ফলাফলের উপরেই জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যোগদান অনেকটা নির্ভর করিতেছে। সুতরাং চীন সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ টি ভি সুঙ্ ৩০শে জুন, ১৯৪৫, মস্কোতে উপস্থিত হইলেন ষ্টালিনের সঙ্গে আলোচনার জন্য।

কিন্তু মস্কোতে চীনা প্রতিনিধি সুঙ্ এবং ষ্টালিনের মধ্যে এই সমস্ত আলোচনা ছিল গতানুগতিক মাত্র কিংবা বাহ্যতঃ চিয়াং কাইসেকের গবর্নমেণ্টের প্রতি মর্যাদা দেখাইবার জন্য। কারণ, জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়া কর্তৃক যুদ্ধে যোগদানের শর্ত স্বরূপ ইয়াল্টাতে রুজভেল্ট ও ষ্টালিনের মধ্যে (এই বৈঠকে চার্চিল বা চিয়াং কাইসেকের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না। এই সম্পর্কে এবং ইয়াল্টায় প্রস্তাবিত চুক্তি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা অষ্টম পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) যে সমস্ত কথাবার্তা পাকা হইয়াছিল, সেগুলি চুংকিংয়ে জেনারেল চিয়াং কাইসেককে জানাইয়া দেওয়া এবং তাঁর সম্মতি 'আদায়' করাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। যদিও মস্কোতে মাঞ্চুরিয়ার উপর কুওমিণ্টাং সরকারের সার্বভৌম অধিকার, বহির্মংগোলিয়ার স্বাধীনতা, ডাইরেন বন্দর ও পোর্ট আর্থার নৌঘাঁটি এবং চাইনিজ রেলপথ ইত্যাদি নিয়া যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছিল, তথাপি চিয়াং কাইসেকের পক্ষে ষ্টালিনের এই সমস্ত প্রস্তাব না মানিয়া উপায় ছিল না। কেন না, পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট আগেই এগুলি সমর্থন করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে নূতন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানও জানাইয়াছিলেন যে, মার্কিন গবর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে তিনিও ইয়াল্টা প্রস্তাবগুলি সমর্থন করিতেছেন এবং তিনি আশা করিতেছেন যে, চিয়াং কাইসেকও এগুলি গ্রহণ করিবেন। অপর পক্ষে ট্রুম্যানের এক তারের জবাবে প্রধান মন্ত্রী চার্চিলও জানাইয়া দিলেন যে, তিনিও প্রস্তাবগুলি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতেছেন এবং প্রস্তাবগুলিকে স্বাগত জানাইতেছেন। (১২)

সুতরাং মিত্রশক্তির তিন প্রধান যে সমস্ত প্রস্তাব ও রাশিয়ার দাবী সমর্থন করিতেছেন, চিয়াং কাইসেক সেগুলি অগ্রাহ্য করিবেন কোন ভরসায়? অবশ্য জুলাই মাসে মস্কোতে ষ্টালিনের সঙ্গে টি ভি সুঙের আলোচনায় কিছুটা 'দর কষাকষির' মনোভাব দেখা গিয়াছিল। এটা অবশ্য অস্বাভাবিক ছিল না। কেন না, চিয়াং কাইসেক এবং ট্রুম্যান উভয়েই মনে মনে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরোধী ছিলেন এবং চিয়াং কাইসেক চাহিতেছিলেন রাশিয়া যেন চীনা কমিউনিষ্ট পার্টিকে কোন সাহায্য না দেন! অবশ্য ষ্টালিনও চিয়াং কাইসেককে চীনের ঐক্যরক্ষাকারী একমাত্র শক্তিরূপে স্বীকার করিয়া নিয়াছিলেন এবং জানাইয়াছিলেন যে, চীনের বিরুদ্ধে তাঁর কোন ভূমিগত দাবী নাই। চীনে আমেরিকার 'খোলা দরজার' নীতিও ('ওপেন ডোর পলিসি') তিনি সমর্থন করিয়াছিলেন এবং কোরিয়ার জন্য চীন, বৃটেন,

(১২) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩০০-৩০১

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া—এই চতুঃশক্তির ট্রাষ্টিশিপ (অছিগিরি) গঠনের প্রস্তাবও নীতি হিসাবে মানিয়া লইয়াছিলেন। (১৩)

কিন্তু পরবর্তী কালে আমেরিকা কর্তৃক আইও জিমা ও ও'কিনাওয়া দখল এবং এ্যাটম্ বোমা তৈয়ারির পর অনেক মার্কিন সেনাপতি ও রাজনীতিবিদ্ রুজভেল্ট ও ষ্ট্যালিন চুক্তির সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, জাপানের পরাজয়ের জন্য রাশিয়ার সাহায্যের কোন প্রয়োজন ছিল না। মার্কিন নৌ ও বিমান শক্তির প্রচণ্ড আক্রমণে জাপান আগেই কাবু হইয়া পড়িয়াছিল।

(১৩) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৭৭

দশম পর্ব

পঞ্চম অধ্যায়

এ্যাটম্ বোমা—হিরোশিমা ও নাগাশাকি

অবশেষে মানুষের সর্বকালের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অস্ত্রের আবিষ্কার হইল। পৃথিবীতে এক নতুন যুগ—পারমাণবিক বা অ্যাটমিক যুগের যাত্রা শুরু হইল। কিন্তু ১৯৪৫ সালের ৬ আগষ্ট হিরোশিমার (জাপান) বিরুদ্ধে এই নতুনতম দানবিক অস্ত্র প্রয়োগের দ্বারা অপরিসীম বর্বরতা ও হিংস্রতার মধ্যে এই পারমাণবিক যুগের বোধন হইল এবং সারা পৃথিবীর চিন্তাশীল ও বিবেকবান মানুষ বিস্ময়ে ও ত্রাসে হতভম্ব হইয়া গেল। এমন কি, বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের অবসান সংবাদও এই দানবিক শক্তির ক্রূরতার মধ্যে চাপা পড়িয়া গেল। একজন মার্কিন ঐতিহাসিকই মন্তব্য করিয়াছেন—

'The incredible blasts of atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki knocked Japan out of the conflict. So great was the shock among all humanity that even the end of the global war became secondary news,' (১)

কিন্তু পারমাণবিক বোমার আবিষ্কার ও নির্মাণের পিছনে রহিয়াছে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মৌলিক শক্তির গোপন রহস্যের উদ্ঘাটন যার জন্য পৃথিবীর নানা দেশের খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরা যুগের পর যুগ ধরিয়া গবেষণা করিয়া আসিয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের অভাবনীয় কৃতিত্বের ফলে যে ব্রহ্মাস্ত্র তৈরী হইল, তার ভয়াবহ মারমূর্তি দেখিয়া বিজ্ঞানীরা নিজেরাই হতবাক ও সন্ত্রস্ত হইলেন। এ যেন আরব্য উপন্যাসের সেই বোতল থেকে দৈত্যের আবির্ভাবের মত এক অবিশ্বাস্য গল্প। বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক শক্তির রহস্য সন্ধান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অজস্র মানুষের মৃত্যু ও হত্যার দ্বারা বিজ্ঞানের পবিত্র মন্দিরকে কলুষিত করিতে চাহেন নাই। অধিকাংশ বিজ্ঞানীই চাহিয়াছিলেন 'সত্যের অনুসন্ধান'। কিন্তু সেই অনুসন্ধানের ফল যে, এভাবে মিলিটারি চক্রের হাতে গিয়া পড়িবে এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বধ্বংসী প্রলয়ঙ্কর অস্ত্রে পরিণত হইবে, তার জন্য অনেকেই প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু মহাযুদ্ধের কূটনীতি ও রণনীতির জটিল চক্রে এমন এক অবস্থার উদ্ভব হইল যে, বোতলের মুখ থেকে নির্গত দৈত্যকে আর বোতলের মধ্যে ফিরাইয়া নেওয়া সম্ভব হইল না। বরং সেই থেকে আজ (১৯৭৭ সাল) পর্যন্ত সেই দৈত্যের শক্তি লক্ষগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মানুষের জগৎ জীবন-মৃত্যুর এক চরম সন্ধিক্ষণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। * যে পরমাণু বা atom শব্দটি ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাস থেকে সারা দুনিয়ার শিক্ষিত সমাজে এত প্রচার লাভ করিয়াছে, তার

---

(১) লুই স্নাইডার, পৃষ্ঠা ৫৯২

* ১৯৭৬ সালের আগষ্ট মাসে জার্মান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত মারণাস্ত্র প্রতিযোগিতা (দি আর্মস রেস্) সংক্রান্ত একটি পুস্তিকায় দেখানো হইয়াছে কিভাবে পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণে এই প্রতিযোগিতা আজ সমগ্র মনুষ্য জাতির অস্তিত্বকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। একটি প্রামাণ্য রিপোর্ট উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে :

উৎপত্তি কিন্তু গ্রীক 'atoms' শব্দ থেকে, যার অর্থ অবিভাজ্য বা indivisible—এজন্য দীর্ঘকাল পর্যন্ত পরমাণু বা এ্যাটম অবিভাজ্য বলিয়া বিশ্বাস ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষভাগে ফরাসী বিজ্ঞানীরা ইউরেনিয়াম ও রেডিয়াম নিয়া গবেষণা করিতে গিয়া যে তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান পাইলেন, তার ফলেই পরমাণুর অবিভাজ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়াছিল এবং সেই সন্দেহ ক্রমে দূরীভূত হইল বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে বহু নামকরা বিজ্ঞানীর গবেষণার ফলে। প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হিসাবেই হোক কিংবা সমরাস্ত্রের দিক থেকেই হোক এ্যাটমিক বোমার মত এমন মারাত্মক ভয়াবহ অস্ত্র মানুষের ইতিহাসে ইতিপূর্ব আর কখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এতদিন পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহে বা রণক্রিয়ায় মানুষ রাসায়নিক শক্তি ('কেমিক্যাল পাওয়ার') থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য এবং জ্বালানী ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তির বিভাজন থেকে যে এমন প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসকর কাণ্ড ঘটানো যাইতে পারে, এমন কল্পনা আগে মানুষের ছিল না। ১৯১১ সালে স্বনামখ্যাত বৃটিশ বিজ্ঞানী (নিউজিল্যাণ্ডের অধিবাসী) লর্ড রাদারফোর্ড পরমাণুর গঠন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিলেন। ১৯১৯ সালে তিনি এ্যাটমকে ভাঙিবার পদ্ধতিও বাহির করিলেন এবং ১৯৩২ সালে অন্যতম খ্যাতনামা বৃটিশ বিজ্ঞানী স্যার জেমস্ চ্যাড্উইক (James Chadwick) নিউট্রন বা পরমাণু পিণ্ডীভূত অংশ আবিষ্কার করিলেন।…

বিজ্ঞানের এই নতুন গবেষণা বিজ্ঞানী এবং সামরিক উভয় মহলেই প্রভূত কৌতূহলের উদ্রেক করিল। পারমাণবিক বোমা সংক্রান্ত একটি বিশ্ববিখ্যাত পুস্তকের গোড়াতেই লর্ড রাদারফোর্ড সম্পর্কে নিম্নলিখিত গল্পটি উল্লেখ করা হইয়াছে :

"It is said that during the last year of the First World War Ernest Rutherford, already famous for his work on atomic research, failed to attend a meeting of the British Committee of experts appointed to advise on new systems of defence against enemy Submarines. When he was censured for his absence, the vigorous New Zealander retorted without embarrassment : 'Talk softly, please. I have been engaged in experiments which suggest that the atom can be artificially disintegrated. It it is true, it is of far greater importance than a war."

"In the United States alone, the explosive power of stockpiles exceeds that of 600,000 Hiroshima bombs. These reserves are more than eough to annihilate the present world population twelve times over." (Weltgewerks chafts bewegung, Berlin 9/1975, p. 6)

একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যদি এই প্রকার পারমাণবিক ধ্বংসকর শক্তি থাকিয়া থাকে, তবে সোভিয়েত রাশিয়াসহ পৃথিবীর মোট পাঁচটি পারমাণবিক রাষ্ট্রশক্তির প্রলয়ঙ্কর শক্তি কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে তা কল্পনা করাও কঠিন।

—লেখক

এর ভাবার্থ –"শুনা যায় প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ বছরে শত্রুর সাবমেরিনের উৎপাত থেকে প্রতিরক্ষার নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে পরামর্শ দেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। এই কমিটিতে উপস্থিত থাকবার জন্য আর্নেষ্ট রাদারফোর্ডকে আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছিল। তিনি ইতিপূর্বেই তাঁর পারমাণবিক গবেষণার জন্য প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সভায় তিনি সময় মত উপস্থিত না হওয়ায় যখন তাঁকে ভর্ৎসনা করা হইয়াছিল, তখন সেই বলিষ্টমনা বিজ্ঞানী বিন্দুমাত্র সঙ্কোচবোধ না করিয়া তুড়ুক জবাব দিলেন: 'আমি এমন একটা গবেষণা নিয়া ব্যস্ত ছিলাম, যাতে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, পরমাণুকে কৃত্রিমভাবে বিদীর্ণ বা বিভাজন করা সম্ভব। যদি এটা সত্য হয়, তবে, আপনাদের দুই একটা যুদ্ধের চেয়েও এই ব্যাপারটা অনেক, অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হইবে!'—(২)

* * *

ত্রিশের দশকে এই গবেষণা নানাদেশের বিজ্ঞানীদিগকে যে প্রেরণা জোগাইল তারই ফলে শেষ পর্যন্ত ১৯৩৮ সালে বার্লিনের কাইজার উইলহেলম ইনষ্টিটিউটের একদল জার্মান বিজ্ঞানী প্রথম হাতে-কলমে পরমাণু বিভাজন (split the atom) ঘটাইলেন। এই ঘটনার ফলে আমেরিকানদের মনে ভয় ঢুকিল যে, মহাযুদ্ধের মধ্যেই জার্মানরা পরমাণু বোমা তৈয়ার করিয়া ফেলিবে। তখন থেকে আন্তর্জাতিক জগতে এ্যাটম্ বোমা তৈয়ারির প্রতিযোগিতা শুরু হইয়া গেল—যদিও গোড়ার দিকে আমেরিকানরা পারমাণবিক বোমাকে আজগুবী গল্প বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞান জগতের ঋষিতুল্য সাধক বিশ্ববিখ্যাত আলবার্ট আইনষ্টাইন ১৯৩৯ সালের ২রা আগষ্ট প্রেসিডেণ্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টের নিকট যে ঐতিহাসিক চিঠি লিখিয়াছিলেন (এবং যে চিঠির জন্য তিনি পরবর্তীকালে অনুতাপ করিয়াছিলেন) তার ফলেই কিন্তু এ্যাটম বোমা তৈয়ারির ব্যাপারটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গুরুত্ব লাভ করে। সেই ঐতিহাসিক চিঠিটা নিম্নরূপ:

'In the course of the last four months it has been made probable through the work of Joliot in France, as well as (Enrico) Fermi and (Leo) Szilard in America, that it may become possible to set up a nuclear chain reaction in a large mass of uranium, by which vast amounts of power and large quantities of new radium-like elements would be generated. Now it appears this could be achieved in the immediate future.

'This new phenomenon would also lead to the construction of bombs, and it is conceiveable, though much less certain—that extremely powerful bombs—of a new type may thus be constructed. A single bomb of this type, carried by boat and exploded in a

---

(২) Brighter than a Thousand Suns—Robert Tungk, Pelican book, 1970, P. 15.

port, might very well destroy the whole port, together with some of the surrounding territory...' (৩)

অত্যন্ত শক্তিশালী এবং উচ্চ ধ্বংসকর ক্ষমতাসহ পারমাণবিক বোমা যে, অনতিদূর ভবিষ্যতেই নির্মাণ করা সম্ভব, আইনষ্টাইন তাঁর চিঠিতে সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলিলেন। অবশ্য বৃটেনে, ফ্রান্সে জার্মানীতে, ইতালীতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বনামধ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানীগণ ইতিপূর্বেই পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে গভীরভাবে গবেষণা ও অনুসন্ধান শুরু করিয়াছিলেন। কার্যতঃ এই সমস্ত বিজ্ঞানীদের মধ্যে যেন একটা প্রতিযোগিতাও শুরু হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আইনষ্টাইনের চিঠি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে বোমা তৈয়ারিতে উৎসাহান্বিত করিয়া তুলিল। রুজভেল্ট তাঁর জীবিত কালে এই বোমা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু উদ্যোগ তিনি নিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে নতুন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁর আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, 'সম্পূর্ণরূপে সামরিক কারণেই এই বোমা তৈয়ার করিতে হইয়াছিল।' কিন্তু রুজভেল্ট বোমা তৈয়ারির প্রেরণা পাইয়াছিলেন আইনষ্টাইনের কাছ থেকে। ট্রুম্যানের ভাষায়—

'The idea of the atomic bomb had been suggested to President Roosevelt by the famous and brilliant Dr. Albert Einstein, and its development turned out to be a vast undertaking. It was the achievement of the combined efforts of science, industry, labour and the military, and it had no parallel in history. The man in charge and their staffs worked under extremely high pressure, and the whole enormous task required the services of more than one hundred thousand men and immense quantites of material. It required over two and a half years and necessitated the expenditure of two and a half billions of dollars'. (৪)

এর মর্ম এই যে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিকট পরমাণু বোমা নির্মাণের এই প্রস্তাব দিয়াছিলেন সুবিখ্যাত এবং প্রতিভাদীপ্ত বৈজ্ঞানিক ডঃ আলবার্ট আইনষ্টাইন। কিন্তু এর বিকাশ সাধনে বিশাল এক সংগঠনের প্রয়োজন হইয়াছিল। বিজ্ঞান, শ্রমশিল্প (কলকারখানা), শ্রমকর্মী এবং মিলিটারি সকলের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে এই অসাধ্য সাধন সম্ভব হইয়াছিল এবং ইতিহাসে এর কোন জুড়ি ছিল না। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং তাদের ষ্টাফকে কঠোরতম উচ্চ চাপের মধ্যে কাজ করিতে হইয়াছিল। এই বিরাট দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া লক্ষাধিক লোকের যেমন কর্মে আত্মনিয়োগ করিতে হইয়াছিল, তেমনি অজস্র পরিমাণ দ্রব্যাদিরও প্রয়োজন হইয়াছিল। এই বোমা নির্মাণে আড়াই বছরের বেশী সময় লাগিয়াছিল এবং খরচ পড়িয়াছিল ২৫০ কোটি ডলার।

---

(৩) লুই স্নাইডার—পৃষ্ঠা ৫৭৪

(৪) Memories by Harry S. Trueman, Signet book, Vol. 1, 1965, p. 460.

ঐতিহাসিক স্নাইডারও বলিয়াছেন যে, এই ধরনের বিরাট কাজের কোন নজির ইতিহাসে নাই। বড় বড় কলকারখানা তৈয়ার করিতে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার কর্মীর প্রয়োজন হইয়াছিল এবং সেগুলি 'অপারেট' করিতে দরকার হইয়াছিল অন্ততঃ ৬৫ হাজার লোকের। অথচ অত্যন্ত সঙ্গোপনে কম্পার্টমেণ্টে ভাগ ভাগ করিয়া প্রত্যেকটি কর্মীকে এমন ভাবে কাজ করিতে দেওয়া হইয়াছিল, যেন অপর কোন কর্মী টের না পায় এবং তার নিজের পক্ষেও যতটুকু না জানিলে নয়, তার চেয়ে বেশী তাকে জানিতে দেওয়া হইত না। মহাযুদ্ধের এটা ছিল সবচেয়ে গোপনতম কাজ। সুতরাং হিরোশিমায় প্রথম বোমা বর্ষণের সংবাদ যখন প্রকাশিত হইল, তখন এই সমস্ত কর্মীরা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছিলেন এবং ওক রিজ অঞ্চলের একজন সংবাদপত্র বিক্রেতা একটি স্থানীয় খবরের কাগজের ১৬০০ কপির প্রত্যেকটি এক ডলার (বর্তমান বিনিময় হার অনুসারে সাড়ে ৮ টাকা) মূল্যে ৩৫ মিনিটের মধ্যে বিক্রী করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কারণ, এই সমস্ত কর্মী জানিতেন না যে, তারাই এতদিন ধরিয়া এই বোমা প্রস্তুত কবিতে'ছলেন !

এই গোপনীয়তার কথ উল্লেখ করিয়াট্রুম্যানও লিখিয়াছেন যে, হাজার হাজার লোকের মধ্যে খুব মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোকই জানিতেন এই সমস্ত কলকারখানায় কি কাজ চলিতেছে। এমন কড়াকড়ি গোপনীয়তা অবলম্বন করা হইয়াছিল যে, ওয়াশিংটনের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদেরও অনেকের বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না যে, কলকারখানাগু'লিতে কি কাজ চলিতেছে। এমন কি, প্রেসিডেণ্ট হওয়ার আগে ট্রুম্যানও জা'নতেন না। তবে, ১৯৩৯ সালের আগে সাধারণতঃ বিজ্ঞানীমংলে এই তথ্য জানা ছিল যে, তত্ত্বগত ভাবে পরমাণু থেকে শক্তি নির্গত করা সম্ভব। সেই সময় বৃটেনে যুদ্ধের পক্ষে প্রয়োজনীয় যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যের অনুশীলন চলিতেছিল, ১৯৪০ সালে আমেরিকানরাও সেগুলির সঙ্গে একত্র হাত মিলাইলেন—যদিও আমেরিকা তখন যুদ্ধরত ছিল না।

কিন্তু জার্মানী যে একটা গোপন অস্ত্রের সন্ধানে আছে, এই গুজব তখন মিত্রপক্ষীয় মহলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ১৯৪২ সালে শুনা গেল যে, জার্মানী পারমাণবিক শক্তি যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে কাজে লাগাইবার চেষ্টায় আছে। আমেরিকানদের তখন বিশ্বাস হইল যে, জার্মানী যে নূতনতম ভি—১ এবং ভি—২ রকেট ছুড়িতেছে, সেগুলিকে পারমাণবিক শক্তির দ্বারা সজ্জিত করা হইবে এবং এই সমস্ত অস্ত্রের দ্বারাই জার্মানী বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখিতেছে। কিন্তু সেই স্বপ্ন তাদের বৃথা গেল, তারা তেমন কোন অস্ত্র আবিষ্কার করিতে পারিল না। মিত্রপক্ষের কপাল ভালো যে, হিটলার তেমন কোন ব্রহ্মাস্ত্রের সন্ধান পাইলেন না। কিন্তু যে সমস্ত জার্মান বিজ্ঞানী পারমাণবিক গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই হিটলারের পক্ষপাতী ছিলেন না এবং তাঁদের মনে মনে এমন ইচ্ছা ছিল না যে, হিটলার এই ভয়ঙ্কর শক্তির অধিকারী হোক। বিশেষতঃ নাৎসী পার্টির জাতিবিদ্বেষ ও ইহুদী বিদ্বেষের জন্য অনেক নাম করা বিজ্ঞানী ইংলণ্ড ও আমেরিকায় পলাইয়া গেলেন। স্বয়ং আইনষ্টাইন আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। তারপর ফ্যাসিষ্ট ইতালীয় সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী এনরিকো

ফেরমি (Fermi) এবং অধিকৃত ডেনমার্ক থেকে স্বনামপ্রসিদ্ধ নীলস্ বোরের প্রভৃতি আমেরিকায় বা ইংলণ্ডে পলায়ন করিয়াছিলেন। অথচ এরা তিন জনই ছিলেন পরমাণু বিজ্ঞান বিশারদ এবং এ্যাটম্ বোমা নির্মাণে এদের সাহায্য ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু হিটলার অধিকাংশ বিজ্ঞানীর সাহায্য ও সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হইলেন। তথাপি মিত্রপক্ষ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। জার্মানী কর্তৃক এ্যাটম্ বোমা নির্মাণের বা গবেষণার সম্ভাব্য স্থানগুলিতে বৃটিশ ও নরওয়েজান বিমান-কমাণ্ডো একত্রে দুঃসাহসিক হানা দিতে লাগিলেন। ১৯৪২-৪৩ সালের শীতকালে অধিকৃত নরওয়েস্থিত জার্মানীর 'ভারী জলের' (heavy water) কারখানায় হানা দিলেন এবং নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে সেই কারখানা ধ্বংস করিয়া দিলেন। কেন না, এ্যাটম্ বোমা নির্মাণে 'ভারী জল' ছিল একটা মূল্যবান উপাদান। আর তা ছাড়া পরমাণু বোমা তৈয়ারির মত উপযুক্ত সম্পদ এবং আনুষঙ্গিক বিরাট ব্যবস্থাও তখন নাৎসী জার্মানীর ছিল না।···

উইলিয়াম শাইরার লিখিয়াছেন যে, জার্মানীর পারমাণবিক বোমার পরিকল্পনা সম্পর্কে লণ্ডন ও ওয়াশিংটন অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল। কিন্তু এই ব্যাপারে 'হিটলারের তেমন কোন বিশেষ আগ্রহ না থাকায়' এই পরিকল্পনার কোন অগ্রগতি ঘটিল না। অধিকন্তু গেষ্টাপো পুলিশের প্রধান হিমলার জার্মানীর পরমাণু বিজ্ঞানীদেরকে স্বদেশের প্রতি অনুরক্ত নয় বলিয়া সন্দেহ করিতেন এবং তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করিলেন। ফলে, ১৯৪৪ সাল শেষ হওয়ার আগেই মার্কিন ও বৃটিশ গবর্নমেণ্ট জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন যে, জার্মানী এবারের যুদ্ধে এ্যাটম্ বোমার সন্ধান পাইবে না। পশ্চিম ইউরোপে জেনারেল আইজেনহাওয়ারের আক্রমণ ও অগ্রগতির পর অধ্যাপক সামুয়েল গাউডস্মিট (Goudsmit) এক গোয়েন্দা মিশনসহ জার্মানীর পারমাণবিক গবেষণা সম্পর্কে অনুসন্ধানও করিয়াছিলেন।—(৫)

এই অনুসন্ধানের ফলে এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল যে, জার্মান বিজ্ঞানীদের মধ্যে ক্ষুদ্র একদল পারমাণবিক অস্ত্র আবিষ্কারের চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু ১৯৪৪ সালে মিত্রপক্ষের ক্রমাগত বোমাবর্ষণ ও জার্মানীর ক্রমাগত পরাজয়ের ফলে সেই সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়।

* * *

অসম্ভব গোপনীয়তার মধ্যে পরমাণু বোমা তৈয়ারীর চেষ্টা হইতেছিল বটে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর সচিব ষ্টিমসন এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী বায়ারনেস্ (Byrnes) তাঁদের পদাধিকার বলেই এই পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ট্রুম্যান প্রেসিডেণ্ট পদে আসীন হওয়ার কিছুকাল পরেই তাঁরা তাঁকে জানাইলেন যে, এমন এক ব্রহ্মাস্ত্র তৈয়ারী হইতেছে, যেটা সফল হইলে আমেরিকা যুদ্ধের পর এমন ক্ষমতার অধিকারী হইবে যে, সে ইচ্ছামত অপরকে ডিক্টেট করিতে পারিবে।

কিন্তু এ্যাটম্ বোমা পরীক্ষার একমাস আগেও মার্কিন রণনেতাগণ জাপানকে খুব

(৫) দি রাইজ এ্যাণ্ড ফল অব দি থার্ড রাইখ্—পৃষ্ঠা ১৩০৬

দ্রুত ধরাশায়ী কর সম্পর্কে আশান্বিত ছিলেন না। বরং তাঁরা এই মর্মে এক পরিকল্পনা স্থির করিয়াছিলেন যে, জেনারেল ওয়াল্টার ক্রুগারের নেতৃত্বে মার্কিন ষষ্ঠ আর্মি ১৯৪৫ সালের শেষ ভাগে খাস জাপানের দক্ষিণতম অংশে কিয়ুস্যু (Kyushu) দ্বীপে প্রথম অবতরণ করিবে। এর চারমাস পর টোকিওর নিকটবর্তী এলাকায় ক্যান্টো সমতল ভূমিতে দ্বিতীয় আক্রমণ ঘটিবে এবং ১৯৪৬ সালের শেষ ভাগে জাপান নতশির হইবে—অবশ্য তার আগেও জাপান কাবু হইতে পারে তার বিমান ও নৌ শক্তির পতনের জন্য। কিন্তু জেনারেল মার্শাল অনুমান করিলেন যে, এই সমস্ত অভিযানের ফলে ৫ লক্ষ আমেরিকানের প্রাণ যাইতে পারে।

সুতরাং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও মার্কিন প্রাণহানি এড়াইবার জন্য ১৯৪২ সাল থেকেই (যখন জার্মানী উড়ন্ত বা রকেট বোমা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করিয়াছিল) মিত্র পক্ষ যেন পারমাণবিক শক্তির গবেষণার জন্য দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু করিলেন, যার নাম দেওয়া যাইতে পারে 'ল্যাবরেটারির যুদ্ধ'। এই যুদ্ধ আগেই বৃটিশ বিজ্ঞানীর শুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃটেন জার্মানীর আক্রমণের পাল্লার মধ্যে ছিল বলিয়া গবেষণা কেন্দ্রগুলি নিরাপদ ছিল না। সুতরাং রুজভেল্ট ও চার্চিল কিংবা মার্কিন ও বৃটিশ বিজ্ঞানীরা পরস্পরের সহিত হাত মিলাইলেন এবং দূরবর্তী আমেরিকার নিরাপদ ও নিভৃত কেন্দ্রে গবেষণাগার ও কারখানাগুলি প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইতিমধ্যে জার্মানীর পতন ঘটিল বটে, কিন্তু দূরবর্তী প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলিতে অত্যন্ত তিক্ত ও তীব্র যুদ্ধে মার্কিন সৈন্যদের প্রাণবলি হইতে লাগিল। সুতরাং সমস্ত শক্তি ও সম্পদ নিয়োগ করিয়া পারমাণবিক বোমা তৈয়ারির চেষ্টা আরম্ভ হইল। সমর বিভাগের আর্মি ইঞ্জিনিয়ারদের একটা বিশেষ শাখার উপর এই বোমা তৈয়ারির দায়িত্ব দেওয়া হইল। এভাবেই সুবিখ্যাত 'ম্যানহাটান প্রোজেক্ট' এর জন্ম হইল, যার ভারপ্রাপ্ত হইলেন মেজর-জেনারেল লেসলি আর গ্রোভ্স। অবশ্য বলাই বাহুল্য যে, ল্যাবরেটারিতে আসল গবেষণার কাজ করিতেছিলেন বৃটিশ ও মার্কিন বিজ্ঞানীগণ একত্রে। তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হইল পৃথিবী-বিখ্যাত আর একটি নাম—কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য পদার্থ বিজ্ঞানী ডঃ জে রবার্ট ওপেনহাইমার (Oppenheimer)—তিনিই পরবর্তীকালে এ্যাটম্ বোমার জন্মদাতা কিংবা জনকরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। কারণ এই বোমা তৈয়ারিতে তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশী ছিল। তিনি একাধারে বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, প্রেমিক, সংস্কৃতজ্ঞ এবং কৃতী অধ্যাপক ও দক্ষ সংগঠক ছিলেন। আর পরিশ্রম ক্ষমতাও ছিল তাঁর অসাধারণ সুতরাং তাঁর গুণগ্রাহী ও ভক্তের সংখ্যা ছিল অজস্র। নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে লস্ এ্যালামোস (Los Alamos) নামক স্থানে মূল সংগঠন গড়িয়া তোলা হইল। এছাড়া টেনাসি অঞ্চলের ওক্ রিজে এবং ওয়াশিংটন থেকে ১৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমের একটি বিচ্ছিন্ন এলাকায় রিচল্যাণ্ড শহরে দুইটি প্রকাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এ্যাটম্ বোমা নির্মাণের জন্য।

হ্যারি ট্রুম্যান প্রেসিডেন্টের গদিতে আরোহণের পর এই সমস্ত তথ্য জানিতে পারিলেন এবং ষ্টিমসন তাঁকে বলিলেন যে, আর চার মাসের মধ্যেই বোমা তৈয়ারি সম্পূর্ণ হইতে পারে। এই বোমার ফলাফল কি হইতে পারে, সেই সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে

পরামর্শ দেওয়ার জন্য সমর সচিব ষ্টিমসনের সভাপতিত্বে মার্কিন সরকারের ও সমর বিভাগের কয়েকজন শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিকে নিয়া একটি 'ইণ্টেরিম কমিটি' গঠিত হইল। এই কমিটিতে আমেরিকার তিনজন প্রখ্যাতনামা বিজ্ঞানী (যাঁরা প্রভূত দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন)—যেমন, ডঃ ভ্যানেভার বুশ, ডঃ কার্ল টি কম্পটন এবং ডঃ জেমস বি কোনাণ্ট সদস্যরূপে গৃহীত হইলেন।

এই কমিটিকে সাহায্য দেওয়ার জন্য বিজ্ঞানীদের আর একটি পৃথক গ্রুপ গঠিত হইল এবং পরমাণু বিজ্ঞানে তাঁরাও ছিলেন অসাধারণ খ্যাতি সম্পন্ন। এঁরা হইলেন ডঃ ওপেনহাইমার, ডঃ আর্থার এইচ কম্পটন, ডঃ ই ও লরেন্স এবং ডঃ এনরিকো ফেরমি যিনি ইতালী থেকে পলাইয়া আসিয়াছিলেন।—(৬)

ট্রুম্যান লিখিয়াছেন যে, এই দুইটি বিশেষজ্ঞ কমিটিই যথাশীঘ্র সম্ভব শত্রুর বিরুদ্ধে এই বোমা ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। কোন নির্জন দ্বীপে এই বোমা ফাটাইয়া এর শক্তি প্রদর্শন করিলে শত্রু কাবু হইবে বা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিবে, এমন বিশ্বাস তাদের ছিল না। সুতরাং এর ধ্বংসকারী ক্ষমতা প্রমাণের জন্য পূর্বাহ্ণে কোন সতর্কতা ছাড়াই শত্রুর বিরুদ্ধে এর প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। ট্রুম্যান বলিতেছেন যে, তিনি এর অপরিমিত বিধ্বংসী ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

* * *

১৬ই জুলাই, ১৯৪৫, আমেরিকার নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে আলামগারদোর নিকট বিশ্বের প্রথম এ্যাটম্ বোমার পরীক্ষা সফল হইল—তৃতীয় অধ্যায়ে পটসডাম সম্মেলনের দ্বিতীয় দফার আলোচনায় সে কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্য জাতির ইতিহাসে পারমাণবিক শক্তির এই আবির্ভাব ও বিস্ফোরণ এক অভাবনীয় যুগের সূচনা করিয়াছে। সুতরাং পরমাণু বোমার জন্মলগ্নের অতি নাটকীয় কাহিনীর বর্ণনা একজন বিশিষ্ট বাঙালী বিজ্ঞানীর রচনা থেকে এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।*

"বিশ্বের প্রথম পরমাণু বোমাটি ফাটানো হইয়াছিল আমেরিকাতে। ১৯৪৫ সালের জুলাইয়ের এক নিশীথে আমেরিকার নিউ মেক্সিকোর এক বিজন প্রান্তরের একটি পরিত্যক্ত খামার বাড়ীর অত্যন্ত গোপন আবহাওয়ার মধ্যে বিশ্বের প্রথম পরমাণু বোমাটিকে পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করার জন্য জুড়ে তোলা হচ্ছিল। সোমবার ১৬ জুলাই ১৯৪৫ সালের শেষ রাত্রিতে সেটিকে আলামগার্দোর বিজন মরুভূমির বুকে ফাটানো হয়। মরুভূমির মধ্যে বড়সড় পাথরের একটা টিলার উপর নিরেট লোহার তৈরী একটি মঞ্চ—তাতেই বসানো হয়েছে এ্যাটম্ বোমাটিকে—মঞ্চের সাংকেতিক নাম 'পয়েণ্ট জিরো'। সেখান হতে মাইল দশেক দূরে মূল নিয়ন্ত্রণ শিবির—সেখানে বিশেষ পোষাকে সজ্জিত, মুখে এবং শরীরের অন্যান্য উন্মুক্ত অংশে থকথকে ক্রিম লাগানো অবস্থায়, চোখে গাঢ় রঙের বিশেষ চশমা পরে বৈজ্ঞানিকের দল উপুর

(৬) ট্রুম্যানের আত্মস্মৃতি (ইং) পৃষ্ঠা ৪৬২

* এই লেখকের নাম ডক্টর ধ্রুব মাজিত। ইনি পদার্থ বিজ্ঞানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ, ডি। স্পেকট্রোস্কপি সম্পর্কে এঁর উচ্চতর গবেষণা দেশে ও বিদেশে উচ্চ প্রশংসিত। ইনি একজন বিশেষজ্ঞ গবেষক এবং এঁর প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল বাংলা ১৩৮৩ সালের বৈশাখ সংখ্যায় বিখ্যাত 'উদ্বোধন' মাসিক পত্রে।

হয়ে শুয়ে আছেন। দূরের মঞ্চের দিকে সকলের দৃষ্টি—সকলের বুকের মধ্যে ঘা পড়ছে। অদ্ভুত এক আশা-নিরাশার দোলায় সবাই দুলছেন। সারারাত্রি ধরে প্রস্তুতি পর্ব চলেছে - চরম মুহূর্তের জন্য।

"মাইকে ঘোষকের গলা শোনা যাচ্ছে—চার-তিন-দুই—তারপর লাল কমলা সবুজ নীল বেগুনী আলোকের সে কি অবর্ণনীয় ঝলকানির সঙ্গে কানের পর্দা ফাটানো অতি দীর্ঘস্থায়ী অমানুষিক এক শব্দলহরী আগ্নেয়গিরির লাভার মত গলিত মৃত্তিকা পাথর আর ধাতব খনিজের রূপালি গলিত স্রোত তথা উজ্জল রক্তবর্ণের ধূমায়িত ভস্মরাশি ব্যাঙের ছাতার আকারে উপরের দিকে উঠে চলেছে ধীরে ধীরে। এক সময় সেই ব্যাঙের ছাতার উচ্চতা দাঁড়লো সাত মাইলেরও বেশী। এত সব কিছু যেন মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে গেল—অনেকেই পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের প্রথম ঝলকানিটা দেখতেই পেল না—তবে দূরে পাহাড়ের গায়ে ঠিকরে পড়া উজ্জল আলোর ছটা যা চোখে পড়ল—চিরকালের মত চোখের দ্যুতি ছিনিয়ে নিতে সে আলোই যথেষ্ট। উত্তেজনায় অনেকেই চোখের চশমা খুলে একবার খালি চোখে সেই "দিব্য" আলোক দেখতে চাইলেন—সঙ্গে সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য অন্ধ হয়ে রইলেন। হায় নিয়তি! এতগুলি বছর ধরে পরমাণু বোমার যে দিব্য আলোক ঝলকানি প্রত্যক্ষ করার জন্য তাঁরা সযত্নে অপেক্ষা করছেন—আজ তাঁরা এই চরম মুহূর্তের বিশেষ ক্ষণটিতে এসেও সেই দিব্য দ্যুতি দেখতে পেলেন না।

"পরমাণু বোমার পিতা—ওপেনহাইমার নিয়ন্ত্রণ-কক্ষের একটি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর নবজাতকের অস্তিত্বের ক্রন্দন এবং তার ভূমিষ্ঠ হওয়ার ক্ষণটিকে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করছিলেন—অন্ধকার রাত্রির বুক চিরে হঠাৎ ঝলসে উঠলো আলো—তীব্র আলোক ছটায় উদ্ভাষিত হয়ে উঠল তাঁর চোখমুখ—হয়ত হৃদয়ও। ওপেনহাইমারের হৃদয় আজ বিহ্বল—শান্ত কণ্ঠে তিনি আবৃত্তি করছেন—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগের একটি শ্লোক :

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মন্ ॥—১১।১২

—যদি কখনও আকাশে এক সঙ্গে সহস্র সূর্যের প্রভা উদিত হয়, তাহলে সেই দীপ্তি পরমাত্মার প্রভার কিঞ্চিৎ তুলনাযোগ্য হলেও হতে পারে।

"বাতাসে বারুদের গন্ধ—মৃত্যুর গন্ধ চারদিকে। মৃত্যুর এই চরম ক্ষমতাধর ব্রহ্মাস্ত্রটি তৈরী হয়েছে তাঁর হাত দিয়েই। পরমাণু বোমার ভয়াবহতায় ওপেনহাইমারের হৃদয় অস্থির—তিনি সান্ত্বনা খুঁজছেন। কিন্তু তাঁর জন্য কি সান্ত্বনাই বা আছে! ওপেনহাইমার হয়ত শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁর শেষ সান্ত্বনা চাইছেন—বিড় বিড় করে তিনি পুনরায় আবৃত্তি করলেন গীতার একাদশ অধ্যায়ের আর একটি শ্লোক :

শ্রীভগবানুবাচ—
কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

ঋতেঽপি ত্বা ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥

—আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল, বর্তমানে লোকসংহার করতে প্রবৃত্তহয়েছি। তুমি যুদ্ধ না করলেও বিপক্ষ দলে যে বীরগণ আছেন, তাঁরা কেউ আর বেঁচে থাকবেন না।

ওপেনহাইমার একটু আশ্বস্ত হইলেন—তিনি তাহলে উপলক্ষ মাত্র, একাজ তিনি না করলে ভগবান অন্য কারুকে দিয়ে করাতেন!"

* * *

"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। হিটলারের ফ্যাসীবাদী জার্মানী আত্মসমর্পণ করেছে—জাপান আত্মসমর্পণ করার মুখে। এমন সময় হঠাৎ ১৯৪৫ সালের ৬ই আগষ্ট সকাল ৮.১৫ মিনিটে জাপানের কয়েক লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ করলেন সমগ্র আকাশ জুড়ে তীব্র নীল-বেগুনী আলোর অতি উজ্জ্বল ঝলক, আর সেই সঙ্গে শুনলেন কান-বধির হওয়া একটানা প্রচণ্ড শব্দ লহরী—বিশ্বের দ্বিতীয় পরমাণু বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটানো হলে হিরোশিমায়। তার কয়েকদিন বাদে তৃতীয়টিও অনুরূপ আলোক এবং শব্দের বন্যার মধ্যে প্রকটিত হলো নাগাশাকিতে। জাপানের মাথার উপরে অতি উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ঘন বাষ্পের ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে উঠলো প্রায় চার মাইল উঁচু হয়ে এই অদ্ভুত এবং বিকটদর্শন ব্যাঙের ছাতা (Mushroom cloud from Atomic Explosion) পরমাণু বোমার প্রতীকরূপে আজ চিহ্নিত। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দু'লক্ষ মানুষ মারা গেলেন—প্রায় দশ লক্ষ মানুষ হলেন বীভৎস রকমের বিকলাঙ্গ চারিদিকে শুধু আগুন আর আগুন। হাজার হাজার মানুষ দিশেহারা হয়ে ছুটাছুটি করছে—সেই ব্যাপক অগ্নিকুণ্ড হতে বের হবার আশায়। তাদের কেউ কেউ মুহূর্তের মধ্যে সাত-আট ফুট লম্বা হয়ে যাচ্ছেন, আবার কারুর দেহ দুমড়ে মুচড়ে একেবারে ছোট হয়ে যাচ্ছে। কারুর চোখ দুটি ঠেলে বেরিয়ে আসছে, কারুর গায়ের চামড়া উঠে গিয়ে লোল হয়ে গায়েই ঝুলছে। কাছাকাছি পাহাড়গুলো দাউ দাউ করে জ্বলছে—মহাসাগরের বুকে লেগেছে প্রচণ্ড ধাক্কা আর তার উত্তাল জল হয়ে পড়েছে উত্তপ্ত। ক্রন্দন আর আর্তনাদে সেদিনের সেই ভয়ঙ্কর শারদপ্রভাত মুখরিত হয়ে উঠেছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষের অশ্রুতে যা চিরসিক্ত, তাদের মর্মান্তিক বেদনায় যা ভারাক্রান্ত—এমন কোন করুণ দৃশ্যের বর্ণনা করা সহজ সাধ্য নয়।

"কি ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব যে হয়েছিল, তার কিছুটা হয়তো বোঝা যাবে যাঁরা সেদিন ঐ অবস্থার মধ্যেও বেঁচে গিয়েছিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে। তাঁদের ক'জনের মুখ হতে শোনা যাক সেদিনের বর্ণনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাকোশ ইতো সেদিন ছিলেন একজন স্কুলের বিদ্যার্থী। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—'প্রফেসর ইতো, কি দেখেছিলেন আপনি, মনে আছে কিছু?'

একটুখানি ভেবে নিয়ে অধ্যাপক বললেন—মনে না থাকার কিছু নেই স্পষ্টই মনে আছে সব কিছু। আগুন জ্বলছে, যেদিকে তাকানো যায় শুধু আগুন।

সেই অগ্নিকুণ্ডের ভিতর হতে বেরিয়ে আসার সে কি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা! বোমার আঘাতে গলে গিয়ে সব কিছু জেলি হয়ে গেছে। একটা আশ্চর্য জিনিস—বিশ্বাস করুন প্রথম দিকে কিন্তু কোন সোরগোল ছিল না। কিন্তু কয়েক মিনিট বাদে—উঠল এক তুমুল আর্তনাদ—যে চিৎকারের কোন তুলনাই হয় না।'

"একজন শ্রমিক বললেন—'রাত্রে এবং সকালে একটি কারখানায় কাজ করি। কারখানায় সকালের ভোঁ বেজে গেছে। হঠাৎ বেগুনি আলোক ঝলক দেখে সবাই চমকে উঠলাম। যেখানটিতে বোমাটি বিস্ফোরিত হলো, তার তিন মাইলের মধ্যেই ছিল আমার কারখানা। ছুটে গেলাম কারখানার গেটের দিকে—কিন্তু গেটের কাছে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই বাতাসের ঝটকা এসে আমার সামনের সব কিছু ভূমিসাৎ করে দিল। কয়েক শত শ্রমিক কারখানার বাড়ীর নীচে চাপা পড়ে প্রাণ হারালো - দেয়াল ধ্বসে পড়লো, আর তা সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত এক ধরনের ছাই হয়ে উড়ে গেল। ঝড় বইছে তখন সাইক্লোনের মত। দূরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে রক্তবর্ণ লেলিহান অগ্নিশিখা। ওদিকে শহরের মধ্য হতে রক্তবর্ণ বাষ্পপুঞ্জ পৃথিবী হতে সোজা আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। তার দিকে তাকায় কার সাধ্য!'

"ঠিক তখন পরমাণু বোমার স্রষ্টারা কি করছিলেন, কি ভাবছিলেন? সেদিন তাঁদের মাথার উপরের আকাশ অবশ্যই নিরাপদ ছিল, কোন তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি তো তাঁদের মাথায় ঝরে পড়ছিল না। সুতরাং হয়তো ধরে নেওয়া হবে সেদিন তাঁরা ছিলেন একেবারেই নিশ্চিন্ত অথবা এই মহান সৃষ্টির উল্লাসে কিঞ্চিৎ দিশেহারা। কিন্তু—না, তাঁরা সেদিন কোন বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়েন নি। বিশ্বের বিজ্ঞানীকুল সর্বদা ভেবেছেন—আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি তাঁরা একি বেইমানি করে ফেল্লেন—তীব্র ধিক্কার তাঁদের অন্তর জর্জরিত করছিল প্রতি মুহূর্তে। পদার্থ-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ মনীষী—বিজ্ঞানী সমাজের 'পোপ' মহান আইনষ্টাইন তখন আমেরিকার প্রিন্সটনে। 'সেণ্টার অব্ এ্যাডভান্সড্ ষ্টাডিজ' গবেষণায় রত। শোনা যায় পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের দিনটিতে তিনি বেদনায় নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে কপালের শিরা চেপে ধরে বসেছিলেন নির্জনে একাকী। সেদিনটিকে বলা যায় আইনষ্টাইনের 'কৃষ্ণ দিবস'—পরমাণু গবেষণার প্রথম দিকেই তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন—'পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ভাঙ্গন ঘটিয়ে মানুষের কতটা মঙ্গল করা সম্ভব, তা আগে হতে চিন্তা করা গেলেও—এর দ্বারা যে মানুষের কত অকল্যাণ হতে পারে, তা চিন্তাও করা যায় না।'

"আলবার্ট আইনষ্টাইনের 'কৃষ্ণ দিবসের' কথা সত্য হোক আর নাই হোক—তবু একটা কথা আমরা কল্পনা করে নিতে পারি, সেদিন তাঁর হয়তো মনে হয়েছিল তাঁরই আবিষ্কৃত পদার্থ বিত্তার সেই বিশেষ সূত্রটির কথা—তাঁর সেই সুবিদিত 'শক্তি-ভর—সমীকরণের' কথা, যাতে বলা হয়েছে পদার্থের মধ্যে যে বিপুল শক্তি সঞ্চিত আছে, তার পরিমাণ পদার্থের ভরের সঙ্গে আলোকের গতির বর্গগুণ করলে যত হয় তার সমান। এ সূত্রের এমন ভয়ঙ্কর সমর্থন গবেষণাগারে অথবা বিমূর্ত শূন্যে না ঘটিয়ে ঘটানো হলো হিরোশিমা এবং নাগাশাকির নিতান্ত করুণ এক মানবিক পরিবেশের মধ্যে—হয়তো এই বিষাদটাই তাঁকে ধিক্কার জানাচ্ছিল বেশী করে এবং সেটাই আমাদের কাছে তাঁর 'কৃষ্ণ দিবস'। তাঁর দুঃখ ও হতাশার হয়তো আর একটি

কারণও ছিল – তা হল তাঁর প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে লেখা সেই ঐতিহাসিক চিঠি; যাতে তিনি প্রেসিডেণ্টকে পরমাণু বোমা তৈরী করার জন্ম অনুরোধ জানিয়েছিলেন।*

"নিউক্লিয়ার তথা পরমাণু পদার্থ বিজ্ঞান কোন একক মহান বৈজ্ঞানিকের মানসপুত্র নয়। অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম করা যেতে পারে, যাঁরা এই বিজ্ঞানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। বিশ্বের প্রায় সকল জাতির লোক এর উন্নতির জন্য কাজ করেছেন। সবার নাম করতে গেলে একটা 'Who's Who' ধরনের বই হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তবু—মহান আইনষ্টাইন এবং পরমাণু বোমার পিতা রবার্ট ওপেনহাইমার ছাড়াও নিজেদের কীর্তিতে যাঁরা দুঃখবোধ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম উল্লেখ না করে পারা যায় না—এরা পরমাণু পদার্থ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সকলেই প্রায় সমান বিখ্যাত :

বৃটেনের পল অ্যাড্রিয়ন মরিস ডিরাক, লর্ড ব্ল্যাকেট, স্যার জেমস্ চ্যাডউইক, ডেনমার্কের নেলস্ হেনরিক বোর, তাঁর ছেলে এ্যাগে বোর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্ল অ্যাণ্ডারসন, হানসবেথে, গ্লীন সীবর্গ, ইভা নোডাক, অ্যালিসন, রিচার্ড ফাইনম্যান, জন নিউম্যান, রোসেনবার্গ, আর্থার হোলি কম্পটন, আর্নেষ্ট অরল্যাণ্ডো লরেন্স, হুইলার, হ্যারল্ড উরে; জার্মানীর আটো হান, ফ্রাইট্জ ট্রাসম্যান, অটো ফ্রিশ, ওয়ারনার হাইসেনবার্গ; ইতালীর এনরিকো ফেরমি, এ্যামিলেও সেগ্রে; হাঙ্গেরীর লিও সেলার্ড, ইউগেনী ভিগনার, এডওয়ার্ড টেলর, রাশিয়ার পিটার কাপিৎজা, লেভ লেণ্ডাউ কুর্চাতভ, সাখারভ, তামম্, চেরেনকভ, স্পেনের আলভারেজ, অষ্ট্রিয়ার এরউইন শ্রদিনজার, উলফগাঙ পাউলি, কুমারী লিজা মাইটনার; ভারতবর্ষের সত্যেন্দ্রনাথ বসু; ফ্রান্সের দ্য ব্রয়েগলী, জুলিয়েট কুরী দম্পতি; জাপানের হিদকী ইউকোওয়া, জোলিওনিশানা; হল্যাণ্ডের ভন্-দ্য-গ্রাআফ; মেক্সিকোর ভল্লার্তা প্রভৃতি কীর্তিমান বিশ্ব-বিখ্যাত বিজ্ঞানীর দল। এইসব শান্তিকামী বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা সযত্নে আমেরিকার সমর দপ্তরে পেণ্টাগণের সমর বিশারদদের হাতে এই ব্রহ্মাস্ত্রটি তুলে দিয়েছিলেন, তাঁরা সেদিন যা কিছু করেছিলেন, তা দেশের স্বার্থে, আবিষ্কারের উদগ্র নেশায় এবং সর্বোপরি পরমাণু বোমার ব্যাপারটি সম্পর্কে যথেষ্ট অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে। পরমাণু বোমার মর্মান্তিক তাৎপর্য কিছুটা উপলব্ধি করে তাঁরা প্রায় সবাই নিজেদের কীর্তির ভয়াবহতায় আর্তনাদ করে উঠেছিলেন। আর সেই পরমাণু বোমার পিতা, বিচক্ষণ প্রশাসক, স্বচ্ছন্দ কবি, দার্শনিক, বহু ভাষাবিদ, গীতা বিশারদ এবং সর্বোপরি প্রখর বুদ্ধিমান পদার্থ-বিজ্ঞানী রবার্ট ওপেনহাইমার, যাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে পাওয়া গেল সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই মরণাস্ত্রটি, সেই ওপেনহাইমারও সেদিন ক্ষুণ্ণমনে ভাবছিলেন লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে নিহত আর পঙ্গু করে নগরকে নগর উড়িয়ে দিয়ে মাইলের পর মাইল শস্য শ্যামল উর্বর কৃষিক্ষেত্রকে বন্ধ্যা করে কি লাভ হলো? এর কি সত্যই কোন প্রয়োজন ছিল? বিজ্ঞান কি শুধুই অশুভ আর মৃত্যুর হাহাকারের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলবে এখন হতে? দুঃখ হয়েছিল হয়তো ওপেন-

* এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে সেই ঐতিহাসিক চিঠির উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

হাইশ্যারেরই সবচেয়ে বেশী। কারণ, নাৎসী তথা হিটলার বিরোধীরা তাঁকে দিয়েই এই চরম বিয়োগ ভারাক্রান্ত অধ্যায়টি রচনা করিয়েছিল।"

* * *

পারমাণবিক বোমা পরীক্ষার এই নবযুগ পর্বকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্মরণ করা হইয়াছিল ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৭০ সালের ১৬ই জুলাই তারিখ। সেদিন ওয়াশিংটন থেকে নিম্নলিখিত ইংরাজী রিপোর্টটি কলকাতার সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হইয়াছিল :

Washington, July 16 -- The atomic age began at exactly 5-30 in Alamogordo, New Mexico, 25 years ago.

To-day the USA recalls the event in sombre terms. Dr. J. Rober Oppenheimer, one of the authors of the nuclear bomb project conceived the events in the words of t e Bhagvat Gita :

'If the radiance of a thousand suns
Were to burst at once in to the sky
That would be like the splendour of the one...
I am become death,
That shatterer of worlds.'

The New York Times reported the bursting of the first bomb in these unforgettable words written by William L. Laurence who witnessed the burst of the atomic age.

'Just at that instant there rose from the bowels of the earth a light not of this world, the light of many suns in one. It was a sunrise such as the world had never seen, a great, green super sun climbing in a fraction of a second to a height of more than 8000 feet, rising even higher until it touched the clouds, lighting up the earth and the sky all around with a dazzling luminosity.

"It went, a great ball of fire about a mile in diametre, changing colours as it kept shooting upwards, from deep purple to orange, expanding growing bigger, rising as it was expanding, as an elemental force freed from its bonds after being chained for billions of years.

'For a fleeting instant the colour was unearthly green, such as one sees only in the corona of the sun during a total eclipse. It was as though the earth had opened and the the sky had split.

---

* দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হলো। সুপণ্ডিত লেখক পারমাণবিক বোমাসংক্রান্ত প্রামাণিক গ্রন্থসমূহের (যেমন Brighter than Thousand Suns by Jungk, R.) রেফারেন্স দিয়ে রচনাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই বোমার জটিল টেকনিক্যাল দিক সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনা 'উদ্বোধন' মাসিকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় (১৩৮১ সাল) প্রকাশিত হয়েছিল।

"One felt as though he had been privileged to witness the birth of the world—to be present at the moment to creation when the Lord said : Let there be light.,"

(স্টেটসম্যান, কলিকাতা,
১৭ই জুলাই, ১৯৭০)

পারমাণবিক যুগারম্ভের 'রজত জয়ন্তী'(!) উপলক্ষে বিখ্যাত মার্কিন পত্রিকা 'নিউইয়র্ক টাইমস' এর এই রিপোর্টের বিশদ বাংলা অনুবাদ দেওয়া সম্ভবতঃ অনাবশ্যক। কেন না, বোমা বিস্ফোরণের আসল প্রতিক্রিয়াগুলির বর্ণনা আগেই দেওয়া হইয়াছে। তবে, প্রত্যক্ষদর্শী একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলিয়াছেন—তাঁরা যেন পৃথিবীর প্রথম জন্ম এবং আলোকের প্রথম আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিলেন !

* * *

কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে এ্যাটম্ বোমা নিক্ষেপের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত ছিল? ট্রুম্যান তাঁর স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেন যে, সেই দায়িত্ব তাঁর উপরই ন্যস্ত ছিল।

"কখন এবং কোথায় পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করিতে হইবে, সেই সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার আমার উপরেই ছিল। এ বিষয়ে কাহারও যেন কোন ভুল ধারণা না থাকে—'Let there be no mistake about it'—আমি এই বোমাকে সামরিক অস্ত্র বলিয়াই মনে করিতাম এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। প্রেসিডেন্টের শীর্ষস্থানীয় সামরিক উপদেষ্টাগণ এর ব্যবহার সুপারিশ করিয়াছিলেন এবং যখন আমি এই বিষয়ে চার্চিলের সঙ্গে কথা বলিয়াছিলাম, তখন তিনি নিঃসংশয় চিত্তে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যদি এই বোমার দ্বারা যুদ্ধ শেষ করা যায়, তবে নিশ্চয়ই এর ব্যবহার করিতে হইবে।' (৭)

চার্চিল যে এই বিষয়ে ট্রুম্যানের সঙ্গে একাত্ম এবং একমত হইবেন, সেকথা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। তিনিও তাঁর মহাযুদ্ধের গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরের ওকিনাওয়া দ্বীপে আত্মবিনাশী জাপানী সৈন্যদের ভয়াবহ বেপরোয়া লড়াই দেখিয়া তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন। কেননা, এভাবে জাপানকে জয় করিতে গেলে ১০ লক্ষ মার্কিন সৈন্য এবং ৫ লক্ষ বৃটিশ সৈন্যের প্রাণ যাইতে পারে। এই অবস্থায় এ্যাটম্ বোমা আবিষ্কারের সংবাদে চার্চিল যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। কারণ, এই অতি-প্রাকৃত (super natural) অস্ত্র যুদ্ধও তাড়াতাড়ি শেষ করিবে এবং 'বীর জাপানী সৈন্যেরাও' অজস্র প্রাণক্ষয় থেকে রেহাই পাইবে। আর জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়ার কোন সহযোগিতা বা সাহায্যেরও প্রয়োজন হইবে না। সুতরাং পরীক্ষার আগেই ৪ঠা জুলাই তারিখ এই বোমা জাপানীদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য বৃটিশ পক্ষ নীতিগত ভাবে মত দিয়াছিলেন।

চার্চিল তাঁর বলিষ্ঠ ভাষায় অত্যন্ত জোরের সঙ্গে লিখিয়াছিলেন যে, 'এ্যাটোমিক

(৭) ট্রুম্যানের আত্মস্মৃতি (ইং)—পৃষ্ঠা ৪১২

বোমা জাপানের বিরুদ্ধে ব্যবহারের দ্বারা তাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হইবে কিনা, এটা আমাদের মধ্যে কখনও বিতর্কের বিষয় পর্যন্ত ছিল না। সকলেই এই প্রশ্নে স্বেচ্ছাকৃতভাবে ও স্বাভাবিকভাবেই সম্পূর্ণ একমত ছিলেন এবং আমাদের অন্য কিছু করা উচিত, এমন কোন সামান্যতম প্রস্তাবও 'আমি কারুর মুখে শুনি নাই।' (৮)

ইতিমধ্যে জাপানের পক্ষ থেকে মস্কোতে শান্তি স্থাপনের জন্য জাপানী রাজদূতের মারফত একটি বার্তা ষ্ট্যালিনের হাতে পৌঁছিয়াছিল বটে, কিন্তু তার মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ছিল না বলিয়া সেটা গ্রাহ্য হইল না। তবে, সেই বার্তায় একথা বলা হইয়াছিল যে, জাপান "নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের" দাবী মানিয়া লইতে পারে না। তবে, অন্যান্য প্রশ্নে আপোষ মীমাংসা করিতে রাজী আছে। পটসডাম সম্মেলনের পূর্বাহ্নে জাপানের সম্রাটের পক্ষ থেকে মস্কোতে এই বার্তাটি পৌঁছিয়াছিল এবং ষ্ট্যালিন সেকথা চার্চিলকে জানাইয়াছিলেন। চার্চিল এই বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সঙ্গে যখন আলোচনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি জাপান সম্পর্কে 'নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের' দাবী নিয়া জেদ প্রকাশ করিতে রাজী ছিলেন না। তখন মার্কিন নেতারা পুনরায় বিষয়টি বিবেচনা করিলেন এবং জাপানকে আত্মসমর্পণের সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে "জাপানী সৈন্যবাহিনীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ" দাবী করিয়া ২৬শে জুলাই পটসডাম থেকে একটি চরমপত্র প্রচার করা হইল। (তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষ এই চরমপত্র অগ্রাহ্য করিলেন এবং ২৮শে জুলাই রেডিও টোকিও মিত্র শক্তিবর্গের চরমপত্রের কোন জবাব না দিয়া ঘোষণা করিল যে, জাপানী গবর্নমেণ্ট যুদ্ধ চালাইয়া যাইবেন। তখন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান স্থির করিলেন যে, ৩রা আগষ্টের পর জাপানের বিরুদ্ধে এ্যাটম্ বোমা প্রয়োগ করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। 'সামরিক প্রয়োজনে' এবং 'সৈন্যক্ষয় হ্রাস করার জন্যই' এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। মার্কিন সমর কর্তারা জাপানী সামরিক উৎপাদন কেন্দ্রের যত কাছাকাছি সম্ভব এই বোমা নিক্ষেপের সঙ্কল্প করিলেন এবং এজন্য পর পর চারটি শহরের নাম স্থির করা হইল, যথা—হিরোশিমা, কোকুরা, নাইগাটা এবং নাগাশাকি। রণনৈতিক বিমানবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল স্পাৎস (Spaatz) নিযুক্ত হইলেন লক্ষ্য বস্তুর উপর বোমা নিক্ষেপের ব্যবস্থা করার জন্য। আবহাওয়ার অবস্থা অনুসারে তারিখ নির্দেশের স্বাধীনতা তাঁকে দেওয়া হইল—তবে, ৩রা আগষ্টের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। বোমাবাহী বিমান ছাড়া আর একটি পৃথক বিমানে সামরিক ও বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষকের দল কয়েক মাইল তফাতে থাকিয়া বোমাবর্ষণের ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করিবেন—এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হইল। কিন্তু সমর সচিব ও রাষ্ট্রপতির অনুমতি ছাড়া এই বোমা ব্যবহারের কোন সংবাদ প্রকাশ করা চলিবে না। সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরের ম্যারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের টিনিয়ান দ্বীপে জাহাজ ও প্লেনযোগে বোমার উপযুক্ত মালমশলা, পাইলট, নক্সা ও বিশেষজ্ঞদের দ্রুত সমাবেশ ঘটানো হইল। বি-২৯ সুপার ফোর্টরেস শ্রেণীর একটি বিশেষ ইউনিট এই উদ্দেশ্যে গঠিত হইল এবং তারা টিনিয়ান দ্বীপ থেকে আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হইল।

---

(৮) চার্চিল, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫২-৫৫৩

কর্নেল পল ডব্লিউ টিবেটস্ (Tibbets) নামক একজন তরুণ বৈজ্ঞানিক এই দুঃসাহসিক কার্য সম্পন্ন করার ভার পাইলেন এবং হিরোশিমার আকাশে বি-২৯ শ্রেণীর যে বিমানটি তিনি পাইলট হিসাবে পরিচালনা করিলেন, তার নামকরণ করা হইল 'এনোলা গে' (Enola Gay)। 'এনোলা গে'র মাত্র তিনজন আরোহী—কর্নেল টিবেটস্, নেভী ক্যাপ্টেন উইলিয়াম পারসন এবং মেজর টমাস ফেরেবী (Ferebee) আসল ব্যাপারটা জানিতেন, আর বাকী লস্করেরা এই বোমা বিষয়ে কিছুই জানিতেন না। শুধু এইটুকুই জানিতেন যে, তাঁরা একটি গুরুতর 'গোপনীয়' সামরিক অভিযানে যাইতেছেন।...

৫ই আগস্ট (ইংরাজী মতে ৬ই) রাত্রি ২-৪৫ মিনিটের সময় 'এনোলা গে' সেই কালান্তক বোমাটি নিয়া টিনিয়ান দ্বীপ থেকে দীর্ঘ যাত্রায় বাহির হইল জাপানের দিকে। দুইটি পর্যবেক্ষক বিমান তাকে অনুসরণ করিল। এই বিমান দুইটিতে ছিল ক্যামেরা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক দল। কিন্তু এই বিমানের উড্ডয়ন এবং ঊর্ধ্ব আকাশে আরোহণ বেশ বিপজ্জনক ছিল। কারণ, বোমাটি খুব ভারী ছিল এবং এর আগে তিনটি বি-২৯ বিমান এখান থেকে উড়িতে গিয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। আমেরিকার সৌভাগ্যক্রমে 'এনোলা গে' বিমান নিরাপদেই জাপানের দিকে উড়িয়া গেল এবং ভোর ৭ টার সময় (হিরোশিমা সময়) দক্ষিণ জাপানের দিকে মুখ করিল। জাপানী রাডার যন্ত্রে তা' ধরা পড়িল এবং সমগ্র হিরোশিমা অঞ্চলে বিমান আক্রমণের সতর্কতাস্বরূপ সাইরেন বাজিয়া উঠিল। এর কিছুক্ষণ পরেই আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকারী একটি মার্কিন বিমান হিরোশিমার আকাশের উপর উড়িয়া চলিয়া গেল। কোন বোমা বর্ষিত হইল না। সুতরাং যথারীতি সাইরেন 'মোক্ষধ্বনি' (অল ক্লিয়ার) বাজিয়া উঠিল এবং লোকেরা মনে করিল বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। অতএব হিরোশিমা শহরের লোকেরা (বাসিন্দার সংখ্যা ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার) যথারীতি কলকারখানায় ও অফিসের কাজকর্মে যোগ দিতে শুরু করিল এবং অনেক স্কুলের শিশুরাও রাস্তায় বাহির হইল।

৬ই আগষ্ট, সোমবার, সকাল ৮টা—হিরোশিমার ঊর্ধ্ব আকাশে দুইটি প্লেন দেখা গেল। কিন্তু শহরের লোকেরা মনে করিল ওই দুইটি পর্যবেক্ষণকারী বিমান, বোমারু নয়। সুতরাং তারা কেউ নিরাপত্তার আশ্রয় গ্রহণ করিল না। ওদিকে 'এনোলা গে' বিমানের মধ্যে বোমাটি শহরের উপর নিক্ষেপ করার জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি ঘটানো হইল —মার্কিন আবহাওয়া বিমান থেকে আবহাওয়া অনুকূল বলিয়া রিপোর্ট পাওয়া গেল। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ তখনই হিরোশিমার 'ভাগ্য চূড়ান্তরূপে নির্ণীত' হইয়া গেল। সুতরাং পাইলট কর্নেল টিবেট্‌, বোমা নিক্ষেপকারী এবং নেভিগেটর ও রাডার অপারেটর ৩১, ৬০০ ফুট উপর থেকে বোমাটি নিক্ষেপের দায়িত্ব নিলেন। সকাল ৮টা ১১ মিনিটের সময় 'এনোলা গে' হিরোশিমার উপরে আসিয়া হাজির হইল এবং বোমাটি নীচে নিক্ষিপ্ত হইল। (৯)

(৯) Japan Subdued—Hurbert Feis, p. 109-10

এই কালান্তক বোমা হিরোশিমাতে কী নিদারুণ এবং অবর্ণনীয় বিপর্যয় ঘটালো, তার কিছু বর্ণনা আগেই দেওয়া হইয়াছে। এবার 'এনোলা গে'র পাইলট কর্নেল টিবেটের এবং অন্যান্য বৈমানিকের অভিজ্ঞতার বর্ণনা থেকে কিছুটা পুনরাবৃত্তি করা যাইতে পারে। বোমাটি মাটি স্পর্শ করার আগেই বিস্ফোরিত হইয়াছিল এবং 'এনোলা গে' সেই আঘাতের তরঙ্গ এড়াইবার জন্য দূরে সরিয়া গেল—পর্য-বেক্ষণকারী বিমান দুটিও নিরাপদ দূরত্বে ছিল। এই বোমা বর্ষণের ফলাফল সম্পর্কে বিমান থেকে ফটো গ্রহণ করা হইয়াছিল।

বোমাটি নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর হঠাৎ হিরোশিমা শহর যেন অতি তীক্ষ্ণ, তীব্র এবং চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল সূর্যলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল :

"Suddenly a piercing, blinding light, as bright as the Sun, burst over the city. There was an instant of deadly silence. Then an earth-shaking shock thundered violently down over the centre of the city, crumbling everything in its range to rubble and dust."

অর্থাৎ শহরটি আকস্মিক তীব্র আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর নিস্তব্ধতা সেখানে নামিয়া আসিল। তারপর শহরের কেন্দ্রস্থলে ভূমিকম্পের আলো-ড়নের মত প্রচণ্ড আঘাত অনুভূত হইল এবং তার পাল্লার মধ্যে যাহা কিছু ছিল, সমস্তই একেবারে ধ্বংস হইয়া গুঁড়া গুঁড়া হইয়া ধূলায় ও আবর্জনায় পরিণত হইল। (১০)

বিস্ফোরণের দ্যুতি থেকে নানা রকমের আলো—নীল, কমলা, বেগুনী ও ধূসর রং বিচ্ছুরিত হইতেছিল। নীচের সেই ভয়াবহ দৃশ্য বর্ণনার অতীত ছিল। 'এনোলা গে'র একজন বৈমানিক সেই দৃশ্য দেখিয়া 'মাই গড্' বা 'হা ঈশ্বর' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিয়াছিলেন।

ব্যাঙের ছাতার মত অদ্ভুত আকৃতি নিয়া নিবিড় ধূম্রজাল ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে উঠিতেছিল মাটি থেকে হাজার ফুট পর্যন্ত ধূলা ও বালির ঘূর্ণিঝড় যেন বহিতেছিল এবং তারপর শহরের দিকে দিকে আগুন জ্বলিতে আরম্ভ করিল। ২।৩ মিনিটের মধ্যেই সেই ভয়াবহ ধূম্রজাল ৪০ হাজার ফুট উর্দ্ধে উঠিয়া গেল।

হিরোশিমার উপর নিক্ষিপ্ত এই বোমা ২০ হাজার টন টি-এন-টি বা বিস্ফোরকের সমান ছিল এবং এই দানবিক বোমা প্যারাসুট যোগে পাঁচ মাইল পর্যন্ত নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করিবার আগেই ফাটিয়া গিয়াছিল।

বোমা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড ঝাপ্টায় বড় বড় গাছ ও টেলিফোনের থাম বা পোলগুলি দাঁতন কাঠির মত ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল। বিভিন্ন অট্টালিকার লৌহ বা ধাতু নির্মিত চাদর বা শীটগুলি ও রাস্তার মোটরগাড়ীগুলি যেন ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উড়িয়া গেল। ধূলায় ও ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং দাউ দাউ করিয়া সর্বত্র আগুন জ্বলিতে লাগিল। হিরোশিমা শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল, অন্ততঃ শহরের ৬০ ভাগ অদৃশ্য হইয়া গেল। পাঁচটি বড় বড় রাস্তুমে কারখানা নিশ্চিহ্ন হইল এবং হাজার হাজার লোক জানিতেই পারিল না তারা কিভাবে মারা পড়িল। অন্ততঃ ঘটনাস্থলেই ৭৮ হাজার লোক সোজাসুজি নিহত

(১০) স্নাইডার, পৃষ্ঠা ৫৭৭

হইল। ১০ হাজার লোক চিরকালের জন্য নিখোঁজ হইয়া গেল এবং প্রায় ৮০ হাজার আহত হইল। আরও হাজার হাজার কিংবা অসংখ্য লোক মারাত্মক গামা রশ্মির প্রতিক্রিয়ায় দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইল। শহরের চারদিকে ব্যাপক 'অগ্নিঝড়ের' জন্য বিভ্রান্ত, বিমূঢ় ও ত্রাসগ্রস্ত নরনারী চারদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কাহারও কাহারও দেহের চামড়া খসিয়া ঝুলিয়া পড়িতে লাগিল। কাহারও বা চোখ ঠেলিয়া বাহিরে আসিতে লাগিল। অসহ্য যন্ত্রণায় লোকে পাগলের মত চীৎকার করিতে লাগিল। একপ্রকার তীব্র গন্ধে বাতাস আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং বহু লোক টলিতে টলিতে বমি করিয়া ফেলিল। ৬০ হাজার অট্টালিকা ধ্বংস হইল। আর বাকী অজস্র অট্টালিকা জখম হইল।

সোজা কথায় হিরোশিমার সেই নারকীয় বীভৎস ও বিপর্যয়কর দৃশ্যের কোন বিশদ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু হিরোশিমার পরও জাপানী সামরিক হাইকমাণ্ড আত্মসমর্পণ না করায় তিন দিন পর বা ৯ই আগষ্ট নাগাসাকিতে দ্বিতীয় পরমাণু বোমা বর্ষিত হইল। হিরোশিমার চেয়েও নাগাসাকির এই বোমা আরও উন্নত ধরনের ছিল এবং এর ধ্বংসকর ক্ষমতা আরও বেশী ছিল। শহরের অধিকাংশ কলকারখানা ও সামরিক দ্রব্য সরবরাহের কেন্দ্রসহ ৩ মাইল লম্বা ও ২ মাইল চওড়া এলাকায় একমাত্র ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছু রহিল না। নাগাসাকিও হিরোশিমার মতই শ্মশানে পরিণত হইল।...

কিন্তু শিল্প-প্রধান নাগাসাকি শহরে সকাল বেলা ১১টার পর (৯ই আগষ্ট ১৯৪৫) যে বোমা বর্ষিত হইয়াছিল, তাতে ওই শহরের ২ লক্ষ ৬০ হাজার বাসিন্দার মধ্যে ১ লক্ষের কম লোক বিস্ফোরণের ঝাপ্টার মধ্যে পড়িয়াছিল। কারণ, শহরের অন্যান্য অংশ পাহাড়ের দ্বারা সুরক্ষিত' ছিল। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে আমেরিকান মেডিক্যাল মিশন তদন্তের পর ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, নাগাশাকিতে ৪০ হাজার মৃত ও ২৫ হাজার আহত হইয়াছিল।

হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এই বর্বর এ্যাটম্ বোমা নিক্ষেপের ফলে অন্ততঃ ২ লক্ষ মানুষ নিহত হইয়াছিল, যদিও আমেরিকানরা হিরোশিমায় মাত্র ৬৬ হাজার লোকের মৃত্যুর কথা স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু ২৫ বছর পর হিরোশিমা দিবস উপলক্ষে ১৯৭০ সালে জাপানীরা বলিয়াছিলেন যে, একমাত্র হিরোশিমাতেই দুই লক্ষ মানুষ মারা পড়িয়াছিল।

কিন্তু পারমাণবিক বোমা এমন অমানুষিক ব্যাপার যে, সেই বোমা বর্ষণের ত্রিশ বছর পরেও জাপানের বহু লোক তেজস্ক্রিয়াজনিত কঠিন ব্যাধিতে দুঃসহ যন্ত্রণা ভুগিতেছিল।

[এই দানবিক কাণ্ডের ফলে হতাহত ও মৃত (তেজস্ক্রিয়াজনিত রোগে) এবং ক্ষতিগ্রস্ত বাসগৃহ ও সম্পত্তি ইত্যাদি ধ্বংসের চূড়ান্ত হিসাব নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। কেননা, এই সম্পর্কে নানা সময় অনুসন্ধানের ফলে যে সমস্ত হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে সংখ্যাগত গরমিল আছে। যেমন, ১৯৭৭ সালের জানুয়ারী মাসের

প্রথম সপ্তাহে 'অমৃত' সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত জাপানী বিজ্ঞানীদের নূতনতম তদন্তের যে ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে, তাতে দেখা যায় যে, হিরোশিমায় বিস্ফোরিত প্রথম পরমাণু বোমাটি ছিল ১,২৫০০০ টন টি-এন-টির সমতুল্য। সেই সময় হিরোশিমার অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৬০ হাজার এবং বোমা বিস্ফোরণের জন্য প্রাণ হারাইয়াছিল ১ লক্ষ ৪১ হাজার লোক, আহতদের মধ্যে ১০ হাজার মারা গিয়াছিল।

আর নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত দ্বিতীয় পারমাণবিক বোমাটি ছিল ২২০০০ টন টি-এন-টি'র সমতুল্য। ৯ই আগষ্ট তারিখ এই বোমাটি মাটি থেকে ৫০০ মিটার উচ্চতায় ফাটানো হইয়াছিল। এর ফলে নাগাসাকিতে প্রাণ হারাইয়াছিল ৭৯ হাজার লোক। জাপানী বিজ্ঞানীদের নূতনতম রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, হিরোশিমা ও নাগাসাকি দুই নগরের মোট অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৭০ হাজার—১৯৪৫ সালের পরমাণু বোমায় মারা গিয়াছিল এই দুই শহরের মোট ২,২০০০০ মানুষ। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলিতে যারা অকালে মারা গিয়াছিল, তাদের সংখ্যা যোগ দিলে দুইটি পারমাণবিক বোমায় নিহতের সংখ্যা ২ লক্ষ ৫০ হাজারেরও বেশী দাঁড়াইবে।]

* * *

কিন্তু ৬ই আগষ্ট, ১৯৪৫, এ্যাটম্ বোমা বর্ষণে হিরোশিমায় যখন নরকের সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এবং বৃটেনের স্বনামধন্য উইনস্টোন চার্চিল যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

ট্রুম্যান তখন পটসডাম সম্মেলন থেকে 'আগষ্ট' যুদ্ধজাহাজ যোগে ওয়াশিংটনে ফিরিবার পথে। চতুর্থ দিনে তিনি জাহাজে বসিয়া মার্কিন সমরসচিবের কাছ থেকে পৃথিবী কম্পনকারী এ্যাটম্ বোমা বর্ষণের সংবাদ পাইলেন।

এই সংবাদে ট্রুম্যান অভিভূত হইলেন এবং জাহাজের অভ্যন্তরেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী বায়ারনেসকে (Byrnes) টেলিফোনযোগে খবর দিলেন। যে সমস্ত লস্কর তাঁর চারদিকে ছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে ট্রুম্যান বলিলেন:

'This is the greatest thing in history. It's time for us to get home'

'ইতিহাসের এটা সর্ববৃহৎ ব্যাপার। এখন আমাদের ঘরে ফেরার সময় এলো'।

তারপর জাহাজের রেডিও যোগে এই বোমাবর্ষণের আরও বিস্তৃত খবর পাওয়া গেল এবং ট্রুম্যান ভোজনকক্ষে সমবেত লস্কর ও অফিসারদের নিকট (তখন তাঁরা মধ্যাহ্ন ভোজন করিতেছিলেন) এবং পরে জাহাজের রিপোর্টারদের এক বৈঠকে সদ্য নিক্ষিপ্ত এ্যাটম্ বোমার ফলাফল ও গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিয়া এক বক্তৃতায় মন্তব্য করিলেন যে, ইতিহাসে বিজ্ঞানের সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টায় এত বড় কাজ আর কখনও হয় নাই। যদি জাপান এর পরেও আত্মসমর্পণ না করে, তবে জাপান ধ্বংস হইয়া যাইবে। (১১)

(১১) ট্রুম্যানের স্মৃতিকথা (ইং)—পৃষ্ঠা ৪৬৫ ৪৬৬

চার্চিল লিখিয়াছেন যে, পটসডাম থেকে প্রচারিত চরমপত্র জাপান অগ্রাহ্য করিতেই হিরোশিমা ও নাগাশাকির উপর পরমাণু বোমা নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। এই বোমা বর্ষণের আগে সুপার ফোর্টরেস শ্রেণীর মার্কিন বোমারুগুলি জাপানের শহরগুলির উপর নিদারুণ বোমাবর্ষণ চালাইতেছিল। কিন্তু প্রাণহানি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে মিত্রপক্ষ ১১টি জাপানী শহরকে সতর্ক করিয়া দেওয়ার জন্য প্রতিদিন বিমান থেকে ১৫ লক্ষ ইস্তাহার এবং চরমপত্রের ৩০ লক্ষ কপি বিতরণ করিয়াছিলেন।

চার্চিলের দয়া আছে, সন্দেহ নাই! যিনি এ্যাটম্ বোমা পরীক্ষার আগেই জাপানের বিরুদ্ধে উহা ব্যবহারের জন্য ট্রুম্যানের নিকট সম্মতি দিয়া রাখিয়াছিলেন এবং যে নৃশংসতার জন্য তাঁর বিবেকে বিন্দুমাত্র ব্যথা লাগে নাই, সেই ব্যক্তিই আবার জাপানীদের সতর্ক করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ ইস্তাহার বিলি করার জন্য যেন মানবিক করুণা বোধ করিতেছেন!

অথচ এ্যাটম বোমা বর্ষণের খবর পাওয়ার পর উইনষ্টোন চার্চিল এই মর্মে এক বিবৃতি দিলেন যে, 'ঈশ্বরের অপরিসীম অনুগ্রহ' যে, জর্মানদের পরিবর্তে বৃটিশ ও আমেরিকান বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক শক্তির গোপন রহস্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন!

আর স্তম্ভিত জাপানী সংবাদপত্রসমূহ এই আক্রমণকে 'দানবিক, বর্বর ও পাশবিক' বলিয়া তীব্র ধিক্কার দিলেন এবং আমেরিকাকে মনুষ্যজাতি ও ন্যায়বিচারের হত্যাকারী বলিয়া নিন্দা করিলেন। আর টোকিও রেডিও ঘোষণা করিল :

'The impact of the bomb is so terrific that practically all living things, human and animals, literally were seared to death by the tremendous heat and pressure engendered by the blast. All the dead and injured were burned beyond recognition....The effect of the bomb is widespread. Those outdoors burned to death, while those indoors were killed by the indescribable pressure and heat.' (১২)

অর্থাৎ সোজা কথায় হিরোশিমায় এই এ্যাটম্ বোমা বর্ষণের ফল এমন সাংঘাতিক হইয়াছিল যে, কার্যতঃ সমস্ত জীবন্ত বস্তু—পশু ও মানুষ সকলেই অভূতপূর্ব উত্তাপ ও চাপের জন্য মারা পড়িয়াছিল। নিহত এবং আহত সকলেই এমনভাবে পুড়িয়া গিয়াছিল যে, তাদেরকে আর চেনা যাইত না। এই বোমার ফল বহু দূর বিস্তৃত হইয়াছিল। যারা ঘরের বাইরে ছিল, তারা দগ্ধ হইয়া মারা গেল, আর যারা ঘরের ভিতরে ছিল, তারা অবর্ণনীয় চাপ ও উত্তাপের জন্য মারা পড়িল।...

হিরোশিমা ও নাগাসাকি উভয় শহরেই পারমাণবিক বোমার আঘাতে জনজীবন ও কলকারখানা স্তব্ধ হইয়া গেল। মৃতদেহের অপসারণ একটা কঠিন সমস্যার মত দেখা দিল। কেননা, সমস্ত কিছুর মধ্যেই যেন একটা বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া গিয়াছিল। একমাত্র কংক্রিট এবং লৌহ ও ইস্পাতের তৈরী বাড়ীগুলির কাঠামো

(১২) স্নাইডার, পৃষ্ঠা ৬০২-৬০৩

দাঁড়াইয়াছিল, আর সব ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। অনেক মৃতদেহ রাস্তায় পড়িয়াছিল এবং কোন কোন এলাকা যেন ভূতুড়ে ছায়ার আকার ধারণ করিয়াছিল। এ্যাটম্ বোমা রশ্মির প্রতিক্রিয়ায় এবং তেজস্ক্রিয়তার ফলে অগণ্য লোক নানা প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিল। রক্ত-পাইখানা, বমি, জ্বর, চুল উঠিয়া যাওয়া এবং দেহের অভ্যন্তরে রক্তক্ষরণের জন্য বহু লোক ১ থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতেছিল। আর একটা ভয়াবহ প্রতিক্রিয়াও উল্লেখযোগ্য। বিস্ফোরণের ফলে বহু নারীর গর্ভপাত হইয়াছিল এবং অকালে সন্তান প্রসূত হইয়াছিল। অনেক স্ত্রী-পুরুষের প্রজননক্ষমতাও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। (১৩)

* * *

কিন্তু ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে জাপানকে পরাজিত করার জন্য সত্যই কি পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিল? হিরোশিমার পর এই প্রশ্ন বিশেষভাবে বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। যাঁরা ট্রুম্যান ও চার্চিলের মত এ্যাটম্ বোমা বর্ষণের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁদের মতে এই বোমা নিক্ষেপের দ্বারা কেবল কয়েক লক্ষ আমেরিকান জীবনই রক্ষা পায় নি, জাপানীদের জীবনও রক্ষা পাইয়াছে। কারণ, যুদ্ধ অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি শেষ হইয়াছিল। কিন্তু সুবিখ্যাত মার্কিন গ্রন্থকার মিঃ ডি এফ ফ্লেমিং লিখিয়াছেন যে, পটসডাম সম্মেলন সম্পর্কে ৯ই আগষ্ট প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, তাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, জাপানী সামরিক ঘাঁটি হিসাবে হিরোশিমার উপর পৃথিবীর প্রথম এ্যাটম্ বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। জাপানকে সতর্ক ও সমঝাইয়া দেওয়ার জন্যই এই বোমা বর্ষিত হইয়াছিল। "এর পরেও যদি জাপান আত্মসমর্পণ না করে, তাহলে তার সামরিক কল-কারখানাগুলির উপর আরও বোমা বর্ষিত হইবে এবং দুর্ভাগ্যক্রমে তার ফলে হাজার হাজার অসামরিক লোক মারা যাইবে।"

প্রকৃতপক্ষে হিরোশিমা দক্ষিণ জাপানের সামরিক ঘাঁটি হইয়া থাকিলেও এবং পারমাণবিক আক্রমণের সময় সেখানে কয়েক হাজার সৈন্য থাকিয়া থাকিলেও সৈন্যদের উপর লক্ষ্য করিয়া কিন্তু বোমা বর্ষিত হয় নাই, নিহত হইয়াছিল অজস্র অ-সামরিক লোক এবং এর উদ্দেশ্য ছিল ভয় দেখাইয়া জাপানকে যুদ্ধে ক্ষান্ত দিতে বাধ্য করা। 'যুদ্ধের যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়া এবং হাজার হাজার মার্কিন যুবকের প্রাণ রক্ষা করাই' ট্রুম্যানের উদ্দেশ্য ছিল এই বোমা নিক্ষেপের পিছনে।

অবশ্য সেই সময়ের মার্কিন জনমতও এই বোমাবর্ষণ সমর্থন করিতেছিল। কারণ, জাপানীরা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক যেভাবে পার্ল হারবার আক্রমণ করিয়াছিল এবং মার্কিন যুদ্ধবন্দীদের উপর যে বর্বর ব্যবহার করিয়াছিল, তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যও মার্কিন জনমত উৎসুক ছিল। (১৪)

সোজা কথায় আমেরিকার জনগণের একটা বিপুল অংশ তাড়াতাড়ি যুদ্ধের অবসান দাবি করিতেছিল। বিশেষতঃ ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসানের পর মার্কিন সৈন্য ও

---

(১৩) স্যার জন হ্যামারটন সম্পাদিত 'দি সেকেণ্ড গ্রেট ওয়ার', ৯ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯১৩

(১৪) দি কোল্ড ওয়ার, পৃষ্ঠা, ২৯৬

অফিসারবৃন্দ আবার 'সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া' দূরবর্তী জাপানী রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়ার জন্য আদৌ উৎসাহ বোধ করিতেছিলেন না। সুতরাং পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করিয়া যদি তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ করা যায়, তাতে জনমতের কোন আপত্তি ছিল না।

আর একটা প্রশ্নও চিন্তা করার ছিল। এত অজস্র কোটি টাকা (মোট ২৫০ কোটি ডলার) ব্যয় করিয়া মানুষের ইতিহাসে যে ভয়ঙ্করতম অস্ত্র তৈয়ার করা হইল, রণক্ষেত্রে তার কার্যকারিতা কতটুকু, সেটাও যাচাই করিয়া দেখার ইচ্ছা ছিল। কেননা, এত ব্যয়বহুল অস্ত্র নির্মাণের সার্থকতা সম্পর্কে জনমতের নিকট কৈফিয়ৎ দেওয়ার দায়িত্বও ছিল সরকার পক্ষের। এখানে স্মরণীয় যে, বিজ্ঞানাচার্য আইনস্টাইনের কাছ থেকে সেই ঐতিহাসিক চিঠি (১৯৩৯ সালের ২রা আগষ্ট) পাওয়ার পর প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়াই এ্যাটম বোমা নির্মাণের ব্যয়বহুল বিরাট পরিকল্পনায় হাত দিয়াছিলেন। সুতরাং এত বছর পর এত মানুষের চেষ্টা, গবেষণা ও পরিশ্রমের ফলে যে বোমা প্রস্তুত হইল, শত্রুর বিরুদ্ধে বাস্তবক্ষেত্রে তা কতখানি কাজে লাগিতে পারে, সেই পরীক্ষারও প্রয়োজন ছিল। এ্যাটম বোমা বর্ষণের এটাও ছিল অন্যতম কারণ।

তথাপি হিরোশিমার পর আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ স্বীকার করিয়াছিলেন যে, জাপানের বিরুদ্ধে পরমাণু বোমাবর্ষণ অপরিহার্য ছিল না। বিমান-বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক জেনারেল হেনরি আর্নল্ড বলিয়াছেন—'জাপানীরা বিমানপথের উপর কর্তৃত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং তারা আর বেশীদিন টিকিয়া থাকিতে পারিত না।' অনুরূপভাবে নৌবিভাগের বড় কর্তা ফ্লিট এ্যাডমিরাল উইলিয়াম হালসি (Halsey) মন্তব্য করিয়াছেন—'এভাবে প্রথম পরমাণু বোমার পরীক্ষা অনাবশ্যক ছিল। এই বোমা নিক্ষেপ অত্যন্ত ভুল ছিল। যে অস্ত্রের কোন প্রয়োজন ছিল না, সেই অস্ত্র দুনিয়ার সামনে এভাবে জাহির করার কি দরকার ছিল?' কারণ, মার্কিন নৌ-সেনাপতির মতে জাপানী নৌবহর ইতিপূর্বেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং এই বোমা নির্মাণের জন্য তিনি বৈজ্ঞানিকদের উপর দোষারোপ করেন। আর মার্কিন বিমান বিভাগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'ষ্ট্রাটিজিক বম্বিং সার্ভে' এর রিপোর্টের উপসংহারে মন্তব্য করা হইয়াছিল যে, সমস্ত ঘটনার বিস্তৃত তদন্ত এবং যে সমস্ত জাপানী নেতা এই সমস্ত ব্যাপারে জড়িত ছিলেন, তাঁদের মতামত গ্রহণের পর রিপোর্ট রচয়িতাগণ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন যে, ১৯৪৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের আগেই জাপান এ্যাটম বোমা ছাড়াই আত্মসমর্পণে বাধ্য হইত। এমন কি, এজন্য রাশিয়ারও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের দরকার ছিল না এবং আমেরিকার পক্ষ থেকে খাস জাপানী দ্বীপ আক্রমণের পরিকল্পনারও দরকার ছিল না।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ বায়ারনেস্ (Byrnes) বলিয়াছেন যে, এ্যাটম বোমার জন্য যুদ্ধ শেষ হয় নাই। আসলে এই বোমা যখন নিক্ষিপ্ত হইতেছিল, জাপান সেই সময়ই পরাজিত হইয়াছিল এবং সন্ধি প্রার্থনা করিতেছিল। (১৫)

(১৫) দি কোল্ড ওয়ার, পৃষ্ঠা ২৯১

স্বয়ং চার্চিল যিনি এ্যাটম বোমার এত ভক্ত ছিলেন, তিনি পর্যন্ত তাঁর মহাযুদ্ধের স্মৃতিগ্রন্থে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, একমাত্র পারমাণবিক বোমার জন্যই জাপান পরাজয় স্বীকার করে নাই। আসলে জাপানের ভাগ্য আগেই নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। বৃটেনের মত জাপান ছিল 'দ্বীপবাসী শক্তি' (Island Power), সুতরাং নৌবহরের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু জাপানের সেই নৌশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। (১৬)

আমেরিকার অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সামরিক নেতা ও প্রেসিডেন্টের প্রধান উপদেষ্টা এ্যাডমিরাল লেহাই (Leahy) অত্যন্ত কঠোর ভাষায় পরমাণু বোমা বর্ষণের ঘটনাকে নিন্দা করিয়াছেন—"হিরোশিমা ও নাগাশাকির উপর এই বর্বর অস্ত্রের ব্যবহারের দ্বারা জাপানের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধের প্রকৃত কোন সহায়তা হয় নাই। কারণ, জাপানের বিরুদ্ধে সমুদ্রপথের অবরোধ সৃষ্টি এবং গতানুগতিক বোমাবর্ষণের প্রচণ্ডতার দ্বারাই জাপান পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল এবং আত্মসমর্পণে উদ্যোগী হইয়াছিল।'

শীর্ষস্থানীয় মার্কিন সামরিক নেতৃবৃন্দ এবং স্বয়ং চার্চিলের যখন এই অভিমত, তখন এ্যাটম্ বোমা আদৌ বর্ষিত হইল কেন? ক্যাপ্টেন লীডেল হার্ট এর ব্যাখ্যাস্বরূপ বলিয়াছেন যে, এই বোমাবর্ষণের পিছনে দুইটি কারণের সন্ধান পাওয়া যায়—প্রথমতঃ ১৮ই জুলাই পটসডামে (যখন এ্যাটম বোমার সাফল্যজনক পরীক্ষার রিপোর্ট পৌছিল) চার্চিল ট্রুম্যানকে বুঝাইয়াছিলেন যে, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের আর প্রয়োজন নাই। রুশ সাফল্যের উপর জাপানী যুদ্ধের অবসান আর নির্ভরশীল নয়। বিশেষতঃ পটসডাম সম্মেলনে ষ্ট্যালিন যেভাবে জাপানের দখলদারির অংশ চাহিতেছিলেন, তাতে আমেরিকা অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিলেন। সুতরাং এই বিব্রত অবস্থা ও রুশ সাহায্য এড়াইবার জন্য সোভিয়েত বাহিনী কর্তৃক মাঞ্চুরিয়াতে আক্রমণের আগেই এ্যাটম্ বোমা বর্ষণের দ্বারা জাপানকে ধরাশায়ী করার সঙ্কল্প হইয়াছিল।

আর দ্বিতীয় কারণ ছিল—এ্যাটম্ বোমা তৈয়ারির বিপুল অর্থব্যয়ের সার্থকতা কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ করা এবং সেই ইচ্ছা পারমাণবিক বিজ্ঞানীদেরও ছিল। অন্যথা জনমতের নিকট তাঁরা কি কৈফিয়ৎ দিতেন? এ জন্যই হিরোশিমা ও নাগাসাকির উপর এ্যাটম্ বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। (১৭)

মার্কিন ঐতিহাসিক ডি এফ ফ্লেমিং লিখিয়াছেন যে, হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের পিছনে চারি প্রকারের কারণ ছিল:

(ক) মার্কিন সৈন্যদের জীবন বাঁচাইবার স্বাভাবিক তাগিদ।

(খ) মহাযুদ্ধের স্থায়িত্বকাল হ্রাস।

(গ) রণক্ষেত্রে বোমার কার্যকারিতা প্রমাণ করা এবং

(ঘ) সোভিয়েত রাশিয়াকে দূরপ্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ না দেওয়া।

এমন কি, বৃটেনের ও সামরিক মহলের কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই প্রকার বর্বর অস্ত্র কিংবা গণহত্যাকারী অস্ত্র প্রয়োগের বিরোধী ছিলেন। যেমন—বৃটিশ

---

(১৬) চার্চিল—৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৯

(১৭) ক্যাপ্টেন লীডেল হার্ট, পৃষ্ঠা ৬৯৭

নৌবহরের এ্যাডমিরাল ভাইকাউন্ট ক্যানিংহাম ১৯৪৭ সালের ১৪ই মে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, জাপানের উপর পারমাণবিক বোমা বর্ষণের জন্য তিনি সর্বদাই দুঃখ বোধ করিয়াছেন। কারন, ওই বোমা ছাড়াই জাপান আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু যে পারমাণবিক শক্তি মানুষের কল্যাণের জন্য প্রয়োগ করা যাইত, তা' এভাবে অস্ত্রের মাধ্যমে ব্যবহার করায় সেই কল্যাণের দিকটা চাপা পড়িয়া গেল। (১৮)

জাপানের বিরুদ্ধে পারমাণবিক বোমা বর্ষণের সংবাদে সোভিয়েত রাশিয়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল—যদিও এই সংবাদ প্রথমে চাপা দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছিল। সোভিয়েত থেকে প্রকাশিত (১৯৭০) একটি নূতনতম পুস্তকে বলা হইয়াছে যে, হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের ফলে মোট ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার অসামরিক ব্যক্তি নিহত বা পঙ্গু হইয়াছিল এবং "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী মহল এমন এক অপরাধের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, পৃথিবীর ইতিহাসে যার তুলনা নাই। এটা কেবল নিরর্থক নিষ্ঠুরতাই ছিল না, ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে মার্কিন গবর্নমেণ্টের রণনৈতিক সুবিধালাভের চেষ্টা। জাপানী লেখকেরা যথার্থই মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, এ্যাটমিক বোমা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ অস্ত্র ছিল না, বরং ওটা ছিল পরবর্তী কালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রথম অস্ত্র।" (১৯)

---

(১৮) দি কোল্ড ওয়ার, পৃষ্ঠা ৩০৬

(১৯) Great Patriotic War of the Soviet Union, p 415-16.

দশম পর্ব

ষষ্ঠ অধ্যায়

জাপানের বিরুদ্ধে রুশ আক্রমণ ঃ রণনীতি ও কূটনীতির প্যাঁচ

১৯৩১ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর জাপান চীনের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ আক্রমণ এবং তারপর দখল করিয়া নিল। সেই থেকে জাপান চীনের বিরুদ্ধে যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িল, কার্যতঃ সেই যুদ্ধই কিন্তু জাপানের কাল হইয়া দাঁড়াইল। কারণ, প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের উৎপত্তি সেই থেকে এবং ১৯৪৫ সালের ৮ই আগষ্ট রাশিয়া কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মাত্র ১৪ দিনের মধ্যে সেই ১৪ বছরের দখলীকৃত মাঞ্চুরিয়া জাপানের হাতছাড়া হইয়া গেল—জাপান চূড়ান্ত রূপে পর্যুদস্ত ও পরাজিত হইল। অবশ্য তার আগেই জাপান আমেরিকার প্রচণ্ড প্রত্যাঘাতে এবং হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমার বজ্রাঘাতে প্রায় ধরাশায়ী অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু জঙ্গীবাদ ও ফ্যাসিজমের পাল্লায় পড়িয়া জাপান যে 'পাপ' করিয়াছিল, জার্মানীর মত অনুরূপভাবেই তাকে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। সোভিয়েত রাশিয়া কিংবা কমিউনিষ্ট মতবাদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া জাপানী সামরিক নেতারা চীন ও সোভিয়েত সীমান্তে দীর্ঘকাল যাবত হামলা করিতেছিলেন এবং পার্ল হারবারের (ডিসেম্বর ১৯৪১) পর যে বিশাল সাম্রাজ্য তাঁরা গ্রাস করিয়াছিলেন, সেই সাম্রাজ্য হজম করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ, সেই শক্তি ও সম্পদ তাঁদের ছিল না। অথচ নাৎসী জার্মানী ও ফ্যাসিষ্ট ইতালীর মিত্ররূপে জাপান যেমন ইঙ্গ মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল, তেমনি সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে নিরপেক্ষতার চুক্তি স্বাক্ষর (এপ্রিল ১৯৪১) সত্ত্বেও রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানীকে সহায়তা করিয়া আসিতেছিল। যদিও হিটলার কর্তৃক রাশিয়াকে আক্রমণের পর জাপান সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে হাতে-কলমে কোন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় নাই, তবু সেটা তার কোন 'সুবিবেচনা' বা তথাকথিত নিরপেক্ষতার কারণ সঞ্জাত ছিল না। আসলে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে মস্কোর যুদ্ধ এবং ১৯৪২ সালের ষ্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে জাপান হিটলারের হাতে রাশিয়ার পরাজয়ের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু সেটা যখন ঘটিল না, বরং হিটলারী বাহিনীর পরাজয় ঘটিতে লাগিল, তখন সোভিয়েত রাশিয়ার মত বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে জাপান ঝাঁপাইয়া পড়িতে সাহস পাইল না—যদিও এই প্রসঙ্গ নিয়া জাপানী নেতাদের মধ্যে অনেক বার শলাপরামর্শ হইয়াছিল।

তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, রুশ-জার্মান যুদ্ধে জাপান হিটলারকে অন্ততঃ পরোক্ষভাবে যে সাহায্য দিয়া আসিয়াছে, তার গুরুত্ব কম নয়। কারণ, মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের ১০ লক্ষ সৈন্য নিয়া গঠিত শক্তিশালী কোয়াণ্টাং বাহিনীর (মাঞ্চুরিয়ার কোয়াণ্টাং উপদ্বীপের নামানুসারে) জন্য রাশিয়াকে সর্বদাই সশঙ্ক থাকিতে এবং ৪০ ডিভিসন সৈন্য সতর্ক পাহারায় রাখিতে হইয়াছিল। যদিও মস্কো

এবং ষ্ট্যালিনগ্রাদের নিদারুণ সঙ্কটময় যুদ্ধে দূরপ্রাচ্যের এই সমস্ত বাহিনী থেকে রাশিয়াকে কয়েক ডিভিসন দুর্দান্ত সাইবেরিয়ান সৈন্য আমদানি করিতে হইয়াছিল, তথাপি সেটা ছিল জরুরী অবস্থায় বিপদের ঝুঁকি গ্রহণের মত। কিন্তু জাপান সম্পর্কে সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বদাই একটা অস্বস্তিকর কিংবা ভয়ের মনোভাব ছিল। কেননা, সোভিয়েত নেতারা জাপানকে বিশ্বাস করিতেন না এবং জাপানের জঙ্গীবাদী নেতারাও সোভিয়েত কমিউনিষ্ট নেতাদের বিদ্বেষ ও সন্দেহের চোখেই দেখিতেন। সুতরাং দুইপক্ষ থেকেই একটা সংঘাতের মনোভাব ছিল এবং সমগ্র পরিস্থিতির উপর বাধ্য হইয়াই সোভিয়েত নেতাদের অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে আর্মি জেনারেল এস এস স্তমেঙ্কো (Shtemenko) লিখিয়াছেন যে, ১৯৪২ সালের সঙ্কটের দিনগুলিতে দূরপ্রাচ্যের জেনারেল ষ্টাফদের জন্য ডেপুটি চীফের পদ সৃষ্টি করিতে হইল এবং সমর বিভাগের রণক্রিয়া দপ্তরে একটি ফার্ ইষ্টার্ন সেক্টর খুলিতে হইল এবং মেজর-জেনারেল এফ আই শেভচেঙ্কোর মত একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ সেনাপতিকে তার ভার দিতে হইল।

কিন্তু মহাযুদ্ধের আগেই ১৯৩৮ সালে দূরপ্রাচ্যের এবং ১৯৪১ সালে ট্রান্সবৈকাল মিলিটারি ডিষ্ট্রিক্ট দু'টির পুনর্গঠন করিতে হইয়াছিল। ১৯৪৩ সালের দ্বিতীয় অর্ধের পর যখন সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গন সোভিয়েতের অনুকূলে যাইতে লাগিল, তখন মিত্রপক্ষের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, জার্মানীর পতনের পর জাপানেরও পতন অনিবার্য হইয়া উঠিবে। সুতরাং পশ্চিমী মিত্রেরা রাশিয়াকে জাপানের বিরুদ্ধে দলে টানিতে চাহিলেন। কিন্তু তেহরান সম্মেলনে (নভেম্বর ডিসেম্বর, ১৯৪৩) তিন বিশ্বনেতার বৈঠকে যখন ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল, একমাত্র তখনই ষ্ট্যালিন নীতিগতভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে জঙ্গীবাদী জাপানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সম্মত হইলেন। অবশ্য এই অস্ত্র ধারণ করা হইবে হিটলারী জার্মানীর পরাজয়ের পর। (১)

*   *   *

১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালে যখন সত্য সত্যই ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হইল, তখন জাপান নিয়া রাশিয়ার উপর আর একবার চাপ দেওয়া হইল। কিন্তু ষ্ট্যালিন জবাব দিলেন যে, জার্মানীর পরাজয়ের আগে জাপানের বিরুদ্ধে অভিযান সম্ভব নয়। কিন্তু ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েত সুপ্রীম কমাণ্ডের পক্ষ থেকে দূরপ্রাচ্যের সৈন্যদের সমাবেশ এবং সরবরাহ ইত্যাদি সম্পর্কে পরিকল্পনা তৈরী করার জন্য খোদ সদর দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হইল। কারণ, ষ্ট্যালিন ইঙ্গিত দিলেন যে, শীঘ্রই এটার দরকার হইতে পারে।

এই সময় অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি একদিন চার্চিল ও ইডেন মস্কোতে আসিয়া হাজির হইলেন।

---

(১) The Soviet General Staff at War—1941-1945 by General of the Army Shtemenko, Moscow, 1970, p. 323

জেনারেল স্তেমেঙ্কো লিখিয়াছেন যে, সদর দপ্তরে তিনি ও জেনারেল আন্তোনোভ (জেনারেল ষ্টাফের বড়কর্তা) যথারীতি তাঁদের রিপোর্ট পেশ করিতে গিয়াছিলেন এবং সেই সময়েই তিনি প্রথম বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে দেখিয়াছিলেন। অবশ্য সদর দপ্তরে তাঁদের পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদেরকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল যে, পাশের ঘরে চার্চিল ষ্ট্যালিনের সঙ্গে কথা বলিতেছেন এবং সুপ্রীম কমাণ্ডার নির্দেশ দিয়া রাখিয়াছেন যে, তাঁরা যেন আসিবা মাত্র তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।

এই নির্দেশ অনুসারে স্তেমেঙ্কো এবং আন্তোনোভ পাশের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, চার্চিল ও ষ্ট্যালিন পরস্পরের মুখোমুখি আরাম কেদারায় বসিয়া আছেন এবং 'ভয়ানকভাবে ধোঁয়া ছাড়িতেছেন।' অর্থাৎ চার্চিল একটা মোটা চুরুট এবং ষ্ট্যালিন যথারীতি তাঁর পাইপ টানিতেছিলেন। আর দোভাষী প্যাভলোভ তাঁর ডেস্কে বসিয়া আছেন।

স্তেমেঙ্কো এবং আন্তোনোভকে ষ্ট্যালিন চার্চিলের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। চার্চিল তখন রণাঙ্গনের অবস্থা জানিতে চাহিলেন এবং জেনারেল আন্তোনোভ সংক্ষেপে উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত রণক্ষেত্রের অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। চার্চিল তখন টেবিলের উপর পাতা মানচিত্রের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া খুব মন দিয়া অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলেন এবং একটি মাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—'আইজেনহাওয়ারের বিরুদ্ধে জার্মানরা কত সৈন্য নিয়োগ করিয়াছে?'

আন্তোনোভ সেই সংখ্যা বলিলেন। এরপর তাঁদের দুইজনকে সেই কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেওয়া হইল। কিন্তু তাঁরা দুইজনেই পাশের কক্ষে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন চার্চিলের বিদায় নেওয়ার আশায়। কেননা, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দলিলে সুপ্রীম কমাণ্ডারের স্বাক্ষরের প্রয়োজন ছিল।

মিনিট কুড়ি পর চার্চিল চলিয়া গেলেন। ষ্ট্যালিন তখন একজন অফিসারকে ডাকিয়া বলিলেন:

'চার্চিল যে সমস্ত হুইস্কি ও সিগার আমাকে উপহার দিয়ে গিয়েছেন, সেগুলি সামরিক লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দাও।'

তারপর আন্তোনোভ ও স্তেমেঙ্কোর দিকে তাকাইয়া ষ্ট্যালিন মন্তব্য করিলেন—"আপনারা খেয়ে দেখবেন কিন্তু, আমার বিশ্বাস জিনিসগুলি খুব ভালো।" (২)

বলা বাহুল্য যে, ষ্ট্যালিনের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে চার্চিল তাঁর সঙ্গে জাপানী যুদ্ধের বিষয় নিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন।

* * *

জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার আক্রমণ যে অনিবার্য তার প্রথম আভাস পাওয়া গেল ৫ এপ্রিল ১৯৪৫, যখন সোভিয়েত গবর্নমেণ্ট রুশ-জার্মান নিরপেক্ষতার চুক্তি বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রী মলোটোভ জাপানী গবর্নমেণ্টকে জানাইয়া দিলেন যে, ১৯৪১ সালে এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর পরিস্থিতির 'আমূল পরিবর্তন' ঘটিয়া গিয়াছে, জার্মানী সোভিয়েত রাশিয়াকে আক্রমণ করিয়াছে এবং জাপান জার্মানীকে সহায়তা করিয়াছে। অধিকন্তু জাপান যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে সেই বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র। 'সুতরাং

(২) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা৩২৫

স্বাক্ষরিত চুক্তির তৃতীয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী চুক্তির মেয়াদ ফুরাইবার এক বছর আগে চুক্তি বাতিল করার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার যে নিয়ম আছে, সেই অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৩ এপ্রিল, ১৯৪৫ তারিখ থেকে এই বিজ্ঞপ্তি দিতেছে।'

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের এই কার্য আইনের দিক থেকে সঠিক ছিল না। কারণ, আইন অনুযায়ী ১৩ এপ্রিল, ১৯৪৬ পর্যন্ত এই চুক্তির মেয়াদ ছিল। সুতরাং আগষ্ট মাসে (১৯৪৫) রাশিয়া কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণ কার্যত চুক্তিভঙ্গের তুল্য ছিল। (৩)

কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ারও অনেক নালিশ জমিয়া উঠিয়াছিল। হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর মস্কোস্থিত জাপানী রাষ্ট্রদূত জার্মানীকে অনেক মূল্যবান সংবাদ সরবরাহ করিয়াছেন। দূরপ্রাচ্যে অনেক রুশ সৈন্য তো সতর্কতাস্বরূপ রাখিতেই হইয়াছিল, অধিকন্তু "১৯৪১ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে ১৯৪৪ সালের শেষ পর্যন্ত জাপানী সশস্ত্র বাহিনী বে-আইনী ভাবে ১৭৮টি সোভিয়েত পণ্যবাহী জাহাজ আটক করিয়াছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের দূরপ্রাচ্যের সীমায় জাপানীরা ক্রমাগত উস্কানি দিয়াছে এবং ৩৯ বার সোভিয়েত ভূমির উপর গোলাবর্ষণ করিয়াছে।" (৪)

ষ্ট্যালিনগ্রাদ পর্যন্ত রাশিয়ার প্রতি জাপানের আসল মনোভাব কি ছিল তা জানা রাশিয়ার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কেননা, ১৯৪২ সাল পর্যন্ত টোকিওতে সোভিয়েত রাশিয়ার একজন অত্যন্ত দক্ষ গোয়েন্দা ছিল—নাম রিচার্ড সোর্জ। ইনি নিজেই ছিলেন একজন জার্মান সাংবাদিক এবং টোকিওস্থিত জার্মান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তাঁর ছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব (প্রথম খণ্ডে এঁর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে)। এই গোয়েন্দার মৃত্যুদণ্ডের পর ১৯৪৩, ১৯৪৪ সালে রুশ-জাপান সম্পর্ক মোটামুটি 'ঠাণ্ডা' ছিল। কিন্তু জার্মানীর পরাজয়ের পর ইয়াল্টা চুক্তি অনুসারে রাশিয়া আগষ্ট মাসে (১৯৪৫) মাঞ্চুরিয়াতে জাপানকে আক্রমণে উদ্যত হইল।...

এদিকে জাপান কিন্তু রাশিয়ার মারফৎ মিত্রশক্তির সঙ্গে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে আলোচনা আরম্ভ করার জন্য বিষম চেষ্টা করিতে লাগিল—যে কথা আগেই (পটসডাম সম্মেলন উপলক্ষে) উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, জাপানের অবস্থা কাহিল হইয়া উঠিতেছিল। আমেরিকান ঐতিহাসিক হার্বার্ট ফীজ লিখিয়াছেন যে জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী টোগো মস্কোস্থিত জাপানী রাষ্ট্রদূত স্যাটোকে বারবার তাগিদ দিতেছিলেন মলোটোভের সঙ্গে দেখা করিয়া আলোচনা আরম্ভ করার জন্য। কারণ, 'যুদ্ধের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন এবং আর কয়েক দিনের মধ্যেই এই যুদ্ধ শেষ করিয়া ফেলিতে হইবে, হাতে আর সময় নেই।'

"Since the loss of one day relative to this present matter may result in a thousand years of regret, it is requested that you immediately have a ta k with Mololov."

---

(৩) আলেকজাণ্ডারওয়ার্থ, পৃষ্ঠা ৯১৮

(৪) Great Patriotic War of the Soviet Union—Moscow, 1970, p. 411.

অর্থাৎ 'বর্তমান বিষয়টি এমন জরুরী যে, এই সম্পর্কে মাত্র একটি দিন নষ্ট হইলেও হাজার বছর ধরিয়া দুঃখ করিতে হইতে পারে। সুতরাং অবিলম্বে মলোটোভের সঙ্গে কথা বলার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা যাইতেছে।'

মিঃ ফিজ এই ঘটনার উপর মন্তব্য করিতেছেন : 'Poor Sato! Stalin and Molotov were just starting back from Potsdam, and they traveled by train and did not reach Moscow until the plane carrying the bomb had left Titian.' (৫)

অর্থাৎ মন্দভাগ্য স্যাটো! টগোর বার্তা নিয়া তাঁর আর আলোচনার সুযোগ হইল না। কারণ, পটসডাম থেকে ষ্ট্যালিন ও মলোটোভ যখন ট্রেনে করিয়া মস্কোর দিকে রওনা হইলেন, তখন মস্কোতে তাঁদের পৌঁছিবার আগেই মার্কিন প্লেন টিটিয়ান দ্বীপ (গুয়ামের অদূরবর্তী) থেকে এ্যাটম বোমা হিরোশিমার দিকে রওনা হইয়া গেল!...

৬ই আগষ্ট, ১৯৪৫, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ঘোষণা করিলেন যে, হিরোশিমার উপর এ্যাটম বোমা নিক্ষেপ করা হইয়াছে।

এই ঘোষণার দুই দিন পর ৭-৮ই আগষ্ট অত্যন্ত তাড়াহুড়া করিয়া সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে মলোটোভ জাপানী রাষ্ট্রদূত স্যাটোকে ডাকিয়া আনিয়া সোভিয়েত সরকার কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কথা জানাইয়া দিলেন।

৯ই আগষ্ট থেকে সোভিয়েত রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বলিয়া ঘোষিত হইল এবং ৮ই আগষ্ট রাত্রে মলোটোভ এক প্রেস কনফারেন্সে অত্যন্ত গম্ভীর ও শুষ্ক মুখে সে কথা জানাইয়া দিলেন। কিন্তু হিরোশিমায় এ্যাটম্ বোমা বর্ষণের কথা একবার উল্লেখও করিলেন না এবং রুশ সংবাদপত্রেও সেই বোমার কথা প্রাধান্য পাইল না। কিন্তু যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়া এবং অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে প্রচার করা হইতে লাগিল মাঞ্চুরিয়ায় সোভিয়েত বাহিনীর আক্রমণের সংবাদ।

জেনারেল ইয়ামাদার অধীন মাঞ্চুরিয়ায় কোয়াণ্টাং আর্মি ১০ লক্ষ সৈন্য নিয়া গঠিত ছিল এবং এরা জাপানের উৎকৃষ্টতম স্থলসৈন্যরূপে পরিচিত ছিল। মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩১ ডিভিসন এবং এদের অস্ত্রসজ্জা ছিল ১,১৫৫টি ট্যাঙ্ক, ৫৩৬০ কামান এবং ১৮০০ বিমান। মাঞ্চুকোও এবং অন্তর্মঙ্গোলিয়ার সৈন্যের সংখ্যা ৩ লক্ষ হইলেও এদের অস্ত্রসজ্জা অত্যন্ত খারাপ ছিল। রুশ জেনারেল স্তেমেঙ্কোর মতে এদের কোন রণদক্ষতাও ছিল না।

অপর পক্ষে দূরপ্রাচ্যে আগে থেকেই যে সোভিয়েত বাহিনী ছিল, তাদের সঙ্গে মে-জুলাই মাসে, ১৯৪৫, আরও নূতন নূতন সৈন্যদল যুক্ত হইল এবং পরিকল্পনা করা হইল পশ্চিমে মঙ্গোলিয়া ও পূর্বদিকে ব্লাডিভোস্টোকের সমুদ্র উপকূলের এলাকা থেকে একযোগে সাঁড়াশির চাপের আকারে প্রচণ্ড দুইটি আঘাত হানা হইবে মাঞ্চুরিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত কোয়াণ্টাং বাহিনীর বিরুদ্ধে।

বলা বাহুল্য যে, সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রসজ্জায় সোভিয়েত বাহিনী জাপানের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল এবং যে তিনটি প্রধান রণক্ষেত্র বা ফ্রন্টের সৃষ্টি হইল, তাতে

(৫) Japan Subdued, p 104

২টি ট্যাঙ্ক ডিভিসনসহ মোট ৮০ ডিভিসন সোভিয়েত সৈন্যের সমাবেশ ঘটিল। অর্থাৎ সৈন্যসংখ্যা দাঁড়াইল ১৫ লক্ষেরও বেশী, আর ফিল্ডগান্ ও মর্টার শ্রেণীর কামান ২৬ হাজারেরও বেশী, ট্যাঙ্কের সংখ্যা ৫ হাজার ৫ শতের বেশী এবং ৩,৮০০ রণবিমান। ফলে, সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী মাঞ্চুরিয়ায় জাপ বাহিনীর তুলনায় সৈন্য অস্ত্র সব দিক দিয়াই অনেক বেশী শক্তিশালী ও শ্রেষ্ঠ ছিল। (৬)

মার্শাল ম্যালিনোভস্কি, মার্শাল মেরেৎসকোভ, মার্শাল ভ্যাসিলাইভস্কি (প্রধান সেনাপতি) এবং জেনারেল পুরকায়েভ—এই কয়জন রণদক্ষ সোভিয়েত সেনাপতি মাঞ্চুরিয়াতে জাপবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার দায়িত্ব পাইলেন।

তিনটি প্রধান আক্রমণ একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হইল গোড়াতে সবই মাঞ্চুরিয়ার হারবিন্ অভিমুখে। এই তিনটি রণক্ষেত্র ছিল:

(ক) মার্শাল মেরেৎসকোভের অধীন প্রথম ফার্ ইষ্টার্ন আর্মি—ভ্লাডিভোষ্টক বন্দরের উত্তর অঞ্চল থেকে।

(খ) দ্বিতীয় ফার্ ইষ্টার্ন আর্মি জেনারেল পুরকায়েভের অধীন আমুর নদী পার হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম স্থঙ্গ্রি উপত্যকায়।

(গ) ট্রান্স-বৈকাল আর্মি ম্যালিনোভস্কির অধীন—মাঞ্চুলি থেকে পূর্বদিকে চীনা ইষ্টার্ণ রেলপথ বরাবর।

এই সমস্ত প্রধান আক্রমণ ছাড়া অন্যান্য উপ-রণক্ষেত্রও ছিল। আর এই সমস্ত রুশ সেনাপতির ছিল সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে যুদ্ধের প্রচণ্ড অভিজ্ঞতা ও অপূর্ব দক্ষতা। কিন্তু কোয়াণ্টাং আর্মিও শক্তিশালী ছিল এবং কয়েক বছর ধরিয়া তারা প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা পাকা করিয়াই গড়িয়া তুলিয়াছিল। এছাড়া প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতাও জাপানী বাহিনীর সহায়ক ছিল।

কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও সোভিয়েত বাহিনীর অভিযানের মুখে কোয়াণ্টাং বাহিনী বেশীদিন টিকিয়া থাকিতে পারিল না। ইংরাজ সামরিক সম্পাদক মেজর-জেনারেল স্যার চার্লস গাইন (Charles Gwyun) মন্তব্য করিয়াছেন যে, জাপানী সৈন্যদিগকে পরাজিত করা একেবারে জলভাতের মত সহজ ছিল না এবং জাপানীদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা উত্তম ছিল। তথাপি—

'Nevertheless the conduct of the campaign afforded another striking demonastration of Russian military efficiency. The transfer of troops from west to east and the completion of preparations for an offensive on a great scale in the time available after the collapse of Germany were in themselves remarkable feats. The strategic plan of campaign was admirably suited to the circumstances and its tactical execution showed how thoroughly the lessons of the German war had been absorbed'. (৭)

---

(৬) গ্রেট প্যাট্রিওটিক্ ওয়ার অব্ দি সোভিয়েত ইউনিয়ন, মস্কো, পৃষ্ঠা ৪১৮

(৭) The Second Great War—Edited by Sir John Hammerton, Maj-General Sir Charles Gwyun, Vol 9, p 3780, 3785.

অর্থাৎ এই সমস্ত বিঘ্ন সত্ত্বেও এই অভিযান আর একবার রুশ সামরিক ক্ষমতার চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিল। পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে এত সৈন্যের স্থানান্তরিতকরণ এবং জার্মানীর পতনের মাত্র এত কম সময়ের মধ্যে এমন প্রকাণ্ড আকারে আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পূর্ণকরণ, একমাত্র এই ঘটনাগুলিই খুব চমকপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হইবে। অবস্থা অনুযায়ী এই অভিযানের রণনৈতিক পরিকল্পনা খুব চমৎকাররূপে উপযোগী ছিল এবং কার্যক্ষেত্রে এর রণকৌশলগত প্রয়োগ প্রমাণ করিতেছে যে, সোভিয়েত বাহিনী কিরূপ পরিপূর্ণতার সঙ্গে জার্মান যুদ্ধের শিক্ষা করায়ত্ত করিয়াছেন।'

মাঞ্চুরিয়ায় রুশ আক্রমণের দক্ষতা সম্পর্কে বৃটিশ সমর-ঐতিহাসিকের এই মন্তব্য নিশ্চয়ই স্মরণযোগ্য।

সুতরাং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই জাপানের কোয়াণ্টাং বাহিনী চূর্ণ হইয়া গেল। রুশ সৈন্যেরা উত্তর কোরিয়াতেও ঢুকিয়া পড়িল। দক্ষিণ শাখালিন ও কিউরাইল দ্বীপ দখলের জন্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় রুশ নৌবহর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল এবং সরকারীভাবে আত্মসমর্পণের কথা ঘোষিত হওয়ার পরেও জাপানী বাহিনীর মধ্যে এমন কতকগুলি উগ্র দেশপ্রেমিক ইউনিট ছিল যারা অনেকদিন পর্যন্ত রুশ-সৈন্যদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল।

মাঞ্চুরিয়াতে এবং বিশেষভাবে পোর্ট ডাইরেন ও পোর্ট আর্থার—এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর দখলের জন্য সোভিয়েত কমাণ্ড বিমানবাহিত সৈন্যদল নামাইয়া দিয়াছিল। কারণ, তাঁদের আশঙ্কা ছিল যে, মার্কিন সৈন্যেরা রুশদের আগেই সেখানে অবতরণ এবং বন্দর দুইটি দখল করিয়া নিতে পারে। অবশ্য ইতিমধ্যে মিত্রপক্ষের নিকট জাপানের আত্মসমর্পণের পালাও শুরু হইয়াছিল এবং যুদ্ধে ক্ষান্ত দেওয়ার জন্য জাপ সম্রাটের আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে ৫ লক্ষ ৭৪ হাজার জাপানী সৈন্য বন্দী হইল (২০ হাজার আহত সহ)। ধৃত বন্দীদের মধ্যে ছিলেন ১৪৮ জন সেনাপতি। ৮০ হাজার জাপানী নিহত হইয়াছিল। সেই তুলনায় রাশিয়ার ক্ষতি হইয়াছিল নিতান্তই সামান্য—মাত্র ৮ হাজার নিহত ও ২১ হাজার আহত হইয়াছিল।

জাপানের সঙ্গে এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে ১৪ই আগষ্ট চিয়াং কাই-সেকের চীনের সঙ্গে ৩০ বছরের জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, এই চুক্তি স্বাক্ষরে চীনের পক্ষ থেকে (মার্কিন প্ররোচনায়) স্বেচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করা হইয়াছিল। আর ২২শে আগষ্ট ষ্ট্যালিন কোয়াণ্টাং আর্মির আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করিলেন।

* * *

কিন্তু মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী বাহিনীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার 'শেষ মুহূর্তে'র এই আক্রমণ পশ্চিমী সামরিক ইতিহাসে ও মিত্রপক্ষীয় সোভিয়েত-বিরোধী মহলে গভীর বিতর্ক, বিদ্রূপ ও সমালোচনার উদ্রেক করিয়াছে। কারণ, এই যুদ্ধের পটভূমিকায় উভয়পক্ষের অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার কূটনৈতিক চাল ও চক্রান্ত ছিল। ১৬ই জুলাই পারমাণবিক বোমার সাফল্যজনক পরীক্ষার পর প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও তাঁর পরামর্শদাতারা এবং বৃটেনে চার্চিলের সমর্থকগণ

পটসডাম সম্মেলন থেকেই সোভিয়েত বিরোধিতা শুরু করিয়াছিলেন। পোল্যাণ্ড, পূর্ব ইউরোপ ও বলকানে তাঁরা সোভিয়েত নীতিকে সম্প্রসারণবাদরূপে চিহ্নিত করিয়া ক্ষোভ ও উষ্মা প্রকাশ করিতেছিলেন। সুতরাং জাপানে, সুদূর প্রাচ্যে বা চীনে কিংবা মাঞ্চুরিয়ায় যাতে সোভিয়েত রাশিয়া আর কোন সম্প্রসারণ ঘটাতে না পারে, সেজন্য তাঁরা সতর্ক হইলেন এবং রাশিয়াকে আর 'আস্কারা' না দিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেন। এজন্যই দেখা যায় যে, ২৬শে জুলাই পটসডাম সম্মেলন থেকে যখন বৃটিশ-মার্কিন-চীনা চরমপত্রে জাপানকে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের জন্য আহ্বান জানানো হইল, তখন রুশপক্ষ অনুরোধ জানাইলেন ওই চরমপত্রের প্রকাশ আরও দুই দিনের জন্য স্থগিত রাখিতে। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ জবাব দিলেন যে, সেই পত্র ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে!

আসলে পারমাণবিক শক্তিতে বলীয়ান হওয়ার ফলেই ট্রুম্যান ষ্ট্যালিনকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই জাপানের বিরুদ্ধে চরমপত্র ছাড়িয়াছিলেন। অনুরূপভাবে ২৯শে জুলাই মলোটোভ যখন ট্রুম্যানকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন যে, সোভিয়েত রাশিয়াকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের জন্য 'নিয়মমাফিক অনুরোধ' জানানো হোক, তখন ট্রুম্যান নানা ছুতায় সেটা এড়াইয়া গেলেন। এই সম্পর্কে মস্কোস্থিত মার্কিন মিলিটারি মিশনের বড়কর্তা জেনারেল ডীন্ (Deane) মন্তব্য করিয়াছেন—

"জাপানী যুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার যোগদান আর অত্যাবশ্যক ছিল না। সুতরাং রাশিয়ার প্রতি কর্কশ ও উদাসীন হওয়ার মত অবস্থায় আমরা পৌঁছিয়াছিলাম।" (৭)

এই সময় মার্কিন রাষ্ট্রনেতা ও সামরিক নেতারা রাশিয়া কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সম্ভাবনার কথা নিয়াই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন না, পাছে জাপানের আত্মসমর্পণের আগেই লালফৌজ মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিয়া বসে, এই দুর্ভাবনায়ও ব্যাকুল ছিলেন। ২৮ জুলাই নৌ-সচিব ফরেষ্টাল (Forrestal) পররাষ্ট্র-সচিব বার্নসের (Byrnes) সঙ্গে এই সমস্যা নিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন এবং বার্নস বলিয়াছিলেন যে, মাঞ্চুরিয়াতে, বিশেষভাবে ডাইরেন ও পোর্ট আর্থার বন্দরে রুশদের ঢুকিয়া পড়ার আগেই জাপানের যুদ্ধটা মিটাইয়া ফেলিতে হইবে। কারণ,"একবার রাশিয়ানরা সেখানে ঢুকিলে আর তাদেরকে বাহির করিয়া দেওয়া যাইবে না।" বার্নসের পরবর্তী কালের বক্তব্য থেকে আরও জানা যায় যে, ট্রুম্যান এই আশঙ্কাতেই ষ্ট্যালিনকে এ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের কথা জানান নাই। কারণ, সে কথা জানিলে ষ্ট্যালিন হয়তো আগেই মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিয়া বসিতেন। (৮)

এমন কি চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী টি ভি সুং (পরে প্রধানমন্ত্রী) এবং ষ্ট্যালিনের মধ্যে যাতে পটসডাম সম্মেলনের আগে ও পরে দ্রুত কোন সাক্ষাৎ এবং বহিঃ-মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়ার রেলপথ ও ডাইরেন বন্দর ইত্যাদি নিয়া কোন চুক্তি দ্রুত

---

(৭) এ্যাটোমিক ডিপ্লোমাসি : হিরোশিমা এ্যাণ্ড পটসডাম, পৃষ্ঠা ১৮২
(৮) ঐ পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৮৩

নিষ্পন্ন না হয়, কার্যতঃ ট্রুম্যান কালহরণের তেমন কৌশলও অবলম্বন করিয়াছিলেন। (৯)

এই কৌশলের কথা পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বার্নসও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ষ্ট্যালিন ও চিয়াং কাইসেকের মধ্যে আলোচনা যত দীর্ঘ ও বিলম্বিত হয়, ততই মঙ্গল। কেননা, সেই অবস্থায় মাঞ্চুরিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার যোগদানে আরও বিলম্ব ঘটিবে এবং তার আগেই হয়তো জাপান আমেরিকার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বসিতে পারে। সুতরাং দেখা গেল রাশিয়া ও চীনের মধ্যে আলোচনা পটসডাম সম্মেলনের আগে ১৪ দিন (৩০ জুন থেকে ১৪ জুলাই) এবং পরে আর এক সপ্তাহ—৭ আগষ্ট থেকে ১৪ আগষ্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এর পিছনে ওয়াশিংটনের ইঙ্গিত ছিল চিয়াং কাই-সেকের প্রতি। (১০)

একথা সত্য যে, ইয়াল্টা চুক্তি অনুসারে বহিঃমঙ্গোলিয়া এবং মাঞ্চুরিয়ার বন্দর ও রেলপথ ইত্যাদি সম্পর্কে ষ্ট্যালিনের দাবিগুলি রুজভেল্ট মানিয়া নিলেও এইগুলি সম্পর্কে চিয়াং কাই-সেকের সম্মতির দরকার হইবে এবং রুজভেল্ট সেই সম্মতি আদায় করিয়া দিবেন এমন কথাও চুক্তিতে ছিল। স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছিল :

'The Heads of three Great Powers have agreed that these claims of the Soviet Union shall be unquestionably fulfilled after Japan has been defeated !'

অর্থাৎ জাপানের পরাজয়ের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সমস্ত দাবি নিঃসন্দেহেই পূর্ণ করা হইবে। এই সম্পর্কে তিনটি বৃহৎ শক্তির রাষ্ট্রপ্রধানগণ একমত হইয়াছিলেন। (১১)

তিন প্রধানের মধ্যে এই স্বাক্ষরিত চুক্তি সত্বেও সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের মধ্যে বন্ধুতা ও মৈত্রীর চুক্তি স্বাক্ষরে বিলম্ব হইতে লাগিল এবং হিরোশিমায় বোমাবর্ষণের পর রাশিয়া কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আগে সেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাশিয়াকে এড়াইবার জন্য মার্কিন কূটনীতি দস্তরমত প্যাঁচ কষিতেছিল এবং রাশিয়াও তেমন সন্দেহ করিতেছিল বলিয়াই এ্যাটম বোমা নিক্ষিপ্ত হওয়ার দুই দিন পরেই মাঞ্চুরিয়াতে আক্রমণ করিল। চিয়াং কাই-সেকও কিন্তু মার্কিন কূটনীতির এই প্যাঁচ ধরিয়া রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি নস্যাৎ করিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিলেন। কিন্তু রুজভেল্ট ও চার্চিলের মত দুই বিশ্বনেতা যখন ইয়াল্টাতে ষ্ট্যালিনের সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াছেন, তখন চিয়াং কাইসেক আর চুক্তি-ভঙ্গ করিতে সাহস পাইলেন না। বিশেষতঃ ততক্ষণে বিশাল সোভিয়েত বাহিনী মাঞ্চুরিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছিল।...

(৯) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৮৪

(১০) আলেকজাণ্ডার ভার্থ, পৃষ্ঠা ৯২৩

(১১) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৯২৩

ট্রুম্যানের কূটনীতি সম্পর্কে আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, পটসডাম সম্মেলনের শেষের দিকে জাপানের সম্রাট যখন প্রিন্স কোনেয়েকে মস্কোতে শান্তি আলোচনার জন্য পাঠাইবার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করিলেন, তখন ট্রুম্যান ষ্ট্যালিনকে সোজাসুজি পরামর্শ দিলেন সেই শান্তি প্রস্তাব উপেক্ষা করার জন্য।

কিন্তু পটসডাম থেকে প্রচারিত চরমপত্র জাপান 'অগ্রাহ্য করিয়াছে'—জাপানী বার্তার এই অনুবাদও স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতি কিংবা বিভ্রান্তিকর বলিয়া মনে হইতে পারে। অথচ জাপানী কর্তৃপক্ষ এই অগ্রাহ্য করার কথা স্বীকার করেন না। কেননা, জাপানী শব্দ—'makusatsu'-এর অর্থ 'অগ্রাহ্য করা' নয়, জাপানী ভাষায় এর আসল অর্থ হইল—বর্তমানে এই বিষয়ে 'কোনো মন্তব্য না করা'। কিন্তু চরমপত্র অগ্রাহ্য করা হইয়াছে—মার্কিন পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে কিংবা দৈবাৎ এই ছুতা দেখাইয়া হিরোশিমার উপর তাড়াতাড়ি বোমাবর্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া হইল। (১২)

একদিকে দূরপ্রাচ্যে রাশিয়ার উপর একহাত লওয়ার জন্য ট্রুম্যান ও তাঁর পরামর্শদাতারা যেমন জাপানের শান্তি প্রস্তাব অগ্রাহ্য এবং হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এ্যাটম্ বোমা বর্ষণের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, অন্যদিকে সোভিয়েত রাশিয়াও তেমনি মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের আগেই জাপান যাতে আমেরিকার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া না বসে তার জন্যও কম ব্যস্ত ছিলেন না। কেবল তাই নয়, এই কূটনীতি এমন বিশ্রী ধরনের ছিল যে, সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ভাষার মধ্যে 'মিথ্যা'র অবতারণা ছিল। একথা লিখিয়াছেন 'দি কোল্ড ওয়ার' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা উদারতাবাদী ঐতিহাসিক মিঃ ডি এফ ফ্লেমিং।

"দুই দিন পর (বোমাবর্ষণের) সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন যে, যেহেতু জাপান আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে এবং মিত্রপক্ষ সোভিয়েত সরকারের নিকট এক প্রস্তাব দাখিল করিয়া জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন এবং যেহেতু এর দ্বারা যুদ্ধের স্থায়িত্বকাল হ্রাস পাইবে, প্রাণহানির সংখ্যা কমিয়া যাইবে এবং বিশ্বব্যাপী দ্রুত শান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়তা করা হইবে, সেজন্য সোভিয়েত রাশিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। মিত্রপক্ষের প্রতি মিত্রজনোচিত দায়িত্ব পালনের জন্যই সোভিয়েত সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং ২৬শে জুলাইয়ের ঘোষণায় যোগ দিয়াছেন।" (১৩)

জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার এই ভাষার মধ্যে কারচুপি ও গোঁজামিল ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু মূলতঃ একথা সত্য যে, ইয়াল্টা চুক্তি অনুসারে ষ্ট্যালিন রুজভেল্ট-চার্চিলের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, জার্মানীর পরাজয়ের তিন মাসের মধ্যেই রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে। সোভিয়েত

(১২) এ্যাটোমিক ডিপ্লোমাসি, পৃষ্ঠা ১৮৫ এবং আলেকজাণ্ডার ভার্থের পুস্তকে জার্মান লেখকের উদ্ধৃতি, পৃষ্ঠা ৯২৪

(১৩) দি কোল্ড ওয়ার, পৃষ্ঠা ৩০৪-৩০৫

পক্ষের দাবি এই যে, ৮ই আগষ্ট যুদ্ধে যোগদান করিয়া সোভিয়েত রাশিয়া মিত্রশক্তির প্রতি তাঁদের সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিয়াছেন।

কিন্তু মহাযুদ্ধের উপসংহারের শেষের দিকের এই সমস্ত ঘটনাবলী অত্যন্ত জটিল। কেননা, ইয়াল্টা চুক্তি, এ্যাটম বোমা ও জাপানের আত্মসমর্পণ—এই সমস্ত ব্যাপারগুলি যেন প্রত্যেকের জাতীয় স্বার্থের ও পরিস্থিতির সঙ্গে জট পাকাইয়া গিয়াছিল। আমেরিকা কর্তৃক এ্যাটম বোমা নির্মাণের আগে পর্যন্ত ইয়াল্টা চুক্তির যে মূল্য বা প্রয়োজন ছিল, সেই মূল্য পরে আর রহিল না। বিশেষতঃ প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এবং চার্চিলের অন্তরঙ্গমহল অত্যন্ত সোভিয়েত-বিরোধী ছিলেন। সুতরাং পারমাণবিক শক্তি করায়ত্ত করার পর তাঁরা ষ্ট্যালিনের রাশিয়াকে এড়াইয়া জাপানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিতে চাহিলেন। তাঁরা অনুভব করিলেন যে, পারমাণবিক বোমার ব্রহ্মাস্ত্র করায়ত্ত করার পর পৃথিবীর সামরিক ভারশক্তির পাল্লা তাঁদের দিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাঁরা আর সোভিয়েতের কোন দাবি মানিতে প্রস্তুত বা ইচ্ছুক নহেন। জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যোগদানও আর তাঁরা চাহিলেন না। অপর পক্ষে ষ্ট্যালিন ইয়াল্টা চুক্তির সুযোগ নিয়া ১৯০৪-৫ সালের রুশ জাপান যুদ্ধে জারের বা ইম্পিরীয়েল রাশিয়ার পরাজয়ের 'প্রতিশোধ' নিতে ও হৃতরাজ্য ও দ্বীপগুলি (কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ শাখালিন) পুনরুদ্ধার করিতে চাহিলেন। এছাড়া মুকডেন ও ডাইরেন বন্দর, মাঞ্চুরিয়ার রেলপথ ইত্যাদির প্রশ্ন তো ছিলই।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, চিয়াং কাইসেক যদিও উত্তর চীন ও মাঞ্চুরিয়া সংক্রান্ত ইয়াল্টা চুক্তিতে আপত্তি জানান নাই, কারণ গত ৪০ বছর ধরিয়া এই অঞ্চলে তাঁর কোন পাত্তাই ছিল না, তথাপি মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টি ইয়াল্টা চুক্তির এই অংশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। কেননা, এখানে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির সৈন্যেরা জাপানের বিরুদ্ধে সক্রিয় যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। মাও সে-তুংয়ের আরও আপত্তির কারণ এই ছিল যে, মার্কিন জেনারেল প্যাট্রিক হার্লি কর্তৃক চীনা জাতীয়তাবাদীদের (কুওমিণ্টাং) সঙ্গে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির মিলনের যে সমস্ত শর্ত স্থির করা হইয়াছিল, ষ্ট্যালিন সেগুলি গ্রহণ করিয়া মাও সে-তুংকে চিয়াং কাইসেকের সঙ্গে কোয়ালিশন গঠনের জন্য চাপ দিয়াছিলেন। কিন্তু মাও সে-তুং সেই প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। (১৪)

কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও ষ্ট্যালিন মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন এবং জাপান যাতে একমাত্র আমেরিকার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে না পারে, সেদিক অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে হিরোশিমায় মার্কিন এ্যাটম্ বোমা বর্ষণের জন্য রাশিয়া প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং ৮ই আগষ্ট তারিখে তাড়াহুড়া করিয়া রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করিল, অনেকের মতে সামরিকভাবে তার আর প্রয়োজন ছিল না। কেন না, জাপান পতনের মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল এবং আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। ফলে, এই অবস্থায় জাপানকে আক্রমণ করায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমী মহলে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য উদ্রেক

(১৪) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৭৭

করিল এবং শেষ মুহূর্তে রাশিয়া 'লুঠের মাল কুড়াইবার জন্য' যুদ্ধে নামিয়াছে, এমন তীব্র শ্লেষও ধ্বনিত হইল। কার্যতঃ হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে ৬ই ও ৯ই আগষ্ট পরপর দুইটি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরিত হওয়ার পরেই জাপানী যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছিল। মিত্রপক্ষ তখন যুদ্ধজয়ের উৎসব করিতেছিলেন। কিন্তু মাঞ্চুরিয়া সম্পূর্ণ দখল না হওয়া পর্যন্ত রাশিয়া সে কথা তাদের স্বদেশবাসীকে জানাইতে প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং ১৪ই আগষ্ট জাপানী সম্রাটের আত্মসমর্পণ সংক্রান্ত ঘোষণা সত্ত্বেও জাপানী সৈন্যেরা রুশবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ক্ষান্ত দেয় নাই। এই 'যুক্তি' দেখাইয়া সোভিয়েত সেনানীমণ্ডলীর প্রধান জেনারেল আন্তোনোভ ২০শে আগষ্ট পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়া গেলেন।

এদিকে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এ্যাটম্ বোমা বর্ষণের সংবাদ রুশ সংবাদপত্র-গুলিতে চাপিয়া যাওয়া হইল কিংবা দেরী করিয়া অত্যন্ত লঘুভাবে 'বিদেশী সংবাদের পৃষ্ঠায়' এক কোণে ছাপা হইল।

মিত্রপক্ষের তুলনায় রাশিয়াই যে জাপানকে যুদ্ধে হারাইবার বেশী কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে, এটা জাহির করিবার জন্য "রুশরা জাপানের চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের জাল চলচ্চিত্র তৈরী করিল এবং এমনভাবে সেই চিত্র দেখাইল যে, একমাত্র রাশিয়াই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে!" (১৫)

* * *

কিন্তু সোভিয়েত পত্র-পত্রিকায় হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এ্যাটম্ বোমা বর্ষণ সংবাদ কোন প্রাধান্য না পাইলেও সোভিয়েত জনগণের মধ্যে সেই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল। ফলে, দুই রকমের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইল। প্রথমতঃ আমেরিকা কর্তৃক এই প্রলয়ঙ্কর বোমা নির্মিত হওয়ায় কোন কোন রুশমহল বিমর্ষ চিত্তে মনে করিলেন যে, এত রক্তপাত ও ত্যাগ স্বীকারের পর জার্মানীকে যে পরাজিত করা হইল সেই সমস্তই বৃথা গেল।

দ্বিতীয়তঃ এ্যাটম বোমার বর্বরতার দ্বারা জাপান এভাবে ঘায়েল হওয়ায় রুশ জনগণের মধ্যে জাপানী জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি উদ্রেক করিল এবং রাশিয়া যে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিয়াছে, তার জন্য রুশ জনগণ মোটেই উৎসাহ বোধ করিল না। অর্থাৎ জাপানের বিরুদ্ধে মাঞ্চুরিয়াতে রাশিয়ার এই যুদ্ধ আদৌ জনপ্রিয় ছিল না। বরং জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে এত প্রাণহানির পর আবার জাপানের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে তাদের যেন যথেষ্ট অনীহা বা অনাগ্রহ ছিল। অবশ্য রাশিয়ার জনগণ তখনও ইয়াল্টা চুক্তির কথা জানিত না। তবু রুশ জনগণ অনুমান করিল যে, হিরোশিমার বোমা ও রুশ যুদ্ধঘোষণার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন একটা সম্পর্ক আছে।...

সোভিয়েত পত্রিকাগুলি এ্যাটম বোমা সম্পর্কে নীরব রহিল বটে, কিন্তু রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার পর জারের আমল থেকে আজ পর্যন্ত রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের সমস্ত দুষ্কার্য ও আক্রমণের দীর্ঘ ফিরিস্তি প্রকাশিত হইল এবং ঘোষণা করা হইল 'পোর্ট আর্থারের' কলঙ্ক মুছিয়া ফেলা হইবে!

(১৫) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩০৫

সুতরাং প্রশ্ন উঠিতে পারে ইম্পিরীয়েল রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির যে তীব্র সমালোচনা আগে সোভিয়েত সংবাদপত্রগুলিতে করা হইয়াছিল, তার সঙ্গে জাপানের বিরুদ্ধে আলোচ্য প্রতিশোধাত্মক নীতির মিল কোথায়? কিংবা এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি কি মার্কসবাদসম্মত? (১৬)

কিন্তু তৎসত্ত্বেও ষ্ট্যালিন জাপানী যুদ্ধজয় সম্পর্কে যে বক্তৃতা দিলেন, তা-ও কম হতবুদ্ধিকর নয়। ষ্ট্যালিন বলিলেন যে, ১৯০৪-৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের প্রতিশোধ এতদিনে গ্রহণ করা হইল। জার সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়া জাপান বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক পোর্টআর্থার আক্রমণ এবং কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ শাখালিন গ্রাস করিয়াছিল। "আমরা বয়স্ক ব্যক্তিরা ৪০ বছর ধরিয়া এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। আজ সেই দিন সমাগত।" (১৭)

ষ্ট্যালিনের মত একজন বিশ্ববিখ্যাত বিপ্লবী মার্কসবাদীর মুখে এমন মন্তব্য অভিনব বটে!

(১৬-১৭) রাশিয়া এ্যাট্ ওয়ার, পৃষ্ঠা ৯২৬-২৭ এবং ৯২৮

দশম পর্ব

সপ্তম অধ্যায়

জাপানের আত্মসমর্পণ : বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র

জাপানকে পরাজিত করার জন্য আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে যেন একটা দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হইয়াছিল এবং এই প্রতিযোগিতায় এ্যাটম্ বোমা নিক্ষেপের দ্বারা যদিও আমেরিকা রাশিয়াকে পিছনে ফেলিয়া দিল এবং প্রতিযোগিতায় জয়ী হইল, তবু কিন্তু পরদিন জাপানের আত্মসমর্পণের আগেই রাশিয়া মাঞ্চুরিয়াতে আক্রমণ করিয়া বসিল এবং কার্যতঃ বাজীমাৎ করিল। কেন না, রাশিয়াকে বাদ দিয়া একমাত্র আমেরিকার নিকট জাপানের আর আত্মসমর্পণ ঘটিয়া উঠিল না। যদিও পশ্চিমী মহলে একথা প্রচারিত যে, হিরোশিমাতে পারমাণবিক বোমার আঘাতের জন্যই জাপান মিত্রপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হইয়াছিল, তথাপি সমস্ত সামরিক লেখকই এই বিষয়ে একমত নন। এমন কি, কোন কোন বিশিষ্ট মার্কিন গ্রন্থকার পর্যন্ত একথা অস্বীকার করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন :

'Though the fate of Heroshima has stuck in the world's memory and though it has been regarded as the final cause of Japan's capitulation, it seems, in point of fact, that it was the Russian invasion that tilted the Japanese over to put an end to the war.' (১)

'যদিও হিরোশিমার ভাগ্য পৃথিবীব্যাপী মানুষের স্মৃতিতে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে এবং যদিও জাপানের আত্মসমর্পণের এটাই চূড়ান্ত কারণ বলিয়া ধারণা করা হইয়াছে, তথাপি ঘটনাবলী দৃষ্টে মনে হয় যে, রাশিয়ার আক্রমণের জন্যই জাপান যুদ্ধ শেষ করার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল।'

কারণ, উপরোক্ত মার্কিন গ্রন্থকারদ্বয়ের মতে হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা বর্ষণের ভয়াবহতা ও বীভৎসতা তখনও হিরোশিমার বাইরে, এমন কি টোকিওতে পর্যন্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তিরাও ভালো করিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ জাপানী জনগণ তখনকার বি-২৯ রাক্ষুসে মার্কিন বোমারুর ক্রমাগত ভয়ঙ্কর বোমাবর্ষণে ও ধ্বংস বিস্তারে যেন অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মাঞ্চুরিয়াতে 'রুশ বর্বরদের' আক্রমণ জাপানের কাছে অনেক বেশী ভীতিপ্রদ ছিল। জাপানের পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গেও রাশিয়ার প্রশ্ন একান্তরূপে জড়িত ছিল। কেন না, সাম্যবাদ প্রসারের আতঙ্ক এর পিছনে ছিল। অধিকন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার মত আর একটি বৃহৎ শক্তির আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার কোন সাধ্য তখন জাপানের ছিল না।

মার্কিন ছাড়া একজন বৃটিশ গ্রন্থকারও লিখিয়াছেন যে, টোকিওতে যখন আত্মসমর্পণের প্রশ্ন নিয়া উচ্চস্তর মহলে প্রচণ্ড বিতণ্ডা চলিতেছিল এবং আত্মসমর্পণের

Total war—(vol-2) by Peter Calvocoressi &Guy Wint, Ballantine Books, New York, 1973, p. 339.

বিরোধীগণ মার্কিন আক্রমণ প্রতিরোধের পক্ষে ওকালতি করিতেছিলেন, তখন টোকিওর পদস্থ মহলে অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে, মার্কিন ও বৃটিশরা প্রস্তুত হওয়ার আগেই রুশ আক্রমণ নিশ্চিতরূপে ঘটিবে। এমন কি, যদি যুদ্ধ চলিতে থাকে, তবে, জাপানী জাতি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে পারে। আবার এ্যাটম্ বোমা পড়িতে পারে (১২ আগষ্ট টোকিওতে এ্যাটম্ বোমা পড়িবে বলিয়া জোর গুজব রটিয়াছিল) এবং যদি আর পারমাণবিক আক্রমণ নাও ঘটে, তবু রুশ আক্রমণ ঘটিতে পারে এবং রুশ আক্রমণের অর্থ-ই হইতেছে জাপানী রাজবংশের বিনাশ—'a Russian invasion would mean an end of the imperial house.' (২)

রুশ আক্রমণের এই ভীতি জাপ সম্রাটের বিশ্বাসভাজন ও সম্মানভাজন উপদেষ্টাগণের মধ্যেও ছিল।

উইলিয়াম ক্রেইগ নামক আর একজন বিশিষ্ট ইংরাজ গ্রন্থকার জাপানের পতন সম্পর্কে তাঁর রচিত এক চাঞ্চল্যকর পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা বর্ষণের দিন সকালে—৯ই আগষ্ট, যখন সংবাদ আসিল যে, সোভিয়েত সৈন্যেরা মাঞ্চুরিয়া সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে, তখন প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী সুজুকি আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন—'খেইল্ খতম্'—'The game is up' (৩)

সুতরাং তিনি ও তাঁর মতাবলম্বীগণ যুদ্ধ শেষ করার দিকে ঝুঁকিলেন। অতএব জাপানের আত্মসমর্পণে রাশিয়ার ভূমিকাকে লঘু করিয়া দেখার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। বরং 'আধুনিক জাপানের ইতিহাস' লেখক রিচার্ড ষ্টোরি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, ৮ই আগষ্ট জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত আক্রমণ এ্যাটোমিক বোমার মতই চূড়ান্ত পর্যায়ের ছিল এবং যুদ্ধ শেষ করিতে জাপানকে বাধ্য করিয়াছিল।

* * *

জাপানের আত্মসমর্পণ বহু নাটকীয় এবং জটিল ঘটনায় পরিপূর্ণ, যেগুলির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে, সংক্ষেপে একথা উল্লেখ করা যায় যে, ঘটনার এই জটিলতার জন্য শেষ পর্যন্ত স্বয়ং জাপানের সম্রাট হিরোহিতোকে আসরে নামিতে হইয়াছিল, যা ছিল জাপানের ও রাজবংশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। কেন না, 'দেবতুল্য' মহামান্য সম্রাট কখনও ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইয়া জনগণকে নির্দেশ দেন না কিংবা তাঁর মন্ত্রিবর্গও তাঁর ব্যক্তিগত উপদেশ ও নির্দেশ লাভের জন্য কখনও তাঁকে বিব্রত করেন না—এটা ছিল জাপানের প্রচলিত প্রথা বা কনভেনশন। কিন্তু এবার জাপান যে অভাবনীয় সঙ্কটের সম্মুখীন হইল, তাতে সম্রাটকে ভাবিতে হইল, এমন কি ব্যক্তিগতভাবে শেষ পর্যন্ত অংশ নিতে হইল। সম্রাট হিরোহিতো চীনের কনফুসিয়াসের দার্শনিক মতবাদের দ্বারা কিছুটা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন

---

(২) A History of Modern Japan—by Richard Storry, Pelican, London, p. 233.

(৩) The Fall of Japan—by William Craig, Pan books, London, 1970, p. 97-98

এবং এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে ওক্ গাছের মত সোজাসুজি দাঁড়াইতে নাই। কারণ, তাহলে ভাঙিয়া পড়িয়া চূর্ণ হইতে হইবে। বরং উইলো গাছের মত নমনীয় হইতে হইবে, যাতে ঝড়ের তাণ্ডব থামিয়া গেলে আবার সে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারে। (৪)

অর্থাৎ হিরোহিতো যুদ্ধ শেষ ও শান্তির পথ অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু জাপানে জঙ্গীবাদের প্রাবল্য ছিল, আর্মি ও নেভির এবং বিশেষভাবে আর্মির দাপট বেশী ছিল। কিন্তু ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে সাইপান দ্বীপের পরাজয়ের ফলে জেনারেল তোজোর সরকারের পতন হওয়ায় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ক্রমশঃ সিভিলিয়ান বা অ-সামরিক নেতৃত্বের দিকে সরিয়া আসিতেছিল এবং 'জুসিন' বা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীদের গঠিত কাউন্সিলের চাপ বৃদ্ধি পাইতেছিল। যদিও 'জেনরো' (Genro) বা বয়োজ্যেষ্ঠ রাষ্ট্রনেতাদের সংগঠনের মত এই কাউন্সিলের কোন সংবিধানগত ক্ষমতা ছিল না, তবু যুদ্ধের এই সঙ্কটে এর প্রভাব ক্রমশ বাড়িতেছিল। কিন্তু সৈন্য ও নৌবাহিনী যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে চাহিতেছিল—যদিও সিনিয়র অফিসারেরা উপলব্ধি করিতেছিলেন যে, যুদ্ধ জয়ের আর কোন আশা নাই, তবু মুখ ফুটিয়া প্রকাশ্যে কেউ সেকথা কবুল করিতে সাহস পাইতেছিলেন না। কেন না, উগ্র-মস্তিষ্ক তরুণ সৈন্যদের পক্ষ থেকে টেরোরিজম ও হত্যাকাণ্ডের ভয় ছিল। কারণ, 'জাপানের ইতিহাসে কেউ কখনও শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করে নাই এবং এটা একটা ধর্মীয় বিশ্বাস বা 'cult'-এর মত দাঁড়াইয়া গিয়াছিল।' (৫)

তথাপি গোপনে এবং পর্দার আড়ালে 'সম্মানজনক শান্তি' স্থাপনের জন্য মিত্রপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা চলিতেছিল এবং তখন বিপন্ন জাপানের সম্মুখে মিত্রপক্ষের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবির পটভূমিকায় জাপানের একটি মাত্র প্রস্তাব স্পষ্ট ও জোরদার হইয়া উঠিল—সম্রাটের মর্যাদা ও অধিকারের নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টি আদায় করিতে হইবে।

কিন্তু সম্রাট সম্পর্কে জাপানের জনগণের যত ভক্তিই থাকুক না কেন, পশ্চিমী মহলে এটা নিতান্তই একটা 'সেন্টিমেন্ট' বলিয়া বিবেচিত ছিল। এমন কি, খোদ আমেরিকাতে পর্যন্ত সম্রাট ও রাজবংশের বিরোধী মনোভাব প্রবল ছিল। বিশেষতঃ পার্ল হারবার আক্রমণের বিশ্বাসঘাতকতা স্মরণ করিয়া বহু আমেরিকান হিরোহিতোকে 'যুদ্ধাপরাধী' বলিয়া পর্যন্ত মনে করিতেন। কারণ, এই আক্রমণের সিদ্ধান্ত সেনানীমণ্ডলীর হইয়া থাকিলেও এর পিছনে জাপ সম্রাটের অনুমোদন ছিল। সোভিয়েট উচ্চতম নেতৃত্বও সম্রাট হিরোহিতোকে যুদ্ধাপরাধী বলিয়া মনে করিতেন।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও মার্কিন সমরসচিব ষ্টিমসন জাপানের সম্রাট সম্পর্কে জাপানীদের মনোভাবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। কারণ, সম্রাটকে বজায় রাখিলে তাঁর মাধ্যমে জাপানে দখলদারির কার্য পরিচালনা এবং বহুদূর বিস্তৃত জাপ

(৪) টোট্যাল ওয়ার—দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪১

(৫) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩৪২

সাম্রাজ্যে সৈন্যবাহিনীর আত্মসমর্পণ গ্রহণ করা সহজতর হইবে— এই বাস্তব বুদ্ধির দ্বারা ট্রুম্যান ও ষ্টিমসন পরিচালিত হইলেন। সুতরাং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও তাঁর উপদেষ্টাগণ পটসডাম সম্মেলন থেকে ঘোষিত নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবির জবাবে জাপানীদের বক্তব্য সোজাসুজি গ্রহণ না করিয়া এমন ভাবে একটি বার্তা রচনা করিলেন যাতে জাপ সম্রাটের মর্যাদাও রক্ষা পায়, অথচ বাহ্যতঃ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবিও বজায় থাকে। সোজা কথায় 'সাপও মরে এবং লাঠিও না ভাঙ্গে'—এমন কূটনৈতিক কৌশলই অবলম্বিত হইল।

* * *

এদিকে টোকিওতে তখন রাজপ্রাসাদ ও পটসডাম ঘোষণাকে কেন্দ্র করিয়া কি নাটক জমিয়া উঠিতেছিল? ৮ই আগষ্ট মাঞ্চুরিয়াতে রুশ আক্রমণের সংবাদ যেন পারমাণবিক বোমা বর্ষণের মতই বজ্রাঘাত তুল্য ছিল। 'এই তারিখটিই সম্ভবত জাপানের ইতিহাসে সবচেয়ে সঙ্কটজনক ছিল।' (৬)

জাপানে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অল্প কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়া যে সুপ্রীম কাউন্সিল গঠিত ছিল, ৯ই আগষ্ট সকালে সেই কাউন্সিলের বৈঠক বসিল নতুন পরিস্থিতি ও শান্তির শর্ত আলোচনার জন্য। এই কাউন্সিলের বৈঠক ৬ জন সদস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যথা—প্রধানমন্ত্রী সুজুকি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী টোগো, নৌমন্ত্রী ইয়োনাই, সমর মন্ত্রী আনামি এবং নৌ ও স্থল সেনানীমণ্ডলীর দুই প্রধান জেনারেল উমেজু এবং এ্যাডমিরাল তয়োদা। অন্যান্য সহকারীদের এই বৈঠক থেকে বাদ দেওয়া হইল, পাছে তারা প্রভাব বিস্তার করে, এই আশঙ্কায়।

এই সভার আলোচনায় দেখা গেল যে, সুজুকি, টোগো এবং ইয়োনাই একমাত্র সম্রাটের মর্যাদার প্রশ্ন বাদ দিয়া পটসডাম ঘোষণার বাকী শর্তগুলি গ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু সমরমন্ত্রী আনামি প্রভৃতি বাকী তিনজন তাতে রাজী ছিলেন না। তাঁদের মতে পটসডাম ঘোষণা গ্রহণের জন্য জাপানের পক্ষ থেকে মোট ৪টি শর্ত জুড়িয়া দিতে হইবে, যথা—

(ক) সম্রাটের অধিকার ও মর্যাদা এবং রাজতন্ত্র রক্ষা করিতে হইবে।
(খ) শত্রু সৈন্যদল কর্তৃক জাপান দখল করা চলিবে না।
(গ জাপানীরা নিজেরাই তাদের সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে নিরস্ত্র করিবে এবং
(ঘ) জাপানী যুদ্ধাপরাধীদেরকে জাপানই বিচার করিবে।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও নৌমন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন যে, একমাত্র সম্রাটের প্রশ্ন ছাড়া বাকী সমস্ত শর্ত আরোপ করা বৃথা। মিত্রপক্ষ এগুলির কিছুই গ্রহণ করিতে রাজী হইবেন না। সুতরাং সুপ্রীম কাউন্সিলের ৬ জনের বৈঠকে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল না। তখন সমগ্র বিষয়টি বিবেচনার জন্য ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভায় পেশ করা হইল। সেদিন অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যায় দীর্ঘ ৭ ঘণ্টা ধরিয়া বিশদ আলোচনা ও বিতর্ক হইল। কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারিল না।

(৬) রিচার্ড ষ্টোরি, পৃষ্ঠা ২৩০

অথচ সে দিনই (৯ই আগষ্ট) সকালে খবর আসিল যে, নাগাসাকিতে দ্বিতীয় এ্যাটোমিক বোমা বর্ষিত হইয়াছে। সুতরাং অনেক বিতর্কের পর রাত দশটায় মন্ত্রিসভার মিটিং খতম হইয়া গেল এবং প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সোজা সম্রাটের কাছে গেলেন রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। তাঁরা অনুরোধ জানাইলেন সেদিনই অবিলম্বে এই জরুরী অবস্থা বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সম্রাটের সমক্ষে সুপ্রীম কাউন্সিলের অধিবেশন ডাকার জন্যে। (৭)

বিমান আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সম্রাটের প্রাসাদ-সংলগ্ন ভূগর্ভে যে আশ্রয় তৈরী হইয়াছিল, এই অসাধারণ সভা সেখানে অনুষ্ঠিত হইল। কিন্তু ভূগর্ভের এই আশ্রয়টি ছিল নিতান্তই স্বল্পায়তন—লম্বায় ৩০ ফুট, চওড়ায় ১৮ ফুট। ১১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বর্ণখচিত কিংখাবে (ব্রকেড্) মোড়া (যুদ্ধের এই অবস্থায়ও কিছুটা রাজকীয় আদবকায়দা ছিল) একটি দীর্ঘ টেবিলের চারদিকে মিলিত হইয়াছিলেন। কক্ষটি সুরক্ষিত ছিল বটে, কিন্তু হাওয়া-বাতাসের কোন ব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং আগষ্ট মাসে সেই ভ্যাপসা গরমের দিনে সাজসজ্জা পরিহিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যেন ঘর্মাক্ত কলেবর হইতেছিলেন। ১১ জনের মধ্যে ৬ জন ছিলেন পূর্বোক্ত সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য—'বিগ সিক্স' নামে পরিচিত এবং এঁদের হাতেই ছিল জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে নীতি নির্ধারণের অধিকার। বাকী চারজন ছিলেন সেক্রেটারি এবং একজন ছিলেন নিমন্ত্রিত "অতিথি"।

৮১ বছর বয়স্ক বৃদ্ধ কাণ্টারো সুজুকি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ও 'বিগ সিক্সের' তথা-কথিত নেতা। কিন্তু তিনি জাপানের একজন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। কারণ ১৯০৪-৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধে তিনি একজন হীরো ছিলেন। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে শান্তি ও যুদ্ধের মধ্যে তিনি কোন মতি স্থির করিতে পারিতেছিলেন না এবং ব্যক্তিগতভাবে যদিও তাঁর কোন শত্রু ছিল না, তবু আত্মসমর্পণের প্রস্তাব গ্রহণে টেরোরিষ্টদের হাতে তাঁর প্রাণনাশের ভয় ছিল।

৬৩ বছর বয়স্ক পররাষ্ট্রমন্ত্রী টোগো শান্তির পক্ষপাতী ছিলেন। আর ৬৫ বছরের নৌমন্ত্রী ইয়োনাই (যিনি হুইস্কির ভক্ত ছিলেন) ছিলেন প্রো-আমেরিকান। সুতরাং জঙ্গীবাদীদের দাপটে তিনি অবসর নিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তিন বছর পর ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে তোজোর পতনের পর আবার নৌমন্ত্রীর ক্ষমতায় ফিরে আসেন। টোগো, ইয়োনাই ও সুজুকির বিরুদ্ধে ছিলেন ৫৭ বছর বয়স্ক যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল আনামি এবং অপর দুইজন স্থল ও নৌ সেনানীমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল উমেজু ও এ্যাডমিরাল তয়োদা—এঁরাই ছিলেন ১৯৩১-৪০ সাল পর্যন্ত মাঞ্চুরিয়া ও চীনে আক্রমণ ও যুদ্ধ চালাইবার জন্য দায়ী। (আর এই সমগ্র ব্যাপারটার পরিকল্পনাকারী ও উস্কানিদাতা ছিলেন জেনারেল তোজো)।

এই ইম্পিরীয়েল সম্মেলনে যিনি অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ছিলেন জাপানের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্যতম ৮০ বছর বয়স্ক ব্যারন কিচিরো হিরাণুমা, প্রীভি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট এই কাউন্সিল ছিল খোদ সম্রাটের পরামর্শদাতা।

---

(৭) রিচার্ড স্টোরি, পৃষ্ঠা ২৩১

অভিজাত হিরোহিতো রাজভক্ত, দেশভক্ত এবং জাতীয়তাবাদী ছিলেন। গত কয়েক দশক ধরে তিনি জাপানের বহু রক্তারক্তি কাণ্ড এবং সামরিক উঠানামার সাক্ষী ছিলেন। তিনি কৌশলী, তেজস্বী এবং আলোচনা চালাইতে দক্ষ ছিলেন। ১৯৪১ সালে সন্ত্রাসবাদীরা তাঁকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল এবং তিনি আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের বিরোধী ছিলেন। তোজো ক্ষমতায় আসার পর তিনি পর্দার আড়ালে চলিয়া গেলেন। কিন্তু আজ যুদ্ধের উপসংহারের দিনে তিনি সিংহাসনকে রক্ষা এবং সরকারী গ্রুপবাজির তীব্র বিরোধ থেকে দেশকে উদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন ... ;

ভূগর্ভের সেই আশ্রয়শালায় সমবেত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ২৫ মিনিট ধরিয়া অপেক্ষা করার পর জাপানের 'দিব্য শাসক' একজন সহকারীসহ তাঁর আবাস কক্ষের দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি টেবিলের মাথায় একটি চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন এবং তাঁর প্রজাবৃন্দ অভিবাদনপূর্বক আসনে উপবেশন করিলেন। কিন্তু উপস্থিত ব্যক্তিরা যখন দেখিলেন যে, তাঁদের মহামান্য সম্রাট মাথার চুল আচড়ান নাই এবং দাড়িও কামান নাই, তখন তাঁরা বিমর্ষ হইলেন।

হিরোহিতোর জন্ম ১৯০১ সালে। যুবরাজ হিসাবে জাপানের বাইরে ইউরোপ পরিদর্শন করিয়া তিনি রক্ষণশীলদেরকে হতভম্ব করিয়া দিয়াছিলেন এবং রাজবংশের যে মহিলাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনি পাঁচ বছর বাগদত্তা ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাত্র ৯বার তাঁদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং এই সমস্ত ব্যাপার নিয়া তখন প্রাসাদের রাজকীয় মহলে যথেষ্ট নিন্দা ও সমালোচনা হইয়াছিল। কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে হিরোহিতো সৎ ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ১৯২৪ সালে তাঁর বিবাহ এবং ১৯২৬ সালে তিনি জাপানের ১২৪তম সম্রাটরূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর পরলোকগত পিতা বিকৃত মস্তিষ্ক ছিলেন।...

সভার নিয়মমাফিক প্রধান মন্ত্রী সুজুকি পটসডাম ঘোষণার বয়ান পড়িয়া শুনাইবার জন্য ক্যাবিনেট সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিলেন এবং ঘোষণাটি যদিও সকলের জানা ছিল, তবু আবার পড়া হইল। তখন সুজুকি সম্রাটকে বুঝাইয়া দিলেন যে, সারাদিন আলোচনার পরেও তাঁরা ৬ জন এই ঘোষণা গ্রহণ সম্পর্কে একমত হইতে পারেন নাই এবং কার্যতঃ অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং পুনরায় সম্রাটের উপস্থিতিতে এই আলোচনার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী সুজুকি প্রথমেই পররাষ্ট্র মন্ত্রী টোগোকে তাঁর মতামত জানাইতে অনুরোধ করিলেন এবং টোগো বলিলেন—'যদিও পটসডাম ঘোষণা গ্রহণ করা নিতান্তই অসম্মানজনক, তবু এটা গ্রহণ না করেও উপায় নেই। তবে, সম্রাটের মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে হবে।'

নৌ-মন্ত্রীও অনুরূপ মতামত প্রকাশ করা মাত্র যুদ্ধমন্ত্রী আনামি তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিলেন এবং উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—'কিছুতেই না। আমাদের সৈন্যেরা স্বদেশ রক্ষার জন্য এখনও যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের

প্রদত্ত চারটি শর্ত গৃহীত না হয় (এই মতগুলি উপরেই উল্লেখ করা হইয়াছে) ততক্ষণ যুদ্ধ না চালাইয়া উপায় নাই।'…

এভাবে উত্তেজিত আলোচনার সময় কৌশলী ব্যারন হিরাণুমা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—'রাশিয়া যুদ্ধের ঘোষণা করিল কেন ?'

টোগো জবাব দিলেন—'রাশিয়া মধ্যস্থের ভূমিকা নিতে ইচ্ছুক ছিল না, যুদ্ধ করিতেই ইচ্ছুক ছিল।'

'কিন্তু রাশিয়া বলিয়াছে যে, জাপানী গবর্নমেণ্ট ২৮শে জুলাই তারিখ পটসডাম ঘোষণা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। একথা কি সত্য ?'—জিজ্ঞাসা করিলেন হিরাণুমা।

টোগো উত্তর দিলেন—'না, আমরা অগ্রাহ্য করি নাই।'

টোগোর এই জবাব সত্য ছিল। কিন্তু আসলে গোল বাধিয়াছিল জাপানী জবারের মধ্যে 'mokusatsu' শব্দটির মার্কিন পক্ষীয় অনুবাদ নিয়া।…

এভাবে কিছুক্ষণ প্রশ্নোত্তরের পর ব্যারন হিরাণুমা জঙ্গীবাদীদের উদ্দেশ্যে খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনারা এ্যাটম্ বোমার আঘাত ঠেকাইতে পারিবেন এবং যুদ্ধের এই অবস্থায় কিভাবেই বা আত্মরক্ষা করা সম্ভব ?'

এই সমস্ত স্পষ্ট প্রশ্নের জবাবে জঙ্গীবাদী আনামি, উমেজু, তায়োদা বোবার মত বসিয়া রহিলেন।…

তখন প্রধান মন্ত্রী সুজুকি তাঁর তুরুপের তাস নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হইলেন, ৯ই তারিখ সকালে মাঞ্চুরিয়ায় রুশ আক্রমণের সংবাদ পাওয়ার পর তিনি টোগো ও মার্কুইস কিডোর সঙ্গে সম্রাটের সহিত একটি গোপন বুঝাপড়ায় উপনীত হইলেন এবং স্থির করিলেন যে, পটসডাম ঘোষণা গ্রহণ করা হইবে। সুতরাং সেদিনের মিটিংয়ে তারা নিজেরা কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ভোট দিবেন না—চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার দেওয়া হইবে স্বয়ং সম্রাটের উপর।

পর্দার আড়ালে এই গোপন বুঝপড়ার পর রাত্রি ২টার সময় দুই ঘণ্টার অধিক কাল ধরিয়া আলোচনার পর যখন কোন মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারিল না, তখন হঠাৎ প্রধান মন্ত্রী সুজুকি দাঁড়াইয়া উঠিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, মহামান্য সম্রাট এই অবস্থায় তাঁর রাজকীয় সিদ্ধান্ত দিয়া জাতিকে সঙ্কট থেকে রক্ষা করুন।

বিরোধী জঙ্গীবাদী নেতারা কখনও এমন একটা অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না এবং তাঁরা কখনও প্রত্যাশা করেন নাই যে, সম্রাটকে তাঁর সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিতে অনুরোধ করা হইবে।

তখন সেই নিঃশব্দ সভাকক্ষে হিরোহিতো উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন :

'I have given serious thought to the situation prevailing at home and abroad and have concluded that continuing the war can only mean destruction for the nation and a prolongation of bloodshed and cruelty in the world.…'

অর্থাৎ স্বদেশ ও বিদেশের পরিস্থিতি আমি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, যুদ্ধ আরও চালাইবার অর্থ হইতেছে জাতির আরও ধ্বংস এবং পৃথিবীতে রক্তপাত ও নিষ্ঠুরতা দীর্ঘায়িত করা।' (৮)

সম্রাট হিরোহিতো তাঁর এই বক্তৃতায় প্রজাবৃন্দের অশেষ দুঃখের কথা এবং যুদ্ধ চালাইবার অক্ষমতার কথাও বর্ণনা করিলেন এবং সিদ্ধান্ত করিলেন যে, পটসডাম ঘোষণা গ্রহণ ও যুদ্ধ শেষ করিতে হইবে—"এমন একটা সময় আসিয়াছে, যখন অসহনীয়কেও সহ্য করিতে হইবে।"...

সমগ্র সভাকক্ষ নিস্তব্ধ হইল। কাহারও একটি পা'ও নড়িল না এবং কেহ সমর্থন বা বিরোধীতাও করিলেন না।

তখন প্রধান মন্ত্রী দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—'সম্রাটের সিদ্ধান্ত সম্মেলনেরও সিদ্ধান্ত।' সুজুকির তুরুপের তাস নিক্ষেপ সার্থক হইল।...

এরপর রাত্রি ৩টার সময় প্রধান মন্ত্রীর গৃহে মন্ত্রিসভার পূর্ণ অধিবেশন বসিল এবং সম্রাটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। অর্থাৎ যুদ্ধ শেষ করিতে হইবে। তবে, একমাত্র শর্ত সম্রাটের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। ইতিমধ্যে সেনানীমণ্ডলীর প্রধান উমেজুর সহকারী জেনারেল যোশীজুমি ঘটনার এই পরিণতিতে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রধান মন্ত্রী সুজুকির প্রতি আক্রমণোদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁকে নিরস্ত করা হইল।

ভোর রাত্রি চারটায় মন্ত্রিসভার বৈঠক ভাঙিল এবং সারাদিন ও সারারাত্রির ক্লান্তির পর মন্ত্রিরা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।...

এদিকে সকাল ৭-৩৩ মিনিটের সময় টোকিও শহরের মধ্যস্থলে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দপ্তর থেকে বেতার-যন্ত্রীরা এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের সাঙ্কেতিক বার্তা সুইজারল্যাণ্ড-সুইডেনের মারফৎ মিত্রপক্ষের বিভিন্ন রাজধানীতে পাঠাইতে লাগিলেন।

ওয়াশিংটনের প্রতিক্রিয়া

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁর আত্মস্মৃতিতে লিখিয়াছেন যে, মস্কোস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারিম্যান তাঁকে জানাইয়াছেন যে, হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা বর্ষণের পর ৭ই আগষ্ট সোভিয়েত সরকার জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং মাঞ্চুরিয়া সীমান্ত আক্রমণ করিলেন। ষ্ট্যালিন বলিয়াছেন যে, সোভিয়েতের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জার্মানীর পরাজয়ের ঠিক তিন মাস পরেই রাশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে যোগদান করিল এবং ষ্ট্যালিন স্বয়ং এ্যাটম বোমা সম্পর্কে অত্যন্ত কৌতূহল দেখাইলেন। তিনি বলিলেন যে, এর ফলে জাপানী যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইতে পারে। তবে, এ্যাটম বোমার রহস্য গোপন রাখিতে হইবে। অধিকৃত বার্লিনের ল্যাবরোটারিগুলিতে এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যাতে বুঝা যায় যে, জার্মানীও এ্যাটম ভাঙার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কোন ফল লাভ করিতে পারে নাই। 'ষ্ট্যালিন আরও বলিলেন

(৮) দি ফল্ অব্ জাপান—উইলিয়াম ক্রেইগ, প্যানবুক, লণ্ডন, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ১০৬-১০৮

যে, সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকরাও এই সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁরা সফল হন নাই।'—(১)

৯ই আগষ্ট তারিখে নাগাশাকিতে দ্বিতীয় পারমাণবিক বোমা সম্পর্কে ট্রুম্যান লিখিয়াছেন যে, দ্বিতীয় এ্যাটম বোমা নিক্ষেপের কথা ছিল কোকুরাতে এবং সেখানে সম্ভব না হইলে নাগাশাকিতে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা কোকুরাতে পৌঁছিবার পরেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং বিমানটি তিনবার ঘুরিয়াও লক্ষ্যস্থানের হদিশ পাইল না। এদিকে বিমানের গ্যাস ফুরাইয়া আসিতেছিল এবং সেটা বিপদের কথা ছিল। সুতরাং বিকল্প লক্ষ্য হিসাবে নাগাসাকির দিকে ধাওয়া করা হইল। কিন্তু নাগাসাকির আকাশেও মেঘ ঘনাইয়া আসিল। কিন্তু ইতিমধ্যে হঠাৎ মেঘের ফাঁক দিয়া নাগাসাকি শহর বোমারু বৈমানিকের দৃষ্টিগোচর হইল। তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় এ্যাটমবোমা নাগাসাকির উপর নিক্ষিপ্ত হইল!

ট্রুম্যানের মতে নাগাসাকির উপর দ্বিতীয় পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে টোকিওতে বাস্তবতঃ ত্রাসের সৃষ্টি হইল। কারণ, পরদিন এমন আভাষ পাওয়া গেল যে, জাপান আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছে।

১০ই এপ্রিল সকাল সাড়ে ৭টায় টোকিও রেডিও থেকে এবং পরে দুপুরবেলা ওয়াশিংটনে সরকারীভাবে সুইডিস ও সুইস দূতাবাসের মারফৎ জাপানের আত্মসমর্পণের জন্য 'মহিমান্বিত সম্রাটের অনুজ্ঞার' খবর পাওয়া গেল। ২৬শে জুলাই, ১৯৪৫, পটসডাম থেকে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন এবং পরে সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়কের অনুমোদিত যে চরমপত্র ঘোষিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, জাপান তা' গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু সর্ত এই যে, সার্বভৌম শাসক হিসাবে সম্রাটের বিশেষ অধিকার ও মর্যাদা ক্ষুন্ন করা চলিবে না। জাপানী গবর্নমেণ্ট আশা করেন যে, তাঁদের এই অনুরোধ রক্ষা করা সম্পর্কে মিত্রপক্ষের কাছ থেকে অতি দ্রুত স্পষ্ট আভাষ পাওয়া যাইবে।

এই বার্তা পাওয়ার পর ট্রুম্যান তাঁর সমর, নৌ, পররাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রপতির প্রধান রণ অধিকর্তা—এই চারজন শীর্ষস্থানীয় ব্যাক্তির সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠিল জাপানের সম্রাট জাপানী প্রশাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং তাঁকে বজায় রাখিয়া জাপানের জঙ্গীবাদ উচ্ছেদ করা কি সম্ভব?

তখন মন্ত্রীরা তাঁকে যে পরামর্শ দিলেন সংক্ষেপে তার মর্ম এই যে, জাপানী সম্রাজ্যের আত্মসর্পণ কার্যকর করার পক্ষে সম্রাটকে বজায় রাখা সুবিধাজনক হইবে। কেননা, সম্রাটের অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কেউ সাহস পাইবে না। অপর দিকে পটসডাম ঘোষণার নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবীর মর্যাদাও বজায় রাখিতে হইবে। সুতরাং অনেক চিন্তা ভাবনার পর এই মর্মে এক জবাবের খসড়া রচিত হইল যে, জাপান কর্তৃক আত্ম সমর্পণের পর থেকে সম্রাটের ও জাপান সরকারের কর্তৃত্ব মিত্রপক্ষীয় সুপ্রীম কমাণ্ডারের আজ্ঞাধীন হইবে। অধিকন্তু সম্রাট ও জাপানী হাইকম্যাণ্ডকে আত্ম সমর্পণের সর্ত স্বাক্ষর করিতে হইবে।

(১) ট্রুম্যান—প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১০

সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ, চীনা ও রুশ সরকারকে এই খসড়া জবাবের প্রতিলিপি পাঠাইয়া দেওয়া হইল। এই খসড়া গৃহীত হইল বটে, কিন্তু বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রধান মন্ত্রী এ্যাটলি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেভিন সম্রাট সম্পর্কে এই মর্মে এক সংশোধনী প্রস্তাব জুড়িয়া দিলেন যে, জাপ গবর্নমেণ্ট ও জাপানী হাইকমাণ্ডের আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষরদান সম্রাট কর্তৃক সুনিশ্চিত করিতে এবং তাঁদেরকে উপযুক্ত ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব অর্পণ করিতে হইবে।

চীন ট্রুম্যানের প্রস্তাব গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু সোভিয়েত সরকার জানাইলেন যে, জাপানের প্রস্তাব নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ নয়। সুতরাং সোভিয়েত সৈন্যেরা মাঞ্চুরিয়ায় যুদ্ধ বন্ধ না করিয়া আগাইয়া যাইতেছে। তবে, মার্কিন প্রস্তাব সম্পর্কে সোভিয়েত সরকার কিছুটা ইতস্ততঃ ও দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের পর জানাইলেন যে, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের খসড়া প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বটে, কিন্তু জাপানী আত্মসমর্পণ কার্যকর করার জন্য মার্কিন ও সোভিয়েত (মার্শাল ভেসিলেভস্কি) দুইজন সুপ্রীম কমাণ্ডার নিয়োগ করা উচিত। মার্কিন পক্ষ সরাসরি এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য মলোটোভ ও ষ্ট্যালিন পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শের পর সেই রাত্রেই মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে টেলিফোনে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁরা ট্রুম্যানের খসড়া প্রস্তাবেই সম্মত।

ট্রুম্যান লিখিয়াছেন যে, মিত্রশক্তি কর্তৃক দখলীকৃত জার্মানীতে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁদের হইয়াছে তাতে জাপান সম্পর্কে তার পুনরাবৃত্তি না করিতে ট্রুম্যান স্বয়ং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন অধিকৃত জার্মানীতে ও অষ্ট্রিয়াতে সোভিয়েতের আচরণ থেকে আমেরিকার যে যে শিক্ষালাভ হইয়াছে, তাতে মিত্রশক্তিবর্গকে কিছুতেই জাপানে দখলদারির অংশ দেওয়া হইবে না। (১০)

* * *

মিত্রপক্ষের তিন শক্তির কাছ থেকে অনুমোদন লাভের পর প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান জাপানের উদ্দেশ্যে রচিত তাঁর বার্তায় বৃটিশ সংশোধনী প্রস্তাবের সঙ্গে নিজেদের সংযোজন যুক্ত করিয়া সম্রাট সম্পর্কে নিম্নলিখিত চূড়ান্ত বাক্যটি রচনা করিলেন :

"The Emperor will be required to authorize and ensure the signature the Government of Japan…"

এই বার্তা স্বাক্ষরের তারিখ ছিল ১১ আগষ্ট, ১৯৪৫ এবং কূটনৈতিক নিয়মমাফিক সুইস্ দূতাবাসের মারফৎ টোকিওতে এই বার্তা পাঠানো হইল।

জেনারেল ম্যাক-আর্থার মিত্রপক্ষের তরফ থেকে জাপানের সুপ্রীম কমাণ্ডার নিযুক্ত হইলেন এবং জাপানের আত্মসমর্পণ গ্রহণের অধিকার তাঁকে দেওয়া হইল অধিকন্তু নির্দেশ দেওয়া হইল যে, জাপানী সৈন্যবাহিনীকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় লর্ড মাউণ্ট-ব্যাটেনের কাছে, দূরপ্রাচ্যে সোভিয়েত হাইকমাণ্ডের কাছে এবং চীনে চিয়াং কাই-সেকের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

কিন্তু চীনে জেনারেল চিয়াং কাইসেকের সঙ্গে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির তীব্র

(১০) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪১৬

বিরোধের জন্য জাপানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণের প্রশ্নেও তিক্ত মতভেদ দেখা দিল। কারণ, চীনা কমিউনিষ্ট বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল চু:ত কমিউনিষ্ট দখলীকৃত এলাকাগুলিতে জাপানী সৈন্যদেরকে তাঁদের (কমিউনিষ্টদের) নিকট আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলেন।

ঐই সংবাদ পাওয়ার পর ট্রুম্যান কড়া হুকুম জারি করিলেন যে, কোন রাজনৈতিক দলের কাছে জাপানী সৈন্যদে: আত্মসমর্পণ করা চলিবে না। কারণ, এটা পটসডাম ঘোষণা:ও বিরোধী এবং চীনে গৃহযুদ্ধ বাধিতে পারে, এমন কোন কার্যের উস্কানি দেওয়াও চলিবে না। জাপানী বাহিনীকে একমাত্র মিত্রপক্ষীয় গবর্নমেণ্ট মূহের প্রতিনিধিদের কা.ছ আত্মসমর্পণ কবিতে হইবে।

কিন্তু আত্মসমর্পণের দাবি থেকে সম্রাটকে রেহাই দেওয়া সত্ত্বেও ১৩ই আগষ্ট জাপানের কাছ থেকে যখন কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন ওয়াশিংটনে উৎকণ্ঠা দেখা দিল। কারণ, উগ্র জঙ্গীবাদীদের শান্ত করার জন্যই সম্রাট সম্পর্কে এই বিবেচনা দেখানো হইয়াছিল। এই উৎকণ্ঠার বর্ণনায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বার্নস (Byrnes) যে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছেন, সেটা কম উল্লেখযোগ্য নয়:

'Never have I known time to pass so slowly…'

'সময় যে এত মন্দগতিতে চলে, একথা আগে কখনও জানতুম না।'—১১

অবশেষে ১৪ই আগষ্ট অপরাহ্নে ৪টা ৫ মিনিটের সময় সেই বহুপ্রার্থিত খবর পাওয়া গেল:

"জাপান আত্মসমর্পণ করেছে।" (১২)

সন্ধ্যা ৬টার সময় ওয়াশিংটনের সুইস্ দূতাবাস মারফৎ সরকারীভাবে জাপানের আত্মসমর্পণের বার্তা মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রীর হাত দিয়া হোয়াইট হাউজে পৌঁছল, যে বার্তার ফলে জাপানের প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিল। চতুঃশক্তির নিকট প্রেরিত ঐতিহাসিক বার্তাটি এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে:

1 His majesty the Emperor has issued an Imperial rescript regarding Japanese acceptance of the provisions of the Potsdam declaration.

2. His maj sty the Emperor is prepared to authorise and ensure the signature by his Government and the Imperial General Headquarters of the necessary terms for carrying out the provision of the Potsdam declaration His majesty is also prepared to issue his commands to all the military, naval, and air authorities of Japan and all the forces under their control whereever located to cease active operation, to surrender arms and to issue such other orders

স্বাক্ষর করিতে হ Japan Subdued Herbert Feis, p 127.

(১) ট্রুম্যান—ট্রুম্যান, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৮০

as may be required by the Supreme Commander of the Allied Forces for the execution of the above-mentioned terms.—(১৩)

এর সহজ মর্ম এই-'১। মহামান্য সম্রাট জাপান সরকার কর্তৃক পটসডাম ঘোষণার শর্তাবলী গ্রহণ সম্পর্কে একটি রাজকীয় অনুজ্ঞা জারি করিয়াছেন।

২। পটসডাম ঘোষণার অনুচ্ছেদগুলি কার্যক্ষেত্রে পালনের উদ্দেশ্যে জাপানের সরকার ও সামরিক সদর দপ্তর কর্তৃক যে সমস্ত শর্ত স্বাক্ষরের প্রয়োজন হইবে, মহিমান্বিত সম্রাট সেগুলির সম্পর্কে নিশ্চয়তা বিধান ও কর্তৃত্বদানের জন্য প্রস্তুত আছেন। জাপানের সমস্ত স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনীর কর্তৃপক্ষের অধীন যে সমস্ত সৈন্য আছে, তারা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, তাদের সকলকে রণক্রিয়া বন্ধ করিতে এবং অস্ত্রসমর্পণ করিতে আদেশ দেওয়ার জন্য মহামান্য সম্রাট প্রস্তুত আছেন। উপরোক্ত শর্তগুলি কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করার জন্য মিত্রপক্ষীয় বাহিনী-গুলির সর্বোচ্চ অধিনায়ক যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজনীয় মনে করিবেন, মহামান্য সম্রাট সেগুলি পালনের জন্যও হুকুম জারি করিতে ইচ্ছুক আছেন।'

বলা বাহুল্য যে, সরকারীভাবে জাপানের আত্মসমর্পণের এই বার্তা পাওয়ার পর সন্ধ্যা ৭টার সময় প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান হোয়াইট হাউজে সমবেত সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকট এই ঐতিহাসিক খবর ঘোষণা করিলেন এবং সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও পৃথিবীর সর্বত্র মিত্রপক্ষীয় মহলে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল।

সম্রাটকে গ্রেপ্তারির চক্রান্ত

কিন্তু সরকারীভাবে জাপানের আত্মসমর্পণের আগে খোদ রাজধানী টোকিওতে এমন সব লোমহর্ষক এবং চক্রান্তমূলক ঘটনাবলীর সমাবেশ হইয়াছিল, যে ঘটনাবলী রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধে কিংবা বেপরোয়া হত্যাকাণ্ডে পরিণত হইতে পারিত। কারণ, জাপানে আসল ক্ষমতা পরিচালনা করিত সামরিক নায়কেরা এবং তাদের মধ্যে এমন একটি গোষ্ঠী ছিল, যারা মিত্রপক্ষের নিকট পরাজয় স্বীকার বা আত্মসমর্পণ করিতে আদৌ রাজী ছিল না। অবশ্য সম্রাটের প্রতি তাদের অনুরক্তিও কম ছিল না। তথাপি পটসডাম ঘোষণার প্রশ্নে গভীর বিতণ্ডা দেখা দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বয়ং সম্রাট এই ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িলেন কিংবা হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলেন। পার্ল হারবারের ব্যাপারে সম্রাটের সম্মতি ছিল বটে, কিন্তু সেই আক্রমণের সিদ্ধান্ত ছিল সামরিক নেতাদের। কিন্তু পটসডাম ঘোষণা গ্রহণের দায়িত্ব স্বয়ং সম্রাট স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। সুতরাং জাপানের প্রভাবশালী মহলে সংশয় দেখা দিল যে, মিলিটারি কি সম্রাটের সিদ্ধান্ত কার্যকর করিতে ইচ্ছুক হইবে? কারণ, শান্তি আলোচনার সূত্রপাত থেকেই মিলিটারির একটা অংশে এর বিরুদ্ধে কানাঘুষা শুনা যাইতেছিল এবং আর্মির নিকট গোপনসূত্রে যতই পটসডাম ঘোষণাকে কেন্দ্র করিয়া পর্দার অন্তরালবর্তী আলোচনা ও মিত্রপক্ষের নিকট বার্তা আদান-প্রদানের সংবাদ পৌঁছিতেছিল, ততই সামরিক মহলের একটা চক্র উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। ১১ই আগষ্ট থেকেই চক্রান্ত শুরু হইয়াছিল। কোন কোন পদস্থ সেনাপতিও এই চক্রান্তের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন বটে, তবে তাঁরা

(১৩) Truman—Vol-1, p. 48

হাতে-কলমে সম্রাটের বিরুদ্ধে কিছু করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু ১৪ই আগষ্ট রাত্রে এই চক্রান্ত এক চরম নাটকীয় কাণ্ডের রূপ ধারণ করিল। জাপানের কয়েকটি সম্পন্ন পরিবারের তরুণ অফিসাররা ছিলেন অত্যন্ত উগ্র মস্তিষ্ক। তাঁরা জাপানের আত্মসমর্পণে বাধা দেওয়ার জন্য এক আকস্মিক অভ্যুত্থান ঘটাইবার এবং সম্রাটকে বন্দী করিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করিলেন। (১৪)

এই চক্রান্তকারী দলের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিলেন মেজর হাতানাকা। তাঁকে সমর্থন জানাইলেন মন্ত্রী দপ্তরের সহকর্মী জিরো শিজাকি এবং এঁদের হস্ত শক্তিশালী করিলেন প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজোর জামাতা মেজর কোগা ও যুদ্ধ মন্ত্রী দপ্তরের কর্নেল ইডা। রাজপ্রাসাদের প্রহরী বাহিনীর (ইম্পিরীয়েল গার্ডস ডিভিসন) কিছু কিছু সদস্যের সঙ্গে এই সমস্ত চক্রান্তকারী যোগাযোগ স্থাপন করিলেন এবং তাঁরা নানাভাবে চেষ্টা করিলেন প্রহরীবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল মোরিকে হাত করার জন্য। খোদ যুদ্ধ মন্ত্রী জেনারেল আনামির শ্যালক কর্নেল তাকেসিতাকেও এই চক্রান্তকারীরা দলে টানিতে চাহিলেন বটে, কিন্তু কিছুটা সহানুভূতি থাকিলেও কর্নেল তাকেসিতা এমন মারাত্মক ষড়যন্ত্রে মনেপ্রাণে সায় দিতে পারিতেছিলেন না। তথাপি মেজর হাতানাকার উৎসাহে কোন ভাঁটা পড়িল না। তিনি তাঁর বিদ্রোহী দলবল নিয়া মধ্যরাত্রে রাজপ্রাসাদে হানা দিলেন এবং প্রাসাদের চত্বরে প্রাচীরের অভ্যন্তরে যেখানে রাজকীয় প্রহরীবাহিনীর সদর দপ্তর ছিল এবং বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল মোরির কক্ষ ছিল, হাতানাকা তাঁর সঙ্গীদের নিয়া সেই কক্ষে ঢুকিয়া পড়িলেন। ওদিকে প্রহরী বাহিনীর সৈন্যেরা চঞ্চল হইয়া অট্টালিকার ও দরদালানে ছুটাছুটি ও হৈ চৈ শুরু করিয়া দিয়াছিল। হাতানাকা মোরিকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। কেন না, মোরির অধিনায়কত্ব ছাড়া এই প্রাসাদ-বিদ্রোহ সফল করার সম্ভাবনা ছিল না। জেনারেল মোরি তরুণ বিদ্রোহী গোষ্ঠীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া ভয়ানক বিব্রত ও বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মোরি হাঁ বা না কিছুই বলিলেন না। হাতানাকা তখন তাড়াতাড়ি যুদ্ধমন্ত্রীর দপ্তরে গিয়া কর্নেল তাকেসিতাকে দিয়া কার্যোদ্ধার করিতে চাহিলেন এবং বলিলেন যে, রাত্রি ২টার সময় দ্বিতীয় রেজিমেণ্ট রাজপ্রাসাদে ঢুকিয়া পড়িবে। তাঁদের অফিসারেরা রাজী আছেন। তখন যুদ্ধ মন্ত্রী জেনারেল আনামি যদি নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তা হলে জাপান আত্মসমর্পণ থেকে রক্ষা পাইয়া যাইবে। সুতরাং যুদ্ধ মন্ত্রীকে রাজী করাইবার জন্য কর্নেল তাকেসিতার সাহায্য দরকার।

কিন্তু তাকেসিতা তখন সমস্ত ব্যাপারটা চিন্তা করিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন যে, তাঁর ভগ্নিপতি জেনারেল আনামি এমন বিদ্রোহে রাজী হইবেন না। সুতরাং তাকেসিতা মদের গ্লাস হাতে নিয়া সুরা পান করিতে করিতে হাতানাকাকে নিরস্ত করিতে চাহিলেন এবং দৃঢ়তারসঙ্গে বলিলেন—'অত্যন্ত বিলম্ব হয়ে

(১৪) টোট্যাল ওয়ার—(দ্বিতীয় খণ্ড) পৃষ্ঠা ৩৪৪

গেছে। এই বিদ্রোহ সফল করার জন্য চারজন উচ্চতম পর্যায়ের সেনাপতি বা জেনারেল আনামি, জেনারেল টানাকা, জেনারেল মোরি এবং জেনারেল উমেজুর একমত হওয়া দরকার। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়।' অর্থাৎ তাকেসিতা হাতানাকাকে কার্যতঃ বলিয়াই দিলেন যে, এই প্রকার অভ্যুত্থান ব্যর্থ হইতে বাধ্য। (১৫)

কিন্তু মেজর হাতানাকা তাতেও নিরস্ত হইলেন না। তিনি সেই গভীর রাত্রে যুদ্ধ মন্ত্রীর দপ্তর থেকে হন্তদন্ত হইয়া রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন এবং এই অস্বাভাবিক উত্তেজনার মধ্যে ছুটাছুটির জন্য ঘর্মাক্ত কলেবর হইতে লাগিলেন। তিনি এবং তাঁর একজন সঙ্গী সোজা প্রহরীবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল মোরির কক্ষে ঢুকিয়া পড়িলেন। মোরির সঙ্গে তখন বিদ্রোহীরা প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ধরিয়া আলোচনা চালাইতেছিলেন। মোরির ঘরে তখন কর্নেল শিরাইসি (মোরির শ্যালক) ছাড়া আর কেহ ছিলেন না। রাত তখন ২টা, গভীর নিশীথে হাতানাকা যেন তাঁর ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি মোরিকে শেষবারের জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বিদ্রোহে তিনি যোগ দিতে রাজী আছেন কিনা। কিন্তু মোরি নিঃশব্দ রহিলেন। তখন হাতানাকা ক্ষিপ্ত হইয়া হঠাৎ তাঁর রিভলভার বাহির করিলেন এবং সোজাসুজি গুলী করিয়া জেনারেল মোরিকে হত্যা করিলেন। আর তাঁর সঙ্গী তরোয়াল দিয়া মোরির বাম কণ্ঠে এক কোপ বসাইয়া দিলেন। কর্নেল শিরাইসি এই আকস্মিক ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডে স্তম্ভিত ও আতঙ্কিত হইয়া যখন হত্যাকারীদ্বয়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত হইলেন, তখন হাতানাকার সঙ্গী তাঁর সেই রক্তসিক্ত তরোয়াল দিয়া কর্নেল শিরাইসির ঘাড়ের উপর এমন প্রচণ্ড আঘাত হানিলেন যে, তাঁর মাথা দেহ থেকে প্রায় আলগা হইয়া পড়িল।...

এই খুনখারাপির পর মেজর হাতানাকা জেনারেল মোরির শীলমোহর জাল করিয়া এবং জাল হুকুমনামা জারি করিয়া রাজপ্রাসাদের প্রহরীবাহিনীকে বিদ্রোহীদের হাতে তুলিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিলেন।

রাত্রি তখন ২-১৫, ১৪ আগষ্ট (ইংরাজী মতে ১৫ আগষ্ট), হাতানাকা মনে করিলেন রাজপ্রাসাদ তাঁর দখলে আসিয়া গিয়াছে এবং সেই সঙ্গে সম্রাটও। কিন্তু তিনি জানিতেন যে, সম্রাট হিরোহিতো ১৫ই আগষ্ট দুপুরে জাতির উদ্দেশ্যে বেতার যোগে ভাষণ দিবেন, পটসডাম ঘোষণা অনুযায়ী সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে আত্মসমর্পণের জন্য হুকুম দিবেন। সুতরাং এই ভাষণ দান বন্ধ করিতে হইবে এবং তার জন্য প্রয়োজন বেতারের রেকর্ড হস্তগত করা। যদিও সেই বেতার ভাষণ তৈরী হওয়ার পর ১২টা ৫ মিনিটের সময় সম্রাট শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন এবং যদিও সেই রেকর্ড রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে প্রশাসনিক বিল্ডিংয়ের দেওয়ালের একটি নিরাপদ সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, তথাপি হাতানাকা ও তাঁর সঙ্গীরা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কোথাও তার সন্ধান পাইলেন না।

---

(১৫) দি ফল্ অব জাপান, পৃষ্ঠা ১৬৮-৬৯

এদিকে ঘুমন্ত সম্রাটকেও কেউ জাগাইতে সাহস পাইতেছিলেন না। লর্ড প্রীভিশীল মাকুইস কিডো বিদ্রোহের আঁচ পাইয়া প্রাসাদের নীচের কুঠুরিতে আত্মগোপন করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে আরও প্রায় ১৭জন বেতার বিভাগীয় অফিসারের জীবন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কার্যত তাঁরাও বিদ্রোহীদের হাতে বন্দী ও জামিনস্বরূপ আটক ছিলেন। (১৬)

অন্যদিকে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে মদের ফোয়ারা বহিতে লাগিল। কিন্তু বিদ্রোহীদের চূড়ান্ত ভাগ্যনিয়ামক সেই বেতার রেকর্ডের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। ক্রমে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল এবং চক্রীদের উৎসাহে ভাঁটা পড়িল—শেষ পর্যন্ত তারা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। (১৭)

কিন্তু 'আধুনিক জাপানের ইতিহাস' (ইংরাজী) প্রণেতা এই বিদ্রোহের ব্যর্থ সমাপ্তির একটি ভিন্ন চিত্র দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, কিছু বিদ্রোহী তরুণ সৈন্য কর্তৃক রাজপ্রাসাদ দখল ও অভ্যুত্থান ঘটাইবার চেষ্টার খবর টোকিওর সৈন্যবাহিনীর সদর দপ্তরে পৌঁছিয়াছিল এবং দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ রাজপ্রাসাদে গিয়া হাজির হইলেন। তিনি তাঁর একমাত্র ব্যক্তিত্বের জোরে ও আবেগপূর্ণ বাগ্মিতার গুণে বিদ্রোহী নায়কদের অভিভূত করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁদেরকে বুঝাইলেন যে, এভাবে মাথা গরম করিয়া বিদ্রোহ ঘটাইবার চেষ্টা অত্যন্ত অন্যায়। তখন বিদ্রোহীরা তাঁদের ভুল বুঝিতে পারিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলেই চারজন বিদ্রোহী আত্মহত্যা করিলেন।...

সকালবেলা সম্রাটের প্রাসাদের বাইরে পাইন অরণ্য থেকে দুই ব্যক্তি বাহির হইয়া আসিলেন। এঁরা ছিলেন বিদ্রোহীদের নেতা হাতানাকা এবং তাঁর সঙ্গী মিজাকি। বিদ্রোহের ব্যর্থতা এবং তাঁদের কার্যের জন্য তাঁরা অনুতপ্ত হইলেন। মিজাকি সম্রাটের প্রাসাদের দিকে মুখ করিয়া নতজানু হইলেন এবং তারপর 'উৎসবের ছুরিকা' দিয়া নিজ হাতে নিজের পেট কাটিয়া হারাকিরি করিলেন আর মেজর হাতানাকা, যিনি কয়েক ঘণ্টা আগে প্রাসাদের রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ককে পিস্তলের গুলি দিয়া হত্যা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি নিজেই সেই পিস্তল দিয়া নিজের দুই চোখের মধ্যে গুলি করিলেন। তাঁর রক্তলিপ্ত কৃশতনু মাটিতে ঢলিয়া পড়িল। সেই রক্তের উপর প্রভাতসূর্যের আলো পড়িয়া জ্বল জ্বল করিতে লাগিল।' (ফল অব্ জাপান পৃষ্ঠা ১৮৮)।

ওদিকে তখন সমর মন্ত্রী জেনারেল আনামি তাঁর আবাসকক্ষের বারান্দায় বসিয়া পৃথিবী থেকে শেষ বিদায় গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন এবং তিনি একটা বিদায় ব্যঞ্জক কবিতাও লিখিতেছিলেন। যদিও তিনি যুদ্ধে পরাজয় স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন না, তথাপি তিনি অনুরক্ত প্রজা হিসাবে সম্রাটের সিদ্ধান্ত মানিয়াছিলেন এবং মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের দ্বারা কোন জটিলতাও সৃষ্টি করেন নাই। তিনি ষ্টাফ অফিসারদের একাংশের বিদ্রোহের আঁচ পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাদেরকে বাধাও দেন নাই। কিংবা তাঁদের কার্যের অনুমোদনও করেন নাই। কারণ, 'তার হৃদয়

(১৬) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৭৩
(১৭) টোট্যাল ওয়ার্—দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৫

ছিল বিদ্রোহের পক্ষে, কিন্তু তাঁর মস্তিষ্ক ছিল বিদ্রোহের বিপক্ষে'। বিদায় গ্রহণের বার্তা রচনা শেষ হওয়ার পর জেনারেল আনামি ভোর রাত্রি চারটার সময় সম্রাটের প্রাসাদের দিকে মুখ করিয়া বসিলেন এবং তারপর নিজ হাতে একটি তীক্ষ্ণ ছোরা দিয়া তাঁর নিজের উদর কাটিয়া ফেলিলেন এবং তাতেও ক্ষান্ত না হইয়া সেই ছোরা নিজের ঘাড়ে বিদ্ধ করিলেন। (১৮)

সমর মন্ত্রী হিসাবে জেনারেল আনামি যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য নিজেকে দায়ী ও অপরাধী মনে করিলেন। সুতরাং জাতির প্রতি তিনি যে অন্যায় করিয়াছিলেন এবং সৈন্যেরা মহামান্য সম্রাটের প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া যে 'অপবিত্র' কাজ করিয়াছিলেন, এই হারাকিরির দ্বারা তিনি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন!

* * *

টোকিওতে গভীর রাত্রে নিদ্রামগ্ন নাগরিকদের অজ্ঞাতসারে যখন নিঃশ্বাসরোধকারী গোয়েন্দাকাহিনীর মত এই সমস্ত নিদারুণ উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাবলী ঘটিতেছিল, তখন সম্রাট তাঁর প্রাসাদকক্ষে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছিলেন এবং পরদিন ১৫ আগষ্ট দ্বিপ্রহরে যেন এই নাটকের সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্য হিসাবে সম্রাটের বেতার বক্তৃতা জাতির উদ্দেশ্যে প্রচারিত হইল। যদিও তাতে মিত্রপক্ষের নিকট জাপানের আত্মসমর্পণের কথা ঘোষিত হইল, তথাপি সম্রাটের 'রাজকীয় ঐতিহ্য' অনুযায়ী সালঙ্কার ও সাড়ম্বর ভাষার ঐশ্বর্যে অনেক প্রজাই সহসা সেই ভাষণ অনুধাবন করিতে পারিলেন না। বরং অধিকাংশ সাধারণ প্রজাই বিহ্বল ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু এই রাজকীয় ভাষণ সত্ত্বেও জাপানের সর্বত্র কর্নেল ও মেজররা সভা সমিতিতে আত্মসমর্পণের কথা আলোচনা করিতেছিলেন। এমন কি বিমানবাহিনীর 'আত্মবিনাশী' যে সমস্ত পাইলট (সুইসাইড স্কোয়াড) জাতির পক্ষ থেকে চূড়ান্ত চেষ্টার জন্যে প্রস্তুত হইতেছিলেন, তাঁরা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, টোকিও উপসাগরে আমেরিকার যে যুদ্ধজাহাজ 'মিশৌরি'তে জাপানের আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হইবে, এই আত্মবিনাশী পাইলটের দল সেই জাহাজটির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বিস্ফোরণ ঘটাইবে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই চক্রান্ত একেবারে শেষ মুহূর্তে বানচাল হইয়াছিল।...

কিন্তু সম্রাট হিরোহিতো জাতির উদ্দেশ্যে তাঁর বেতার বক্তৃতায় বৃটেন ও আমেরিকাকে লক্ষ্য করিয়া এমন কয়েকটি কথা বলিলেন, (সম্ভবতঃ এগুলি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত মত) যেগুলি মিত্রপক্ষের নিকট আদৌ প্রীতিপদ ছিল না :

'We declared war on America and Britain out of our sincere desire to ensure Japan's self preservation and the stabilization of South East Asia, it being far from our thought either to infringe upon the sovereignty of other nations or to embark upon territorial aggrandizement. (19)

(১৮) রিচার্ড স্টোরি—পৃঃ ৩৬

(১৯) Total War—2nd Vol. p, 346—347

জাপানের আত্মসংরক্ষণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্থায়িত্ব বিধানকে সুনিশ্চিত করার আন্তরিক ইচ্ছা নিয়াই আমরা আমেরিকা ও বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলাম। অন্যান্য জাতির সার্বভৌম স্বাধীনতা লঙ্ঘন করা কিংবা পররাজ্য দখলের লিপ্সা পূরণ করার কোন ইচ্ছা আমাদের ছিল না।

কিন্তু সম্রাটের তরফ থেকে আত্মপক্ষ-সমর্থনের এই নির্লজ্জ চেষ্টা সত্ত্বেও পরাজয়ের গ্লানিতে ও দুঃখে জাপানের বহু লোক কাঁদিয়া ফেলিল। তবে, জনসাধারণের অনেকেই আবার যুদ্ধের ভয়াবহ সর্বনাশ এবং অবর্ণনীয় দুর্গতি ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তথাপি জাপানী জনতার বিরাট অংশই যেন ছিল এই শান্তিপর্বের নিষ্ক্রিয় দর্শকের মত! (২০)

(২০) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩৪৮

দশম পর্ব

অষ্টম অধ্যায়

দলিল স্বাক্ষর ঃ আত্মহত্যা ঃ যুদ্ধশেষ

সম্রাটের বেতার ঘোষণার পর এবার দেশপ্রেমগর্বী এবং সাম্রাজ্যবিলাসী জাপানের আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষরের পালা। সুতরাং হিটলারী জার্মানীর মত জঙ্গীবাদী জাপানের পক্ষেও ব্যাপারটা ভয়াবহ রকমের মর্মান্তিক ও নাটকীয় ঘটনায় পরিপূর্ণ ছিল। আগের অধ্যায়ে সেগুলির কিছু কিছু চাঞ্চল্যকর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ব্যাপারগুলি সেখানেই শেষ হইয়া যায় নাই। দলিল স্বাক্ষর থেকে শুরু করিয়া মার্কিন সৈন্যবাহিনী কর্তৃক জাপানী দ্বীপে দখলদারী প্রতিষ্ঠা, এমন কি তার পরেও অনেক রোমহর্ষক ঘটনার সমাবেশ হইয়াছিল।...

১৫ আগষ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের অবসান ঘোষণা করিলেন এবং জেনারেল ম্যাক-আর্থার তাঁর আত্মস্মৃতিতে লিখিয়াছেন যে, যুদ্ধাবসান ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এত অভিনন্দন বার্তা ও এত সম্মানের অধিকারী হইলেন যে, এত সম্মান তিনি জীবনে আগে কখনও পান নাই। সুতরাং 'আনন্দে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। অথচ এর আগে ছোটবেলা থেকে তিনি কখনও চোখের জল ফেলেন নাই।' (১)

জাপানী যুদ্ধের এই উপসংহার পর্বে জেনারেল ডগলাস ম্যাক-আর্থারের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল— ক) মিত্রপক্ষের সর্বোচ্চ সেনাপতি বা সুপ্রীম কমাণ্ডার হিসাবে সর্বত্র সমস্ত জাপানী সৈন্যবাহিনীর আত্মসমর্পণ কার্যকর করা এবং (খ) প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের প্রধান সেনাপতিরূপে নির্দিষ্ট এলকায় জাপানীদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করা। অবশ্য এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করিবেন এ্যাড-মিরাল নিমিৎস এবং জেনারেল ওয়েড মেয়ার।

স্থির হইল জাপানের দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলি আমেরিকার খাস নিয়ন্ত্রণে রাখা হইবে কিংবা কয়েকটি দ্বীপ অষ্ট্রেলিয়াকে দেওয়া হইবে। 'আর ইউরোপীয় মিত্রপুঞ্জ সম্পর্কে ব্যবস্থা হইল বৃটন, কমনওয়েলথ, নেদারল্যাণ্ডস ও ফ্রান্স প্রশান্ত মহাসাগরে এবং এশিয়ার খাস ভূমিতে তাদের কলোনী ও পূর্বেকার অধিকৃত দেশগুলি তাদের নিজেদের চেষ্টায় ও নিজেদের লোক দিয়া পুনরায় উদ্ধার করিয়া নিতে পারিবে।' (২)

অর্থাৎ মহাযুদ্ধের শেষেও এশিয়াতে পশ্চিমী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ বজায় রাখার ইচ্ছা ট্রুম্যান ও ম্যাক-আর্থারের ছিল—এই মনোবৃত্তি লক্ষ্য করার মত।

তবে, সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কে এই নির্দেশ দেওয়া হইল যে, ইয়াল্টা ও

(১) Reminiscences—Douglas MacArther, p. 379

(২) Japan Subdued—Feis, p, 139

পটসডাম চুক্তি অনুসারে রাশিয়া দূর প্রাচ্যে তাদের ভূমিগত দাবীর অধিকার পাইবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ষ্ট্যালিন ট্রুম্যানের নিকট একটি অতিরিক্ত প্রস্তাব পেশ করিলেন। এই প্রস্তাবে বলা হইল যে, ১৯১৯-২১ সালে জাপান সমগ্র সোভিয়েত দূর প্রাচ্য দখল করিয়া নিয়াছিল। সুতরাং 'জনমতকে শান্ত করিবার খাতিরে' রাশিয়াকে হোকাইডো দ্বীপের উত্তর অংশ (মূল জাপানী দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত) দখল করিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও মার্কিন সেনানীমণ্ডলীর প্রধানগণ এই প্রস্তাব দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। কারণ, জাপানে আর কোন শক্তিকে দখলদারির কোন অংশ দেওয়া হইবে না। তবে, কিউরাইল ও দক্ষিণ শাখালিন দ্বীপ সম্পর্কে ইয়াল্টা-পটসডাম চুক্তি মানিয়া লওয়া হইবে এবং সেখানে জাপ সৈন্যদের আত্মসমর্পণ রাশিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে।

আর কোরিয়া সম্পর্কে এই ব্যবস্থা হইল যে, ৩৮নং সমান্তরাল রেখার উত্তরে রাশিয়া এবং দক্ষিণে আমেরিকা জাপ সৈন্যদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করিবে।

যদিও ইন্দোচীনে জাপানী বাহিনীর আত্মসমর্পণ গ্রহণের জন্য ফ্রান্স তার দাবী জানাইয়াছিল, তথাপি দেখা গেল যে, জাপানী সৈন্যদের আত্মসমর্পণ নিষ্পন্ন করার মত শক্তি ও সংগঠন ফ্রান্সের নাই। তখন স্থির হইল যে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সুপ্রীম কমাণ্ডার লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে ফরাসী সরকারের একজন প্রতিনিধিও থাকিবেন। আর হংকংয়ের 'ক্রাউন কলোনী'র (বৃটিশ) জাপ সৈন্যেরা চীনের বদলে বৃটিশ পক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন।

জাপানের এই আত্মসমর্পণকে যথাসম্ভব নাটকীয় এবং আকর্ষণীয় করিবার উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠান টোকিওর যতটা কাছাকাছি সম্ভব নিষ্পন্ন করার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু জাপানের চরমবাদীদের পক্ষ থেকে হানা দেওয়ার আশঙ্কা থাকায় এই অনুষ্ঠান উপকূল ভাগ থেকে টোকিও উপসাগরে ১৮ মাইল দূরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী ও বৃহত্তম (৪৫ হাজার টনের) যুদ্ধজাহাজ 'মিশৌরির' গ্যালারি ডকে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইল কিন্তু এই যুদ্ধজাহাজ বাছাই করা নিয়া আমেরিকার আর্মি ও নেভীর মধ্যে ভিতরে ভিতরে বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। কারণ, নৌ-সচিব ফরেষ্টাল চাহিয়াছিলেন প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-সেনাপতি এ্যাডমিরাল নিমিৎসকে দিয়া আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে। কিন্তু ম্যাক-আর্থার ছিলেন সমগ্র মিত্রপক্ষীয় তরফের সুপ্রীম কমাণ্ডার। সুতরাং এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব তাঁর উপরেই অর্পণ করা হইল। কিন্তু এই বিশাল যুদ্ধজাহাজের নাম 'মিশৌরি' (Missouri) রাখা হইল কেন? কারণ, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান মিশৌরি রাজ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁর কন্যা আনুষ্ঠানিক ভাবে নামকরণ কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। (৩)

জাপানে আমেরিকানদের সদর সামরিক কার্যালয় সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইয়োকোহামায়। ম্যাক-আর্থার কিঞ্চিৎ গর্বের সঙ্গে লিখিয়াছেন যে, জাপানীদের আত্মসমর্পণ গ্রহণের জন্য তিনি ইয়োকোহামার আটসুগি (Atsugi)

(৩) Japan Subdued—p. 155

বিমান বন্দরে অবতরণ করার পর যখন শহরের দিকে তাঁর দলবল নিয়া মোটর শোভাযাত্রা যোগে যাইতেছিলেন, তখন সেই ৫ মাইল পথের দুই ধারে দুই ডিভিসন বা ৩০ হাজার জাপানী সৈন্য লাইন বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং তাঁকে জাপ সম্রাটের অনুরূপ মর্যাদায় পাহারা দিয়াছিলেন! তথাপি মার্কিন মহলে জাপানীদের প্রতি পুরাপুরি বিশ্বাস ছিল না। সুতরাং ম্যাক-আর্থারের মনেও কিছুটা সংশয় দেখা দিয়াছিল এবং তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, এত সৈন্য দিয়া পাহারা দেওয়ার পিছনে জাপানীদের কোন গূঢ় মতলব নাই তো?

হার্বার্ট ফিজ লিখিয়াছেন যে, স্বয়ং ষ্ট্যালিনের চিত্তেও এই বিষয়ে গভীর সন্দেহ ছিল ২৭ আগষ্ট তারিখ তিনি মস্কোস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারিম্যানের নিকট মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, জাপানীদের বিশ্বাস নাই তাদের মধ্যে অনেক মাথা পাগলা গুপ্তঘাতক ও বিশ্বাসঘাতক রহিয়াছে। সুতরাং মিত্রপক্ষীয় প্রতিনিধিদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জাপানের বিশিষ্ট রাষ্ট্রনেতা ও রণনেতাদেরকে গ্রেপ্তার করিয়া জামিনস্বরূপ আটক রাখা উচিত। (৪)

এই সন্দেহের আর একটি দৃষ্টান্ত স্বয়ং ম্যাক-আর্থারের বই থেকেই উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুপ্রীম কমাণ্ডার সদলে ইয়োকোহামার বিরাট হোটেল--নিউ গ্রাণ্ড হোটেলে যখন প্রথম রাত্রে ডিনার খাইতে বসিলেন, তখন তাঁর টেবিলে পরিবেশিত প্রথম প্লেটটি তাঁহার এক সহকর্মী হঠাৎ কাড়িয়া লইয়া গেলেন এবং পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, তাঁর খাদ্যে বিষ মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে কিনা!

অবশ্য ম্যাক-আর্থার তখন সহাস্যে মন্তব্য করিয়াছিলেন—"কেউ কি চিরকাল বেঁচে থাকে?"...(৫)

২রা সেপ্টেম্বর, সকাল ৯ টায় (টোকিও সময়) 'মিশৌরি' যুদ্ধজাহাজে আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের প্রস্তুতি করা হইল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া এই দলিল স্বাক্ষরে উপস্থিত ছিলেন বৃটিশ, সোভিয়েত, চীনা, অষ্ট্রেলিয়ান, কানাডীয়ান, নিউজিল্যাণ্ড, ডাচ ও ফরাসী—এই মিত্রপুঞ্জের প্রতিনিধিবর্গ। সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে যিনি এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন প্রায় একজন অজ্ঞাত পরিচয় সেনাপতি জেনারেল ডেরেভিয়াংকো। এর দ্বারা অনুমান করা যাইতেছে যে, রাশিয়া নিজের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানের উপর তেমন কোন গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহেন নাই। কারণ, জাপানী সৈন্যবাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং জাপানে দখলদারির অংশ প্রাপ্তির দাবী নিয়া ট্রুম্যানের সঙ্গে ষ্ট্যালিনের বিরোধ ও মন কষাকষি চলিতেছিল।

আর একদিকে জাপানের পক্ষ থেকেও সংশয়াচ্ছন্ন প্রশ্ন দেখা দিল কোন্ জাপানী নেতা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর দিবেন? যদিও জাপানের সম্রাটের প্রশ্নে পটসডাম ঘোষণা অনুযায়ী এই দলিলকে কার্যতঃ নিঃশর্ত বলা চলে না, তথাপি

(৪) জাপান সাবডিউড—পৃষ্ঠা ১৫৫ পাদটীকা
(৫) ম্যাক-আর্থার—পৃষ্ঠা ৩০৬

উগ্রপন্থী ও সন্ত্রাসবাদী সৈন্যদের পক্ষ থেকে এক্ষেত্রেও ভয় ছিল। সুতরাং সম্রাট কর্তৃক পটসডাম ঘোষণা অনুযায়ী আত্মসমর্পণের দাবী গৃহীত হওয়ার পর সুজুকি-মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিলেন এবং যেহেতু আত্মসমর্পণের ব্যাপারটা স্বয়ং সম্রাটের নির্দেশের অধীন ছিল, সেজন্য স্থির হইল নূতন মন্ত্রিসভাও রাজপরিবারের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা গঠিত হইবে। সম্রাটের আত্মীয় (যিনি সৈন্যবাহিনীর একজন জেনারেল) প্রিন্স হিগাশি কুনি প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন এবং জাপানের অন্যতম সম্মানভাজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স কোনোয়ে ডেপুটি প্রধান মন্ত্রীর পদগ্রহণে সম্মত হইলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বা ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী কেউ আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর দিতে রাজী হইলেন না, কিংবা সাহস পাইলেন না। প্রিন্স কোনোয়ে জাপানের এক শীর্ষস্থানীয় নেতা হওয়া সত্ত্বেও জাপানের এই পরাজয়ে ও আত্মসমর্পণের ব্যাপারে মর্মাহত হইলেন। এমন কি পাছে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে তিনি আদালতে অভিযুক্ত হন, এই দুশ্চিন্তায় তিনি শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করিলেন। অথচ ব্যক্তিগত ভাবে প্রিন্স কোনোয়ে কিন্তু জঙ্গীবাদী ছিলেন না। তিনি আমেরিকা ও রাশিয়ার সঙ্গে শান্তিরক্ষা ও আপোষ মীমাংসারই পক্ষপাতী ছিলেন। তথাপি সেদিনের জাপানের সামরিক ঘূর্ণাবর্তের প্রচণ্ড ঝাপ্টা থেকে তিনিও রেহাই পাইলেন না। তাঁর মত আরও অনেককেই মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছিল।...

আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর দানের এই সমস্যার মীমাংসা হইল বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ পররাষ্ট্র মন্ত্রী সিগেমিৎসুর দ্বারা। রাজকীয় নির্দেশে তিনিই জাপানের পক্ষ থেকে প্রধান প্রতিনিধির দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন এবং তাঁর উপর সম্রাটের এত আস্থা আছে জানিয়া সিগেমিৎসু বরং নিজেকে সম্মানিত বোধ করিলেন। ইতিপূর্বে তিনি আরও দুইবার পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন এবং তিনি যুদ্ধ শেষ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন।

কিন্তু সৈন্যবাহিনীর প্রতিনিধি জেনারেল উমেজু যদিও দ্বিতীয় ডেলিগেটরূপে মনোনীত হইলেন, তথাপি তিনি দলিল স্বাক্ষরে অত্যন্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। এমন কি, যখন এই প্রস্তাব তাঁর নিকট প্রথম করা হইয়াছিল, তখন তিনি রাগিয়া আগুন হইয়াছিলেন এবং হারাকিরির ভয় দেখাইয়াছিলেন। (৬)

অবশেষে সম্রাটের বিশেষ অনুরোধে জেনারেল উমেজুর মত কট্টরপন্থী সেনা-নায়ককেও দলিল স্বাক্ষরে রাজী হইতে হইল। এঁদের সঙ্গে জাপানের আরও ৯ জন প্রতিনিধি ছিলেন। কিন্তু পূর্বাহ্নে এঁদের কারুর নামই প্রকাশ করা হয় নাই। এমন কি, জেনারেল ম্যাক-আর্থারের মিশৌরি জাহাজের দিকে যাত্রার সময় পর্যন্ত গোপন রাখা হইয়াছিল। কারণ, তখন জাপানে আত্মসমর্পণের বিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদী যুবকদেরও অভাব ছিল না। এজন্য আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান স্থলভাগে না হইয়া জলপথে সমুদ্রের উপর যুদ্ধজাহাজে অনুষ্ঠিত হইল।

জেনারেল ম্যাক-আর্থার ও অন্যান্য সকলে একটি মোটর লঞ্চে করিয়া মিশৌরি

(৬) ম্যাক-আর্থার—পৃষ্ঠা ৩৮৮-৮৯

জাহাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বয়োবৃদ্ধ সিগেমিৎসু সকলের আগে আগে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া এবং একটি লাঠির উপর ভর দিয়া চলিতেছিলেন। তাঁর একটি পা ছিল কাঠের তৈরী। প্রায় বছর পনের আগে সাংহাইতে টেরোরিষ্টদের নিক্ষিপ্ত বোমায় সিগেমিৎসুর একখানি পা উড়িয়া গিয়াছিল। তখন থেকে তিনি এই খোঁড়া পায়ের যন্ত্রণা বহন করিয়া রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছিলেন। ইংরাজ গ্রন্থকার মিঃ উইলিয়াম ক্রেইগ মন্তব্য করিয়াছেন যে, যাঁরা সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মনে হইতেছিল সিগেমিৎসু যেন গোটা পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ জাপানী জাতিরই প্রতিনিধি ছিলেন—ভালো করিয়া দাঁড়াইতেও অক্ষম ছিলেন! (৭)

টেবিলের উপর সবুজ রঙের কাপড়ের ঢাকনা ছিল, কিন্তু আত্মসমর্পণের দলিলের রঙ ছিল সাদা। আর জাপানের সেই নির্দিষ্ট স্থানটিতে বহু বিচিত্র বর্ণের পোষাক, ইউনিফর্ম ও সাজসজ্জা পরিহিত সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তির ভিড় ছিল। আর সামরিক সংবাদদাতারা ও ক্যামেরাম্যানরা সেখানে এত প্রচুর সংখ্যায় সমবেত হইয়াছিলেন যে, ভীড়ের চাপে যেন শ্বাসরোধ হওয়ার অবস্থা হইয়াছিল। সেই উৎসুক জনতার ভীড় সুবৃহৎ জাহাজের সর্বত্র পতাকাদণ্ড থেকে শুরু করিয়া কামানের নলের উপর পর্যন্ত এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা করিল। ম্যাক-আর্থার মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'সহস্র চোখের তীক্ষ্ণ ও তীব্র দৃষ্টি যেন তীরের মত আমাদের শরীর বিদ্ধ করিতেছিল।'

ম্যাক-আর্থার স্থির পদক্ষেপে মাইকের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে, পৃথিবীর অধিকাংশ জাতির প্রতিনিধিরূপে তাঁরা এখানে সমবেত এবং তাঁরা বিজিত ও বিজেতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া যেন এই অনুষ্ঠানের পবিত্র উদ্দেশ্য রক্ষা করিতে পারেন এবং অতীতের রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ডের ভিতর থেকে যেন একটি শ্রেষ্ঠতর পৃথিবী জন্মলাভ করিতে পারে—যে পৃথিবীতে স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা ও ন্যায়বিচারের মর্যাদা রক্ষা পাইবে :

'It is my earnest hope and indeed the hope of all mankind that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past—a world founded upon faith and understanding—a world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish—for freedom, tolerence and justice' (৮)

সুপ্রীম কমাণ্ডার অতঃপর জাপানী প্রতিনিধিদিগকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষরের জন্য আহ্বান জানাইলেন। সমগ্র জাহাজব্যাপী তখন গভীর নিস্তব্ধতা। গুরুভার জনিত পা ধীরে ধীরে টানিয়া আনিয়া সিগেমিৎসু টেবিলের ধারে একটি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। হাওয়ায় তখন তাঁর কপালের চুল উড়িতেছিল। তিনি তাঁর সিল্কের টুপি এবং হাতের হলদে দস্তানা খুলিয়া রাখিলেন।

(৭) দি ফল্ অব্ জাপান—পৃষ্ঠা ২৭২
(৮) Reminiscences—MacArthur, p. 392-93

তারপর একটি কলম বাহির করিয়া দ'ললের উপর চোখ বুলাইলেন, তাঁকে যেন হতবুদ্ধির মত দেখাইল। তখন ম্যাক-আর্থারের নির্দেশে তাঁর চীফ অব্ ষ্টাফ টেবিলের ধারে গিয়া দেখাইয়া দিলেন দলিলের ঠিক কোন স্থানে সই করিতে হইবে।

বিব্রত পররাষ্ট্র মন্ত্রী যেন একটু লজ্জিত হইলেন এবং তারপর মাথা নীচু করিয়া দলিলে স্বাক্ষর দিলেন। বেলা তখন সকাল ৯টা বাজিয়া ৪ মিনিট।

জাপানের দ্বিতীয় প্রতিনিধি জেনারেল উমেজু দলিলের কিছু না পড়িয়াই সিগেমিৎসুর স্বাক্ষরের নীচে সই করিলেন।

অতঃপর জেনারেল ম্যাক-আর্থার এবং মিত্রপক্ষের অন্যান্য প্রতিনিধিরা একে একে দলিলে স্বাক্ষর করিলেন।

মাথার উপর তখন বি-২৯ মার্কিন বোমারুগুলি দল বাঁধিয়া উড়িতেছিল এবং আকাশ থেকে সূর্যের আলো যেন একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের পতন জলন্ত অক্ষরে ঘোষণা করিতেছিল……

৪ঠা সেপ্টেম্বর জাপানী ডায়েট বা পার্লামেন্টের এক জরুরী অধিবেশন আহ্বান করা হইল এবং সেই অধিবেশনে স্বয়ং সম্রাট ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইয়া আত্ম-সমর্পণের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া এক বক্তৃতা দিলেন এবং সমস্ত প্রজাকে আত্মসমর্পণের শর্তগুলি পালন করিয়া শান্তি ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আহ্বান জানাইলেন।

জাপানের ইতিহাসে এই ঘটনা ছিল অভূতপূর্ব। কেন না, এর আগে কোন সম্রাট কোনদিন তাঁর প্রজাবর্গের সামনে উপস্থিত হইয়া অনুরূপ বক্তৃতা দেন নাই। (১)

* * *

কিন্তু গোড়ার দিকে সুপ্রীম কমাণ্ডার ম্যাক-আর্থারের কার্য খুব নির্ঝঞ্ঝাট ছিল না। কারণ, মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে রাজনৈতিক মত বৈষম্য ছিল। আর তা'ছাড়া জাপানের মোট ৬৯ লক্ষ ৮৩ হাজার সৈন্যের নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা ছিল। অধিকন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে ষ্ট্যালিন ও মলোটোভ দাবি জানাইলেন যে, জাপানে মার্কিন দখলদারি নরম (soft) হইতে পারে, অতএব ম্যাক-আর্থারের বদলে জাপানের জন্য একটি চতুঃশক্তির কমিশন নিয়োগ করা হোক।

অন্যদিকে আমেরিকাতেও একশ্রেণীর রাজনীতিক, সংবাদপত্র ও রেডিও ভাষ্যকার এবং কমিউনিষ্ট পত্রিকা "ডেইলি ওয়ার্কার" জার্মানীর বিরুদ্ধে যেমন কঠোর পন্থা অবলম্বনের জন্য দাবি জানাইলেন, তেমনি জাপানের বেলায়ও সম্রাট ও রাজপরিবারকে উচ্ছেদের জন্য দাবি জানাইলেন। তারপর শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ ও রুশ উভয় পক্ষ জাপানে দখলদারির অংশ গ্রহণের জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কিন্তু জার্মানীর দখলদারির অভিজ্ঞতা থেকে মার্কিন সরকার এই সমস্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। অবশেষে মস্কো বৈঠকে ১১টি জাতির (যারা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল) প্রতিনিধি নিয়া একটি দূর প্রাচ্য কমিশন এবং একটি Allied Council গঠিত হইল—যে কাউন্সিলের সদস্য হইল আমেরিকা, বৃটিশ কমনওয়েলথ,

(১) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪০১

চীন ও রাশিয়া। কিন্তু এদের প্রত্যেকেরই ভিটো প্রয়োগের ক্ষমতা ছিল। ফলে, এই কাউন্সিল ও কমিশন শেষ পর্যন্ত কোন কাজে আসিল না। (১০)

* * *

কিন্তু জাপানী সাম্রাজ্যের পতন ও ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয় সত্বেও এশিয়াতে সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটল না। ব্রহ্মদেশে, সিঙ্গাপুরে, ইন্দোচীনে, মালয়ে এবং ইন্দোনেশিয়ায় (বলা বাহুল্য যে, ভারতে তখনও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন বজায় ছিল) আগেকার দখলদার শক্তিবর্গ দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার বৃটিশ শক্তির সহায়তায় স্ব স্ব রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন এবং জাপানীদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ফলে, স্থানীয় স্বাধীনতাকামী ও জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে (যাঁরা এতদিন বিদেশীদের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছিলেন) সংঘর্ষ দেখা দিল—যেমন ইন্দোচীনে হো চি মিনের দলের সঙ্গে এবং ইন্দোনেশিয়ায় সুকর্ণের জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে। জাপান কর্তৃক পটসডাম ঘোষণা গৃহীত হওয়ার পর ১৭ আগষ্ট, ১৯৪৫, ইন্দোনেশিয়ার ন্যাশানাল পার্টি সুকর্ণের নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়ায় স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। কিন্তু বৃটিশ সৈন্যেরা তড়িৎ গতিতে আসিয়া হাজির হইল এবং জাপানীদের সহযোগিতায় ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতাকামীদের দমন করিতে লাগিল···

অপরপক্ষে মাঞ্চুরিয়ায় বিজয়ী রুশবাহিনী যখন মাঞ্চুকোতে প্রবেশ করিল, তখন জাপানীদের পৃষ্ঠপোষিত এবং আশ্রিত মাঞ্চুকোর পুতুল 'সম্রাট' পিউ-ই (Pu-Yi) জাপান অভিমুখে পলায়নের মুখে মুকডেনে ধরা পড়িলেন এবং রুশদের হাতে পাঁচ বছর বন্দী ছিলেন। পরে তাঁকে চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির হাতে সমর্পণ করা হইয়াছিল ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬৭ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এই প্রাক্তন 'মাঞ্চুকো সম্রাট' পিকিংয়ের পুরাতন রাজপ্রাসাদের বাগানে মালীর কাজ করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিতেন।······(১১)

আত্মহত্যা

জাপ সাম্রাজ্যবাদের পতন ও সরকারীভাবে জাপানের আত্মসমর্পণের আগে থেকেই জাপানী সেনাবাহিনী এবং জঙ্গীবাদী নেতাদের মধ্যে ঘোরতর মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। কারণ, পরাজয়ের গ্লানিটা বজ্রের মত তাদের বুক বিদ্ধ করিতেছিল। তবে 'দেবতার বংশোদ্ভূত' সম্রাটের নির্দেশনামা মানিয়া লইয়া অনেকে শান্ত হইলেও কট্টরপন্থীর সান্ত্বনা পাইতেছিল না। তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র একদল অভ্যুত্থান ঘটাইবার চেষ্টা এবং সম্রাটকে গ্রেপ্তারপূর্বক ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত পর্যন্ত করিয়াছিল—যে ব্যর্থ চেষ্টার কাহিনী আগের অধ্যায়ে

(১০) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪১৭

(১১) টোট্যাল ওয়ার—(দ্বিতীয় খণ্ড) পৃষ্ঠা ৩৫০

বর্ণনা করা হইয়াছে। গর্বিত ইম্পিরীয়েল জাপ বাহিনী এখন নিরস্ত্র ও বেকার। সুতরাং নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ বেপরোয়া হইয়া উঠিলেন। জেনারেল আনামি, এ্যাডমিরাল ওনিসি, জেনারেল টানাকা প্রমুখ প্রসিদ্ধ রণনেতারা আগেই আত্মহত্যা বা মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। প্রিন্স কোনোয়ের মত সম্ভ্রান্ত রাষ্ট্র-নীতিবিদও একই পন্থা অনুসরণ করিলেন।

এবার 'পালের গোদা' জেনারেল হেদিকি তোজোর পালা। দুর্দান্ত তোজো ছিলেন প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের সবচেয়ে উর্বর মস্তিষ্ক চক্রান্তবাজ। কিন্তু ৬৩ বছর বয়স্ক এই জাপানী বীরপুরুষের গৌরবের দিন অস্তমিত। তাঁর সাধের সৈন্যবাহিনী পরাজিত ও বিপর্যস্ত। সুতরাং জনসাধারণের চক্ষেও তিনি নামিয়া গেলেন এবং অনেকেই প্রত্যাশা করিলেন যে, তিনি এবার আত্মহত্যা করিবেন। এমন কি, তাঁকে হারাকিরি করার জন্য জনগণের পক্ষ থেকে তাঁর পরিবারের নিকট টেলিফোন-যোগে তাগিদ আসিতে লাগিল।

জেনারেল তোজোর বিশাল বাসগৃহ ছিল টোকিওর বড়লোকদের পাড়ায়, ভূমির আয়তনও ছিল জমিদারির মত প্রকাণ্ড এবং সেখান থেকে মাত্র ৫০ মাইল দূরে 'পবিত্র' ফুজিয়ামা পর্বত দেখা যাইত। কিন্তু এই সম্পদ ও খ্যাতি আজ তোজোর জীবনে যেন বিড়ম্বনা মাত্র। পরাজয়ের গ্লানি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তোজো তাঁর শেষ পন্থা হিসাবে মৃত্যুবরণই বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন। সুতরাং তিনি সেই চরম মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি ডাক্তারের কাছে গেলেন এবং তাঁর কাছ থেকে জানিয়া নিলেন তাঁর দেহে হার্টের যথাযথ অবস্থান কোথায়। সেই জায়গাটা তিনি চিকিৎসকের কাছ থেকে চিহ্নিত করিয়া আনিলেন। আগে তাঁর কর্তব্য আছে সম্রাট ও সম্রাট পরিবারের প্রতি একটি পত্র লিখিয়া তিনি যুদ্ধের সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে নিলেন এবং রাজ-পরিবারকে সমস্ত দায়িত্ব থেকে রেহাই দিলেন।

১০ই সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা তোজোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং তোজো তাঁর সুসজ্জিত বাগানে বসিয়া খোস মেজাজে গল্প করিলেন। মিত্রপক্ষীয় বোমারুগুলি তাঁর সম্পত্তির, বিশেষ ভাবে তাঁর সুদৃশ্য পাইন গাছগুলির যে ক্ষতি সাধন করিয়াছে, রিপোর্টারদের কাছে তা' নিয়া তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, তাঁকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে গণ্য করা হইবে না। 'কেন না, কোন জাতি যদি কোন যুদ্ধকে যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করে, তবে সেই যুদ্ধ পরিচালনা করার অর্থই যুদ্ধাপরাধ নয়—এই দুয়ের মধ্যে নিশ্চয়ই তফাৎ আছে' (১২)

কিন্তু পরদিনই তোজোর ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। ইয়োকোহামাতে মার্কিন অষ্টম বাহিনীর সদর দপ্তরে যুদ্ধাপরাধীদের যে তালিকা তৈরী হইতেছিল, তাতে তোজোর নাম ছিল প্রথম সারিতে। অপরাহ্ণ চারটার সময় ৬ জন সৈন্যসহ একজন মার্কিন

---

(১২) উইলিয়াম ক্রেইগ, পৃষ্ঠা ২৮৫

মেজর তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য তাঁর বাস ভবনে আসিয়া হাজির হইলেন। তাঁর গ্রেপ্তারির এই রোমাঞ্চকর দৃশ্য দেখার জন্য সংবাদপত্রের রিপোর্টার এবং ফটো-গ্রাফাররাও ভীড় করিলেন। তোজো তাঁর গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং তাঁর আগে তাঁর স্ত্রীকে গৃহত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দিলেন, মিসেস্ তোজো তখন পিছনের দরজা দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এদিকে তাঁর গ্রেপ্তারকারী মার্কিন সৈন্যেরা যখন তাঁর বন্ধ দরজার উপর আঘাত করিতেছিলেন, তখন তোজো হঠাৎ তাঁর পাঠকক্ষের জানালা খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলেন—'আমি জেনারেল তোজো'। কিন্তু তিনি জানিতে চাহিলেন যে, তাঁকে গ্রেপ্তার করার উপযুক্ত কর্তৃত্ব আগন্তুকদের আছে কিনা। তাঁরা দোভাষী মারফৎ জানাইলেন যে, হাঁ, আছে। তাঁকে গ্রেপ্তার করিয়া ইয়োকোহামাতে লইয়া যাওয়ার জন্যই তাঁরা আসিয়াছেন।

ব্যস্! আর কিছু বলিতে হইল না। তোজো তাঁর কক্ষের একটি চেয়ারের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন এবং তাঁর বুকের চিহ্নিত স্থান লক্ষ্য করিয়া রিভালভারের গুলি চালাইলেন (তাঁর জামাতা কোগ এই রিভালভার দিয়াই যুদ্ধাবসানের দিন আত্মহত্যা করিয়াছিলেন)। বেলা তখন অপরাহ্ণ ৪-১৭ মিনিট গুলির শব্দে বাইরে অপেক্ষমাণ মার্কিন মেজর ও তাঁর সৈন্যেরা দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন তোজোর মাথা চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়াছে, আর রিভলভারটা মেঝেতে পড়িয়া আছে।

তোজো কিন্তু মরিলেন না। সেই ঘরে ভীড়ের মধ্য থেকে কে একজন বলিয়া উঠিল—'দ্যাখো পীত বেজন্মাটার কাণ্ড। ছুরি চালাবার সাহস পর্যন্ত হলো না।' (১৩)

তোজোর কপাল মন্দ। মার্কিনীদের হাতে বন্দী হইয়া তিনি ইয়োকোহামার সামরিক হাসপাতালে নীত হইলেন এবং সেখানে আমেরিকান সার্জেনদের চিকিৎসায় সারিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁর দেশের লোকের অনেকে এজন্য তাঁকে বিদ্রূপ করিলেন। (পরে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে তাঁর বিচার ও ফাঁসি হইয়াছিল)

তোজো যখন মার্কিন সামরিক হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়িতেছিলেন, তখন টোকিওর অন্য এক শহরতলীতে আর একজন বিখ্যাত সামরিক পুরুষ অনুরূপ সমস্যায় পড়িলেন। তবে, তাঁর সমস্যাটা একটু ভিন্ন ধরনের ছিল। কেন না, তাঁর পত্নীই তাঁকে প্রাণ বিসর্জনের জন্য তাগাদা দিতেছিলেন। ফিল্ড মার্শাল জেনারেল স্যুগিয়ামা এবং তাঁর ত্রিশ বছর বর্ষীয়া স্ত্রী সুখী দম্পতীরূপেই জীবন যাপন করিতেছিলেন। পার্ল হারবার আক্রমণের সময় স্যুগিয়ামা ছিলেন সেনানী মণ্ডলীর কর্মাধ্যক্ষ। সুতরাং প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের সঙ্গে একান্তরূপে জড়িত। কিন্তু আজ পরাজয়ের জাতীয় বিপর্যয়ের পর স্যুগিয়ামার মত জাঁদরেল সামরিক পুরুষের নিশ্চয়ই দায়িত্ব অস্বীকার করা উচিত নয়। তাঁর স্ত্রী এই যুক্তিতে তাঁর নিজের এবং জাতির আত্ম-সম্মান রক্ষার জন্য স্যুগিয়ামাকে মৃত্যুবরণের জন্য অনুরোধ করিলেন এবং স্যুগিয়ামাও

(১৩) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃঃ ২৮৭

পরদিন আত্মহত্যা করার জন্য সঙ্কল্প করিলেন। তাঁর স্ত্রী খুসী হইলেন এবং স্বামী-স্ত্রী সেদিন রাত্রে মনের আনন্দে মদ্য—সাকি (Sake) পান করিলেন এবং হৃষ্টচিত্তে গল্প করিতে করিতে 'শেষ ডিনার' সম্পন্ন করিলেন।

আত্মহত্যার জন্য স্ত্রী স্বামীকে প্ররোচিত করে, এমন দৃশ্য পৃথিবীতে কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু সেদিনের জাপানে বোধ হয় সবই সম্ভব ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে আত্মহত্যায় দেরী হইল। কারণ, সম্রাট সুগিয়ামাকে ডাকিয়া নির্দেশ দিলেন যে, সেনাপতিদের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ ভুলিয়া গিয়া টোকিও এলাকা থেকে সৈন্য অপসারণ যত দ্রুত সম্ভব নিষ্পন্ন করা উচিত (আত্মসমর্পণের চুক্তি অনুযায়ী)। সুতরাং সুগিয়ামাকে আগে সম্রাটের আদেশ পালন করিতে হইবে, তারপর নিজের মৃত্যুর কথা।

কিন্তু এদিকে তাঁর স্ত্রী অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং তাঁকে ক্রমাগত তাগাদা দিতে লাগিলেন তাঁর প্রাণ বিসর্জনের জন্য, আত্মসম্মান রক্ষার জন্য। স্ত্রীর তাগাদায় সুগিয়ামার জীবন যেন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল এবং রাত্রে উভয়ের শয্যা গ্রহণও যেন দুঃসহ বলিয়া মনে হইল। অবশেষে ১১ই সেপ্টেম্বর টোকিও এলাকা থেকে শেষ জাপানী বাহিনী অপসারিত হইল এবং সুগিয়ামা ঘোষণা করিলেন তাঁর কর্তব্য শেষ, এবার তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। একথা শুনিয়া তাঁর স্ত্রীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

কিন্তু সুগিয়ামা বৃদ্ধ এবং তাঁর স্ত্রী তরুণী এবং শেষবারের জন্য তিনি পুনরায় স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কবে তুমি হারাকিরি করিবে?'…

১২ই সেপ্টেম্বর সকালে ফিল্ড মার্শাল সুগিয়ামা বেলা ১০টার সময় তাঁর অফিসে গেলেন এবং তাঁর প্রিয় সেক্রেটারি কোবাইয়াসিকে তাঁর শেষ সংকল্পের কথা জানাইলেন এবং তাঁকে এই বিশেষ অনুরোধসহ তাঁর স্ত্রীর নিকট পাঠাইলেন যেন তাঁর স্ত্রী তাঁর মৃত্যুর পর আত্মহত্যা না করেন।

এরপর ফিল্ড মার্শালের কক্ষ থেকে একটা গুলির আওয়াজ শুনা গেল। সুগিয়ামা তাঁর নিজের বুক লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের গুলি করিলেন। অফিসাররা তাঁর কক্ষে ছুটিয়া আসিলেন এবং বিহ্বলচিত্তে লক্ষ্য করিলেন সুগিয়ামা অনিবার্য মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতেছেন।

ইতিমধ্যে একজন অফিসার টেলিফোনে মিসেস সুগিয়ামাকে তাঁর স্বামীর এই মর্মান্তিক ট্রাজিডির কথা জানাইলেন। তিনি একটিমাত্র প্রশ্ন করিলেন—'সত্যি কি, আমার স্বামী মারা গিয়াছেন?'

যখন তিনি জবাব পাইলেন—'হাঁ', তখন টেলিফোনের রিসিভারটা রাখিয়া দিয়া তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং তারপর একটি ছোট্ট ছুরিকা হাতে নিয়া নিজের বুকে বিদ্ধ করিলেন। সেই ক্ষতস্থান থেকে অল্প একটু তাজা রক্ত বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যু হইল না। মিসেস সুগিয়ামা তখন একটি বিষের পাত্র (সায়েনাইড) মুখে তুলিয়া নিলেন এবং নিঃশেষে পান করিলেন।

মিসেস সুগিয়ামার বিগত প্রাণ দেহ মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল।…

অবশ্য সম্রাটের জন্য এবং দেশের জন্য হারাকিরির দ্বারা আত্মবিসর্জন করা জাপানে বীরের ধর্মরূপে গণ্য এবং এই ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রথা পালন করিতে না পারাই বরং ভীরুতারূপে পরিচিত।

সৈন্যদের অত্যাচার

প্রাচীনকাল থেকেই যুদ্ধের ফলে বিজয়ী সৈন্যদের দ্বারা নানাপ্রকার বর্বরতা, অত্যাচার, অনাচার ঘটিয়া আসিতেছে এবং সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইতেছে পুরুষ বন্দীদের উপর নির্যাতন এবং নারীধর্ষণ। এবারের মহাযুদ্ধেও এই সমস্ত বর্বরতা বহু দেশেই চরমে উঠিয়াছিল। যদিও ফ্যাসিষ্টদের অত্যাচারের সঙ্গে কোন তুলনা দেওয়াই চলে না, তবু মিত্রপক্ষীয় সৈন্যেরা নানা স্থানে বহু অনাচার করিয়াছে। যেমন জাপানের আত্মসমর্পণের পর গোড়ার দিকে দখলদার মার্কিন সৈন্যেরা ইয়োকোহামা, ইয়োকোসুকা এবং টোকিওতে লুঠতরাজ, মাতলামি ও নারীধর্ষণের বহু ঘটনার সংগে জড়িত ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে রক্ত ও আগুনের ভিতর দিয়া যাদের দিন রাত্রি কাটে এবং মাসের পর মাস যারা স্ত্রীপুত্র পরিবারের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অস্বাভাবিক জীবন যাপনে বাধ্য হয়, তাদের যৌন মনস্তত্ত্ব সাধারণতঃ উগ্ররূপ ধারণ করে। এই সমস্ত 'ক্ষুধার্ত' সৈন্যের জন্য সময় সময় কিছু 'সুযোগের' ব্যবস্থাও করিয়া রাখিতে হয়। সুতরাং আত্মসমর্পণের দলিলে জাপানের স্বাক্ষর দানের পর যখন মার্কিন সৈন্যদের টোকিওতে প্রবেশ আসন্ন হইয়া উঠিল, তখন একজন সামরিক অফিসার আসিয়া টোকিওর পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—'টোকিওর রেড লাইট ডিষ্ট্রিক্ট, অর্থাৎ গণিকাপল্লী কোথায়?'

কিন্তু মিত্রপক্ষীয় বিমানবহরের ব্যাপক আক্রমণে টোকিওতে যে ধ্বংসকাণ্ড ও অগ্নিলীলার বিস্তার হইয়াছিল, তার ফলে টোকিওর জগদ্বিখ্যাত গণিকাপল্লী—'যোশিওয়ারি এলাকা' পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু জাপানী গবর্নমেণ্ট অতি দ্রুত শহরের অন্য একটি অংশে একটি নতুন গণিকাপাড়া গড়িয়া তুলিলেন। আমেরিকান অফিসারটি সেই নতুন ঠিকানা এবং 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ' সংবাদটি জানিয়া নিলেন।...

দখলদারি আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন সৈন্যদের উচ্ছৃঙ্খলতা, ডাকাতি ও লুঠের খবর এবং বিশেষভাবে স্ত্রীলোকদের উপর বলাৎকারের খবর আসিতে লাগিল। ইংরাজ গ্রন্থকার উইলিয়াম ক্রেইগ লিখিয়াছেন যে, বিজয়ী মার্কিন সৈন্যদের লাঞ্ছনা থেকে নারীর ধর্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে জাপানী মহিলারা অনেক ক্ষেত্রে বিষপানে আত্মহত্যা করিতে চাহিয়াছিলেন। তবু প্রথম ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অনেকগুলি বলাৎকার অনুষ্ঠিত হইল। ইয়োকোসুকা শহরে তিনজন মার্কিন সৈন্য একজন জাপানীর গৃহে হানা দিয়া তার স্ত্রী ও কন্যার উপর ধর্ষণ করিল।

অবশ্য এই সমস্ত অত্যাচারের ঘটনার পর সুপ্রীম কমাণ্ডার ম্যাক-আর্থার এই মর্মে কড়া হুকুম জারি করিলেন যে, কাহারও বলাৎকারের অপরাধ প্রমাণিত হইলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইবে।

এই সমস্ত কড়াকড়ি ও কঠোরতা অবলম্বিত হওয়ার পর জাপানে নারীর উপর চরম লাঞ্ছনার মাত্রা অংশত কমিয়া গিয়াছিল।…

কিন্তু বিজিত জাপানে যখন এই অবস্থা চলিতেছিল তখন বিজয়ী আমেরিকাতে 'শান্তির ললিত বাণী' কি মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল? অর্থাৎ জাপানের পরাজয় স্বীকারের বার্তা প্রচারিত হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রামে, শহরে ও বড় বড় নগরীতে কি অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল?

বিভিন্ন মার্কিন পত্রিকার রিপোর্ট অনুসন্ধান করিয়া মিঃ ক্রেইগ লিখিয়াছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শহরে শহরে, জনপদে জনপদে হল্লা, আমোদ ও উচ্ছৃঙ্খলতার যেন প্রবল বান ডাকিল। অনেক বছর পর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসানে ও শান্তি ঘোষিত হওয়ার পর দলে দলে নরনারী যেন বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারে গা ভাসাইয়া দিল। ফুর্তিবাজ ও হল্লামত্ত সৈন্যরা শহরের কেন্দ্রস্থলগুলিতে চলমান মোটরে লাফাইয়া উঠিতে এবং মহিলাদের চুম্বন করিতে লাগিল। মহিলারা কোন প্রতিবাদ করিলেন না। টাইমস্ স্কোয়ারে উৎসবমত্ত নরনারীর যেন ভীড় জমিয়া গেল। তীব্র বৈদ্যুতিক আলোর উজ্জ্বল আভায় পুরুষ ও নারী পরস্পরকে চুম্বন আলিঙ্গন এবং প্রেমের আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপে ও মদ্যপানে মাতিয়া উঠিল। বিখ্যাত 'ওয়াশিংটন পোষ্ট' সংবাদপত্রের অট্টালিকার সম্মুখে এক বিচিত্র ঘটনা ঘটিল। হঠাৎ দেখা গেল একটি ট্যাক্সি থেকে একটি সৈন্য ও একটি যুবতী নামিয়া আসিতেছে এবং নামিয়াই তারা রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া প্রকাশ্যে তাদের পরিহিত জামা কাপড় সব ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। রাস্তার উপর দণ্ডায়মান 'সহানুভূতিসম্পন্ন দর্শকেরা' তাদের উদ্দেশ্যে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল—'খুলে ফেলো, খুলে ফেলো, সব খুলে ফেলো!'

সত্যি সত্যি সেই নর-নারী সমস্ত খুলিয়া ফেলিয়া রাস্তার উপর সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল…

কিন্তু ভয়াবহ উচ্ছৃঙ্খলতা এবং হিংস্র তাণ্ডব ঘটিল স্যানফ্রান্সিস্কোতে। অপরাহ্ণ ৪টার সময় জাপানের আত্মসমর্পণের খবর আসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে শুরু হইল নৌসৈন্য ও নাগরিকদের মদ্যপানের বেপরোয়া মাতলামি ও উন্মত্ততা। চীৎকারে, হল্লায় ও মোটরগাড়ী চাপা পড়ায় যেন এক ধরনের সন্ত্রাসের দৃশ্যের অবতারণা হইল। বলাই বাহুল্য যে, এমন প্রমত্ত প্রমোদের পরিস্থিতি যুবতী নারীদের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল এবং বিপদ ঘটিলও বটে, অন্ততঃ ৬টি যুবতী পথচারিণীর:

'People stood horrified as at least six girls were forcibly thrown on the pavements, held down and repeatedly raped. No one moved to their aid. Policemen watching the assaults looked the other way, afraid to confront the liquor-sodden serviceman.'

প্রকাশ্য রাস্তার উপর ফেলিয়া অন্ততঃ ৬টি যুবতীর উপর সুরামত্ত সৈন্যদের বারবার বলাৎকার অনুষ্ঠানের কি ভয়াবহ বর্ণনা। দর্শকেরা ত্রাসগ্রস্ত, স্তম্ভিত, আর পুলিশেরা অসহায়ের মত অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল! (১৪)

---

(১৪) The Fall of Japan, William Craig, p. 184, 185.

এভাবেই যুদ্ধ শেষ হইল এবং সম্ভবতঃ যুগে যুগে এমন বর্বরতার মধ্য দিয়াই যুদ্ধের অবসান ঘটিয়া থাকে, আর অগণিত মানুষের আর্তনাদ ধ্বংস, মৃত্যু ও অত্যাচারের আড়ালে চাপা পড়িয়া যায়। ইতিহাসের পরিহাস এই যে, শেষ পর্যন্ত দেশের লোকও সেই সমস্ত পাশবিকতার কথা ভুলিয়া যায়। এমন কি, আবার নতুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে!

যুদ্ধাবসানের ঘোষণা

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান হোয়াইট হাউজ থেকে ঘোষণা করিলেন যে, জাপান নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দাবি মানিয়া লইয়াছে। সমস্ত রণাঙ্গনে কামান গর্জন স্তব্ধ হইয়াছে এবং যুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে। জাপানের আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর—২রা সেপ্টেম্বর তারিখটি জাপানের উপর বিজয় দিবসরূপে (V. J. Day) উদ্‌যাপনের জন্য ঘোষণা করা হইল। এই বিজয় দিবসের বক্তৃতায় ট্রুম্যান তাঁদের কথা স্মরণ করিলেন, যাঁরা এই যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন এবং অসহ্য দুঃখভোগ করিয়াছেন। তাঁদের এই আত্ম-বিসর্জন ও যন্ত্রণা ভোগের জন্যই এই যুদ্ধ জয় সম্ভব হইয়াছে। তিনি তাঁর এই বক্তৃতায় মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে কোন মত বিরোধের কথা উল্লেখ করিলেন না কিংবা পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলাফল সম্পর্কেও কোন মন্তব্য করিলেন না। বরং আগামী দিনের পৃথিবীর শান্তি, নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার এক নতুন যুগ সম্ভাবনার উপরেই জোর দিলেন। তিনি এই বক্তৃতায় ভগবানের কথাও ভুলিলেন না এবং স্মরণ করিলেন তাঁর সাহায্যেই এই জয় সম্ভব হইয়াছে এবং তাঁর সাহায্যেই আগামী দিনের পৃথিবীর শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জিত হইবে :

'From this day we move forward. We move toward a new era of security at home. With the other United Nations we move toward a new and better world of peace and international good will and co-operation.

'God's help has brought us to this day of victory. With his help we will attain that peace and prosperity for ourselves and all the world in the years ahead' (১৫)

চার্চিল যেমন এ্যাটম্ বোমার সাফল্যের জন্য একটি বিবৃতিতে ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং 'ঈশ্বরের দয়াতেই' (by God's ercy) একমাত্র বৃটেন ও আমেরিকা পারমাণবিক রহস্য আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানও তেমনি এত বড় যুদ্ধ জয়ের জন্য ভগবানের প্রতি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ১৯শে আগষ্ট, রবিবার, তারিখটিকে নির্দিষ্ট করিলেন। কারণ, একমাত্র তাঁর দয়াতেই সমস্ত দুঃখকষ্ট ও বিপদ পার হইয়া এত বড় গৌরবান্বিত বিজয় অর্জন সম্ভব হইয়াছে। 'সুতরাং আসুন আমরা তাঁকে ধন্যবাদ দেই।' (১৬)

---

(১৫) Japan Subdued—Feis, p. 156

(১৬) ট্রুম্যান (দ্বিতীয় খণ্ড,) পৃষ্ঠা ৩৭৮

অবশ্য ঈশ্বরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের আগে ১৫ই আগষ্ট জাপানের আত্ম-সমর্পণের সংবাদ পাওয়া মাত্রট্রুম্যান রাত্রি ৮টার সময় হোয়াইট হাউজের সম্মুখে সমবেত জনতার নিকট জয়ে উল্লাস প্রকাশ করিলেন এবং তাঁর আত্মস্মৃতিতে গর্বের সঙ্গে মন্তব্য করিলন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এত বড় যুদ্ধজয়ের পরেও মানুষের সুখ শান্তি ছাড়া কোন দেশের কোন ভূমিখণ্ড কিংবা কোন ক্ষতিপূরণ দাবি করে নাই। 'পৃথিবীর ইতিহাসে যে কোন জাতির পক্ষে এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ।' (১৭)

এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, হিটলারও অনেক যুদ্ধজয়ের পর ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের নেতাদের মতই 'ঈশ্বরের অনুগ্রহে'র দোহাই দিয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই কি শেষ পর্যন্ত তাঁকে আত্মহত্যাও করিতে হইয়াছিল ?

এদিকে মস্কোতেও জাপানের আত্মসমর্পণ উপলক্ষ্যে ৩রা সেপ্টেম্বর বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান হইল এবং ষ্ট্যালিন তাঁর বক্তৃতায় ১৯০৪ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধ (ষষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে) ও জাপানের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আক্রমণের কথা উল্লেখ করিলেন তবে, এবার জাপানের পরাজয়ের জন্য রাশিয়া যে পুনরায় দক্ষিণ শাখা-লিন ও কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ পুনরায় ফেরত পাইবেন এবং এখন থেকে প্রশান্ত মহাসাগর প্রবেশের পথে আর বাধা রহিল না, সে কথা স্মরণ করিলেন। আর দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন যে, এখন থেকে সোভিয়েত রাশিয়া পশ্চিম দিকে জার্মানী এবং পূর্ব দিকে জাপানী আগ্রাসনের আশঙ্কা থেকে মুক্ত হইল।

রেড স্কোয়ারে জয়োৎসব অনুষ্ঠিত হইল এবং বহু আতসবাজী পোড়ানো হইল বটে, কিন্তু কোন কোন প্রত্যক্ষদর্শীর মতে জাপানের বিরুদ্ধে এই জয়লাভে রুশ জনগণের মধ্যে তেমন উৎসাহ ছিল না এবং নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে জয়োৎসবের সময় যে বিশাল জনতার সমাবেশ হইয়াছিল, এবার তার এক-দশমাংশও উপস্থিত ছিল না।

তথাপি রাশিয়ার দাবী এই যে, মাঞ্চুরিয়ায় তাদের আক্রমণের জন্যই জাপানের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটিয়াছে। অপর পক্ষে আমেরিকার দাবি এই যে, এ্যাটম্ বোমার চূড়ান্ত আঘাতেই জাপান এত দ্রুত ধরাশায়ী হইয়াছে। কিন্তু অনেকের ধারণা এই যে, পটসডাম ঘোষণার সময়েই জাপান আত্মসমর্পণের জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিল। কিন্তু তারা জাপ সম্রাটের মর্যাদা সম্পর্কে আশ্বাসের দাবি করিয়াছিল। হিরোশিমায় বোমা বর্ষণের চারদিন আগে এবং মাঞ্চুরিয়ায় রুশ আক্রমণের ৬ দিন আগে ২রা আগষ্ট তারিখ মস্কোতে জাপানী রাষ্ট্রদূত মলোটোভের নিকট পটসডাম ঘোষণার এই প্রশ্নটি নিয়াই আলোচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। (১৮)

কিন্তু তাঁর সেই অনুরোধ ব্যর্থ হইয়াছিল।

* * *

রাশিয়া কর্তৃক মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণের আগে ষ্ট্যালিন একমাত্র চিয়াং কাইসেকের নেতৃত্বে চীনের ঐক্য রক্ষা করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন বলিয়া কোন কোন মার্কিন গ্রন্থে (যেমন, হপকিন্সের রিপোর্ট অনুযায়ী শেরউডের বিখ্যাত ইতিহাসে) উল্লেখ করা হইয়াছে, ইদানীংকালের মস্কো থেকে প্রকাশিত সামরিক

(১৭) ট্রুম্যান (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃষ্ঠা ৪৮১
(১৮) Russia At War—Alex ander Werth, p. 928—929

ইতিহাসগুলিতে সেই সমস্ত কথা অস্বীকার করা হইয়াছে। বরং দাবী করা হইয়াছে যে, জাপানীদের বিরুদ্ধে মাঞ্চুরিয়ায় সোভিয়েত বাহিনীর যুদ্ধের সময় চীন ও সোভিয়েত জনগণের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে এই বন্ধুত্ব উভয় পক্ষের রক্তের মূল্যে গাঢ়তর হইয়াছিল। সেই সময় মাও সে-তুং লিখিয়াছিলেন :

"The Red Army went to the assistance of the Chinese people. This is unprecented in the history of China. Its impact is incalculable."

অর্থাৎ 'লালফৌজ চীনা জনগণের সহায়তার জন্য আগাইয়া আসিয়াছিলেন। চীনের ইতিহাসে এই ঘটনা অভূতপূর্ব এবং এর প্রভাব অপরিমেয়।'

এই প্রসঙ্গে আরও দাবী করা হইয়াছে যে, সোভিয়েত বাহিনীর হাতে পরাজিত জাপানী কোয়ান্টাং বাহিনীর সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ চীনের গণফৌজের (পিপলস্ লিবারেশন আর্মি) হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং এভাবে চীনের বৈপ্লবিক শক্তিকে সহায়তা করা হইয়াছিল। (১৯)

যদিও জাপানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ এবং চীনের প্রশ্ন নিয়া কিছু কিছু বিতর্কের অবসর আছে, তথাপি ইতিহাসের দিক থেকে একথা অস্বীকার করা যায় না যে, ইউরোপে ও সুদূর প্রাচ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার জয়লাভের জন্যই চীনে ও এশিয়া মহাদেশে বৈপ্লবিক শক্তিগুলির জয়যাত্রা ত্বরান্বিত হইয়াছিল।

(১৯) Great Patriotic War of the Soviet Union—Moscow, 1974, p. 428.

দশম পর্ব

নবম অধ্যায়

ন্যুরেমবার্গের বিচার : যুদ্ধাপরাধীদের দণ্ড

২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫, 'মিশৌরি' যুদ্ধজাহাজে জাপান কর্তৃক সরকারীভাবে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের পর বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হইল। কিন্তু ইতিহাসের অভূতপূর্ব এই মহাযুদ্ধ শেষ হইলেও যারা এই পৃথিবীব্যাপ্ত হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসের জন্য দায়ী ছিল, তারা তাদের এই কৃতকর্মের জন্য রেহাই পাইল না। পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের দ্বারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যেমন মনুষ্যজাতির ইতিহাসে এক নতুন যুগের সিংহদ্বার (কিংবা মৃত্যুদ্বার?) খুলিয়া দিল, তেমনি নাৎসী ও ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গের সামরিক ও অসামরিক অফিসার ও নেতাদেরকে যুদ্ধাপরাধের জন্য দায়ী করিয়া বিচার ও দণ্ডদানপূর্বক মহাযুদ্ধের ইতিহাসে আর একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করা হইল। ৩০শে মে, ১৯৪৫, লণ্ডনের 'রাজকীয় ন্যায়-আদালতে' ইউনাইটেড্ নেশন্সের ওয়ার ক্রাইমস্ কমিশনের চেয়ারম্যান লর্ড রাইট-এর (Lord Wright) অধিনায়কত্বে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল, তারই ফলে যুদ্ধাপরাধের বিচার সম্পর্কে চতুঃশক্তির মধ্যে এক নতুন চুক্তি ও চার্টার বা সনদ স্বাক্ষরিত হইল। ৮ই আগষ্ট, ১৯৪৫, লণ্ডনে এই সনদের স্বাক্ষরকারীরা ছিল বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়া। এই সনদের দ্বারা ইতিহাসে সর্বপ্রথম ঘোষণা করা হইল যে, আক্রমণাত্মক যুদ্ধের অনুষ্ঠান, যুদ্ধের আইনভঙ্গ এবং অসামরিক জনগণের—এমন কি নিজ দেশের নাগরিকদের প্রতিও বর্বরতার অনুষ্ঠান আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে। জার্মানীর সামরিক, রাজনৈতিক ও শ্রমশিল্পের নেতাদেরকে একটি আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে (ট্রাইব্যুনাল) বিচারের ব্যবস্থা করা হইবে।

কিন্তু যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কিংবা বিচারের প্রস্তাব এই প্রথম নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরও এই ধরনের প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল বটে, তবে সেগুলি ছিল ভিন্ন প্রকৃতির এবং তখনও অত্যাচার ও ত্রাসের কাহিনী শুনা গিয়েছিল। যেমন—বেলজিয়মের অসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে, নার্স এডিথ ক্যাভেল'-এর ও ক্যাপ্টেন ফ্রাইটের (Fryatt) হত্যাকাণ্ডে এবং হাসপাতাল জাহাজ ও বাণিজ্য তথা যাত্রীবাহী জাহাজগুলির (যেমন, 'লুসিটানিয়া') স্বেচ্ছাকৃত নিমজ্জনে। প্রথম মহাযুদ্ধের এটি একটি অন্যতম ভয়াবহ ঘটনা। ৩১,৫০০ টনের এই বৃটিশ জাহাজটি ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম যাত্রীবাহী জাহাজের অন্যতম। ১৯১৫ সালের ৭ই মে এই জাহাজটি জার্মান সাবমেরিন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত দুইটি টর্পেডোর আঘাতে ২০ মিনিটের মধ্যে সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছিল। এই জাহাজে ১২৫৫ জন যাত্রী এবং ৬৫১ জন লস্কর ছিল। এদের মধ্যে ১২৪ জন আমেরিকান সহ মোট ১১৯৮ জন নিমজ্জিত কিংবা নিহত হইয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর বিরুদ্ধে আমেরিকার যোগদানের অন্যতম কারণ ছিল এই

যাত্রী জাহাজের ধ্বংস সাধন। 'লুসিটানিয়া' জাহাজে কোন অস্ত্রশস্ত্র বা গোলাবারুদ ছিল না।

কিন্তু যারা এই সমস্ত অপরাধের জন্য দায়ী ছিল, তাদের বিচারের জন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে নাই। কয়েকটি তদন্ত কমিশনও নিযুক্ত হইয়াছিল বটে, সাক্ষ্য প্রমাণও কিছু কিছু গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু আসামীদেরকে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে অভিযুক্ত করা সম্ভব ছিল না। এর প্রধান কারণ এই যে, সেবার মিত্রশক্তিবর্গের দ্বারা জার্মানী দখলীকৃত ছিল না। কিন্তু সেবারেও তদন্তে দেখা গিয়াছিল যে, অপরাধগুলি পূর্ব-পরিকল্পিত ও পূর্ব-সঙ্কল্পিত ছিল--দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গের অপরাধের এটাই ছিল নিয়মিত বৈশিষ্ট্য।

অবশ্য ভার্সাই সন্ধির ২২৮ ২৩০ অনুচ্ছেদ অনুসারে জার্মানী যুদ্ধসংক্রান্ত অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদেরকে মিত্রশক্তিবর্গের হাতে অর্পণ করিতে বাধ্য ছিল এবং মিত্রশক্তিবর্গের সামরিক আদালতে তাদের বিচারেরও কথা ছিল, তথাপি কার্যক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২০ সালের প্রথম ভাগে জার্মানীর সবচেয়ে খ্যাতিমান, সম্মানার্হ ব্যক্তিদের নামের তালিকাসহ মোট ৯০০ ব্যক্তির বিচারের দাবী করিয়া মিত্রপক্ষ যে দলিল পেশ করিলেন, তাতে স্বয়ং জার্মানীর সম্রাট বা কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলম, ফিল্ড মার্শাল হিণ্ডেনবুর্গ, ফিল্ড মার্শাল লুডেনডর্ফ, এ্যাডমিরাল ফন্ তিরপিৎস্ (Tirpitz) প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় নৌ-সেনাপতি, সেনানায়ক এবং অধিকাংশ প্রিন্স বা রাজপুত্রদের নাম ছিল। কাইজারের বিরুদ্ধে 'আন্তর্জাতিক নৈতিকতা ও সন্ধিচুক্তির পবিত্রতা ভঙ্গের চরম অপরাধের' অভিযোগ আনা হইয়াছিল। কাইজার অবশ্য হল্যাণ্ড বা নেদারল্যাণ্ডসে পলাইয়া গেলেন এবং সেখানে আশ্রয় নিলেন। ডাচ গবর্নমেণ্ট এই যুক্তিতে কাইজারকে মিত্রশক্তির হাতে অর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন যে, ওলন্দাজদের (ডাচ্) আইনে এই ধরনের কোন অপরাধের উল্লেখ নাই এবং এই অপরাধ একমাত্র ভার্সাই সন্ধির বলে সৃষ্টি করা হইয়াছে। সুতরাং যে অপরাধের আগে কোন আইনগত অস্তিত্ব ছিল না, তার বিচারের দাবী ন্যায়বিচারের পরিপন্থী।

অন্যান্য আসামীদের সম্পর্কে জার্মানীর সরকারের পক্ষ থেকে বলা হইল যে, রাইখষ্ট্যাগে (পার্লামেণ্টে) বিশেষ আইন প্রণয়ন ছাড়া এঁদেরকে মিত্রশক্তিবর্গের হাতে অর্পণ করা যাইবে না। কারণ, এঁদের অধিকাংশই জার্মানীতে জাতীয় বীরপুরুষরূপে সম্মানার্হ। সুতরাং কোন গবর্নমেণ্ট এঁদের বিরুদ্ধে আইন পাশ করিতে গেলে সেই সরকারের তৎক্ষণাৎ পতন অনিবার্য। তবে, বিকল্প প্রস্তাব অনুসারে কয়েকজন নিম্নপদস্থ অফিসারকে লাইপজিগের সুপ্রীমকোর্টে অভিযুক্ত করা হইল। কিন্তু সেখানে বিচারের নামে বিচারের প্রহসন হইল। (১)

প্রথম মহাযুদ্ধের এই অভিজ্ঞতা থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মিত্রপক্ষীয় নেতারা আগে থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং ১৯৪১ সালের ২৫শে অক্টোবর চার্চিল এবং রুজভেল্ট, ১৯৪১ সালের জানুয়ারী ও ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে

(১) The Second Great war—Sir John Hammerton, vol. 9, p. 3971.

সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে মলোটোভ জার্মান অধিকৃত দেশগুলিতে নৃশংসতা অনুষ্ঠান সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করিলেন এবং হিটলারী গবর্নমেণ্ট, জার্মান হাইকমাণ্ড ও তাদের কুকার্যের অংশীদারগণকে এই সমস্ত অপরাধের জন্য দায়িত্ব বহন করিতে ও শাস্তি পাইতে হইবে বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে লণ্ডনে লর্ড রাইটকে চেয়ারম্যান করিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের পক্ষ থেকে নিযুক্ত একটি যুদ্ধাপরাধ কমিশনের তরফ হইতে সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যবস্থা হইল।…

১৯৪৩, নভেম্বর মাসে মস্কোতে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের এক সম্মেলন থেকে ঘোষণা করা হইল যে, যে যে দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধে জার্মান অফিসার ও নাৎসী পার্টির সদস্য ও লোকেরা নৃশংসতা, নির্বিচার হত্যা ও প্রাণ হননের জন্য দায়ী তাদেরকে সেই সেই দেশে ফেরৎ পাঠানো হইবে এবং সেই সমস্ত দেশের আইন অনুযায়ী তাদের বিচার ও দণ্ড হইবে। কিন্তু প্রধান প্রধান যুদ্ধাপরাধীদের এবং যাদের অপরাধ কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, তাদেরকে মিত্রপক্ষের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের দ্বারা শাস্তি দেওয়া হইবে। ১৯৪৫ সালের বিখ্যাত পটসডাম সম্মেলনে সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটিশ গবর্নমেণ্টের প্রধানগণ কর্তৃক এই ঘোষণা অনুমোদিত হইল।

জার্মানীর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও দণ্ডদান সম্পর্কে এই পটভূমিকা স্মরণীয় এবং বিশেষভাবে স্মরণীয় এজন্য যে, একমাত্র ন্যুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালতে প্রধান প্রধান জার্মান নেতাদের বিচার হইয়া থাকিলেও মিত্রপক্ষীয় বিভিন্ন দেশে ও অধিকৃত জার্মান এলাকায় বহু নাৎসী ও ফ্যাসিষ্ট সামরিক বা প্রশাসনিক ব্যক্তির বিচার ও ফাঁসি হইয়াছিল। যেমন, মস্কো ঘোষণার অব্যবহিত পরেই ১৯৪৩, ডিসেম্বর মাসে চারজন জার্মানের বিরুদ্ধে গ্যাস সহযোগে অ-সামরিক সোভিয়েত নাগরিকদেরকে দলবদ্ধভাবে হত্যার অভিযোগ আনা হইল এবং বিচারের পর প্রকাশ্যভাবে তাদেরকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হইল।

যুদ্ধ যতই শেষ হইয়া আসিতেছিল, ততই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য নানাস্থানে সামরিক আদালত প্রতিষ্ঠিত ও অভিযুক্তদের বিচার ও দণ্ড হইতেছিল। ১৯৪৬, ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত জার্মানীর বৃটিশ অধিকৃত এলাকায় ৪৪২ জন অভিযুক্তের মধ্যে ৩২০ জন আসামী দণ্ডিত হইয়াছিল। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিতদের মধ্যে একটি জার্মান সাবমেরিনের (১৯৪৪ সালে অতলান্তিক মহাসমুদ্রে) একজন ক্যাপ্টেন ও দুইজন অফিসারও ছিলেন।

১৯৪৫ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর জার্মানীর লুনবার্গে কুখ্যাত বেলসেন বন্দীনিবাসের ষ্টাফ্ বা কর্মচারীদের মধ্য থেকে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আনা হইল। ১৮ই নভেম্বর তারিখ এদের মধ্যে ৮ জন পুরুষ ও তিনজন স্ত্রীলোক সহ মোট ১১ জন আসামীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইল। এই সমস্ত অপরাধীর মধ্যে ক্যাম্প কমণ্ড্যাণ্ট জোসেফ ক্রামার (Kramer), ক্যাম্প ডাক্তার ফ্রিৎস ক্লিন (Fritz klein) এবং প্রধান নারী ওয়ার্ডার ইরমা গ্রেস (Irma Grese) অত্যন্ত জঘন্য ও বর্বর অত্যাচারের দায়ে অভিযুক্ত হইয়াছিল এবং তাদের সকলেরই ফাঁসি হইয়াছিল।

এই দলের মক্ষীরানী ইরমা গ্রেসি এবং ক্রামার 'বিষ্ট অব্ বেলসেন্' কিংবা বেলসেনের পশুরূপে কুখ্যাত হইয়াছিল। এটাই ছিল জার্মানীতে বন্দীশিবিরের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের প্রথম বিচার।

ইতালীতে ডুস্টলার (Dostler) নামে একজন জার্মান জেনারেলকে একটি মার্কিন সামরিক আদালতে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল ১৫ জন মার্কিন কমাণ্ডো সৈন্যকে হত্যা করার জন্য। এই সৈন্যেরা তখন যুদ্ধবন্দী ছিলেন। জার্মান সেনাপতি এই বলিয়া আত্মপক্ষ সমর্থ করিয়াছিলেন যে, কমাণ্ডো অভিযানে ধৃত সমস্ত শত্রুসৈন্যকে সংহার করার জন্য হিটলারের কড়া হুকুম ছিল। সুতরাং তিনি উপরওয়ালার হুকুম কার্যকর করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু আদালতে তাঁর এই যুক্তি গ্রাহ্য হয় নাই। কেন না, জেনেভা কনভেনশন অনুসারে যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করা যুদ্ধাপরাধ হিসাবে গণ্য।

* * *

যুদ্ধের শেষে বিজয়ী পক্ষের মধ্যে বহু মতভেদ ছিল, একথা সত্য। কিন্তু একটি বিষয়ে তাদের সকলে একমত ছিলেন এবং তাঁদের দৃঢ় সংকল্প ছিল যারা যুদ্ধাপরাধের জন্য দায়ী, যারা হিংস্রতা ও নির্মমতার দ্বারা অগণিত মানুষের সর্বনাশ করিয়াছে, তাদের দণ্ড দিতেই হইবে এবং কোন মতেই তাদের রেহাই দেওয়া হইবে না। মিত্রপক্ষীয় প্রধান চতুঃশক্তির স্বাক্ষরিত (৮ আগষ্ট, ১৯৪৫) এই চার্টারে রাষ্ট্রপুঞ্জের আরও ১৯টি সদস্যরাষ্ট্র যে স্বাক্ষর দিল, তার ফলেই আন্তর্জাতিক সামরিক আদালত গঠিত এবং প্রধান প্রধান নাৎসী নেতাদের বিচার অনুষ্ঠিত হইল। ইতিহাসের নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, যে পুরাতন ন্যুরেমবার্গ শহর ছিল হিটলারের প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল সোসিয়েলিষ্ট পার্টির বিরাট বিরাট সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানের লীলাভূমি এবং যেখানে লক্ষ লক্ষ জার্মান নর-নারী-যুবক হিটলারী মেঠো বক্তৃতার উন্মাদিনী মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পররাজ্য দখলে লোভাতুর হইয়াছিল, সেই ন্যুরেমবার্গের বিচার কক্ষেই বড় বড় নাৎসী নেতাদের জীবনের উপর যবনিকা নামিয়া আসিল।

২০শে নভেম্বর, ১৯৪৫, বেলা ১০টার সময় ৮ই আগষ্টের স্বাক্ষরিত চার্টার অনুযায়ী ন্যুরেমবার্গে আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের অধিবেশন শুরু হইল। বিচারকমণ্ডলী গঠিত হইল চার জন জজ ও চার জন বিকল্প জজ নিয়া। যেমন—

১। সভাপতি লর্ড জাষ্টিস জিওফ্রে লরেন্স (বৃটিশ)

২। বিকল্প—স্যার উইলিয়াম নরম্যান বারকেট্

৩। মিঃ ফ্রান্সিস বিড্ল (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন এটর্নি-জেনারেল)

৪। বিকল্প—জজ জন জে পার্কার

৫। ফ্রান্সের পক্ষ থেকে—
Henri Donnedieu de Vabres.

৬। বিকল্প—Le Conseiller Falco

৭। সোভিয়েত ইউনিয়ন—
মেজর-জেনারেল আই টি নিকিৎচেক্কো

৮। বিকল্প—লেঃ কর্নেল এ এক ভলচকোভ

বৃটিশ, মার্কিন, ফরাসী ও সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে প্রধান অভিযোক্তা কৌসুঁলি ছিলেন যথাক্রমে—স্যার হার্টলি শ'ক্রস্ (Shawcross) কে-সি, এম-পি, জাষ্টিস রবার্ট এইচ জ্যাকসন, Francois De Menthon এবং জেনারেল আর এ রুদেঙ্কো।

এঁরা ছাড়া এঁদের সঙ্গে আরও ছিলেন স্যার ডেভিড ম্যাকসওয়েল-ফাইফ (Maxwell Fyfe), চার্লস ডুবোষ্ট (ফ্রান্স) এবং কর্নেল ইউরি পোক্রোভস্কি (রাশিয়া)।

১৮ অক্টোবর, ১৯৪৫, চারটি অভিযোগকারী সদস্যরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ২৪ হাজার শব্দ সম্বলিত অভিযোগপত্র পেশ করা হইল ৬টি জার্মান সংগঠন এবং হিটলারী জার্মানীর ২৪জন সামরিক ও নাৎসী নেতার বিরুদ্ধে।

নিম্নলিখিত সংগঠনগুলিকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল :

১। জার্মান সেনানীমণ্ডলী এবং জার্মান সশস্ত্র বাহিনীর হাইকমাণ্ড।

২। জার্মানীর গুপ্ত মন্ত্রিসভাসহ রাইখ ক্যাবিনেট, ডিফেন্স কাউন্সিলের সদস্যবর্গ, অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ এবং সরকারী দপ্তরের প্রধানগণ।

৩। মূল ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রীয় শক্তি—নাৎসী পার্টির নেতৃত্ব—সমস্ত পার্টি-অফিসার এবং প্রশাসকবর্গ (Gauleiter) প্রভৃতি।

৪। এস এস বাহিনী—গোড়াতে এই বাহিনী গঠিত হইয়াছিল হিটলারের ও অন্যান্য নাৎসী নেতাদের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হিসাবে। কিন্তু পরে এরা একটা উৎপীড়ক পুলিশ বাহিনীতে ও ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীতে পরিণত হইল।

৫। এস-এ, হিটলারের গোড়াকার দিকের অনুচরদের নিয়া গঠিত ঝটিকাবাহিনী বা ষ্টর্ম-ট্রুপার।

৬। গেষ্টাপো বা গুপ্ত পুলিশ—সর্বপ্রকার নৃশংস অত্যাচারের জন্য অতি কুখ্যাত সংগঠন।

যে ২৪ জন প্রধান আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইয়াছিল, তাদের নাম :

১। হেরমন উইলহেলম গোয়েরিং—দুই নম্বর নাৎসী নেতা, জার্মান বিমান-বহরের অধিনায়ক, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বা বন্দীশিবির প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্ভাবক এবং একজন সেরা নাৎসী নেতা।

২। জোয়াচিম ফন রিবেন্ট্রপ—নাৎসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী, ১৯৩৯ সালের রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির প্রধান উদ্যোক্তা এবং ইহুদী-বিদ্বেষ অভিযানের মুখ্য পাণ্ডা।

৩। আলফ্রেড রোজেনবার্গ—হিটলারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ন্যাশনাল সোসিয়েলিষ্ট তত্ত্বের প্রধান দার্শনিক উদ্গাতা এবং 'নাৎসী পার্টির আত্মিক ট্রেনিংয়ের' পরিচালক।

৪। উইলহেলম ফ্রিক—রাইখষ্ট্যাগের গোড়াকার দিকের নাৎসী নেতা এবং বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার সংরক্ষক বা প্রোটেক্টর।

৫। জুলিয়াস ষ্ট্রেইচার—যৌনবিষয়ক অতি অশ্লীল সাময়িকীর সম্পাদক ও

ভয়াবহ রকমের গোঁড়া ইহুদীবিদ্বেষী—'মানুষের দেহে ইহুদীরা হইতেছে মূর্তিমান শয়তান'—এই তত্ত্বের প্রচারক।

৬। ভাল্টার ফাঙ্ক—প্রাক্তন অর্থনৈতিক মন্ত্রী। রাইখ ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট এবং বৃহৎ ব্যবসায় ও নাৎসীদের মধ্যে সক্রিয় সংযোগ রক্ষাকারী।

৭। রুডলফ্ হেস—ফুরারের ডেপুটি, ৩নং নাৎসীনেতা, পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিরোধ মীমাংসার ভারপ্রাপ্ত নায়ক। একজন শীর্ষনেতা।

৮। হান্স ফ্রাঙ্ক—ব্যাভেরিয়ার আইনজীবী, ন্যাশনাল সোসিয়েলিজম ও আইনকে একীকরণের জন্য দায়ী। তাঁর ঘোষণা—'ইতিহাসে হিটলারই সবচেয়ে বড় আইন স্রষ্টা' এবং 'ফুয়েরারের ইচ্ছাই আইন'। পোলাণ্ডের নাৎসী গবর্নর-জেনারেল।

৯। কনষ্টানটিন ফন্ নিউরাথ—প্রাক্তন নাৎসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং পরে বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার সংরক্ষক বা প্রোটেক্টর।

১০। ফ্রানজ ফন্ প্যাপেন—দুইটি বিশ্বযুদ্ধেই রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষী। পর্দার আড়ালে রাজনৈতিক ঘোঁট পাকানোতে সিদ্ধহস্ত, নাৎসী কূটনীতিক এবং যুদ্ধের সময় তুরস্কের রাষ্ট্রদূত।

১১। আর্নেষ্ট ক্যালটেনব্রুনার—নাৎসী সিকিউরিটি পুলিশের বড়কর্তা, ইহুদী-দেরকে সংহার করার জন্য হিটলার ও হিমলারের আজ্ঞাবাহী। এস এস জেনারেল, অষ্ট্রিয়ার নিরাপত্তা রক্ষার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং ভিয়েনার পুলিশের অধিকর্তা।

১২। এইচ এইচ গ্রীলে শ্যাক্ট—নাৎসীদের অর্থনীতির যাদুকর বলে পরিচিত ও প্রাক্তন নাৎসী অর্থমন্ত্রী, রাইখ ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট, বিপুল নাৎসী পুনরস্ত্রসজ্জার কর্মসূচী সংক্রান্ত টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ।

১৩। ফ্রীৎস সাউকেল—(Fritz Sauckel) এস-এস এবং এস-এ জেনারেল।

১৪। ব্যালডুর ফন শাইরাস (Schirach)—নাৎসী যুব আন্দোলনের নেতা ও ইহুদী-বিদ্বেষী ;

১৫। আর্তুর ফন্ সেইস্ ইনকোয়ার্ট (Seyss Inquart)—অষ্ট্রিয়ার নাৎসী চ্যান্সেলার এবং পরে নেদারল্যাণ্ডসের কমিশার।

১৬। আলবার্ট স্পীয়ার (Speer)—অসাধারণ টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ, নাৎসী যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের আসল মস্তিষ্ক এবং স্থপতি শিল্পী ও রাইখের দায়িত্বশীল মন্ত্রী।

১৭। হান্স ফ্রিৎসশে (Fritzsche)—নাৎসী প্রচারকার্যের ও সংবাদপত্রের একজন প্রধান সম্পাদক।

১৮। ফিল্ড মার্শাল উইলহেলম কাইটেল—সমগ্র সশস্ত্রবাহিনী বা জার্মান হাইকমাণ্ডের (ও. কে. ডব্লিউ) প্রধান।

১৯। জেনারেল আলফ্রেড জড্ল—জার্মান সৈন্যবাহিনীর সেনানীমণ্ডলীর (ও. কে. ডব্লিউ) প্রধান।

২০। এ্যাডমিরাল এরিখ রেইডার—গ্রাণ্ড এ্যাডমিরাল এবং জার্মান নৌবহরের প্রাক্তন প্রধান।

২১। এ্যাডমিরাল কার্ল ডোয়েনিৎস—গ্রাণ্ড এ্যাডমিরাল এবং জার্মান নেভির প্রধান সেনাপতি।

২২। রবার্ট লে—নাৎসী শ্রমিক বা লেবর ফ্রণ্টের বড় কর্তা।

২৩। গুস্তভ ক্রপ্ ফন্ বোলেন আণ্ড হলব্যাচ—জার্মানীর শ্রমশিল্প 'সম্রাট' এবং সুবিখ্যাত ইস্পাত ও অস্ত্রকারখানার প্রধান কর্তা।

২৪। মার্টিন বোরম্যান—হিটলারের সেক্রেটারি। এস-এর প্রধান এবং পিপলস্ আর্মির বড় কর্তা (অনুপস্থিতিতে বিচার)।

এই ২৪ জন আসামীর মধ্যে ২১ জনকে আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রস্তুতির জন্য ৩০ দিন সময় দেওয়া হইয়াছিল। নাৎসী পার্টির প্রতিপত্তিশালী অন্যতম নেতা মার্টিন বোরম্যান বার্লিন যুদ্ধের পর থেকেই নিখোঁজ হইয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি জার্মানী থেকে কোনক্রমে দক্ষিণ আমেরিকায় পলাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরে জানা গিয়াছে বার্লিনের ধ্বংসস্তূপে তিনি নিহত হইয়াছেন। কিন্তু ন্যুরেম-বার্গের মামলার সময় সেটা নিশ্চিতরূপে জানা ছিল না। এজন্য তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর বিচার ও দণ্ড হইয়াছিল। নাৎসী শ্রমিক ফ্রণ্টের কর্তা কুখ্যাত রবার্ট লে নিজের পাপের বোঝায় অভিভূত হইয়া বিচার আরম্ভের আগেই আত্মহত্যা করেন। জার্মান শ্রমশিল্পের বিশ্ববিখ্যাত অধিনায়ক গুস্তভ ক্রপ্ নাৎসী পার্টির দলভূক্ত ছিলেন না। কিন্তু দৈহিক ও মানসিক ভাবে তিনি এতই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁর বিচার স্থগিত ছিল। কাইটেল, জড্ল, ডোয়েনিৎস এবং রেইডার—এই চারজন রণনায়কও নাৎসী পার্টির সদস্য ছিলেন না বটে, কিন্তু যুদ্ধাপরাধের দিক থেকে তাদের দায়িত্ব আদৌ কম ছিল না। বরং সেরা অপরাধী হিসাবে তাঁদের বিচার হইয়াছিল।

আসামীদের বিরুদ্ধে চার দফা অভিযোগ পেশ করা হইয়াছিল :

১। শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য ষড়যন্ত্র

২। শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ

৩। যুদ্ধাপরাধ এবং

৪। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ

এই সমস্ত অপরাধ অনুষ্ঠানের সপক্ষে অসংখ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ, দলিল, কাগজপত্র এবং বহু বন্দীশিবিরের নৃশংসতা ও হত্যাকাণ্ডের ফটো ও চলচ্চিত্র এবং খাতা ও হিসাবপত্র ইত্যাদি সংগৃহীত ও আদালতে পেশ করা হইয়াছিল। জার্মানীর খাস সরকারী দপ্তর থেকে এবং অধিকাংশ দক্ষিণ জার্মানীর ব্যাভেরিয়া অঞ্চলের সুরক্ষিত স্থান থেকে আমেরিকানদের দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু মিত্রপক্ষের কেউ কেউ বিস্ময়ের সঙ্গে এই প্রশ্ন করিয়াছেন যে, অপরাধের প্রমাণস্বরূপ এই সমস্ত দলিল জার্মানী আত্মসমর্পণের আগে নষ্ট করে নাই কেন? ২০ গাড়ী বোঝাই এই দলিলপত্রের সঙ্গে বৃটিশ, ফরাসী ও রুশদের ধৃত কাগজপত্রও সরবরাহ করা হইয়াছিল। এই পর্বতপ্রমাণ কাগজপত্র থেকে বিশেষজ্ঞরা ৩০০০ দলিল বাছাই করিয়াছিলেন—যেগুলির সমস্তই প্রামাণিক ছিল। এগুলির মধ্যে আসামীদের অনেকের

স্বীকারোক্তিও ছিল। ২০শে নভেম্বর, ১৯৪৫ থেকে শুরু করিয়া ১লা অক্টোবর, ১৯৪৬ পর্যন্ত একাদিক্রমে ৯ মাস ধরিয়া এই বিচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এত ব্যাপক পটভূমিকায় (ক্যানভাসে)—২৫ বছর ব্যাপ্ত ঘটনাবলীর এবং যে ঘটনাবলীর সঙ্গে সারা পৃথিবীর দুর্ভোগ জড়িয়ে ছিল—এমন বিরাট মামলার আর কখনও বিচার হয় নাই —এই কথাগুলি বলিয়াছেন যুদ্ধাপরাধ-বিশেষজ্ঞ প্রখ্যাত বৃটিশ আইনজীবী স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফ্। তিনি নাৎসীদের অপরাধের ব্যাপকতা ও গভীরতা সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, প্রত্যেক যুদ্ধেই সংঘর্ষের সময় কিংবা নিদারুণ কোন লড়াইয়ের পর পাশবিক প্রবৃত্তি জাগে ও জঘন্য অপরাধ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু নাৎসীরা ঠাণ্ডা মাথায় এবং হিসাবনিকাশ করিয়া যেভাবে নৃশংসতাকে রাজ্যজয়ের একটা যান্ত্রিক উপায়ে পরিণত করিয়াছিল, তেমন পরিকল্পনা আগে কখনও পৃথিবীতে দেখা যায় নাই। স্যার ডেভিড তাঁর ফরাসী সহযোগীর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন :

"The National Socialist dictate which raises inhumanity to the level of a principle constitutes in fact the doctrine of disintegration of modern society . All the former conceptions which attempted to humanise war are outdated."

সোজা কথায়—'ন্যাশনাল সোসিয়ালিষ্ট পার্টি তাদের হুকুমনামায় অমানুষিকতাকে এমন একটা নীতিগত পর্যায়ে তুলিয়াছিল যে, কার্যতঃ এই মতবাদ আধুনিক সমাজের ছিন্নভিন্ন করণের মত ছিল। আগেকার দিনে যুদ্ধকে মানবিকতার মধ্যে রাখার জন্য যে সমস্ত চিন্তাভাবনা করা হইয়াছিল, সেগুলি সমস্তই সম্পূর্ণরূপে সেকেলে হইয়া গেল।'

আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তালিকায় 'গণহত্যা' শব্দটির উল্লেখ এবং বিচারের সময় সেই অপরাধের সবিস্তার বর্ণনার দ্বারাই এই নতুন নাৎসী মতবাদের ভয়াবহতার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। (২)

স্যার ডেভিড আরও বলিয়াছেন যে, সুবৃহৎ জার্মান সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলার জন্য এই ধরনের গণহত্যা কিংবা এক একটা জাতিকে—যেমন ইহুদী, পোল, চেক, রাশিয়ানদের সমূলে সংহার করার পরিকল্পনা অনুসরণ করার প্রয়োজন তারা বোধ করিয়াছিল। কিন্তু জার্মানীর ঘরে ও বাইরে এভাবে অসংখ্য ইহুদী ও রাজনৈতিক বিরোধীদেরকে খুন করা যে, একটা অপরাধ এটা যে কোন সভ্য রাষ্ট্রে স্বীকৃত। সুতরাং একমাত্র ন্যুরেমবার্গের আদালতের বিচারের জন্যই এমন বিধান তৈরী হয় নাই।

যে 'চার্টার বা সনদ অনুসারে এই ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইয়াছিল, ন্যুরেমবার্গের বিচারকমণ্ডলী তার উপর চরম গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। কারণ, এই সনদের ধারা অনুযায়ী আসামীদিগকে যে দণ্ড দেওয়া হইবে, একমাত্র সেজন্যই এই

(২) The Nuremberg Trial—R. W. Cooper. 1947, Penguin, p. 10.

আদালতের গুরুত্বঃ ছিল না, বিশেষভাবে গুরুত্ব ছিল এই কারণে যে, এই আদালতের বিচার থেকে ভবিষ্যৎ আগ্রাসকগণ এই শিক্ষা পাইবে যে, এরপর থেকে পরের দেশ আক্রমণ করিতে গেলে সেটা এমন একটা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে যে, 'গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়া আগ্রাসকের ভূমিকা নিতে হইবে '—বৃটিশ এটর্ণী-জেনারেল স্যার হার্টলি শ' ক্রসের মন্তব্য অনুযায়ী।

ন্যুরেমবার্গের বিচারকমণ্ডলী আর একটি বিষয়েও সতর্ক ছিলেন। আসামীদের যথোপযুক্ত শাস্তি বিধান করা হইবে, একমাত্র সেটাই যথেষ্ট ছিল না, কিংবা এরা যে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত ছিল, কেবল সে কথাটা পৃথিবীর সর্বজন সমক্ষে প্রমাণিত হওয়াই যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা ছিল এই যে, সমসাময়িক কালের এবং ভবিষ্যতের বিশ্বব্যাপী জনমত যেন স্বীকার করিয়া নেয় যে, আসামীদের বিচার ও দণ্ড যথাযথভাবে আইন অনুসারেই হইয়াছিল। অন্যথা ন্যুরেমবার্গকে ন্যায়-বিচার বলিয়া গণ্য করা হইবে না, হইবে বিজয়ীদের প্রতিহিংসারূপে।

যে আইন অনুসারে আসামীদের কার্যাবলী অপরাধজনক বলিয়া বিবেচিত ছিল, সেই সমস্ত আইন বিজয়ী দেশের বলিয়া গণ্য করা যায় না। কারণ, আসামীদের কেউ সেই সমস্ত আইনের আওতাভুক্ত ছিল না। অর্থাৎ ন্যুরেমবার্গের আদালত আন্তর্জাতিক আইন অনুসারেই কাজ করিতেছিল এবং আদালত এই সমস্ত আইন গঠন করে নাই, কেননা আদালতের সেই ক্ষমতাও ছিল না। অভিযোগ পত্রের দাবী অনুসারে আসামীরা অপরাধজনক কার্যগুলি সম্পাদন করিয়াছিল কিন, কেবল মাত্র সেইটুকু নির্ধারণ করাই আদালতের ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর আদালত চার্টারের শর্ত অনুযায়ী চার্টারকে আইনের দিক থেকে সঠিক বা সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে এবং আসামীদের কার্যাবলীকে অপরাধজনক বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য ছিল।

কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে—তা হলে চার্টারই কি এই নতুন অপরাধের আইন প্রণয়ন করিয়াছে?—না, এর জবাবেও বলা যাইতে পারে—না। চার্টার সম্পাদন-কারীদের তেমন কোন আইন প্রণয়নের ক্ষমত ছিল না। কারণ, তারা কোন বিশ্ব সংসদের বা 'World Parliament'-এর মর্যাদাসম্পন্ন ছিল না এবং তেমন কোন ক্ষমতারও দাবীদার তাঁরা ছিলেন না। যদি তেমন কোন ক্ষমতাও তাঁদের থাকিত, তবে, তাঁদের সেই কার্যের দ্বারা 'Natural Justice' বা 'স্বাভাবিক ন্যায়পরায়ণতার' উপর হিংস্র আঘাত আনা হইত। কেন না, একমাত্র ১৯৪৫ সালেই যদি তাঁরা সর্বপ্রথম সেই আইন প্রণয়ন করিতেন, তবে, সেই বছরের আগে অনুষ্ঠিত জার্মানদের কার্যাবলী নিশ্চয়ই আইন অনুসারে অপরাধজনক বলিয়া গণ্য করা যাইত না। কারণ, 'স্বাভাবিক ন্যায় বিচারের মূল নীতির উহা বিরোধী হইত।'

সুতরাং চার্টার সম্পাদনকারীদের একমাত্র ক্ষমতা ছিল আগে থেকই যে আইনের অস্তিত্ব ছিল, একমাত্র সেই আইনকে ঘোষণা করা। সুতরাং মৌখিক প্রশ্ন দাঁড়াইল—

"Were the acts declared in the Charter to be crimes by

international law truly crimes by that law before the Charter was drawn up ?'' (৩)

অর্থাৎ চার্টারে যে সমস্ত কার্য অপরাধ বলিয়া ঘোষিত হইল আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে সেগুলি কি চার্টার রচিত হওয়ার আগেই আইনগতভাবে সত্যকার অপরাধ বলিয়া গণ্য ছিল ?

গ্রেট বৃটেনে আন্তর্জাতিক আইন বিশারদগণের মধ্যে এই বিষয়ে মতভেদ ছিল এবং বিচারের আইনগত বৈধতা সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে সর্বসম্মত কোন মতৈক্য ছিল না।*

তবে, একথা সত্য যে, অনেক বিশ্ববিখ্যাত আইনবিশেষজ্ঞ ন্যুরেমবার্গের এই বিচারকে যেমন বিধিসম্মত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন তেমনি কোন কোন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ এই সমস্ত বিচারকে "রাজনৈতিক দেশদ্রোহিতার বিচারের" সঙ্গে তুলনা দিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, "এরদ্বারা বিশ্বের ন্যায়বিচার সংক্রান্ত ধারণার অপহ্নব ঘটানো হইয়াছে।"

আসামীদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ করা হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ বা যুদ্ধের পরিকল্পনা শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া গণ্য ছিল। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সন্ধি ও চুক্তি এবং জাতিসমূহের আচরণ থেকে বিভিন্ন জাতি সমবায়ের মধ্যে এই 'সাধারণ আইন' ('কমন্ ল') উদ্ভূত হইয়াছিল যে, আগ্রাসন অপরাধের তুল্য। সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে চার্টারের অন্যতম স্বাক্ষরকারী অধ্যাপক এ এন ট্রেইনিন 'ফৌজদারি আইন অনুসারে হিটলারী দায়িত্ব' শীর্ষক তত্ত্বে মন্তব্য করিলেন যে, 'পৃথিবীতে সেই যুগ অতিক্রান্ত হইয়াছে যখন বিভিন্ন জাতি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করিত। বর্তমানে স্থায়ী আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আদান প্রদান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মানবসমাজের এই মহা গুরুত্বপূর্ণ অবদান এবং রাষ্ট্র ও জাতিসমূহের মধ্যে সম্পর্কের উপর হননকারী আঘাত নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক অপরাধ। কারণ, আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের ভিত্তির উপর আঘাত হানা আন্তর্জাতিক অপরাধরূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য।'

আর একজন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ লর্ড রাইট যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, সংক্ষেপে তা উল্লেখ করিয়া বলা যায় যে, যুদ্ধকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া যখন রাষ্ট্রসমূহ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দান করে, তখন বুঝিতে হইবে যে, সভ্য জাতিসমূহ এই মূলনীতি গ্রহণ করিতেছে যে, যুদ্ধ অন্যায় এবং অপরাধজনক। সুতরাং এই নীতি আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী। (৪)

অবশ্য পৃথিবীতে এমন একদিন ছিল যখন কোন রাষ্ট্র তার নিজের সুবিধা বা স্বার্থ-

(৩) The Second Great War—Vol-9, p 3974.

* এই বিষয়ে টোকিও আন্তর্জাতিক আদালতের সুবিখ্যাত ভারতীয় বিচারপতি ডঃ রাধাবিনোদ পালের ভিন্ন মত পরবর্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

(৪) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৩৭৮০

সিদ্ধির জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া বিধিসঙ্গত বলিয়া মনে করিত। জার্মান রণপণ্ডিতদের গুরু ক্লাউসেভিৎস (Clausewitz) যুদ্ধের অনুরূপ সংজ্ঞা দিয়াছিলেন :

'War is the continuation of politics by other means'.

অর্থাৎ অপর কোন পন্থায় রাজনীতি পরিচালনার নামই যুদ্ধ !

কিন্তু উনবিংশ ও বিংশ শতকে পৃথিবীর মানুষ ক্রমেই সচেতন হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তারা যুদ্ধকে অন্যায় ও অপরাধজনক বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এই মনোভাব থেকেই যুদ্ধ নিবারণের জন্য এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সদ্ভাব রক্ষা করার জন্য অনেকগুলি আন্তর্জাতিক সন্ধিচুক্তির উদ্ভব হইল। ১৮৯৯ এবং ১৯০৭ সালের হেগ চুক্তি (কনভেনশন) থেকে শুরু করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে প্রতিষ্ঠিত লীগ অব নেশন্সের যে সমস্ত চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে, সেগুলির উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ নিবারণ কিংবা শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা। রাষ্ট্র-সংঘের বিধিবিধানের মধ্যেও যুদ্ধ নিষিদ্ধ ঘোষিত হইল এবং অস্ত্র সীমাবদ্ধ করণের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

১৯২৫ সালের লোকার্নো প্যাক্ট যুদ্ধ নিষিদ্ধ করার পক্ষে ইউরোপীয় ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি ও ঘোষণা ছিল মার্কিন ও ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রীদ্বয়ের পক্ষ থেকে ১৯২৮ সালের কেলগ্-ব্রিঁয়া প্যাক্ট কিংবা 'যুদ্ধ বর্জনের সাধারণ সন্ধিপত্র'। এই সন্ধিপত্রের স্বাক্ষরকারীগণ পবিত্র গাম্ভীর্যের সঙ্গে ঘোষণা করিলেন যে, জাতীয় নীতি হিসাবে তাঁরা যুদ্ধের পন্থা গ্রহণকে পরিত্যাগ করিলেন। পরবর্তী কালে এই সন্ধি পৃথিবীর সমস্ত বৃহৎ শক্তি কর্তৃক গৃহীত হইল এবং ১৯৩৯ সালের মধ্যে (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সন্ধিক্ষণ) জার্মানীসহ পৃথিবীর ৬০টিরও অধিক জাতি এই সন্ধির বাধ্যবাধকতা স্বীকার করিয়া নিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ১১বার এই সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করা হইয়াছিল। তার মধ্যে একমাত্র জার্মানী কর্তৃকই তিনবার—১৯৩১ সালে অষ্ট্রিয়া, ১৯৩৯ সালে চেকোশ্লভাকিয়া এবং ১৯৩৯ সালে পোল্যাণ্ড।

স্যার হার্টলি শ'ক্রস ন্যুরেমবার্গের আদালতে যুদ্ধবিরোধী আন্তর্জাতিক বিধিবিধানগুলির ব্যাখ্যা ও বিবরণ দিয়া বলিয়াছেন যে, ১৯২৮ সালের কেলগ্-ব্রিয়াঁ প্যাক্টের মত ব্যাপক সন্ধিচুক্তি ছাড়াও আরও এমন অজস্র চুক্তি, শর্ত ও বিধিবিধান ছিল এবং যেগুলির দ্বারা যুদ্ধ নিষিদ্ধ ও আন্তর্জাতিক বিরোধ সালিশী বা শান্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বারা মীমাংসার জন্য বাধ্যতামূলক ছিল, সেগুলির সংখ্যা প্রায় হাজার খানেক হইবে। সংখ্যাটি অবিশ্বাস্য বটে, কিন্তু সত্য এবং এই সত্য কার্যতঃ পৃথিবীর সকল জাতির পক্ষেই প্রযোজ্য ছিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ১৯৩৯ সালের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতিই এই নীতি মানিয়া লইয়াছিলেন যে, যুদ্ধ বে-আইনী। অতএব এই নীতি—**'this principle became part of the common law of the community of nations.'**

সোজা কথায়, এই নীতি পৃথিবীর জাতি গোষ্ঠীর 'সাধারণ আইনে' পরিণত হইয়াছিল।

লর্ড রাইট তাঁর ব্যাখ্যায় যুদ্ধকে কেবল অন্যায় বলেন নাই কিংবা ১৯৩৯ সালের যুদ্ধকে মনুষ্যজাতির পক্ষে সর্বাপেক্ষা সর্বনাশকর ঘটনাগুলির অন্যতম বলিয়াই বর্ণনা করেন নাই, আক্রমণাত্মক যুদ্ধকে যুদ্ধাপরাধগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সেরা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। (৫)

চার্টারে বর্ণিত অপরাধগুলির মধ্যে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগের সম্পর্কে তেমন কোন অভিনবত্ব ছিল না। কেননা, এই অভিযোগে- অর্থ ৎ যুদ্ধের নিয়মকানুন ও বিধি-বিধান ভঙ্গের অভিযোগে অতীতেও সামরিক আদালতে শত্রুপক্ষের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও দণ্ড হইয়াছে। প্রধানতঃ নৃশংসতা ও যুদ্ধের আইন ভঙ্গ করার জন্যই এই সমস্ত শাস্তি দেওয়া হইয়াছে।

যুদ্ধের এই সমস্ত নিয়মকানুন সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৮৬৮ সালে সেণ্ট পিটার্স বুর্গের ঘোষণার দ্বারা যখন যুদ্ধে বিস্ফোরক বুলেট নিষিদ্ধ করা হইল, তারপর থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভ পর্যন্ত ৮টি নতুন কনভেনশন বা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল স্থলযুদ্ধের আইন ও আচরণ সম্পর্কে। এই সমস্ত চুক্তির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৯০৬ এবং ১৯২৯ সালের জেনেভা কনভেনশন যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্য ও যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে—১৯০৭ সালের হেগ কনভেনশনও অনুরূপ গুরুত্ব-সম্পন্ন ছিল।

এগুলি ছাড়া হেগ সম্মেলনে নৌযুদ্ধ সম্পর্কেও অনেক নিয়মকানুন গৃহীত হইয়াছিল।

যুদ্ধ সংক্রান্ত এই সমস্ত চুক্তিভঙ্গের জন্যই যে, যুদ্ধাপরাধগুলি দণ্ডনীয় ছিল তা নয়, সমস্ত সভ্যদেশের গৃহীত সাধারণ ফৌজদারী আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ-গুলির মূলনীতিও এই সমস্ত অপরাধের দ্বারা ভঙ্গ করা হইয়াছিল বলিয়াই এগুলি দণ্ডনীয় ছিল।

চার্টারে গৃহীত ও বর্ণিত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের মধ্যে অবশ্যই নূতনত্ব ছিল। কারণ, এই অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, "যুদ্ধের আগে বা পরে যে কোন অসামরিক নাগরিকের বিরুদ্ধে অমানুষিক কার্যের অনুষ্ঠানই মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।" জাতি, বর্ণ, ধর্ম ও রাজনৈতিক মতবাদের জন্য নৃশংসতার অনুষ্ঠান এই সমস্ত অপরাধের অন্তর্গত ছিল। তবে, মানবিকতার বিরুদ্ধে অপরাধের এই আইনগত সংজ্ঞা নিয়া কোন কোন আইনবিশেষজ্ঞ কিছুটা আপত্তি তুলিয়াছিলেন। কেননা, সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্তর্গত কোন নাগরিক বা প্রজার প্রতি সেই রাষ্ট্রের আচরণ আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় পড়ে না।

কিন্তু এর বিরুদ্ধেও এই মর্মে যুক্তি দেখানো হইয়াছে যে, অতীতে অন্য কোন স্বাধীন দেশের নাগরিকের বিরুদ্ধে নৃশংস অত্যাচারের শাস্তি বিধানের জন্য বাইরের

(৫) দি সেকেণ্ড গ্রেট ওয়ার, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৮৩

শক্তির হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছিল—যেমন, তুরস্কে নির্যাতিত খ্রীষ্টানদের পক্ষে। এটাও মানবিকতার বিরুদ্ধে অপরাধের অন্তর্গত।

১৯১৫ সালের ২৮শে মে ফ্রান্স, গ্রেট বৃটেন ও রাশিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে তুরস্কে আর্মেনিয়ান জনসাধারণের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছিল, তার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাবাদ করিয়া এক ঘোষণাবাণী প্রচার করিয়াছিলেন এবং অপরাধীদের শাস্তি বিধানের জন্য দাবি করিয়াছিলেন। তুরস্ক সরকার এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তিদিগকে মিত্রশক্তিবর্গের হাতে সমর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ন্যুরেমবার্গ ও টোকিওর আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগে যে সমস্ত বিচার হইয়াছিল, সেগুলির পক্ষে তুরস্কের এই ঘটনা একটা নজীরের মত উদ্ধৃত হইয়াছিল। (৬)

চার্টার অনুযায়ী মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের এই সংজ্ঞার মধ্যে আর একটি নতুনত্ব এই ছিল যে, কোন আসামী যদি কোন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি বা কোন দায়িত্বশীল সরকারী অফিসারও হইয়া থাকেন, তথাপি তাঁকে অপরাধ অনুষ্ঠানের দায়িত্ব থেকে রেহাই দেওয়া যাইবে না। এমন কি সরকারী হুকুম পালন করিতে গিয়াই অপরাধগুলি সম্পাদন করা হইয়াছে, এই যুক্তিতেও আসামীকে রেহাই দেওয়া যাইতে পারে না। তবে, তার অপরাধের মাত্রা লঘু করিয়া দেখা যাইতে পারে।

১৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধে উপরওয়ালার বা সরকারী হুকুমে অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এমন যুক্তি দেখাইয়া অভিযুক্ত সৈন্যেরা রেহাই পাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এবারের সনদ অনুযায়ী সেই পথ রুদ্ধ হইয়া গেল।

তথাপি এই সনদের বিরুদ্ধে এই মর্মে সমালোচনা উত্থিত হইল যে, আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে যদিও কার্যগুলি অপরাধজনক বলিয়া বিবেচিত, তথাপি কোন রাষ্ট্রের কোন নাগরিক বিশেষকে এই আইন অনুযায়ী অভিযুক্ত করা যাইতে পারে না। কেন না, রাষ্ট্র হিসাবে রাষ্ট্রের সঙ্গেই সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়া থাকে, ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে নয় এবং সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ এই রাষ্ট্রগুলিই আন্তর্জাতিক জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং আন্তর্জাতিক আইনের অনুবর্তী।

কিন্তু এই যুক্তিও ধোপে টিকে নাই। কেন না, বহু অতীতকাল থেকেই স্বীকার করা হইয়া আসিতেছে যে, যুদ্ধের নিয়মকানুন ও আইন ভঙ্গের জন্য ব্যক্তিবিশেষকে দায়ী ও শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে এবং এটাই আন্তর্জাতিক আইনের বিধান (৭)

ন্যুরেমবার্গ আদালতের এই বিচার সম্পর্কে সাধারণ জার্মাণরা ধরিয়াই লইয়াছিলেন যে, এটা বিজয়ী পক্ষের প্রতিহিংসা গ্রহণ করা ছাড়া আর কিছু নয়। তবে, তাঁরা যে সরাসরি বন্দীদের গুলি করিয়া মারেন নাই, এইটুকুই তাঁদের কৃপা। তবে, লণ্ডন টাইমসের বিশেষ সংবাদদাতা আর ডব্লিউ কুপার মন্তব্য করিয়াছেন যে, অধিকাংশ

(৬) Human Rights and the United Nations—Raghubir Chakraborti, 1958, Calcutta, p. 22

(৭) The Second Great War —Vol. 9, p 3981

জার্মানদের সম্ভবতঃ এই ধারণা ছিল যে,'যুদ্ধ আরম্ভ করার দ্বারা নাৎসীরা সবচেয়ে বড় অপরাধ করে নাই। কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ ছিল যুদ্ধে পরাজয়।'

কিন্তু জার্মানদের যে ধারণাই থাকুক, অভিযুক্ত আসামীদের প্রতি সুবিচার করার জন্য ন্যুরেমবার্গের আদালতের সভাপতি ও প্রধান বিচারপতি লর্ড জাষ্টিস লরেন্স তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। আসামীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের যথোচিত সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল এবং কোর্ট কর্তৃক মনোনীত কৌঁসুলিদের তালিকা থেকে আসামীরা তাঁদের কৌঁসুলি বাছাই করার অধিকারী ছিলেন। জার্মান আইনবিদরাও মামলা পরিচালনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন এবং তাঁদের বৃত্তির মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। যদিও তাঁদের অনেকে আদালতের এক্তিয়ার চ্যালেঞ্জ করিয়াছিলেন, তথাপি চার্টার অনুসারে তা চ্যালেঞ্জের বহির্ভূত ছিল।

কোন কোন আইন বিশারদে অবশ্য পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, একমাত্র বিজয়ী পক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়া আদালত গঠন না করিয়া নিরপেক্ষ দেশের কিংবা জার্মানীর বিচারকদের নিয়াও আদালত গঠন করা হোক। কিন্তু এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই এই কারণে যে, সেদিনের রক্তস্নাত ও যুদ্ধক্ষত পৃথিবীর অবস্থা এমন ছিল যে, কোন দেশ থেকেই "নিরপেক্ষ জজ" পাওয়া সম্ভব ছিল না। (স্যার ডেভিড ম্যাক্সওয়েল ফাইফ-এর মন্তব্য)। (৮)

অভিযুক্ত নাৎসী ও জার্মান নেতাদের বিরুদ্ধে অজস্র প্রকার বর্বরতা ও অত্যাচারের অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল। যুদ্ধের আগে এবং পরে জার্মানীতে ও অধিকৃত দেশগুলিতে হত্যা, সমূলে সংহার, নির্বাসন, দাসত্ব গ্রহণে বাধ্যকরণ এবং অন্যান্য অমানুষিক কার্যাবলী কেবল যুদ্ধবন্দী, বিরোধী রাজনৈতিক দল প্রভৃতির বিরুদ্ধেই নয়, সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধেও ব্যাপক হারে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সমস্ত ছিল মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের পর্যায়ভুক্ত।

মিত্রশক্তিবর্গ কর্তৃক জার্মানীর পরাজয় ও ইউরোপের উদ্ধারের পর বিভিন্ন বন্দী-শিবিরের অমানুষিক কার্যাবলীর বিবরণ, যেগুলি আগে নাৎসীরা খুব সতর্কতার সঙ্গে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল, সেগুলি সারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। মিত্র সৈন্যদের দ্বারা বন্দীশালার দ্বার উন্মুক্ত করার কিংবা নাৎসী-কবলিত গ্রাম, জনপদ ও শহরগুলির মুক্তির পর প্রত্যক্ষদর্শীদের এবং ভুক্তভোগীদের (যারা কোনক্রমে রক্ষা পাইয়া গিয়াছিল) অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতার কাহিনী প্রকাশিত হইতে থাকে। জাতি-বিদ্বেষ বর্বরতার এমন চরমে পৌঁছিয়াছিল যে, নাৎসী কবলিত ইউরোপে ৯৬ লক্ষ ইহুদীর মধ্যে অন্ততঃ ৫৭ লক্ষ (মতান্তরে ৬০ লক্ষ) একেবারে 'অদৃশ্য' হইয়া গিয়াছিল। অধিকাংশকেই স্বেচ্ছায় খুন করা হইয়াছিল। জার্মানীর উচ্চতম সামরিক কর্তৃপক্ষও এই স্বেচ্ছাকৃত বর্বরতার দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। কারণ ফিল্ড মার্শাল কাইটেল (জার্মান সশস্ত্রবাহিনীর সর্বোচ্চ কর্তা) রাজনৈতিক বিরোধীদের সম্পর্কে পর্যন্ত 'Night & Fog' (রাত্রি ও কুয়াশা) নামে এক কুখ্যাত সাঙ্কেতিক হুকুমনামা প্রচার করিয়াছিলেন, যার ফলে ধৃত রাজনৈতিক বন্দীরা কর্পূরের মত উবিয়া গিয়াছিল।

(৮) The Nuremberg Trial, p. 11

আউসেভিৎস, বুকানভিল্ড, ডাচাউ, বেলসেন, মাজডেনেক, র‍্যাভেনসব্রুক ইত্যাদি বহু বন্দীনিবাস ইতিহাসে চিরদিন কুখ্যাত হইয়া থাকিবে স্ত্রীলোক ও শিশু নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে হত্যার জন্য। একমাত্র আউসেভিৎস বন্দী শিবিরেই ৪০ লক্ষের অধিক এবং মাজডেনেক শিবিরে ১৫ লক্ষের বেশী লোককে সংহার করা হইয়াছিল।

ন্যুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালতে এজন্য 'genocide' বা গণহত্যা শব্দটি আইনের নূতন মর্যাদা পাইয়াছিল। (৯)

পশ্চিম, পূর্ব, উত্তর, দক্ষিণ অর্থাৎ ইউরোপের নাৎসী-অধিকৃত ও কবলিত সমস্ত স্থানেই অসংখ্য এবং অবর্ণনীয় নৃশংসতার কাণ্ড ঘটিয়াছিল, যেগুলি সবিস্তারে উল্লেখ করা সম্ভব নয় "১৯৪৩ সালের জুন মাস থেকে জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নের অধিকৃত স্থানগুলিতে এই সমস্ত পৈশাচিক অপরাধের প্রমাণ গোপন করার জন্য তারা গোরস্থান খুঁড়িয়া ফেলিয়া মৃতদেহগুলি বাহির করিয়া আনিল ও পুড়াইয়া ফেলিল এবং হাড়গুলি গুঁড়া করিয়া সার হিসাবে ব্যবহার করিল। বাল্টিক রাজ্যসমূহ, স্মোলেনস্ক, লেনিনগ্রাদ, ষ্ট্যালিনগ্রাদ, ওরেল, নভোগোরোদ ইত্যাদি শহরগুলিতে অসংখ্য অসামরিক নর-নারীকে সোজা গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিল এবং সোজা গুলি করিয়া মারাই ছিল তাদের পক্ষে সব চেয়ে দয়ার কার্য! এমন কি শিশুরা পর্যন্ত রেহাই পাইল না। তাদেরকে হাসপাতাল থেকে বা শিশুনিবাস থেকে ধরিয়া আনিয়া জীবন্ত অবস্থায় কবর চাপা দেওয়া হইল, জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইল, বেয়নেট দিয়া তাদেরকে বিদ্ধ করা হইল, বিষ দিয়া মারিয়া ফেলা হইল, না খাইতে দিয়া মারা হইল কিংবা তাদের রক্ত নিষ্কাশন করিয়া সেই রক্ত জার্মান আর্মির ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইল"—লণ্ডন টাইমসের সংবাদদাতার রিপোর্ট। (১০)

মার্কিন ঐতিহাসিক স্নাইডার মন্তব্য করিয়াছেন যে, ষড়যন্ত্র, আগ্রাসন ও পাশবিক অত্যাচারের এই সমস্ত কাহিনী এমন আজগুবি যে, ইতিহাসে তার তুলনা নাই। ১,০০০০০০০ বা এক কোটিরও অধিক ইউরোপীয় নাগরিক ও যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করা হইয়াছিল এবং অসংখ্য প্রকার নৃশংসতা হইয়াছিল। আর বিজিত রাজ্যগুলি থেকে কোটি কোটি টন কাঁচামাল, কৃষিপণ্য ও শ্রমশিল্পের যন্ত্রসজ্জা লুণ্ঠন করা হইয়াছিল। (১১)

বন্দীনিবাসগুলির নৃশংসতার নিদর্শনস্বরূপ যখন মাথার খুলি, মানুষের চামড়ার তৈরী ল্যাম্পশেড্ (আলোর আচ্ছাদন) ইত্যাদি আদালতে দেখানো হইল, তখন কাঠগড়ার উপর অনেক নাৎসী আসামীরই মাথা হেলিয়া পড়িল এবং যখন প্রমাণ-স্বরূপ অত্যাচারের চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হইল, তখন অন্যতম আসামী নাৎসী 'অর্থনীতির

(৯) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪২
(১০) ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল, পৃষ্ঠা ৮২
(১১) দ ওয়ার—১৯৩৯-১৯৪৫, পৃষ্ঠা ৬২৭

যাদুকর' শ্যাক্টকে যেন 'ঠাণ্ডায় জমিয়া যাওয়া মৃতবৎ মনে হইল' এবং তিনি স্বেচ্ছায় ছবির পিছনের দিকে পিঠ দিয়া বসিয়া রহিলেন। অর্থাৎ এই সমস্ত চিত্র তাঁর কাছে অসহ্য মনে হইতেছিল।

আদালতে এভাবে 'মৃত্যুপুরীর' ত্রাসের এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ উত্থাপন করা হইল আসামীরা নিজেরাই যেগুলিকে অকাট্য প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিলেন। 'বীরপুরুষ' গোয়েরিং এই সমস্ত চলচ্চিত্র দেখিয়া স্বীকার করিলেন—

'হাঁ, একথা সত্য যে, আমিই বন্দীনিবাসগুলির প্রবর্তন করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি এইটুকু মাত্র চাহিয়াছিলাম যে, রাজনৈতিক বন্দীদেরকে পুনরায় শিক্ষা দেওয়া হোক। কিন্তু ১৯৩৪ সালের পর থেকে এই ক্যাম্পগুলি চালাইতেছিলেন হিমলার। আমার কোন ধারণাই ছিল না যে, এমন সমস্ত বীভৎস কাণ্ড সেখানে ঘটিয়াছে— 'I had no idea that such terrible things took place.' (১২)

ন্যুরেমবার্গের আদালতে অভিযুক্ত নাৎসী নায়কদের মধ্যে মার্শাল গোয়েরিংই সবচেয়ে কূটবুদ্ধি, সাহসী এবং কথাবার্তায় ও প্রভাবে অগ্রগণ্য বলিয়া প্রমাণ দিয়াছিলেন। কার্যতঃ গোয়েরিংকে কেন্দ্র করিয়াই কোন কোন বিষয়ে আদালতের প্রায় সমস্ত শুনানী আবর্তিত হইয়াছিল। এমন কি, তিনি নির্বিকার চিত্তে আত্মপক্ষ সমর্থনে এমন একটা উদ্ধৃতি দিলেন, যার দ্বারা তিনি মনে করিলেন যে, তিনি বাজীমাৎ করিয়াছেন। উক্তিটি এই :

"In the struggle of life and death there is no legality."

"জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে বৈধতার কোন প্রশ্ন নাই।"

গোয়েরিংয়ের মতে তাঁদের "সর্বাপেক্ষা বড় ও জবরদস্ত শত্রু" স্বয়ং উইনষ্টোন চার্চিল এই মন্তব্য করিয়াছিলেন। কিন্তু অভিযুক্ত গোয়েরিং ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, আইনকে অস্বীকার করিয়া নিজের কার্যের বৈধতা প্রমাণ করা যায় না!

আর কিন্তু মার্শাল কাইটেল আত্মপক্ষ সমর্থনে এই যুক্তি দেখাইয়াছিলেন যে, তিনি নামে মাত্র জার্মান সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান ছিলাম। আসলে একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার ক্ষমতার প্রকৃত মালিক ছিলেন হিটলার, তিনি তাঁর আজ্ঞাবহ কর্মচারী মাত্র ছিলেন। (১৩)

কিন্তু ন্যুরেমবার্গের আদালতে যে সমস্ত সোভিয়েত আইনজ্ঞ ও পরিদর্শক উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ, যেমন মিঃ এ পোলটোরাক মন্তব্য করিয়াছেন যে, কাইটেল নিজেকে যতটা গুরুত্বহীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আসলে তিনি ততটা 'বাজে লোক' ছিলেন না। "বরং জার্মান সেনাপতিগণ, যাঁরা মনে করিতেন যে, তাঁরা প্রত্যেকেই রণক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সকলে মিলিয়া যুদ্ধে হারিয়া গিয়াছিলেন।" তাঁরা কিন্তু আসলে হিটলার ও কাইটেলকেই জার্মান সমর-যন্ত্রের আসল নিয়ামক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং জার্মানীর পতনের জন্য সমস্ত দোষ হিটলার ও কাইটেলের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু কাইটেল তা

(১২) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১২৯

(১৩) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ২২১

অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি নামে মাত্র সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান ছিলেন। আসলে হিটলার ছিলেন এক অসাধারণ সামরিক প্রতিভা (হিটলার সম্পর্কে এই উচ্চ ধারণা কিন্তু আরও অনেক জার্মান নায়কের ছিল) এবং তাঁকে কোন উপদেশ দিতে যাওয়া নিতান্তই অনাবশ্যক ছিল। কাইটেল বলিলেন :

"Hitler had studied general staff publications, milita y literatue and that he had a knowledge in the military fields which can only be called amazing."

সহজ কথায়, হিটলার সমস্ত প্রকার সামরিক সাহিত্য এমন গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন যে, এই বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল বিস্ময়কর।

কাইটেল আরও বলিয়াছেন যে, সামরিক অস্ত্রসজ্জা, সংগঠন, সামরিক নেতৃত্ব, সৈন্যবাহিনীর সাজসজ্জা ও যন্ত্রাদি এবং সবচেয়ে আশ্চর্য কথা সারা পৃথিবীর নেভি সম্পর্কে হিটলার অত্যন্ত ওয়াকেবহাল ছিলেন।

"যুদ্ধের সময় আমি যখন তাঁর সদর দপ্তরে ছিলাম, তখন দেখিয়াছি হিটলার সারা রাত জাগিয়া মল্ট্‌কে, শ্লিয়েফেন এবং ক্লাউসেভিৎস প্রমুখ রণপণ্ডিতদের সামরিক গ্রন্থগুলি (জেনারেল ষ্টাফ বুকস্‌) পড়িতেছেন এবং এভাবে তিনি নিজেই সামরিক বিষয়ে অগাধ বিদ্যা অর্জন করিয়াছিলেন। সুতরাং আমাদের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, একমাত্র কোন অসাধারণ প্রতিভার পক্ষেই এটা সম্ভব—

'Therefore, we had the impression only a genius can do that'.

কিন্তু আদালতে হাজির অন্যান্য আসামীরা কিন্তু বারবার 'কাইটেলের আদেশের' কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। (১৪)

অর্থাৎ কাইটেলের নির্দোষিতার ভণ্ডামি তাঁর সহ-আসামীরাও বিশ্বাস করেন নাই।

বলা বাহুল্য যে, হিটলারই যে নাটের গুরু ছিলেন, তাতে কোন সংশয়ের কারণ নাই এবং এই যুদ্ধের মূল দায়িত্বও তাঁর—যদিও অন্যান্যরাও তাঁর সমান অংশীদার ছিলেন। হিটলারী জার্মানীর অন্যতম সেরা মন্ত্রী এ্যাড্‌মিরাল স্পীয়ার ন্যুরেমবার্গের আদালতের শুনানীর পর মন্তব্য করিয়াছেন যে, জার্মানীর মৃতেরা এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরগুলিই হিটলারের ও তাঁর সহযোগীদের অপরাধরূপে চিরকাল সাক্ষ্য দিবে!

* * *

ন্যুরেমবার্গ অনেক দিক দিয়াই নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। আদালতে এই মামলার শুনানীতে ৬০ লক্ষ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল। প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনার মত। আর সারা পৃথিবী থেকে ৩০০ সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন এই মামলা রিপোর্ট করার জন্য এবং আদালতে ভাষান্তরিতকরণের জন্য যেমন দক্ষ ভাষাবিশেষজ্ঞ ছিলেন,

(১৪) The Nuremberg Epilogue—A. Poltorak, Moscow, 1971, p. 269-270.

তেমনি বৈদ্যুতিক যান্ত্রিক ব্যবস্থাও নিখুঁত ছিল। প্রধান তিনটি ভাষায় অনুবাদের কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল এবং প্রত্যেক টিমে তিনজন করিয়া বিশেষজ্ঞ ছিলেন। (১৫)

কারাগারে আসামীদের প্রতি যথাসম্ভব ভালো ব্যবহারই করা হইয়াছিল এবং ন্যুরেমবার্গ আন্তর্জাতিক আদালতের চতুঃশক্তির বিজ্ঞ বিচারপতিগণ সনদ অনুসারে ঘোষিত আইন অনুযায়ী ন্যায়বিচারের কোন ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯৪৪ সালের ২০শে জুলাই হিটলারকে হত্যা চেষ্টার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে নাৎসী গণ-আদালতে ধৃত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি বিচারের নামে যে বীভৎসতার তাণ্ডব করা হইয়াছিল, আদালতে সেই চলচ্চিত্রও দেখানো হইয়াছিল এবং সেই সময় অধিবেশন কক্ষে এক অদ্ভুত নাটকীয়তার সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশ্য "ফাঁসির দড়িওয়ালা" সেই হিটলারপন্থী জজ ফ্রিজলিং (Freisling) শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

* * *

এক মাস স্থগিত থাকার পর ন্যুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালত ৩০শে সেপ্টেম্বর ও ১লা অক্টোবর, ১৯৪৬, তাঁদের ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করেন। এই রায়ে যুদ্ধকে 'চরম আন্তর্জাতিক অপরাধ' বা 'সুপ্রীম ইণ্টারন্যাশনাল ক্রাইম্' বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং মন্তব্য করা হয় যে, আসামীদের কয়েকজন ১২টি জাতির বিরুদ্ধে কেবল যুদ্ধের ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা করে নাই, কার্যতঃ আক্রমণাত্মক যুদ্ধও চালাইয়াছিল। ৫০ হাজার শব্দের এই রায়ে অষ্ট্রিয়া থেকে পার্লহারবার পর্যন্ত আক্রমণাত্মক যুদ্ধের একটি রেখাচিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে—জার্মান সরকারী ও সামরিক দলিলপত্র থেকেই এই রেখাচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ধৃত দলিলপত্রের প্রামাণিক সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া আদালত বিশেষ ভাবে হিটলারের চারটি গুপ্তসভার উল্লেখ করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, এই সভাগুলিতেই আক্রমণাত্মক যুদ্ধের পরিকল্পনা ও চক্রান্ত হইয়াছিল। এই সমস্ত গুপ্তসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ৫ নভেম্বর ১৯৩৭, ২৩ মে ১৯৩৯, ২২ আগষ্ট ১৯৩৯ এবং ২৩ নভেম্বর ১৯৩৯। এই সমস্ত গুপ্তসভাতেই হিটলারের মতলব একেবারে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হইয়াছিল।...

রায় অনুসারে জার্মানীর বিরুদ্ধে চার দফা অভিযোগ—যেমন, শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধের ষড়যন্ত্র, দ্বিতীয়তঃ শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধের অনুষ্ঠান, তৃতীয়তঃ যুদ্ধাপরাধ এবং চতুর্থতঃ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ—এগুলি সবই প্রমাণিত হইয়াছিল।

ন্যুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালত জার্মানীর যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে যে বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তার ভূমিকা থেকে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করিলে অনুষ্ঠিত অপরাধের মাত্রা উপলব্ধি করা যাইবে। আদালত এই সম্পর্কে তাঁদের রায়ে মন্তব্য করিয়াছেন যে, যে বিপুল পরিমাণ দলিল ও সাক্ষ্যপ্রমাণাদি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির সম্পূর্ণ পর্যালোচনা করা অসম্ভব। তথাপি এই সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের

(১৫) দি ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল, পৃষ্ঠা ১৪৮

নির্গলিত সত্য এই যে, মানুষের যুদ্ধের ইতিহাসে এমন বিশাল পটভূমিকায় এত বড় যুদ্ধের অপরাধ আর কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই :

' The truth remains that war crimes were committed on a vast sc-le, never b:fore seen in the history of war. They were purerated in all the countries occupied by Germany, and on t' e high Seas, and were attended by every conceiveable circumstance of cruelty and horror. There can be no doubt that the majority of them arose from the Nazi conception of 'total war', with which the aggressive wars were waged. For in this conception of 'total war' the moral ideas underlying the conventions which seek to make war more human are no longer regarded as having force or validity. Every thing is made subordinate to the overmastering dictates of war. Rules, regulations, assurances and treaties all alike are of no moment, and, so, freed from the restraining influence of international law, the aggressive war is conducted by the Nazi leaders in the most barbaric way. Accondingly, war crimes were committed when and wherever the Fuhrer and his close associates thought them to be advantageous. They were for the most part the result of cold and criminal calulation' (১৬)

মূল ইংরাজী থেকে উদ্ধৃত এই বাক্যাংশের মধ্যেই ন্যুরেমবার্গ আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের রায়ের আসল মর্ম এবং ফ্যাসিষ্ট যুদ্ধের ভয়াবহতা বুঝা যাইবে।...

১লা অক্টোবর, ১৯৪৬, ট্রাইব্যুনালের শেষ অধিবেশন বসিল এবং বিচারক-মণ্ডলীর রায়ে আসামীদের বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা ঘোষিত হইল, অবশ্য দণ্ড ঘোষণার আগে ক্যামেরাম্যানদের আদালত কক্ষ ত্যাগ করিতে হইল। কোন ফটো তুলিতে দেওয়া হইল না এবং ফটো তোলার ফ্লাড-লাইট বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। একমাত্র নীলাভ নিওন লাইট জ্বলিতেছিল, আসামীদের কাঠগড়াও (ডক্) শূন্য ছিল। সমগ্র আদালত কক্ষ তখন অস্ত্রোপচার কক্ষের মত গম্ভীর ও নিস্তব্ধ ছিল।

ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেণ্ট লর্ড জাষ্টিস লরেন্স স্বয়ং আদালতের রায়ের দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করিলেন। দুইজন সশস্ত্র প্রহরীর পাহারায় পার্শ্ববর্তী কক্ষের দরজা দিয়া একেকবারে এক একজন করিয়া আসামী প্রবেশ করিলেন, কাঠগড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রধান বিচারপতি লরেন্স অবিচলিত কণ্ঠে তাঁদের প্রত্যেকের উদ্দেশে পর পর দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণ করিলেন। নিম্নলিখিত ১২ জনের প্রতি ফাঁসির দণ্ডাদেশ দেওয়া হইল। কারণ, তাঁরা সকলেই চার রকম অপরাধের মধ্যে হয় সমস্ত কিংবা অধিকাংশ অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলেন :

(১৬) The Nuremberg Trial—R. W. Cooper 1947 p. 299.

(১) হেরমন উইলহেলম গোয়েরিং (২) জেয়োচিম রিবেণ্ট্রপ (৩) উইলহেলম কাইটেল (৪) আর্নেষ্ট কাল্টেনব্রুনার (৫) আলফ্রেড রোজেনবর্গ (৬) হান্স ফ্রাঙ্ক (৭) উইলহেলম ফ্রিক (৮ জুলিয়াস ষ্ট্রেইচার (৯) ফ্রিস সাওকেল (Fritz Sauckel) (১০) আলফ্রেড জডল (১১) আর্থার সেইস ইনকোয়ার্ট এবং (১২) মার্টিন বোরম্যান—এই শেষোক্ত ব্যক্তি অনুপস্থিত ছিলেন।

উপরের এই ১২ জন প্রধান আসামীক মৃত্যুদণ্ড দওয়া হইল এবং বাকী সকলকে যাবজ্জীবন দণ্ড থেকে বিভিন্ন প্রকারের কারাদণ্ড দেওয়া হইল। তিনজনকে মুক্তি দেওয়া হইল :

রুডল্ফ হেস যাবজ্জীবনদণ্ড, ভাল্টার ফ্রাঙ্ক যাবজ্জীবন, এরিক রেইডার যাবজ্জীবন, ব্যালডুব শাইরাচ ২০ বছর, আলবার্ট স্পীয়ার ২০ বছর, কনষ্টানটিন নিউর‍্যাথ ১৫ বছর, কার্ল ডোয়েনিৎস ১০ বছর, হ্যালম্যর শাক্ট নির্দোষ—মুক্ত, ফ্রাঞ্জ ফন প্যাপেন নির্দোষ—মুক্ত এবং হান্স ফ্রিৎশ (Hans Fritzche) নির্দোষ—অতএব মুক্ত।

রবার্ট লে অভিযুক্ত। কিন্তু ২৫ অক্টোবর, ১৯৪৫, জেলখানায় আত্মহত্যা করিয়াছিলেন এবং জার্মানীর বিশ্ববিখ্যাত শিল্পপতি গুস্তভ ক্রুপ দৈহিক ও মানসিকভাবে এমন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁর বিচার স্থগিত রাখা হইয়াছিল। (১৭)

* * *

মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ্ ডঃ জি. এম. গিলবার্ট ন্যুরেমবার্গের আদালতে অভিযুক্ত আসামীদের সঙ্গে সাক্ষাৎপূর্বক তাঁদের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং চরিত্র ও আচরণ সম্পর্কে যে সমস্ত রিপোর্ট রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলি যথেষ্ট মূল্যবান বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু এখানে সেগুলির বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। এখানে সেই ডায়েরির উপসংহারের সামান্য কয়েকটি লাইন উল্লেখ করা যাইতেছে :

আন্তর্জাতিক আদালত থেকে যে তিনজনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল, তাঁরাও স্বস্তি পাইলেন না এবং তাঁদের স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারিলেন না। যে মুহূর্তে তাঁদের মুক্তির কথা ঘোষিত হইল, তার পরমুহূর্তেই 'জার্মান জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার' অভিযোগে জার্মানীর অসামরিক প্রশাসন তাঁদেরকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ বাহিনী নিয়া হানা দিল এবং 'প্যালেস্ অব্ জাষ্টিস'-এর দরজা ঘিরিয়া ফেলিল।

স্বদেশবাসীদের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার ভয়ে তাঁরা তিনদিন তিনরাত্রি নিজেদের ইচ্ছাতেই জেলের মধ্যে রহিলেন। ফন্ প্যাপেন তিক্ত স্বরে বলিলেন—'আমাকে যেন জানোয়ারের মত তাড়না করা হইতেছে এবং আমাকে কখনো শান্তিতে থাকিতে দেওয়া হইবে না।'

দ্বিতীয় মুক্ত আসামী ফ্রিৎশ (Fritzsche) ডঃ গিলবার্টের কাছে একটি পিস্তল চাহিলেন এবং বলিলেন তিনি আর এই নরকযন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেছেন না। অবশেষে ফ্রিৎশ ও শাক্ট জেলখানা থেকে গভীর রাত্রে বাহির হইয়া আসিলেন বটে, কিন্তু তাঁদেরকে একবার করিয়া গ্রেপ্তার এবং একবার করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইতে লাগিল। ফন্ প্যাপেনও অনুরূপভাবে জেল থেকে বহির্গমনের আশায় রহিলেন।

---

(১৭) The Second Great War—Hammerton, Vol-9, p. 3999

হান্স ফ্রাঙ্ক তাঁর মৃত্যুদণ্ডের সেল থেকে এইসব দেখিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন—"হাঃ হাঃ এরা মুক্তি চায়। হিট্লারিজম থেকে কোন মুক্তি নাই। একমাত্র আমাদের মত মৃত্যু-দণ্ডিতরাই মুক্ত! হাঃ হাঃ!"

কিন্তু বীরপুরুষ গোয়েরিংয়ের মুখে আর হাসি ছিল না। মৃত্যুদণ্ড শোনার পর তিনি সোজা জেলখানায় তাঁর সেলে ঢুকিয়া পড়িয়া খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িলেন। তাঁর আগেকার সমস্ত বীরত্ব উবিয়া গেল এবং চোখ মুখ সম্পূর্ণরূপে চুপসাইয়া গেল।...

কিন্তু গোয়েরিং ফাঁসিতে গেলেন না। ১৪-১৫ অক্টোবর রাত্রে বিষপান (পটেসিয়াম সায়েনাইড্) করিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিলেন এবং হিটলার, হিমলার ও গোয়েবলসের দলে গিয়া মিশিলেন!...(১৮)

ডঃ গিলবার্ট লিখিয়াছেন যে, আসামীদের বিরুদ্ধে যখন প্রথম অভিযোগপত্র রচিত এবং আদালতে সেগুলি পঠিত হইয়াছিল, তখন বিভিন্ন আসামীর বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল। গোয়েরিং বলিয়াছিলেন "বিজয়ীরা সব সময়েই বিচারক হইবে এবং পরাজিতরা হইবে আসামী।"

রিবেন্ট্রপ বলিয়াছেন—'ভুল লোকদের অভিযুক্ত করা হইয়াছে। আমরা সকলেই হিটলারের আজ্ঞাবাহী ছিলাম।"

কিন্তু নাৎসী জার্মানীর অস্ত্র ও গোলা-বারুদ উৎপাদনের মন্ত্রী (যাঁর অধীনে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে জার্মানীতে ও অধিকৃত ইউরোপে মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত হইয়াছিল) এ্যাডমিরাল স্পীয়ার স্বীকার করিয়াছিলেন—"বিচারের দরকার আছে। প্রভুত্ববাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনেও এই ধরনের ভয়ঙ্কর অপরাধ (horrible crimes) অনুষ্ঠানের জন্য সকলেরই দায়িত্ব আছে।"

অর্থাৎ একা হিটলারের নয়। অবশ্য নাৎসী আসামীদের অধিকাংশই সমস্ত অপরাধের দায়িত্ব হিটলারের ঘাড়ে চাপাইতে চাহিয়াছিলেন...

৯ এবং ১০ অক্টোবর, ১৯৪৬, দখলীকৃত জার্মানীর চতুঃশক্তির কণ্ট্রোল কাউন্সিলের (নিয়ন্ত্রণ পরিষদ) নিকট মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্তদের কাছ থেকে ক্ষমাপ্রদর্শনের যে আবেদন-পত্র পাওয়া গিয়াছিল, সেগুলি অগ্রাহ্য হইল। তখন একমাত্র কাজ বাকী রহিল ফাঁসির দণ্ডাদেশ কার্যে পরিণত করা। মার্কিন সার্জেন্ট উডের উপর এই দায়িত্ব অর্পিত হইল। এই দায়িত্ব পাইয়া সার্জেন্ট উড্ তাঁর প্রাণের আনন্দ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁর একমাত্র দুঃখ ছিল গোয়েরিংয়ের জন্য। কারণ, ডেপুটি ফুয়েরার আগেই ফাঁসির মঞ্চকে ফাঁকি দিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাকী সকলকে ১৬ই অক্টোবর মধ্যরাত্রের পর ন্যুরেমবার্গের জেলখানায় একে একে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিলেন। চতুঃশক্তির প্রতিনিধিগণ এই প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকর করার সময় ফাঁসির স্থানে উপস্থিত ছিলেন। আর ছিলেন সোভিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের ২ জন করিয়া সংবাদপত্র প্রতিনিধি—মোট ৮ জন। তিনটি ফাঁসি কাষ্ঠ সাজানো হইয়াছিল। এই তিনটির মধ্যে একটি ছিল রিজার্ভ।

(১৮) Nuremberg Diary- Dr. G. M. Gilbert, Signet, Newyork, 1961, p. 396-97.

১২টি সিঁড়ি বাহিয়া ফাঁসিমঞ্চে আরোহণ করিতে হইত এবং ফাঁসিকাষ্ঠ থেকে মোটা দড়ি ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

প্রথম যে ব্যক্তিকে ফাঁসিমঞ্চে আনা হইল, তিনি হইলেন হিটলারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিবেন্ট্রপ। কিন্তু ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে আগাইতে গিয়া সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া পড়িতেছিলেন এবং নিজের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করিতে পারিতেছিলেন না।

কিন্তু সার্জেন্ট জন উড অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করিলেন। মাত্র ৯০ মিনিটের মধ্যে তিনি পৃথিবীর কুখ্যাত নাৎসী অপরাধীদেরকে একে একে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিলেন। তাঁদের মৃতদেহ মিউনিকের অন্তর্গত একটি বৈদ্যুতিক চুল্লিতে (ক্রিমেটোরিয়াম) পোড়াইয়া ফেলা হইল।...

কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদেরকে পশ্চিম বার্লিনের স্পানডাউ কারাগারে বন্দী করিয়া রাখা হইল। চতুঃশক্তির প্রহরীগণ পালা করিয়া সর্বক্ষণ এঁদেরকে পাহারার মধ্যে রাখিয়াছিলেন। ১৯৬৬ সালে দীর্ঘমেয়াদী বন্দিরা মুক্তি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মহাযুদ্ধের অবসানের ৩২ বছর পর এঁদের সকলেই বর্তমানে (১৯৭৭ সালে) মৃত। একমাত্র এখনও বাঁচিয়া আছেন স্পানডাউয়ের নির্জন কারাকক্ষে নিঃসঙ্গ বন্দীরূপে রুডলফ হেস—হিটলারী শীর্ষ নেতাদের অন্যতম। ১৯৪১ সালে হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের মাত্র ১০ দিন আগে বিমানযোগে বৃটেনে উড়িয়া গিয়া (বৃটেন ও জার্মানীর মধ্যে শান্তির আপোস চুক্তি সম্পাদনের আশায় হেস দুনিয়াব্যাপী নিদারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন থেকেই হেস বন্দী—ইংলণ্ডের পর পশ্চিম বার্লিনের স্পানডউ কারাগারে। ১৯৭৭ সালে হেসের বন্দীজীবনের ৩৬ বছর এবং বয়সও ৮২ বছর অতিক্রান্ত হইতে চলিল। সোভিয়েত রাশিয়ার বিরোধিতার জন্যই হেসের পক্ষে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয় নাই।...

যাদের ক্ষমতার দম্ভে, অবর্ণনীয় অত্যাচারে ও নৃশংসতায় পৃথিবীর অগণিত মানুষ দলিত, মথিত ও রক্তসিক্ত হইয়াছিল, ইতিহাসের অমোঘদণ্ডে শেষ পর্যন্ত তারা সাধারণ খুনী আসামীর মত ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ হারাইল।

দশম পর্ব

দশম অধ্যায়

টোকিওর সামরিক আদালতে বিচার : জাস্টিস্ পালের ভিন্ন রায়

১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে পটসডামের ঘোষণা অনুযায়ী জাপান যখন ১৫ই আগষ্ট আত্মসমর্পণে রাজী হইল এবং ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করিল, তখন মিত্রপক্ষের সুপ্রীম কমাণ্ডার জেনারেল ডগলাস ম্যাক্-আর্থার সেই আত্মসমর্পণের শর্তানুযায়ী জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্দেশ্যে ১৬ জানুয়ারী, ১৯৪৬ এক ঘোষণাপত্র জারী করেন এবং সেই ঘোষণা অনুযায়ী ধৃত জাপানী নেতাদের বিচারের জন্য টোকিওতে একটি আন্তর্জাতিক মিলিটারি ট্রাইবুন্যাল (দূরপ্রাচ্যের জন্য) গঠিত হইল।

যে চার্টার বা সনদ অনুযায়ী ন্যুরেমবার্গের আন্তর্জাতিক আদালত গঠিত এবং জার্মান নেতাদের বিচার ও দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল, অনুরূপ চার্টার (২৬ এপ্রিল ঘোষিত) অনুসারেই জাপানী সামরিক এবং অ-সামরিক নেতাদেরও বিচার ও দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ইউরোপীয় চার্টার এবং জাপান বা দূরপ্রাচ্যের চার্টারের মধ্যে মাত্র একটি প্রশ্নে বৈষম্য ছিল—ইউরোপীয় সনদে রাষ্ট্রপ্রধানকে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ থেকে রেহাই দেওয়ার কোন বিধান ছিল না। কিন্তু জাপান সংক্রান্ত সনদে রাষ্ট্রপ্রধান বা সম্রাটকে সেই বিধান থেকে রেহাই দেওয়া হইয়াছিল। (এ জন্যই সমালোচকদের মতে আইন অনুসারে জাপানের আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণরূপে নিঃশর্ত ছিল না—যদিও কাগজে কলমে বাহ্যতঃ নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের রূপ বজায় রাখা হইয়াছিল।)

টোকিওর এই আন্তর্জাতিক সামরিক আদালত নিম্নলিখিত দেশের বিচারকমণ্ডলী নিয়া গঠিত হইয়াছিল :

স্যার উইলিয়াম এফ ওয়েব—সভাপতি, (অষ্ট্রেলিয়া), জাস্টিস্ ম্যাকডুগাল (কানাডা) বিচারপতি জু-আও মেই Ju-Ao Mei—চীন), হেনরি রেইমবার্জার (Henri Reimburger—ফ্রান্স) অধ্যাপক বার্নাড ভি এ রোলিং(নেদারল্যাণ্ডস), এরিমা হার্ভে নরক্রফট্ (নিউজিল্যাণ্ড), বিচারপতি আই এম জেরিয়ানোভ (সোভিয়েত ইউনিয়ন), লর্ড প্যাট্রিক (বৃটেন), মেজর-জেনারেল এম সি ক্রেমার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), জজ জারানিলা (ফিলিপিন্স) এবং ভারতের পক্ষ থেকে বিচারপতি ডঃ রাধাবিনোদ পাল।

জাপান যে সমস্ত দেশ আক্রমণ করিয়াছিল এবং পরে জাপান যাদের হাতে বা মিত্রপক্ষের হাতে পরাজিত হইয়াছিল, তাদের দেশেরই আইনজ্ঞ প্রতিনিধি নিয়া বিচারকমণ্ডলী, তাদের সহকারীবর্গ এবং অভিযোক্তামণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল।

ন্যুরেমবার্গের অভিযুক্ত জার্মানদের মতই জাপানীদের বিরুদ্ধেও শান্তিভঙ্গ ও যুদ্ধের চক্রান্ত, যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ অনুষ্ঠানের গুরুতর অভিযোগ আনা হইয়াছিল। প্রধানতঃ এই তিনশ্রেণীর অভিযোগের মধ্যে বহুপ্রকার অপরাধজনক কার্যের উল্লেখ করা হইয়াছিল।

৪ঠা জুন, ১৯৪৬, টোকিওতে আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের বিচার শুরু হইল। অভিযুক্ত হইলেন জাপানের প্রধান প্রধান সামরিক ও রাষ্ট্রনীতিক নেতাগণ।

যেমন—মাঞ্চুরিয়ার জেনারেল কেনজি দৈহারা (Doihara), সর্বোচ্চ সমর পরিষদের জেনারেল হাতা, ১৯৩৬ সালের প্রধানমন্ত্রী কোকী হিরোতা, প্রীভি কাউন্সিলের প্রাক্তন সদস্য জিরো মিনামি, প্রধা৹মন্ত্রী ও যুদ্ধমন্ত্রী জেনারেল হিদেকি তোজো, নৌদপ্তরের (১৯৪০-৪৪) প্রধান তাকাসুমি ওকা, উপযুদ্ধমন্ত্রী উমেজু, সমর-পরিষদের সদস্য জেনারেল আরাকি, সামরিক বিষয়ক প্রধান (১৯৩৯-৪২) আকিয়া মুতো, চীফ সেক্রেটারি হোসিনো, অর্থমন্ত্রী কোকোনোরি কায়া, সম্রাটের প্রধান বিশ্বস্ত উপদেষ্টা মার্কুইস্ কেচি কিদো, উপযুদ্ধমন্ত্রী কিমুরা, 'Rape of Nanking'-এর (নানকিংয়ের বলাৎকার) কুখ্যাত গোলন্দাজ রেজিমেণ্টের কর্নেল হাসিমোতো, (দুটি বৃটিশ গানবোট 'লেডিবার্ড' এবং 'বী'-এর উপর গোলাবর্ষণের জন্য দায়ী), প্রধানমন্ত্রী কুনিয়াকি কয়সো, এ্যাডমিরাল ওসুমি নাগানো, বার্লিনের রাষ্ট্রদূত (১৯৩৮-৪৫) হিরোসি ওসিমা, প্রধানমন্ত্রী (১৯২৯) ব্যারন কাইচিরো হিরানুমা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিগেনরি টোগো, পররাষ্ট্র মন্ত্রী সিগেমিৎসু, নৌমন্ত্রী ভাইস-এ্যাডমিরাল শিগেতারো শিমাদা, ইতালীর রাষ্ট্রদূত (১৯৩৯) তোশিও শিরাতোরি, দপ্তরহীন মন্ত্রী লেঃ জেনারেল সুজুকি, কোয়াংটাং বাহিনীর সেনানীমণ্ডলের প্রধান জেনারেল শেইসিরো ইতাগাকি প্রভৃতি।

উপরোক্ত প্রধান যুদ্ধাপরাধীগণ ছাড়া বৃটিশ সামরিক আদালতগুলি ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী থেকে জুলাই মাসের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ ২২৯ জন জাপানীকে অভিযুক্ত করিয়াছিল। এদের মধ্যে ৯৮ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। ১০৫ জনকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড এবং ৩৬ জনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। মার্কিন এবং অষ্ট্রেলিয়ান আদালতগুলিতেও যুদ্ধাপরাধে ধৃত জাপানীদের দণ্ড হইয়াছিল। (১)

কেবল পার্ল হারবার আক্রমণের (১৯৪১ ডিসেম্বর) তারিখ থেকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের যুদ্ধকালীন অপরাধগুলির জন্যই নহে, তারও বহু পূর্ব থেকে চীনে 'মুকদেনের ঘটনাবলী' ও 'নানকিংয়ের বলাৎকার' এবং মার্কিন গানবোট 'প্যানের' উপর গোলাবর্ষণের জন্যও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিচার ও দণ্ড হইয়াছিল।

কিন্তু কেন দণ্ড হইয়াছিল? সেই ভয়াবহ অত্যাচারের কাহিনী অতীতের ইতিহাস থেকে কিছুটা উল্লেখ করা দরকার—চীনে অনুষ্ঠিত জাপানীদের অনাচারের গুরুত্ব বুঝিবার জন্য।

১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে জাপানী বাহিনী চীনের অভ্যন্তরে আক্রমণ চালাইয়া নানকিং শহরে প্রবেশ করার পর হত্যা, লুঠ, অগ্নিকাণ্ড এবং আরণ্যক হিংস্রতার যে তাণ্ডব অনুষ্ঠিত হইল এবং যেভাবে অসংখ্য চীনা স্ত্রীলোক ও শিশুদের উপর পাশবিক অত্যাচার সংঘটিত হইল, তখনকার দিনের ইতিহাসে তার কোন তুলনা ছিল না। নানকিংয়ের প্রত্যক্ষদর্শী ২০ জনেরও বেশী বিদেশীদের সাক্ষ্য থেকে একথা লিখিয়াছেন ফ্রাঙ্ক ওলিভার (যে বইয়ের ভূমিকা লিখিয়াছেন বিখ্যাত পিটার ফ্লেমিং) তাঁর গ্রন্থে। নানকিংয়ের দিকে জাপানী সৈন্যদের অগ্রগতি ঠেকাইবার জন্য পশ্চাদপসরণকারী দুর্বল চীনাবাহিনী যথাসম্ভব পোড়ামাটির নীতি

(১) Second Great War—Vol 9, p. 3985

অবলম্বন করিল এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকের গ্রামে, শহরে, জনপদে আগুন ধরাইয়া দিল। সেই আগুনের লেলিহান শিখায় নানকিংয়ের রাত্রির আকাশ রক্তবর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু জাপানীদের অগ্রগতি ঠেকানো গেল না। কোথায় গেল তাদের বহুঘোষিত ঐতিহ্যমণ্ডিত 'বুশিদো'র সামরিক সদাচার?—তার বদলে দেখা দিল নির্ভেজাল বর্বরতা:

"Instead they treated China and the world to an exhibition of ruthless barbarity. Bushido, the conduct supposed to be set up by the Japanese army, was thrown completely overboard. In a month 24,000 defenceless civilians has been brutally murdered; 10,000 women, ages ranging from children of ten to grandmothers of seventy-two, had been raped; vast sections of the city deliberately burned to the ground; shops and houses, consulates and foreign embassies, looted; and thousands of terror striken people brought to the verge of starvation by refusal to allow food supplies to enter the city. (২)

সংক্ষেপে—জাপানী সৈন্যবাহিনী তাদের বুশিদোর বদলে নানকিংয়ে হিংস্র ও বর্বর আচরণের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইল। এক মাসের মধ্যে অসহায় চীনা নাগরিকদের মধ্যে অন্ততঃ ২৪ হাজারকে নৃশংসভাবে হত্যা করিল এবং ১০ হাজার স্ত্রীলোকের উপর বলাৎকার চালাইল—এই সমস্ত স্ত্রীলোকদের মধ্যে ১০ বছরের শিশু থেকে শুরু করিয়া ৭২ বছরের ঠাকুরমা পর্যন্ত ছিল। দোকান-পাট, ঘরবাড়ী এবং বিদেশী দূতাবাসে পর্যন্ত লুঠতরাজ চলিল। স্বেচ্ছায় আগুন দিয়া শহরের বিস্তীর্ণ এলাকা পোড়াইয়া দেওয়া হইল এবং ত্রাসগ্রস্ত শহরবাসীদেরকে উপবাসে রাখার উদ্দেশ্যে শহরে খাদ্য শস্যের আমদানি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল!

১৯৩৭-৩৮ সাল থেকে চীনে জাপানীদের এই অত্যাচার—যে চীনকে তারা 'বিদেশীদের হাত থেকে রক্ষা' এবং যেখানে তারা 'সুশৃঙ্খল গবর্নমেণ্ট' স্থাপন করিতে চাহিয়াছিল!...

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধাভিযানের সময় ফিলিপিন্সেও অনুরূপ অত্যাচার হইয়াছিল। ফলে, যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে ২৯শে অক্টোবর, ১৯৪৫, ফিলিপিন্স-বিজয়ী জাপানের 'টাইগার'—সেনাপতি জেনারেল ইয়ামাসিতার বিচার আরম্ভ হইল নির্বিচারে ফিলিপিনোদেরকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা, যুদ্ধবন্দীদের উপর অত্যাচার ও প্রাণনাশ, লুণ্ঠন ও অগ্নিপ্রদান এবং দলে দলে মেয়েদের উপর বলাৎকার অনুষ্ঠানের জন্য। ইয়ামাসিতা অবশ্য এই সমস্ত অপরাধের কথা অত্যন্ত তীব্রতার সঙ্গে অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, তিনি ও তাঁর উপরওয়ালা দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের সুপ্রীম জাপানী কমাণ্ডার ফিল্ড মর্শাল কাউণ্ট জুইচি তেরাউচির

(২) Special Undeclared War—by Frank Oliver, Jonathan Cape, London, 1939, p. 168.

(Juichi Terauchi) আজ্ঞাধীন ছিলেন। তিনি কোন নৃশংসতার কথা জানেন না এবং তেমন কোন আদেশও দেন নাই। যদি নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা এই ধরনের কার্য করিয়া থাকে, তবে, তাঁর অজ্ঞাতসারে। কিন্তু আদালতে ইয়ামাসিতার যুক্তি গ্রাহ্য হইল না। ৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫, পার্ল হারবার আক্রমণের বার্ষিকী দিবসে জেনারেল ইয়ামাসিতার প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ (ফাঁসি) দেওয়া হইল। অপর দিকে টোকিওর আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে ধৃত জাপানী নেতাদের যে বিচার অনুষ্ঠিত হইল, তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন জেনারেল তোজো—যিনি জাপানী সামরিক অভিযানের পিছনে আসল মস্তিষ্ক ছিলেন। তাঁর আত্মহত্যার চেষ্টার কথা আগের অধ্যায়েই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। ধৃত ও অভিযুক্তদের বিচার সারা প্রাচ্যখণ্ডে প্রভূত কৌতূহল ও উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। কয়েক মাস ধরিয়া মামলার শুনানীর পর জেনারেল তোজো এবং তাঁর সঙ্গী ৬ জন আসামীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইল। ২২ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ টোকিওর নির্জন সুগামো কারাগারে জাপানের যুদ্ধকালীন ডিক্টেটর তোজো এবং অন্যান্য দণ্ডিতদেরকে ফাঁসি দেওয়া হইল। ফাঁসি কাষ্ঠে আরোহণের আগে তোজো কিন্তু একটি বিদায়কালীন ছোট্ট কবিতা লিখিয়াছিলেন, ইংরাজীতে তার মর্ম এই :

'It is good-by
Over the mountains I go to-day
To the bosom of Buddha
So happy am I.' (৩)

বুদ্ধের শরণ নিয়া তোজোর এই ফাঁসি-মঞ্চে আরোহণকে অন্ততঃ ভীরুতার অপবাদ দেওয়া চলে না।...

ডঃ পালের ভিন্নমত

টোকিও আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের বিচারকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য এবং ভারত-বিখ্যাত আইনজ্ঞ ও বিচারপতি ডঃ রাধাবিনোদ পাল টোকিওর এই চাঞ্চল্যকর মামলায় যে ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছিলেন এবং বিচারকমণ্ডলীর অধিকাংশের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে ভিন্ন রায় দিয়াছিলেন, আইনের ইতিহাসে তা' স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, আইন শাস্ত্রে ডঃ পাল তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। এবং আসামীদিগকে দোষী সাব্যস্ত করার ব্যাপারে তিনি বিচারকমণ্ডলীর মেজরিটি রায়ের সঙ্গে একমত হইতে পারেন নাই। এই বিষয়ে তিনি আন্তর্জাতিক আইন ও সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের বিধিবিধান ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণপূর্বক এবং আসামীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী পক্ষের উত্থাপিত অভিযোগসমূহের ঐতিহাসিক পটভূমিকা বিচার ও সন্ধানপূর্বক যে সুদীর্ঘ রায় দিয়াছিলেন, তা একটি সুবৃহৎ গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে তার সবিস্তার বর্ণনা দেওয়া সম্ভবও নয় এবং প্রয়োজনও নাই।

(৩) লুই স্নাইডার—পৃষ্ঠা ৬৩৭-৩৮

ডঃ পাল তাঁর রায়ে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি তাঁর বিজ্ঞ সহযোগী বিচারকমণ্ডলীর রায় ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হইতে না পারিয়া দুঃখিত।

তাঁর রায়তে প্রকাশ যে, ২৯ এপ্রিল, ১৯৪৬, ১১টি অভিযোগকারী দেশের পক্ষ থেকে জাপানের ২৮ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোট ৫৫ দফার অভিযোগ আনা হইয়াছিল এবং অভিযুক্তদের মধ্যে ২ জন মামলার শুনানীর আগেই মারা যান এবং তৃতীয় ব্যক্তি তার মানসিক অবস্থার জন্য বিচারের অনুপযুক্ত ছিলেন। বাকী ২৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে গুরুতর যুদ্ধাপরাধের বিভিন্ন অভিযোগে মামলার শুনানী চলিয়াছিল। ন্যুরেমবার্গে নাৎসী জার্মানীর নেতাদের মধ্যে জাপানের নেতাদের বিরুদ্ধে তিন বা চার শ্রেণীর যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু বিচারপতি মিঃ পাল এই সমস্ত অভিযোগের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণপূর্বক যে সুদীর্ঘ রায় দিয়াছিলেন, তার মূল ভিত্তি ছিল এই যে, আসামীদের অনুষ্ঠিত কাজগুলি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় কার্য এবং সরকারী যন্ত্রের কার্য হিসাবেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল :

"The acts alleged are in my opinion all acts of state and whatever these accused are alleged to have done, they did that in working the machinery of the Government, the duty and responsibility of working the same having fallen on them in due course of events" (৪)

বিচারপতি মিঃ পাল বিশুদ্ধ আইনের দিক থেকে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন যে, এক জাতি কর্তৃক অন্য জাতির উপর সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব আন্তর্জাতিক জগতে অপরাধ বলিয়া বিবেচিত ছিল কিনা?

দ্বিতীয়তঃ অভিযোগে বর্ণিত যে সময়ে এই সমস্ত যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই সময়ে আন্তর্জাতিক আইনে এগুলি অপরাধজনক ছিল কিনা?—যদি না হইয়া থাকে, তবে, পরবর্তীকালে আইন প্রণয়ন করিয়া ওই সমস্ত যুদ্ধকে অপরাধজনক বলিয়া অভিযুক্ত করা যায় কিন?

কিংবা আগ্রাসী বলিয়া বর্ণিত কোন রাষ্ট্রের কোন ব্যক্তিকে সরকারী ও রাষ্ট্রিয় দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনের জন্য অপরাধী করা যায় কিনা?

ডঃ পাল তাঁর রায়ে ভাবাবেগ বা রাজনীতির দ্বারা পরিচালিত হন নাই। বিশুদ্ধ আইনের এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে নানা বিধি ও আইনের নজীর ও ঘটনার দৃষ্টান্ত তিনি বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, অতীতে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি যে সমস্ত কার্য করিয়াছে, জাপান তার অতিরিক্ত কিছু করে নাই। চুক্তি ও সন্ধিশর্ত ভঙ্গের অভিযোগ, অন্য দেশকে রক্ষণাবেক্ষণের নামে নিজেদের তাঁবে আনা, অন্য দেশের উপর অর্থনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপন, যুদ্ধবন্দীদের কিংবা নারী ও শিশুর উপর যুদ্ধের সময় অত্যাচার এবং আনুষঙ্গিক বর্বরতা ইত্যাদি সমস্তই অতীতে বিভিন্ন শক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত

(৪) International Military Tribunal for the Far East—Justice Radha Binode Pal. Sanyal & Co. Calcutta 1953, P. 5.

হইয়াছে। এমন কি গোপন সন্ধিচুক্তি পর্যন্ত কূটনীতি ও 'পাওয়ার পলিটিক্স'-এর অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত। যেমন, জাপানের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির যুদ্ধে রাশিয়া কর্তৃক যোগদান সম্পর্কে ষ্ট্যালিনের সঙ্গে মিত্রশক্তিবর্গের আগেই গোপন চুক্তি হইয়াছিল এবং সেই চুক্তি এমন এক সময় সম্পাদিত হইয়াছিল যখন সোভিয়েত রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে বাহ্যতঃ বন্ধুতার সম্পর্কই ছিল। (৫)

পার্ল হারবার আক্রমণের আগে জাপান এবং আমেরিকা উভয়েই চীনে জাপানী আক্রমণকে আইনতঃ যুদ্ধ বলিয়া মনে করে নাই। জাপান তেমন কোন ঘোষণা দেয় নাই এবং আমেরিকাও চীন সম্পর্কে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার প্রয়োজন মনে করে নাই। এমন কি আক্রান্ত চীনও এটাকে যুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করে নাই। ডঃ পাল উল্লেখ করিয়াছেন যে, এর আসল কারণ সম্ভবতঃ এই যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি এর দ্বারা কেলগ-ব্রিঁয় চুক্তির যুদ্ধনিবারণী ধারা এবং আন্তর্জাতিক আইনের দায়িত্ব এড়াইতে চাহিয়াছিলেন! সুতরাং আমেরিকা যুদ্ধরত চীনকে (নিরপেক্ষতা আইন সত্ত্বেও) যথারীতি গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিয়া চলিতেছিল। (৬)

ডঃ পাল প্রথম মহাযুদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, সেই সময়েও জার্মানদের বিরুদ্ধে নৃশংসতা, বর্বরতা ইত্যাদি যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ উঠিয়াছিল। কিন্তু ভার্সাই শান্তি সম্মেলন কর্তৃক নিযুক্ত কমিশন সেই সমস্ত অপরাধের জন্য ব্যক্তিবিশেষকে দায়ী ও অভিযুক্ত করিয়া আদালতে বিচার করার জন্য সুপারিশ করিতে পারেন নাই।...

ডঃ পাল তাঁর রায়ে আরও মন্তব্য করিয়াছেন যে, পার্ল হারবার আক্রমণের পিছনে জাপানের কোন ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তমূলক মতলব ছিল না। বরং জাপানী রাষ্ট্রদূত নমুরা চীন ও অন্যান্য প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় আসিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়, যার জন্য একা জাপান দোষী নয় এবং পার্ল হারবারও সেই ব্যর্থ আলোচনার পরিণতিতে আক্রান্ত হইয়াছিল। আলোচনার সময় একমাত্র জাপানের পক্ষ থেকেই নয় আমেরিকার পক্ষ থেকেও যুদ্ধায়োজন চলিয়াছিল। (৭)

বিচারপতি ডঃ পাল তাঁর সুদীর্ঘ রায়ের শেষে টোকিওর আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে অভিযুক্ত সমস্ত জাপানী নেতাকে নির্দোষ বলিয়া সাব্যস্ত করেন এবং মুক্তি দানের জন্য সুপারিশ করেন।

বলা বাহুল্য যে, এটা ছিল ডঃ রাধাবিনোদ পালের একক ব মাইনোরিটি রায়। কিন্তু বিচারকমণ্ডলীর মেজরিটি আসামীদিগকে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন এবং বিভিন্ন প্রকার দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

* * *

ডঃ পাল তাঁর ঐতিহাসিক রায়ের উপসংহারে এ্যাটম্ বা পারমাণবিক বোমা

(৫) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৪২৮
(৬) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৫৮১
(৭) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৫১২-১৩

বর্ষণকেই বরং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও বর্বরতা বলিয়া তীব্র নিন্দাত্মক মন্তব্য ধ্বনিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রথম মহাযুদ্ধের জার্মান সম্রাট বা কাইজার দ্বিতীয় উইলহেলমের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠির উল্লেখ করিয়াছেন। এই চিঠিতে কাইজার মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে অস্ট্রিয়ার সম্রাট ফ্রাঞ্জ জোসেফকে লিখিয়াছিলেন :

"My soul is torn, but everything must be put to fire and sword; men, women and children and oldmen must be slaughtered and not a tree or house be left standing. With these methods of terrorism ...the war will be over in two months, whereas if I admit considerations of humanity it will be prolonged for years ..."

সোজা কথায়, কাইজারের বক্তব্য ছিল যে, যদিও তাঁর বুক ব্যথায় বিদীর্ণ হইতেছে, তথাপি সমস্তই আগুন ও তরবারির মুখে দিতে হইবে। নর-নারী-শিশু এবং বৃদ্ধ নির্বিশেষে অবশ্যই সকলকে সংহার করিতে হইবে—একটি গাছ কিংবা একটি বাড়ীও যেন দণ্ডায়মান না থাকে। একমাত্র এইপ্রকার টেরোরিজম বা সন্ত্রাসবাদের দ্বারাই যুদ্ধ দুই মাসের মধ্যে শেষ হইতে পারে। অপর পক্ষে যদি মানবতার কথা বিবেচনা করা হয়, তবে এই যুদ্ধ বছরের পর বছর ধরিয়া চলিতে থাকিবে। "সুতরাং আমি আগের (টেরোরিজমের) পন্থাই অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি।"

ডঃ পাল মন্তব্য করিয়াছেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর কাইজারের মত প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে মিত্রপক্ষও যুদ্ধ দ্রুত হ্রাস করার নাম করিয়া জাপানের বিরুদ্ধে এ্যাটম্ বোমা নিক্ষেপ এবং নর-নারী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে নির্দোষ নাগরিকদিগকে পাইকারি হারে হত্যা করিয়া মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসী নেতারাও অবশ্য ইম্পীরিয়েল জার্মানীর কাইজারের নীতিই অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু ডঃ পালের মতে জাপানের অভিযুক্ত আসামীগণকে এই ধরনের অপরাধের জন্য দায়ী করা যায় না। (৮)

অবশেষে ডঃ পাল মন্তব্য করিয়াছেন যে, বিজয়ী পক্ষ কার্যতঃ নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই সমস্ত আন্তর্জাতিক আদালত গঠন করিয়াছেন এবং সেই সমস্ত আদালতকে আইন ও বিচারের ছদ্মবেশ পরাইয়াছেন। কিন্তু বিজয়ী পক্ষ কখনও বিজিতকে ন্যায়বিচার দিতে পারেন না। কারণ, আদালত যদি রাজনীতির মধ্যে শিকড় গাড়িয়া বসে, তবে, ন্যায়বিচারের যতই মুখোস পরানো হোক না কেন, "তখন ন্যায়বিচার শুধু বলশালী পক্ষের স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে পরিণত হয় মাত্র।" (৯)

ডঃ রাধাবিনোদ পালের এই রায়ের মধ্যে অনেক তীব্র, তিক্ত ও অপ্রিয় মন্তব্য রহিয়াছে বটে, কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান সম্পর্কে যে গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রকাশ পাইয়াছে, কয়েকজন স্বনামধন্য আইনজ্ঞ, যেমন—ইংলণ্ডের প্রীভি কাউন্সিলের সদস্য লর্ড হ্যাঙ্কি, আন্তর্জাতিক আইন-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডব্লিউ. ফ্রিডম্যান এবং টোকিওর সামরিক আদালতের মার্কিন কৌঁসলি তাঁর উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

এই রায়ের ফলে ভারতের প্রতি জাপানের মনোভাবও খুব অনুকূল হইয়াছিল।

---

(৮) পূর্বোল্লিখিত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৬২০

(৯) পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৭০০

পরলোকগত ডঃ পাল তাঁর জীবিতকালে বর্তমান গ্রন্থকারের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। তবে, ডঃ পালের এই রায় সম্পর্কে বিশেষভাবে স্মরণীয় এই যে, এই রায় রাজনীতি-বিবর্জিত এবং একান্তরূপেই আইনঘটিত। বিচারক হিসাবে তিনি শুধু আইন ও বিধিবিধান এবং বিধিবিধানের পটভূমিকায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিচার করিয়াছেন। অবশ্য সেই সমস্ত ঘটনাবলীর প্রসঙ্গে বিভিন্ন শক্তি-বর্গের মধ্যে সম্পর্কের কথাও বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং অভিযোগগুলির প্রামাণিকতা যেমন—'নানকিংয়ের বলাৎকার' গভীরভাবে তলাইয়া দেখার চেষ্টা করিয়াছেন। ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এই রায়ের মূল্য কম নয়। (১০)

(১০) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৬০৬-৬০৭

দশম পর্ব

একাদশ অধ্যায়

মহাযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা

সরকারী বিবৃতি ঃ ১৯৩৯-১৯৪৫

১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস বা ভারত সচিবের দপ্তরের বার্তা বিভাগ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে যে ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল তাতে ১৯৩৯-১৯৪৫ সালের তথ্য ও ঘটনাবলীর যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, এখানে সেগুলির উল্লেখ করা গেল। কেননা, মহাযুদ্ধের ইতিহাসের পক্ষে এই সরকারী তথ্যগুলি মূল্যবান ও প্রামাণিক।...

"...১৯৩৯ সালের তুলনায় আজ ভারতের নাম বিশ্বে অনেক উপরে স্থান পাইয়াছে। অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়। তবে এজন্য সমস্ত কৃতিত্বই সরল সাধারণ মানুষ, সৈনিক, নাবিক, বৈমানিক, ভূমি ও কলকারখানার শ্রমিকদেরই প্রাপ্য। এইসব মানুষগুলি যেভাবে বিপজ্জনক বছরগুলিতে সর্বশক্তি নিয়োজিত করিয়া কাজ করিয়াছে, তার তুলনা হয় না। সর্বোপরি রণাঙ্গনের যুদ্ধরত সৈনিকরা, যাঁরা সবকটি যুদ্ধ অভিযানে সাহস ও শৌর্যের পরিচয় দিয়াছেন এবং মিত্রশক্তির অন্তর্গত অন্যান্য যেসব জাতির সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ করিয়াছেন তাঁদের সকলেরই প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন।..."

—লর্ড ওয়েভেল, ভাইসরয় অব ইণ্ডিয়া ১৫ অক্টোবর, ১৯৪৫।

সরকারী বিবৃতি

১৯৩৯-১৯৪৫

ভারতের ৪০ কোটি অধিবাসী ছড়াইয়া রহিয়াছে ১৫ লক্ষ ৮১ হাজার ৪১০ বর্গমাইল এলাকা জুড়িয়া। আয়তনগত দিক দিয়া ভারতের আয়তন বৃটেনের ১৭ গুণ, একত্রিতভাবে ফ্রান্স ও স্পেনের ৪গুণ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট এলাকার দুই পঞ্চমাংশ।

ভারত একটি কৃষিপ্রধান দেশ, যদিও তার পক্ষে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখে অন্ন যোগানো খুবই কষ্টকর ব্যাপার। তবে যুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন ভারতের বিভিন্ন এলাকা ও শহরগুলি শান্তিপূর্ণ অবস্থায় উৎপাদনের জন্য ধীরে ধীরে উন্নত হইতেছিল। আধুনিক কোন যুদ্ধের জন্য ভারত সম্পূর্ণভাবে অপ্রস্তুত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ভারতে সেই সময় একটি নতুন বিমানক্ষেত্র তৈরী করিতে পশ্চিমী দুনিয়ার মত চলতি অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিলেই চলে নাই; বরং এ জন্য সবকিছুর গোড়াপত্তন করিতে হইয়াছিল।

যুদ্ধ শুরুর সাথে সাথেই আগে যেখানে ছিল গ্রাম, ধানক্ষেত ও রৌদ্রদগ্ধ মরুভূমি সেখানেই গড়িয়া তোলা হয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা, রাস্তা, রেলওয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাড়ীঘর, বিদ্যুৎ ও শক্তি কেন্দ্র, পয়ঃপ্রণালী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সবকিছু।

যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারত কিভাবে তার কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিল তা নীচের তথ্যাদি হইতেই স্পষ্ট হইয়া উঠে।

পশ্চিমের শত্রু

১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের শত্রুরা ছিল পশ্চিমে। ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর পার্ল হারবারে জাপানী হানার দিন ভারত প্রায় আড়াই লক্ষ সৈন্যকে জাহাজযোগে পশ্চিমাঞ্চলে পাঠাইয়াছিল। সৈন্য সংখ্যার দিক দিয়া ঐ অবস্থায় গ্রেট বৃটেন বা অন্য কোন কমনওয়েলথ দেশ এত বেশী সৈন্য পাঠায় নাই।

আর উত্তর আফ্রিকায় যুদ্ধ-অভিযান শুরুর প্রথম দিকে পাইপ লাইন, রোলিংস্টক ও লোকোমোটিভ সরবরাহের পুরাপুরি দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল ভারত। সেই সময় ভারত তার নিজস্ব ১২০০ মাইল রেল লাইনকে তুলিয়া ফেলিয়া সেই সমস্ত সরঞ্জাম বাইরে পাঠাইয়াছিল।

এমনকি ভারতের গ্রামীণ শিল্পকেও সেই সময় পুরাপুরিভাবে কম্বল, ক্যামোফ্লেজ জাল ও পীট হেলমেট তৈরীর কাজে নিয়োজিত করা হইয়াছিল।

প্রাচ্যের শত্রু

পার্ল হারবারে জাপানী হানার ফলে ভারত দুই দিক দিয়া আক্রমণের মুখোমুখি হইয়া পড়ে। এক কথায় নতুন আর এক শত্রুর মুখোমুখি হয় ভারত এবং পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধ করিবার জন্য আরও অধিক সংখ্যায় সৈন্য যোগানোর নতুন কর্তব্যের মুখোমুখি হয়।

ভারত সেই কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছিল এবং প্রয়োজনীয় সৈন্য যোগান দিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্য নিয়োগ না করিয়াই ভারত প্রশিক্ষণ দিয়া এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সজ্জিত করিয়া ২৫ লক্ষ সেনার এক বিরাট বাহিনী তৈরী করিয়াছিল।

আর এই সেনাবাহিনীর সহায়ক কাজের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল ৮০ লক্ষ ভারতীয়কে।

তাছাড়া যুদ্ধ-শিল্পে নেওয়া হইয়াছিল ৫০ লক্ষ ভারতীয়কে। আর রেল যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সেই সময় ক্রমাগত যে চাপ আসিয়াছিল তাহা ১লক্ষ অতিরিক্ত কর্মী মিলিয়া সম্পন্ন করিয়াছিল।

আক্রমণ ঘাঁটি

আক্রমণ ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের জন্য ভারতকে সেই সময় প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। আর এজন্যই কমনওয়েলথ ছাড়াও চীন এবং আমেরিকার বিরাট সৈন্য বাহিনীকে ভারতে রাখার প্রয়োজন হইয়াছিল।

এই জন্য :

১৩ লক্ষ ২০ হাজার মানুষের থাকার জায়গা তৈরী করা হইয়াছিল।

৪ কোটি ২০ লক্ষ বর্গফুট আবরণ দেওয়া মজুতাগার তৈরী করা হইয়াছিল।

৪ লক্ষ ১০ হাজার ব্যক্তিকে একসঙ্গে প্রশিক্ষণ দিবার জন্য ১০টি নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গঠন করা হইয়াছিল।

বিমানক্ষেত্র

দুইশ'টিরও বেশী সম্পূর্ণ সজ্জিত হানাদারী বিমানক্ষেত্র তৈরী করা হইয়াছিল। এছাড়া, তৈরী করা হইয়াছিল ৭টি বিরাট বিরাট বিমানঘাঁটি। এই বিমানঘাঁটি-গুলির প্রত্যেকটি রানওয়ে ছিল এক মাইলেরও বেশী লম্বা। চীনে সরবরাহ কাজ চালাইবার জন্য মূলতঃ এইগুলি তৈরী হইয়াছিল।

রেলওয়ে

বাংলা আসাম রেলওয়ের ৮০০ মাইলের ক্ষমতাকে চতুর্গুণ করা হইয়াছিল।

ভারতীয় রেলওয়ে সেই সময় এক মাসে ১১ লক্ষ ৬২ হাজার টন সামরিক সামগ্রী, ৫ লক্ষ ৫০ হাজার সামরিক যাত্রী বহন করিয়াছিল। বন্দরগুলি হইতে মাল খালাস করিবার জন্য একদিনে ৩০টি বিশেষ ট্রেনের প্রয়োজন হইয়াছিল। আর এইসব বিশেষ ট্রেনের একটি নিয়মিত দক্ষিণে করাচী হইতে ভারত অতিক্রম করিয়া আসামের লেদো পর্যন্ত ২ হাজার ১৩০ মাইল পথ পাড়ি দিত।

১৯৪১ সালে ভারতীয় রেলওয়েতে মোট ৭৬ কোটি যাত্রী ৩৬০০ কোটি মাইল ভ্রমণ করিয়াছিল।

বন্দর ও জাহাজচলাচল

ভারতের বন্দরগুলির কর্মক্ষমতা অনেক গুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালে ছোট ছোট বৃটিশ অভিযানকারী বাহিনীর অবতরণের উপযোগী উপকূলবর্তী বড় ঘাঁটি ছিল ভারতে সাতটি। আর সেখানে ফ্রান্সের ছিল ১৩৭টি বন্দর।

যুদ্ধের পূর্বে ভারতের অল্প কয়েকটি জাহাজ কারখানায় ছোট ছোট জাহাজ তৈরী হইত এবং ছোটখাটো সারাইয়ের কাজ হইত। কিন্তু যুদ্ধের সময় বেশ কয়েক শত জাহাজ তৈরী হইয়াছিল এইসব কারখানায়; এইসব জাহাজের মধ্যে মাইন ক্ষেপণাস্ত্রী জাহাজ যেমন ছিল, তেমনি ছিল যুদ্ধজাহাজও। সেই সময়ে দেশের ৫৬টি কারখানায় মোট ৩ কোটি ৮৮ লক্ষ ৪০ হাজার টনের ৬৫০০টি জাহাজ মেরামত করা হইয়াছিল।

তাছাড়া বার্মার নদীসংকুল এলাকায় যুদ্ধরত বাহিনীর সরবরাহ ও পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজনে সমস্ত ধরনের নৌ-যান সহ একটি সম্পূর্ণ বাহিনী তৈরী করা হইয়াছিল। এই সব নৌযানের অধিকাংশই ছিল আবার বিশেষ উন্নত ধরনের। যুদ্ধের সময়ে সারা দেশে প্রধানতঃ সামরিক কর্মীদের দিয়া সব সময়ের জন্য বেশ কয়েক শত মাইল সড়ক নির্মাণ করা হইয়াছিল।

সড়ক

দুইটি সড়ক তৈরী হইয়াছিল জরীপহীন জঙ্গল ও পাহাড়ী এলাকার মধ্য দিয়া। এই সড়ক দুটির প্রতিটি লম্বায় ছিল ৩০০ মাইলের বেশী। এই সড়ক দুটি রেল ও ও অগ্রবর্তী ঘাঁটি, যেমন, লেদোর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল। তাছাড়া এই

সড়ক দুটি বার্মার সড়কব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল এবং চীনের সঙ্গে স্থলপথে সড়ক যোগাযোগের পথ খুলিয়া দিয়াছিল।

তেলের লাইন

বাংলা ও আরাকান হইতে আসাম ও উত্তর বার্মার মধ্যে হাজার মাইল লম্বা দুইটি প্রধান তেলের লাইন সহ বহু শত মাইল তেলের পাইপ লাইন বসানো হইয়াছিল।

চিকিৎসা-ব্যবস্থা

সারা দেশে ১৩০টি নতুন হাসপাতাল তৈরী করা হইয়াছিল। তাছাড়া ভারত চিকিৎসা-সামগ্রী তৈরীর পরিমাণ নিজের প্রয়োজনের ২৫ শতাংশ ১৯৪০ সাল হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৬০ শতাংশ করিয়াছিল। এমন কি ভারত হাসপাতাল ও অপারেশনের কাজের সামগ্রী এবং অনেক স্ট্যাণ্ডার্ড মানের যন্ত্রপাতিও সেই সময় তৈরী করিয়াছিল।

ভারতে মিত্রশক্তির জন্য

ভারতকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহারকারী মার্কিন সেনাবাহিনীকে ভারত ১৯৪৪ সালে ৪৪ হাজার মাইল সুতীকাপড় এবং আবার ১৯৪৫ সালে ২৮ হাজার মাইল সুতী কাপড় সরবরাহ করিয়াছিল। তাছাড়া চীনা বাহিনীকেও ভারত ১১ হাজার মাইল সুতী কাপড় সরবরাহ করিয়াছিল।

সুতী ছাড়া অন্যান্য ধরনের কাপড়ও (মোট প্রায় ২০ হাজার মাইল লম্বা) সরবরাহ করা হইয়াছিল।

এই সময়ে ভারতস্থিত মার্কিন সেনাবাহিনীকে ভারত মোট ১২ কোটি ৯১ লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ড (৫১ কোটি ৬৭ লক্ষ ২০ হাজার ডলার) মূল্যের বিভিন্ন দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়াছিল।

শিল্প

দেশের শিল্পসম্পদের উন্নতি সাধন সেই সময় ভারত ও তার মিত্রদেশগুলির কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে উপস্থিত হইয়াছিল। আর এই উন্নতির জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল নতুন কারখানা স্থাপন, নতুন প্ল্যাণ্ট বসানো, নতুন উৎপাদনযন্ত্র চালু করা ও পুরাতনগুলিকে কাজে লাগানো এবং হাজার হাজার নতুন শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার।

ইস্পাত

দেশের সম্পদ হইতেই ভারতের ইস্পাত কারখানাগুলিতে সেই সময় নিম্নে উল্লিখিত জিনিসের জন্য দ্রব্যাদি উৎপাদিত (বছরে প্রায় ১৫ লক্ষ টন হারে) হইয়াছিল : রেললাইন, সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, ব্রীজ, ভাসমান ডক, আরমার পিয়েরসিং স্টীল, জাহাজ, বুলেট প্রুফ স্টীল, ক্রেন, মেসিন টুল।

অস্ত্র-কারখানা

সরকারী অস্ত্রকারখানাগুলি সেই সময় নতুন নির্মিত কারখানাগুলিতে ৮৫ হাজার নতুন কর্মীকে চাকুরি দিয়াছিল

এইসব কারখানায় তৈরী হইয়াছিল :

মেশিনগান, ডেপ্‌থ চার্জ (জল বিস্ফোরক), ফিল্ড গান, কামানের গোলা, বোমা, পাইরোটেকনিকস্‌, গ্রেনেড, প্রোপেল্যাণ্ট, মাইন, ছোট অস্ত্রাদির গোলাবারুদ।

তাছাড়া বন্দুক ও অস্ত্রশস্ত্রের আবরণ নির্মাণে, গোলাবারুদ ভর্তি করিবার কাজে, এইসব অস্ত্রশস্ত্র রঙ করার কাজে এবং এইগুলি পাঠাইবার জন্য পাত্র নির্মাণের কাজেও অন্যান্য শিল্পকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এক কথায় সেই সময় অস্ত্রকারখানাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়া কাজ করিবার ক্ষেত্রে মোট দেড়হাজার ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কশপকে কাজে লাগানো হইয়াছিল।

বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ ও সমাবেশ

ভরতের ১৮টি কেন্দ্রে যুদ্ধের সময় বিমান জড়ো হইত এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হইত। শুধু তাই নয় এইসব কেন্দ্রে বিমানের যন্ত্রাংশ ও আনুষঙ্গিক অংশ তৈরী হইত।

আকাশপথে সরবরাহ

ভারতের কারখানাগুলিতে মিত্রশক্তির জন্য সমস্ত ধরনের মোট ৪৫ লক্ষ প্যারাসুট তৈরী হইয়াছিল।

আর ভারতে তৈরী প্যারাসুটের মাধ্যমে এক বছরে বার্মায় মোট প্রায় ৬ লক্ষ ৯ হাজার ১১৭ টন বিভিন্ন দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হইয়াছিল।

পোশাক-পরিচ্ছদ

ভারতের পোশাক নির্মাণকারী কারখানাগুলিতে যুদ্ধের সময় ৪০ কোটি তৈরী-পোশাক নির্মিত হইয়াছিল। তাছাড়া ভারতীয় চামড়া দিয়া ভারতীয় কর্মীরা মোট ৫ কোটি জোড়া জুতা তৈরী করিয়াছিল।

১৯৩৯ সালে এবং ১৯৪৩ সালে সম্পূর্ণভাবে দেশীয় দ্রব্যাদি দিয়া ভারতে মোট ২০ লক্ষ এবং ১১ কোটি ৩০ লক্ষ পোশাক তৈরী হইয়াছিল।

বার্মায় যুদ্ধে ব্যবহৃত প্রতিটি জংলী সবুজ রংয়ের পোশাকও নির্মিত হইয়াছিল ভারতেই।

সেনাবাহিনীর সম্প্রসারণ

১৯৩৯ সালে যেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার, ১৯৪৫ সালে সেই সংখ্যা গিয়া দাঁড়াইয়াছিল ২৫ লক্ষে।

এছাড়া সেনাবাহিনীর অন্যান্য শাখায় যে সম্প্রসারণ ঘটিয়াছিল তাহা নিম্নরূপ :

	১৯৩৯	১৯৪৫
রাজকীয় ভারতীয় নৌবাহিনী	২,০০০	৩০,০০০
রাজকীয় ভারতীয় বিমানবাহিনী	১,৬০০	৩০,০০০

আর ১৯৪৫ সালে মহিলা অক্সিলিয়ারি কোর (ভারত)-এর সদস্য-সংখ্যা গিয়া দাঁড়াইয়াছিল দশ হাজারে।

রাজকীয় ভারতীয় নৌবহর

পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে জয়লাভ সুনিশ্চিত করিতেই যুদ্ধকালে রাজকীয় ভারতীয় নৌবহর সবসময় রাজকীয় নৌবহরকে সাহায্য করিয়াছে। তাছাড়া ১৯৪২ সালে বার্মা থেকে সৈন্য অপসারণ ও আরাকানের মধ্য দিয়া সৈন্যদের ফিরিয়া আসিবার প্রথম দিকেও ভারতীয় নৌবাহিনী একাই সহায়তা করিয়াছে। আর মিত্রবাহিনীর দ্রুত অগ্রগতির কালে আরাকানের সমুদ্র এলাকা ও বার্মা রণাঙ্গনে আক্রমণ চালাইবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল ভারতীয় নৌবহরের উপর।

এইসব সহযোগিতা ছাড়া, যুদ্ধ চলাকালীন পুরা সময়েই ভারতীয় বন্দরের স্থানীয় নৌ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং পারস্য উপসাগরে টহলদারি কাজেরও দায়িত্ব ছিল ভারতীয় নৌবহরের উপর।

রাজকীয় ভারতীয় বিমানবহর

১৯৪২ সালের শুরুতে রাজকীয় ভারতীয় বিমানবহরে কেবলমাত্র দুইটি স্কোয়াড্রন ছিল। আর এই দুইটি স্কোয়াড্রনে আর এ এক অংশ ছিল শক্তিশালী। কিন্তু যুদ্ধের শেষে ভারতীয় বিমানবহরে স্কোয়াড্রনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দশ হইয়াছিল, অন্যদিকে আর এ এক অংশ মারাত্মকভাবে কমিয়া গিয়াছিল।

যুদ্ধকালে এই সব স্কোয়াড্রনের অনেক কটি স্কোয়াড্রন বার্মা রণাঙ্গণে আক্রমণ কাজে নিযুক্ত ছিল। আর বাকী স্কোয়াড্রনগুলির উপর ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আকাশসীমা রক্ষা করিবার দায়িত্ব ছিল।

যুদ্ধকালে ভারতীয় বিমানবহরের যে সম্প্রসারণ সম্ভব হইয়াছিল, তা মূলতঃ ভারতীয়দের ব্যাপক অংশগ্রহণের ফলে। এই সময় বিমানবহরের বিভিন্ন কাজে তো বটেই, এমনকি সাহায্যকারী আর এ এক কর্মী হিসেবেও ভারতীয়রা কাজ করিয়াছিলেন।

ভারতীয় সেনাবাহিনী

ভারতীয় সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবেই একটি স্বেচ্ছামূলক সেনাবাহিনী। কারণ, ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়ান (বৃটিশ)-দের ছাড়া আর কাহাকেও বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হয় নাই।

১৯৪৫ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনী ছিল নিম্নরূপ :	সংখ্যা
ভারতীয় আরমার্ড কোর	৩১,০০০

রাজকীয় ভারতীয় গোলন্দাজবাহিনী	৮৩,০০০
ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার	২৬৩,০০০
ভারতীয় সিগনাল কোর্	৬৮,০০০
ভারতীয় আর্মি মেডিক্যাল কোর্	১৬৭,০০০
রাজকীয় ভারতীয় আর্মি সার্ভিস কোর্	৩৬০,০০০
ভারতীয় আর্মি অর্ডন্যান্স কোর্	৬৪,০০০
ভারতীয় আর্মি ইলেকট্রিকাল ও মেডিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার	৯৯,০০০

অফিসারদের সংখ্যা

১৯৩৯ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত ভারতীয় অফিসারের সংখ্যা ছিল ১,১১৫ জন। আর ১৯৪৫ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছিল ১৫,৭৪০ জনে।

হতাহত

যুদ্ধকালে (১৯৪৫ সালের আগষ্ট পর্যন্ত) ভারতীয় সেনাবাহিনীর বহু সেনা হতাহত হইয়াছিল—

নিহত	২৪,৩৩৮ জন
আহত	৬৪,৩৫৪ জন
নিখোঁজ	১১,৭৫৪ জন
যুদ্ধবন্দী	৭৯,৪৮৯ জন
মোট	১৭৯,৯৩৫ জন

যুদ্ধ অভিযান

ভারতীয় সেনাবাহিনী নিম্নে উল্লিখিত যুদ্ধ অভিযানে অংশ নিয়াছিল—মালয়, ডিউনিসিয়া, বার্মা, মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব আফ্রিকা, সিসিলি, উত্তর আফ্রিকা, ইতালী, গ্রীস।

পাইফোর্স

মধ্যপ্রাচ্যে (ইরান ও ইরাক) ভারতীয় ডিভিসনকে পাঠানো হইয়াছিল ককেসাস হইয়া ভারত অভিমুখে জার্মানদের সম্ভাব্য অগ্রগতি রুধিবার জন্য। সেইসময় মধ্যপ্রাচ্যে ভারতীয় ডিভিসন পরিচিত হইয়াছিল 'পাইফোর্স' নামে। এককথায়, রাশিয়ার সৈন্যদের পশ্চাদ্‌পসারণ এবং ইরান ও ইরাক হইয়া জার্মান বাহিনীর অগ্রগতির আসন্ন মুহূর্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বাধা দান ছিল সেই সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

রাশিয়া অভিমুখে

জার্মান বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে রাশিয়াকেও ভারত সাহায্য করিয়াছিল। ভারতীয় সৈন্যরা সেই সময় উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে রাশিয়া পর্যন্ত ইরান-জাহিদান থেকে মেশেদা হইয়া দীর্ঘ ৩০০০ মাইল সরবরাহ পথ তৈরী করিয়া দিয়াছিল।

আর এই সড়কপথে ১৫ লক্ষ টন দ্রব্যাদি রাশিয়ায় সরবরাহ করা হইয়াছিল। অথচ সেই সময় জাহাজযোগে এত বৃহৎ পরিমাণ দ্রব্যাদি সরবরাহ করা একপ্রকার অসম্ভব ছিল।

সরবরাহ ছাড়াও, তপ্ত মরুভূমি ও বরফে ঢাকা পাহাড়ী অঞ্চলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা এই সড়ক পথে ২৪ ঘণ্টা সামরিক টহলব্যবস্থাও বজায় রাখিয়াছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী।

একটি বৃহৎ অগ্রগতি

পূর্ব আফ্রিকায় যুদ্ধে নিযুক্ত ভারতীয় সৈন্যরা শুধুমাত্র ঐ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। বরং তাঁরা যুদ্ধ করিতে করিতে উত্তর আফ্রিকা, তিউনিসিয়া ও ইতালী পর্যন্ত দীর্ঘ ৪৫০০ মাইল অগ্রসর হইয়াছিল।

পুরস্কার

যুদ্ধকালে ভারতীয় সেনাবাহিনী ৩১টি ভিক্টোরিয়া ক্রশ জয় করিয়াছিল। এগুলির ২৭টি দেওয়া হইয়াছিল বার্মার যুদ্ধে অসম সাহসিকতার জন্য। এছাড়াও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যরা আরও ২০টি পুরস্কার জয় করিয়াছিল।

এক কথায় যুদ্ধে অসম সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী মোট ৪০২৮টি পুরস্কার জয় করিয়াছিল।

ভারতীয় কম্যাণ্ড

জাপানের পরাজয়কালে জঙ্গলে যুদ্ধ করিবার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৫০০০০০ জনকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হইয়াছিল। এছাড়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কম্যাণ্ডে ৭০০০০০ জন, বিদেশে (পাইফোর্স হিসেবে মধ্যপ্রাচ্য ও ইতালীতে) ২২০০০০ জন এবং ভারতীয় কম্যাণ্ডে ৩০০০০০০ জন ভারতীয় সৈন্য নানাভাবে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিল।

এক কথায় ভারতীয় কম্যাণ্ড ছিল সমস্ত রণাঙ্গনে নানাভাবে সহায়তা করার ক্ষেত্রে অন্যতম একটি অবলম্বন।

বার্মা

বার্মায় নিযুক্ত চতুর্দশ বাহিনী ছিল বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম একক বাহিনী। এর যুদ্ধক্ষেত্র ছিল ৭০০ মাইল বিস্তৃত, যা জার্মানীর বিরুদ্ধে রাশিয়ার ফ্রন্টের সমান।

বার্মায় যুদ্ধরত সেই ১০ লক্ষ সৈন্যের মধ্যে ৭ লক্ষই ছিলেন ভারতীয়।

আর বিভিন্ন রণাঙ্গনে জাপানীরা যত হতাহত হইয়াছিল, তার অর্ধেকই হইয়াছিল বার্মায়, বৃটিশ ও ভারতীয় বাহিনীর হাতে।

দুইভাবে সাহায্য

মিত্রশক্তির যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারত দুইভাবে সাহায্য করিয়াছিল। একদিকে যেমন ভারত নিজস্ব সম্পদ থেকে নির্মিত যুদ্ধ সামগ্রীর একটা বিরাট অংশ সরবরাহ করিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি মিত্র শক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ-সামগ্রীর সরবরাহও ভারত যুদ্ধ চলাকালে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

এই সময় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পর্ষদ উৎপাদনের নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছিল এবং শান্তির সময়ে যে সব দ্রব্য রপ্তানি করা হইত তার দেশীয় বিকল্পের সন্ধান করিয়াছিল। এছাড়া পর্ষদ নিয়োক্ত দ্রব্যের উন্নত ব্যবহার পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন :

কেমিকাল	ওষুধ
প্লাসটিক	ডাই
ভেজিটেবল অয়েল লুব্রিক্যান্ট	শেলাক

কাঠ

অন্যান্য অনেক কিছুর উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালে ভারতে কাঠের উৎপাদনও আশানুরূপ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে যেখানে ভারতে কাঠ উৎপাদিত হইয়াছিল ২ লক্ষ ৪২ হাজার টন, সেখানে ১৯৪৩—৪৪ সালে তা বৃদ্ধি পাইয়াছিল ১২ লক্ষ ৭৪ হাজার টনে।

তাছাড়া এই সময়ে ভারতের কারখানাগুলিতে ৬ কোটি বর্গফুটেরও বেশী পরিমাণ প্লাইউড উৎপাদিত হইয়াছিল।

মিত্রশক্তিকে সরবরাহ

নিজস্ব প্রয়োজন মিটানো ছাড়াও ভারতের নতুন কারখানাগুলি মিত্রশক্তির জন্য প্রয়োজনীয় উল্লেখযোগ্য যুদ্ধসামগ্রীও নিয়মিত সরবরাহ করিয়াছিল।

ভারতে তৈরী বস্ত্রাদি ১৫টি দেশে পাঠানো হইয়াছিল। তাছাড়া মিত্রশক্তির প্রয়োজনীয় ৫০ হাজার বিভিন্ন ধরনের বস্ত্রাদির মধ্যে ৩৭ হাজারই ভারত সরবরাহ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

প্রশান্তমহাসাগরীয় যুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়াকে বিভিন্ন দ্রব্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে ভারত ছিল তৃতীয় স্থানে। সেই সময় অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া, চীন ও রাশিয়াতেও প্রচুর পরিমাণ যুদ্ধ-সামগ্রী পাঠানো হইয়াছিল। এই সব ছাড়া ভারত নিম্নোক্ত দেশগুলিতে সরবরাহ করিয়াছিল :

মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায়—

ইলেকট্রিক তার	তাবু
পাখা	ইস্পাত
বস্ত্র	কাঠ

ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য

বৃটেনে—

তুলা	জুতা
পাট	খাদ্যসামগ্রী

ক্যানভাস

সমস্ত মিত্র দেশগুলিতে—

অভ্র	চামড়া (কাঁচা)
পাট	পশু চর্ম্ম
ম্যাঙ্গানীজ আকরিক	রবার

"ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করিতে আপনারা জাপান যাইতেছেন শুনিয়া আমি খুবই খুশী হইয়াছি। জাপানীদের পরাজয়ে বাধ্য করিবার ব্যাপারে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কৃতিত্ব অনেকখানি। আর সারা বিশ্বই জানে যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী আসাম ও বার্মায় কি সুন্দরভাবে যুদ্ধ করিয়াছে। তাছাড়া ভারতীয় সেনাবাহিনী সাহসিকতা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে আফ্রিকা, জার্মানী, ইতালী ও সিরিয়ায় জার্মানীর পরাজয় ঘটাইবার কঠিন যুদ্ধে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। আপনাদের মধ্যে এমন অনেক ইউনিট এবং অফিসার ও সৈনিক আছেন যাঁরা এই সব কয়টি দেশেই যুদ্ধ করিয়াছেন এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীকে খ্যাতি আনিয়া দিয়াছেন। *

—জেনারেল স্যার ক্লড অকিনলেক, কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ, ভারতবর্ষ (জাপানে দখলদারি ফৌজে যে ভারতীয় সৈন্যদল প্রেরিত হয় তাঁদের উদ্দেশ্যে ভাষণ) ১৫ জানুয়ারী, ১৯৪৬।

---

* সাংবাদিক শ্রীপরিতোষ পাল কর্তৃক মূল ইংরাজী থেকে অনূদিত।

দশম পর্ব

দ্বাদশ অধ্যায়

উপসংহার

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করিয়া মানুষের ইতিহাসের যে বর্বরতম যুদ্ধ দীর্ঘ ৬ বছর ধরিয়া চলিয়াছিল, তার সমাপ্তি ঘটিয়াছিল ১৯৪৫ সালের ১৪ই আগষ্ট। হিটলার কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণের দ্বারা যে রক্তস্রাবী মহাযুদ্ধের সূচনা, জাপান কর্তৃক নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্যে সেই নরমেধযজ্ঞের অবসান। অবশ্য তার আগেই ৮-৯মে নাৎসী জার্মানীর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরের দ্বারা ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের অবসান হইয়াছিল এবং তার পরেই আগষ্ট মাসে জাপানেরও পতন ঘটিল।

এ পর্যন্ত মানুষের ইতিহাসে এমন ভয়ঙ্কর, এমন বীভৎস এবং এমন নির্বিচার ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ডপূর্ণ মহাযুদ্ধ আর অনুষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং প্রথমেই এই মহাযুদ্ধের নরঘাতন লীলার একটা রেখাচিত্র দেওয়া যাক। ১৯৭০ সালে বর্তমান গ্রন্থকার যখন দ্বিতীয়বার পূর্ব-জার্মানী পরিদর্শনে গিয়াছিলেন, তখন সামরিক ইতিহাসের ছাত্ররূপে স্বভাবতঃই তিনি পটসডামের সেই বিখ্যাত সম্মেলন-কক্ষ পরিদর্শন করিয়াছিলেন, যে প্রাসাদকক্ষে ১৯৪৫ সালের ১৭ জুলাই থেকে ২ আগষ্ট পর্যন্ত মিলিত হইয়াছিলেন ষ্ট্যালিন, চার্চিল (পরে এ্যাট্‌লি) ও ট্রুম্যান এবং স্বাক্ষর করিয়াছিলেন পটসডাম চুক্তি। কিন্তু সেই সম্মেলন কক্ষের দেওয়ালে মহাযুদ্ধের যে ভয়াবহ তথ্যগুলি একটি চার্টের আকারে টাঙাইয়া রাখা হইয়াছিল, সেগুলি এই উপসংহার পর্বে নিশ্চয়ই পাঠকদের পক্ষে উল্লেখযোগ্য। যেমন—

প্রথম মহাযুদ্ধে নিহত হইয়াছিল ১ কোটি লোক।

আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিল ৫ কোটি ৫০ লক্ষ লোক।

প্রথম মহাযুদ্ধে ৭ কোটি ৪০ লক্ষ লোক সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দিয়াছিল।

আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগ দিয়াছিল ১১ কোটি লোক।

প্রথম মহাযুদ্ধে ৩৩টি দেশ সরকারীভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল।

আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ৭২টি দেশ।

"মানুষের ইতিহাসের বীভৎসতম অপরাধের অনুষ্ঠান করিয়াছিল ফ্যাসিষ্ট বর্বরেরা। ১০ মিলিয়ান বা ১ কোটি লোককে বন্দীনিবাসগুলিতে হত্যা করা হইয়াছে নানা হিংস্র ও কল্পনাতীত নিষ্ঠুর উপায়ে—বিষাক্ত গ্যাসের সাহায্যে, পিটিয়ে ও শারীরিক যন্ত্রণা দিয়ে, সোজা গুলী করে, ফাঁসিতে লটকিয়ে, স্রেফ উপবাসে রেখে এবং অন্যান্য নানা উপায়ে—যেমন পরীক্ষামূলক ঔষধ প্রয়োগে।

এই নিহত নর-নারী-শিশু-বালক-বালিকা ও বৃদ্ধ প্রভৃতির মধ্যে ছিল ৬০ লক্ষ ইহুদী।

পটসডাম কনফারেন্স হলে জার্মান ফ্যাসিজম কর্তৃক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বলি সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি ছিল:

সোভিয়েত ইউনিয়ন—	২,০০০০০০০
পোল্যাণ্ড—	৬০,০০০০০
জার্মানী—	৮০,০০০০০
যুগোশ্লাভিয়া—	১৭,০০০০০
রুমানিয়া—	৭,৭০,০০০
গ্রেট বৃটেন ও কমনওয়েলথ—	৬,৬৫,০০১
ফ্রান্স—	৬,২০,০০০
ইতালী—	৬,৭০,০০০
গ্রীস—	৫,৭০,০০
চেকোশ্লোভাকিয়া—	৮,৫০,০০০
অস্ট্রিয়া—	৫,৪৬,০০০
হাঙ্গেরী—	৭,৯০,০০০
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩,৬৭,০০০
হল্যাণ্ড—	২,৫৫,০০০
বেলজিয়াম—	১,৬০,০০০
ফিনল্যাণ্ড—	৯৭,০০০
বুলগেরিয়া—	৩২,০০০
আলবেনিয়া—	২৬,০০০
নরওয়ে—	৯,০০০
ডেনমার্ক—	৩,০০০
আহত ও পঙ্গু—	৮,০০০০০০০

উপরে উদ্ধৃত এই সংখ্যার সঙ্গে এশিয়া মহাদেশের চীন ও জাপানের কথাও মনে রাখিতে হইবে। একটি মার্কিন পুস্তকে প্রকাশ যে, চীনে কত লোক হতাহত হইয়াছিল, তা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে, জেনারেলিজিমো চিয়াং কাইসেক তাঁর আত্মকথায় লিখিয়াছেন যে, চীনা সৈন্যের হতাহতের সংখ্যা ৩০ লক্ষেরও বেশী। এই সংখ্যার মধ্যে অবশ্যই চীনের অসামরিক নর-নারীর মৃত্যু ও সম্পত্তি-হানির কথা ধরা হয় নাই।

আর বিমান আক্রমণে ও যুদ্ধে জাপানের প্রাণহানির সংখ্যা ২০ লক্ষ। (১)

এই প্রসঙ্গে বাংলায় ও ভারতে ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ লোকের দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর কথাও নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য।...

১৯৭৫ সালের মে মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবসানের ৩০তম বার্ষিকী উপলক্ষে মস্কো থেকে যে সমস্ত তথ্য প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি স্মরণযোগ্য :

(১) Total War—Vol II—by Peter Calvocoress : Guy Wint New York, 1973, p. 374

১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯—নাৎসীদের পোল্যাণ্ড আক্রমণে যুদ্ধের সূচনা। ৮ মে, ১৯৪৫—নাৎসী জার্মানীর আত্মসমর্পণ।

"যুদ্ধের স্থিতিকাল ছিল ৬ বছর এবং ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা—এই তিনটি মহাদেশের ৪০টি দেশ রণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। ইউরোপীয় মহাদেশ[১] ছিল মহাযুদ্ধের মূল নাটক এবং তাঁর চূড়ান্ত অঙ্ক ছিল সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে।" (২)

যুদ্ধে জড়িত মানুষের সংখ্যা ছিল ১৭০ কোটি। অর্থাৎ সমগ্র মনুষ্যজাতির তিন-চতুর্থাংশ (প্রথম মহাযুদ্ধে ১০০ কোটি)।

যুদ্ধে লিপ্ত দেশগুলির মোট ব্যয় আনুমানিক ১,৫০,০০০ কোটি ডলার।

আমেরিকার সামরিক ব্যয় ৩১,৮০০ কোটি ডলার।

বৃটেনের সামরিক ব্যয় ৩১,০০০ কোটি ডলার

অক্ষশক্তির মোট সামরিক ব্যয় ৪২,০০০ কোটি ডলার।

যুদ্ধে লিপ্ত মোট সৈন্যসংখ্যা ১১ কোটি। প্রধানতঃ সমরাস্ত্র নির্মাণেই শ্রমশক্তি নিযুক্ত হইয়াছিল এবং মাত্র চারিটি দেশ—আমেরিকা, বৃটেন, জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়নে নির্মিত হইয়াছিল :

বিমান—৬,৫৩,০০০
ট্যাঙ্ক—২,৮৭,০০০
কামান—১০,৪২,০০০

যুদ্ধে নিহত সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষ। এর মধ্যে সৈন্য ২ কোটি ৭০ লক্ষ এবং অ-সামরিক নর-নারী ২ কোটি ৮০ লক্ষ।

অ-সামরিক জনগণের উপর নৃশংস আক্রমণ এবং শহর-গ্রাম জনপদ ধূলায় মিশাইয়া দেওয়াই ছিল তাদের বর্বর রণনীতির প্রধান লক্ষ্য। আর বন্দীশিবির-গুলিতে গণহত্যা। এ জন্যই সৈন্য সংখ্যার চেয়ে অ সামরিক নর-নারী-শিশু হত্যার সংখ্যা এত বেশী।

সোভিয়েত দেশে নাৎসীরা নিশ্চিহ্ন করিয়াছিল :

১,৭০১ টি ছোট-বড় শহর
৭০,০০০ টি গ্রাম
৩২,০০০ শিল্পসংস্থা
৯৮,০০০ যৌথ খামার
১,৮৭৬ রাষ্ট্রীয় খামার
৬৫,০০০ কিলোমিটার রেল লাইন

ধ্বংস করে বা জার্মানীতে লইয়া যাওয়া হয় :

১৬,০০০ রেল ইঞ্জিন

এই নি ৪,২৮,০০০ রেলওয়ে ওয়াগন

ইহুদী। য়ত ইউনিয়নের মোট বৈষয়িক ক্ষতি :

পটসডাম ব ২,৬০,০০০ কোটি রুবল

নিম্নলিখিত তথ্ :eat Patriotic War of the Soviet Union, p. 433.

নাৎসীদের বিমান আক্রমণে ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়—

বৃটেনে ২০ লক্ষ ঘরবাড়ী।

ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস ও অন্যান্য দেশেও নিশ্চিহ্ন হয় অসংখ্য ঘরবাড়ী ও অ-সামরিক সংস্থা।

অপরদিকে মিত্রশক্তির পাল্টা আক্রমণে জার্মানীর ধ্বংস হয়:

১৫ লক্ষ ঘরবাড়ী।

নিরাশ্রয় হয় ৭৫ লক্ষ জার্মান।

* * *

দানবিক ফ্যাসিজমকে পরাজিত করার জন্য কি পরিমাণ মূল্য দিতে হইয়াছে, তা উপরে উদ্ধৃত তথ্যগুলি থেকে কিছুটা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার এই অঙ্কও সম্পূর্ণ বা চূড়ান্ত নয়। মানুষের জীবনের ও বিষয়-সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতি ইউরোপে, আফ্রিকায় ও এশিয়ায় সুনির্দিষ্টরূপে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অধিকন্তু মিত্রপক্ষের মধ্যেও ইঙ্গ-মার্কিন এবং সোভিয়েত রাশিয়ার প্রদত্ত হিসাবগুলির মধ্যে সর্বত্র মিল নাই। কারণ, প্রত্যেকেই যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের বীরত্ব ও কৃতিত্বকে প্রাধান্য দিতে চাহিয়াছেন, তেমনি অপরের তুলনায় নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকারকেও বড় করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। সম্ভবতঃ জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় গৌরবের দিক থেকে এই দুর্বলতা স্বাভাবিক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে নাৎসী ও ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গকে প্রতিরোধ ও পরাজিত করিতে গিয়া ৬ বছরের মহাযুদ্ধে যে অভাবনীয় ক্ষতি ও ধ্বংস হইয়াছে, তা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। বিশেষতঃ জীবনের দুর্ভোগ ও যন্ত্রণা পরিমাপ করার যন্ত্র কোথায়? এই দুর্ভোগ ও যন্ত্রণার খেসারৎ দিতে হইয়াছে বিভিন্ন দেশকে মহাযুদ্ধ অবসানের ৩০ বছর পরেও—দারিদ্র্য, বেকারি, মুদ্রাস্ফীতি, বাস্তুহারা এবং অন্যান্য বহুভাবে।

উপরে প্রধানত সোভিয়েত পক্ষের প্রদত্ত হিসাব দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে মার্কিন পক্ষের প্রকাশিত হিসাবও উল্লেখ করা যাইতেছে 'দুই শিবিরের' (রাজনৈতিক মত-বিরোধের দিক থেকে) বক্তব্য অনুধাবনের জন্য।

মার্কিন ঐতিহাসিক লুই স্নাইডার লিখিয়াছেন যে, জার্মানী সমগ্র ইউরোপকে নিজেদের তাঁবেদারিতে আনিতে গিয়া প্রভূত মূল্য দিয়াছিল:

হিটলারী যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল ২ কোটি জার্মান।

এর মধ্যে ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত।

অন্যান্য ভাবে মৃত ৫৩ লক্ষ ৫০ হাজার।

৭২ লক্ষ ৫০ হাজার আহত এবং ১৩ লক্ষ নিখোঁজ।

অর্থাৎ জার্মানীর হতাহত ও নিখোঁজের (বন্দীসহ?) মোট সংখ্যা ১ কোটি ২১ লক্ষ ৫০ হাজার।

জনসংখ্যার এই ক্ষতি ছাড়া মিত্রবাহিনীর হাতে হিটলারের তৃতীয় রাইখ এমনভাবে ধ্বংস হইয়াছিল যে, আগের জার্মানীকে আর যেন চেনাই যাইত না। জার্মানীর ২ কোটি অট্টালিকার মধ্যে ৭০ লক্ষ হয় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত

হইয়াছিল। ২০০০ সেতু ধ্বংস হইয়াছিল, আর ৩০০০ মাইল রেলপথ ও সড়ক চূর্ণ হইয়াছিল। কার্যত প্রায় সমস্ত বড় বড় শহরের রাস্তাই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল এবং জার্মানীর বিখ্যাত রাজধানী বার্লিনের সরকারী ও বে-সরকারী অট্টালিকা, পরিবহণ, জল, বিদ্যুৎ ও গ্যাস ইত্যাদি সমস্ত পাব্লিক সার্ভিস ও সরবরাহ-ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং সর্বত্র মৃত্যুর বিভীষিকায় বার্লিন যেন প্রেতনগরীর রূপ ধারণ করিয়াছিল। আর এই ,প্রেতপুরীতে কত হতভাগ্যকে দেখা গিয়াছে স্ত্রীপুত্র পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের খোঁজ করিতে! হিটলারী নাৎসী ডি.ক্টেটরির চরম মূল্য দিতে হইয়াছে জার্মানীকে। একমাত্র প্রাচীন কার্থেজ নগরীর (রোমানদের হাতে) ধ্বংসের সঙ্গে এর তুলনা করা যাইতে পারে। আ র্থক হিসাবে জার্মানীর ক্ষতির পরিমাণ কমপক্ষে ছিল ২১ হাজার ২০০ কোটি ডলার!

অক্ষশক্তিবর্গের অন্যতম প্রধান অংশীদার জাপানকেও অনুরূপ খেসারৎ দিতে হইয়াছিল।

৯৭ লক্ষ জাপানী অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। এর মধ্যে রণক্ষেত্রে নিহত হইয়াছিল ১২ লক্ষ ১০ হাজার। অন্যান্যভাবে মারা পড়িয়াছিল ৬ লক্ষ ২০ হাজার। আহত হইয়াছিল ১ লক্ষ ৪০ হাজার, নিখোঁজ হইয়াছিল ৮৫ হাজার। অর্থাৎ জাপানের মোট ২১ লক্ষ ১৫ হাজার হতাহত ও বন্দী।

জাপানের সমগ্র নৌবহর ধ্বংস হইয়াছিল এবং বাণিজ্যবহরও ধ্বংস হইয়াছিল শতকরা ৯৫ ভাগ।

জাপানী দ্বীপের এক অংশ থেকে অন্য অংশ পর্যন্ত শহরগুলি চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

পার্লহারবার আক্রমণের চূড়ান্ত পরিণতি এই!

অক্ষশক্তিবর্গের তৃতীয় বড় অংশীদার ইতালীর অবস্থাও মর্মান্তিক হইয়াছিল।

৩১ লক্ষ ইতালীয়ান অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। এর মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছিল ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৪৯৬ জন।

আহত হইয়াছিল ৬৬,৭১৬ জন এবং নিখোঁজ হইয়াছিল ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৭০ জন।

ইতালীর ২০৮ টি যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস হইয়াছিল এবং ৪৯টি আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। আর বাণিজ্য নৌ-বহরের ৯০ ভাগ নষ্ট হইাছিল।

আর্থিক দিক দিয়া ইতালী প্রায় দেউলিয়া হইয়া গিয়াছিল।

২০ বছরের ফ্যাসিষ্ট মহিমার এবং মুসোলিনীর রোমক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের এই পরিণতি!

উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সারা ইতালী বোমায় ও গোলায় বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং সর্বত্র খাদ্যাভাব ও ক্ষুধার্ত মানুষের করুণ দৃশ্য উদঘাটিত হইয়াছিল।

মিত্রপক্ষের মধ্যে বিজয়ী বৃটেন পর্যন্ত মারাত্মকরূপে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্বল হইয়াছিল।

বৃটেন যুদ্ধের জন্য সমাবেশ করিয়াছিল ৫৮ লক্ষ ৯৬ হাজার জন। এর মধ্যে মারা পড়িয়াছিল ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ১১৬ জন।

আহত হইয়াছিল ৩ লক্ষ ১১ হাজার ২৬৭ জন এবং নিখোঁজ হইয়াছিল ৪৬

হাজার ১৭ জন। বৃটেনের বিশাল বাণিজ্য নৌবহর যুদ্ধের সময় প্রভূত পরিমাণে পরিস্ফীত হইলেও ২ কোটি ৩০ লক্ষ টন থেকে হ্রাস পাইয়া ১ কোটি ৬০ টনে দাঁড়াইয়াছিল।

আর খাস বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের ৫ লক্ষ বাড়ী ধ্বংস হইয়াছিল, আর ৪০ লক্ষ বাড়ী জখম হইয়াছিল।

বৃটেনের আর্থিক ক্ষতি হইয়াছিল ভয়াবহ। জাতীয় ঋণের পরিমাণ ৮ হাজার কোটি ডলার থেকে বৃদ্ধি পাইয়া ১০ হাজার কোটি ডলার ছাড়াইয়া গিয়াছিল। আর বিদেশী ঋণের পরিমাণ ৬ গুণ বৃদ্ধি পাইয়া ১ হাজার ৩০০ কোটি ডলারে দাঁড়াইয়াছিল। আর সমুদ্র পারবর্তী বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিশাল মূলধনী কারবার নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

বৃটেনের মিত্র ও দোসর আমেরিকার শক্তি বৃদ্ধির তুলনায় ইংলণ্ড যেন রাহুগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

এখানে সোভিয়েত রাশিয়ার ক্ষতির পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। মার্কিন গ্রন্থকার তার বিশদ বিবরণ দিয়া বলিয়াছেন যে, একমাত্র ষ্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে রাশিয়ার যত লোক হারাইয়াছিল আমেরিকা সমগ্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমস্ত যুদ্ধেও তত লোক হারায় নাই! মার্শাল ষ্ট্যালিন নাকি একবার মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, মিত্রশক্তির জয়লাভে রাশিয়া দিয়াছে রক্ত, বৃটেন দিয়াছে সময় এবং আমেরিকা দিয়াছে মাল। (৩)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অবশ্য ফ্রান্সের ক্ষতি প্রথম মহাযুদ্ধের মত বিপর্যয়কর ছিল না— যদিও প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছিল।

ফ্রান্সের সশস্ত্র বাহিনীর ২ লক্ষ ১৫ হাজার ৬৮ জন নিহত এবং অন্যান্য মৃত ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৫৭৭ জন।

আহত ৪ লক্ষ এবং ১ লক্ষ ৪০ হাজার নিখোঁজ।

৩০ হাজার ফরাসী ফায়ারিং স্কোয়াডের মুখে প্রাণ দিয়াছিলেন।

১ লক্ষ ৮৮ হাজার অন্যান্য অ-সামরিক ব্যক্তি মারা পড়িয়াছিল।

১ লক্ষ ৫০ হাজার নির্বাসিত হইয়াছিল এবং যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে ৩৮ হাজার বন্দীশালায় মারা গিয়াছিল।

কলকারখানা, সেতু, রেলওয়ে ইঞ্জিন ও নৌবহর এবং বন্দর ইত্যাদির ক্ষতি হইয়াছিল অপরিমেয়।

পাঁচ বছর নাৎসী জার্মানীর বুটের তলায় থাকার ফলে ফ্রান্সের নৈতিক শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। চোর, জুয়াচোর, কালোবাজারের কারবারী ও বিশ্বাসঘাতকে দেশ ছাইয়া গিয়াছিল।

বহু স্ত্রীলোকের চরিত্র নষ্ট হইয়াছিল এবং যারা জার্মানদের শয্যাসঙ্গিনী হইয়াছিল, তাদেরকে শাস্তিস্বরূপ মাথা নেড়া করিয়া প্রকাশ্য রাস্তায় প্লাকার্ডসহ (আত্মদোষ স্বীকৃতির প্রমাণ হিসাবে) মার্চ করানো হইয়াছিল এবং জনসাধারণ তাদের মুখে থুতু দিয়াছিল। শত্রুর সহযোগী প্রায় ১ লক্ষ লোককে আদালত থেকে দণ্ড

(৩) দি ওয়ার, লুই স্নাইডার, পৃষ্ঠা ৬১২—১৫

দেওয়া হইয়াছিল এবং ১৯৪৫ সালের জুলাই-আগষ্ট মাসে ৫০০ বিশ্বাসঘাতককে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল।

ফ্রান্সের প্রথম মহাযুদ্ধের (ভার্দুন) হীরো মার্শাল পেঁতা, যিনি ভিসি সরকারের নায়ক এবং জার্মানীর সহযোগী ও আত্মসমর্পণকারী ছিলেন, তাঁরও মৃত্যুদণ্ড হইয়াছিল বিশ্বাসঘাতকতার জন্য। কিন্তু ৯০ বছরের বৃদ্ধকে প্রাণে বধ না করিয়া যাবজ্জীবন দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু কুখ্যাত পিয়ের লাভালকে রেহাই দেওয়া হইল না, বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে তাকে গুলি করিয়া মারা হইল।

এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষয়ক্ষতির কথা। আমেরিকার নৌ, বিমান ও স্থল সর্বপ্রকার সশস্ত্রবাহিনীতে মোট ১ কোটি ৬১ লক্ষ ১২ হাজার ৫৬৬ জন যোগ দিয়াছিল।

এর মধ্যে হতাহত হইয়াছিল ১০ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬৭৪ জন।

যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৯৮৬ জন। অন্যান্যভাবে মৃত ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৮৪২ জন। এবং আহত ৬ লক্ষ ৭০ হাজার ৮৪৬ জন।

ইউরোপ থেকে সুদূর প্রশান্ত মহাসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত সর্বত্র আমেরিকানরা মৃত্যুবরণ করিয়াছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও বে-সামরিক সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ ছিল ন্যূনপক্ষে ৩৫ হাজার কোটি ডলার।

কিন্তু জর্জ মার্শাল মন্তব্য করিয়াছেন যে, একজন সৈন্য রণক্ষেত্রে যে সার্ভিস দেয় গোটা জাতির পক্ষেও তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব নয়! (৪)

* * *

উপরে উদ্ধৃত সংখ্যাগুলি থেকে অন্ততঃ এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে, মানুষের ইতিহাসে এমন ভয়ঙ্কর নরঘাতন এবং অভাবনীয় পাশবিকতার উন্মত্ততা আর কখনও দেখা যায় নাই এবং এত বড় বিরামহীন যুদ্ধও আর কখনও ঘটে নাই। এই মহাযুদ্ধ চলিয়াছিল ২১৯১ দিন ধরিয়া। সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল জুকোভ তাঁর স্মৃতি কথায় মন্তব্য করিয়াছেন—'যুদ্ধের গোটা কালপর্ব জুড়ে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল ঋতুতেই বিরামহীন লড়াই চলেছিল।' এমন কি রাত্রিবেলা পর্যন্ত লালফৌজ লড়াই চালাইয়াছিল। কিন্তু আগে 'বিশেষ অবস্থায় ছাড়া' রাত্রিবেলা সাধারণতঃ রণক্রিয়া চালানো হইত না। ১৯৪৩-৪৫ কালপর্বে লালফৌজ যে বিরাট আক্রমণ অভিযান চালাইয়াছিল, তাতেই নৈশ রণক্রিয়ার পরিধি এত ব্যাপক হইয়াছিল। কিন্তু জার্মান-বাহিনী নৈশ লড়াই এড়াইয়া যাইতে চাহিত। (৫)

কিন্তু জার্মানীর মত জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমুন্নত একটা সভ্যজাতির পক্ষে এমন বর্বর যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া এবং হিটলারের পক্ষে সেই যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া কিভাবে সম্ভব হইল? আর হিটলারের মত এমন নিরঙ্কুশ এবং অপরিসীম ক্ষমতার ডিক্টেটারি (যা পৃথিবীর

---

(৪) পূর্বোদ্ধৃত পুস্তক, পৃষ্ঠা ৬১৬

(৫) মার্শাল জুকোভ প্রণীত 'স্মৃতিচারণ ও গভীর চিন্তন' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত—সোভিয়েত সমীক্ষা, ১৯৭৫, সংখ্যা ২২।

ইতিহাসে আগে কখনও দেখা যায় নাই) অর্জন এবং তার সর্বাত্মক প্রয়োগ কিভাবে সম্ভব হইয়াছিল ?—যে কোন চিন্তাশীল পাঠকের মনে এমন প্রশ্ন নিশ্চয়ই দেখা দিতে পারে। কারণ, যুদ্ধ মাত্রই বর্বর। কিন্তু সেই বর্বরতা এত চরম মাত্রায় উঠিয়াছিল কিভাবে ?

এই জটিল প্রশ্নটির উত্তর দিয়াছেন হিটলারেরই একজন দক্ষ এবং বিখ্যাত পার্শ্বচর ও সমরাস্ত্রের মন্ত্রী আলবার্ট স্পীয়ার (Albert Speer)—ন্যুরেমবার্গের বিচারালয়ে একমাত্র যিনি জার্মানীর এই যুদ্ধ ও যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে হিটলারসহ তাঁর সমস্ত সহকর্মীদেরকেই দায়ী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। পশ্চিম বার্লিনের স্পাডাউ কারাগারে বসিয়া তিনি যে স্মৃতিকথা লিখিয়াছেন, তাতে নাৎসী জার্মানীর বহু চাঞ্চল্যকর চিত্র তিনি উদ্ঘাটন করিয়াছেন। আধুনিক যুদ্ধ ও হিটলারের ডিক্টেটরি সম্পর্কে তিনি একজন অভিজ্ঞ বুদ্ধিজীবী ও যন্ত্রবিশারদরূপে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, এরজন্য মূলতঃ দায়ী যন্ত্রবিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার অবিশ্বাস্য অগ্রগতি ও উন্নতি। তিনি লিখিয়াছেন যে, একমাত্র তিনি নন, এমন ধারণা ও বিশ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন স্বয়ং মার্কিন সমরসচিব মিঃ হ্যারি এল ষ্টিমসন। ১৯৪৭ সালে ষ্টিমসন আমেরিকার বিখ্যাত সাময়িকপত্র "ফরেন এ্যাফায়ার্স" পত্রে লিখিয়াছিলেন :

"We must never forget, that under modern conditions of life, science and technology, all war has become greatly brutalized and that no one who joins in it, even in self-defence, can escape becoming also in a measure brutalized. Modern war can not be limited in its destructive method and the inevitable debasement of all participants .."

অর্থাৎ সহজ কথায় 'আধুনিক জীবনযাত্রার অবস্থায় বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার জন্য সমস্ত যুদ্ধই বর্বরতায় পরিণত হইতে বাধ্য। এমন কি, আত্মরক্ষার জন্য যাঁরা যোগ দিয়া থাকেন, তাঁদের পক্ষেও বর্বর না হইয়া উপায় নাই। আধুনিক যুদ্ধে ধ্বংসের উপায়গুলিকে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয় এবং এমন যুদ্ধে সমস্ত অংশগ্রহণকারীরই চারিত্রিক পতন অনিবার্য।'

মার্কিন সমরসচিবের এই মন্তব্য যে সত্য, তার প্রমাণ কেবল হিটলারী যুদ্ধ ও বন্দীশালার নৃশংসতা নয়, হিরোশিমা ও নাগাশাকির উপর স্বয়ং আমেরিকানদের পারমাণবিক বোমাবর্ষণ।...

হিটলারী ডিক্টেটরির সর্বগ্রাসিতা সম্পর্কে আলবার্ট স্পীয়ার যে সমস্ত মন্তব্য করিয়াছেন, সেগুলি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন :

Hitler's dictatorship was the first dictatorship of an industrial state in this age of modern technology, a dictatorship which employed to perfection the instruments of technology to dominate its own people......By means of such instruments of technology as the radio and public address systems, eighty million persons could be made subject to the will of one individual.

সহজ কথায়—'আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার যুগে হিটলার এমন একটি শ্রমশিল্পে উন্নত রাষ্ট্রের ডিক্টেটরি পাইয়াছিলেন, যে রাষ্ট্রের কারিগরি বিদ্যার সমস্ত যন্ত্রগুলি এই ডিক্টেটরিকে নিখুঁত নৈপুণ্যের মধ্যে প্রয়োগের সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং তাঁর নিজের জনগণের উপর এই যন্ত্রবিদ্যা নিরবচ্ছিন্ন প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল। ৮০ মিলিয়ন লোককে একটি মাত্র ব্যক্তির ইচ্ছাধীন রাখার জন্য আধুনিক কারিগরি বিদ্যার যন্ত্রগুলি, যেমন রেডিও এবং জনগণের নিকট ভাষণ দেওয়ার পদ্ধতি সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা হইয়াছিল।'

মিঃ স্পীয়ার আরও লিখিয়াছেন—'টেলিফোন, টেলিটাইপ ও রেডিও ব্যবস্থার মাধ্যমে একেবারে সর্বস্তরের—উচ্চতম থেকে নিম্নতম পর্যন্ত কর্মচারীদের নিকট সমস্ত হুকুম সোজাসুজি পৌঁছাইয়া দেওয়া যাইত এবং তারা বশম্বদের মত সেগুলি কার্যক্ষেত্রে পালন করিয়া যাইত। অন্যান্য হুকুমগুলিও এমন প্রত্যক্ষভাবেই অফিসার ও সৈনাপত্যের নিকট পৌঁছিত।'

'The instrument of technology made it possible to maintain a close watch over all citizens and to keep criminal operations shrowded in a high degree of secrecy……Dictatorships of the post needed assistants of high quality in the lower ranks of the leadership also—men who could think and act independently. The au'horitarian system in the age of technology can do without such men. …

The criminal events of those years were not only an outgrowth of Hitler's personality. The extent of the crimes was also due to the fact that Hitler was the first to be able to employ the implements of technology to multiply crime.' (৬)

অর্থাৎ প্রযুক্তিবিদ্যার যন্ত্রগুলির মাধ্যমে সমস্ত নাগরিকদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা এবং সমস্ত অপরাধজনক কার্যাবলী অত্যন্ত উঁচু স্তরের গোপনীয়তার মধ্যে কুয়াশাচ্ছন্ন করিয়া রাখা সম্ভব হইত। অতীতকালের একনায়কত্ব সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনার জন্য নেতৃত্বের নিম্নস্তরেও উচ্চগুণসম্পন্ন সহকারীর দরকার হইত—যে সহকারীরা স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কাজ করিতে সক্ষম। কিন্তু যন্ত্রবিদ্যার যুগে প্রভুত্বপরায়ণ রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পক্ষে এই ধরনের লোক ছাড়াও চলিতে পারে। …

'ওই বছরগুলির অপরাধজনক কার্যাবলী একমাত্র হিটলারের ব্যক্তিত্বের অতি-স্ফীতির জন্য ঘটে নাই। এই সমস্ত অপরাধের এই ব্যাপকতা ঘটিয়াছিল এই জন্য যে, হিটলারই প্রথম কারিগরি বিদ্যার যন্ত্রপাতিগুলিকে অজস্র অপরাধের মাত্রা বাড়াইবার জন্য সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।'

এইভাবে হিটলার আধুনিক যন্ত্রবিপ্লবকে বর্বরতা ও হত্যাকাণ্ডের বাহন করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং সেই সমস্ত পৈশাচিকতা অধিকাংশ জার্মান নর-নারীর কাছে

(৬) Inside the Third Reich—Albert Speer, Sphere Books Ltd, London, 1971, p. 692-693.

গোপন রাখিতেও পারিয়াছিলেন। কিন্তু জার্মান সমরনায়কদের অধিকাংশই এই বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন, একথা সত্য নয়। বরং তাদের অনেকেরই জ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছানুসারে এই সমস্ত পাশবিকতা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। যদিও অনেক জার্মান সেনাপতি যুদ্ধের পর তাঁদের আত্মস্মৃতিতে হিটলারের অপরাধকে লঘু করিয়া দেখাইতে কিংবা তাঁর দোষ স্খালন করিতে চাহিয়াছেন, অথবা হিটলারের হাতে অপমানিত বা অপসৃত সেনাপতিরা তাঁর প্রচুর নিন্দাও করিয়াছেন, তবু শীর্ষ সেনানায়কদের অনেকেই, যেমন মার্শাল গোয়েরিং, ফিল্ড মার্শাল কাইটেল, ফিল্ড মার্শাল ম্যানষ্টাইন, জেনারেল গুডেরিয়ান প্রভৃতি হিটলারকে অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী এবং অদ্বিতীয় জার্মান নেতা বলিয়া মনে করিতেন এবং জার্মানীর পতন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর প্রতি অন্ধভক্তি ও বিশ্বাস পোষণ করিতেন। হিটলারের আশ্চর্য স্মরণশক্তি, তাঁর অভূতপূর্ব বক্তৃতার মোহিনী মায়া, অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে তাঁর নিখুঁত জ্ঞান, সামরিক শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ইত্যাদি বহু বিষয়ে তাঁরা ফুয়েরারকে অনন্যসাধারণ মনে করিতেন। আর মনে করিতেন তাঁর চোখের ও ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ অনতিক্রম্য। (৭)

এছাড়া হিটলার কর্তৃক জার্মানীর রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর সমস্ত প্রকার প্রচারযন্ত্র—সংবাদপত্র, রেডিও ইত্যাদি থেকে শুরু করিয়া স্কুলের পাঠ্যপুস্তক পর্যন্ত সর্বত্র একদিকে কঠোর নিয়ন্ত্রণ (হিটলার-বিরোধী সমস্ত দল ও সংবাদ নিষিদ্ধকরণ) ও অন্যদিকে হিটলারের অজস্র স্তুতির বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল। গোয়েবলসের দপ্তর এ বিষয়ে ছিল অসাধারণ দক্ষ। ফলে, জার্মান জাতির কাছে হিটলার ইতিহাসের একজন সর্বোত্তম পুরুষ, জার্মান জাতির ভাগ্যনিয়ামক ও অভ্রান্ত ত্রাণকর্তা বলিয়া প্রতিভাত হইলেন এবং হিটলার নিজেও বিশ্বাস করিতেন যে, তিনিই বিধাতৃ নির্দিষ্ট জার্মানীর সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ধারকর্তা। এমন কি, তিনি কোমলহৃদয় নিরামিষাশী (কারণ জীবহত্যা সহ্য করিতে পারিতেন না!) ও ব্রহ্মচারী বলিয়া প্রচারিত হইলেন!

এভাবে একটা গোটা জাতিকে একটি মাত্র ব্যক্তির কুক্ষিগত ও বশংবদ করিয়া ইতিহাসের এক অভাবনীয় বিপর্যয় ডাকিয়া আনা হইল। (৮)

সুতরাং নাৎসী জার্মানীর এই সর্বগ্রাসী ডিক্টেটরির ইতিহাস থেকে সমস্ত দেশেরই শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত। কারণ, একা হিটলার নয়, ফুয়ারের অধিকাংশ ভক্ত ও সহকর্মীই ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত, ক্ষমতালোভী, নিষ্ঠুর ও পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত। আলবার্ট স্পীয়ার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, যখন জার্মান জাতিকে এক জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বে সর্বস্ব পণ ও ত্যাগ স্বীকার করিতে গোয়েবলসের দপ্তর নিপুণ প্রচারকার্য চালাইতেছিল, তখন হিটলার, হিমলার, গোয়েরিং প্রভৃতি জার্মানীর ভাগ্য বিধাতাগণ অসম্ভব আড়ম্বর ও বিলাসিতাপূর্ণ প্রাসাদোপম অট্টালিকা তৈরার করাইতে ছিলেন—

(৭) এই প্রসঙ্গে ফিল্ড মার্শাল ম্যানষ্টাইন প্রণীত Lost Victories (পৃষ্ঠা ২৭৪-৭৫), জেনারেল গুডেরিয়ান প্রণী· 'Panzer Leader' (ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ) এবং ন্যুরেমবার্গের আদালতের মামলায় গোয়েরিং ও কাইটেলের সাক্ষ্য স্মরণীয় বা দ্রষ্টব্য।

(৮) ডাক্টার সি ল্যাঙ্গার প্রণীত 'Tne Mind of Adolf Hitler' (The Secret Wartime Report) পুস্তক—Pan Books, 1974, London দ্রষ্টব্য।

যদিও যুদ্ধ চালাইবার উপযুক্ত মালমশলার অভাব ঘটিতে ছিল। কেউ কেউ বা রক্ষিতার জন্যও প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

স্পীয়ার এই সমস্ত ঘটনার উপর মন্তব্য করিয়াছেন :

' After only nine years of rule the leadership was so corrupt that even in the critical phase of the war it could not cut back on its luxurious style of living. For 'representational reasons' the leaders all needed big houses, hunting lodges, estates and palaces, many servants, a rich table, and a select wine cellar," (১)

যুদ্ধের দুর্দিনে এই সমস্ত অদ্ভুত বিলাসিতা ও আড়ম্বরপূর্ণ রাজসিক ব্যবস্থা ছাড়াও স্পীয়ার লিখিয়াছেন যে, দুর্নীতিপরায়ণ নাৎসী নেতারা যখন যেখানে ভ্রমণে যাইতেন সেখানেই নিজেদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার নাম করিয়া সাড়ে ষোলফুট পুরু কংক্রীটের ছাদ ও দেওয়ালের অসংখ্য শেলটার বা ভূগর্ভের আশ্রয় নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এজন্য অজস্র অর্থব্যয় ও অজস্র শ্রমিক নিয়োগ করিতে হইয়াছিল।..

* * *

বাহ্যত ফ্যাসিষ্ট শক্তিবর্গ যতই শক্তিশালী বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকুক না কেন, ভিতরে ভিতরে তাদের নৈতিক শক্তি (সামরিক ও বৈষয়িক শক্তি ছাড়াও) পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাদের নেতৃবর্গ দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অপরদিকে মিত্রপুঞ্জের মধ্যে রাজনৈতিক মতভেদ থাকিলেও তাদের মধ্যে এই ধরনের দুর্নীতি ও চারিত্রিক পতন ছিল না। বিশেষতঃ সোভিয়েত রাষ্ট্র তো মহান দেশপ্রেমের যুদ্ধে যেন অগ্নিশুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল এবং সেটা আরও সম্ভব হইয়াছিল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জন্য। যে ব্যবস্থার জন্য একটা গোটা জাতির 'নিহিত আত্মিক শক্তির' জাগরণ ঘটিয়াছিল—এই মন্তব্য করিয়াছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি মার্শাল জুকোভ, তাঁর "স্মৃতিচারণ" গ্রন্থে। তিনি লিখিয়াছেন :

'আমরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের জয়কে সোভিয়েত জনগণের জীবনে নক্ষত্রোজ্জ্বল মুহূর্ত বলে বর্ণনা করিতে পারি। ঐ বছরগুলিতে আমরা ইস্পাতদৃঢ় হয়ে উঠেছিলাম এবং বিরাট নৈতিক পুঁজি সঞ্চয় করেছিলাম।'

অবশ্য এজন্য সোভিয়েত ইউনিয়নকে অপরিমিত ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। আমেরিকার ভূখণ্ডে যখন একটিও বোমা পড়ে নাই কিংবা কোন কামানের গোলায় যখন একটি মাত্র শহরেরও ক্ষতি হয় নাই, তখন রাশিয়াকে ২ কোটি জীবন আহুতি দিতে এবং অসংখ্য শহর, জনপদ ও গ্রাম হারাইতে হইয়াছিল। আর জার্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকার মাত্র ১ লক্ষ ৫০ হাজার এবং গ্রেট বৃটেনের ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হইয়াছিল।

কিন্তু তৎসত্বেও মার্শাল জুকোভ হিটলার-বিরোধী কোয়ালিশনের উচ্চ প্রশংসা

(১) Inside the Third Reich, Albert Speer, p 302, 304

করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, সোভিয়েত জনগণ এই কোয়ালিশনের অন্যান্য সদস্যদের অবদানের কথা কখনও বিস্মৃত হন নাই (১০)

ইতিহাসের দিক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং যুগান্তকারী ঘটনা সম্ভবতঃ দুইটি। প্রথমতঃ পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ও পারমাণবিক যুগের উদ্বোধন এবং দ্বিতীয়তঃ হিটলার ও ফ্যাসিজম বিরোধী মহাজোট বা কোয়ালিশন, যার ফলে ফ্যাসিষ্ট শক্তিগুলির চূড়ান্ত পরাজয় কিংবা নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ।

যদিও পশ্চিমের মিত্রশক্তি মহলে সোভিয়েত বিরোধী এবং ফ্যাসিষ্ট পক্ষপাতী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর অভাব ছিল না, তথাপি জনসাধারণের ও বুদ্ধিজীবী মহলের অধিকাংশই ছিল ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধবাদী ও সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষপাতী। তাঁরা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ফ্যাসিষ্ট আগ্রাসন জয়লাভ করিলে কেবল সার্বভৌম স্বাধীনতাই বিপন্ন হইবে না, জাতীয় অস্তিত্বও বিপন্ন হইবে এবং জনগণ চির-দাসত্ব গ্রহণে বাধ্য হইবে। সুতরাং ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বৃটেন, আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়ার কিংবা চার্চিল-রুজভেল্ট-ষ্ট্যালিনের যে মহাজোট গড়িয়া উঠিল, তার মূলে ছিল জনসাধারণ, শ্রমিকশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রবল নৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ। তা ছাড়া ফ্যাসিষ্ট শক্তিপুঞ্জের পৃথিবীব্যাপী প্রভুত্ব স্থাপনের সামরিক দম্ভ তো ছিলই। অদৃষ্টের আরও পরিহাস এই যে, পশ্চিমের যে সমস্ত ধনিক ও রাজনৈতিক মহল সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে হিটলার ও ফ্যাসিজমকে তোষণ ও পোষণ করিতেছিলেন, তাঁদেরই দেশ হিটলার কর্তৃক সর্বাগ্রে আক্রান্ত হইল। জার্মানী চাহিয়াছিল আগে পশ্চিমী শক্তিবর্গকে খতম করিতে এবং তারপর সোভিয়েত রাশিয়াকে সংহারপূর্বক জাপানের সঙ্গে একত্রে সারা পৃথিবী করায়ত্ত করিতে। যখন জার্মানী সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করিল, তার আগেই প্রায় সারা ইউরোপ হিটলারের কবলে আসিয়া গেল এবং তারপর জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে ও এশিয়া খণ্ডে মার্কিন, বৃটিশ, ফরাসী ও ওলন্দাজ প্রভৃতি সাম্রাজ্য ও জাতীয় স্বার্থকে গ্রাস করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে আফ্রিকায় সুয়েজখাল পর্যন্ত ইতালীয়-জার্মান বাহিনীর অগ্রগতিতে মিশর ও মধ্যপ্রাচ্য হাতছাড়া হইবার উপক্রম হইল। অপরপক্ষে লাতিন আমেরিকায় জার্মান ফ্যাসিজমের অনুপ্রবেশ ও প্রভাব মার্কিন একচেটিয়া ধনিক-গোষ্ঠীকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। সোজা কথায় একদিকে পশ্চিমী শক্তিবর্গের জাতীয় স্বাধীনতা এবং অন্যদিকে তাদের ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বিষম অগ্নিপরীক্ষায় পড়িল। সুতরাং এই অবস্থায় সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত হাত মিলাইয়া সাধারণ শত্রু বা 'common enemy'কে প্রতিরোধ ও পরাজিত না করিয়া উপায় ছিল না। অতএব হিটলার বিরোধী কোয়ালিশনের অন্তর্গত দেশগুলিতে জনসাধারণ থেকে উপরের মহল পর্যন্ত প্রায় সর্বত্র ফ্যাসিষ্ট শত্রুকে পরাজিত করার অদম্য সঙ্কল্প দেখা দিল এবং বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে যেমন সামরিক ও রাজনৈতিক মৈত্রী ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হইল, তেমনি বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক

(১০) ঝুকোভের রচনা থেকে উদ্ধৃত—সোভিয়েত সমীক্ষা, ১৯৭৫, ২২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

চুক্তিও সম্পাদিত হইল। ফ্যাসীবিরোধী মহাজোটের অংশীদাররূপে ষ্ট্যালিন-চার্চিল-রুজভেল্ট কার্যতঃ বিশ্বনেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন এবং পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার দ্বারা ফ্যাসিষ্ট শক্তিপুঞ্জের পতন ঘটাইলেন। নাৎসী শক্তি-বর্গের এই পরাজয়ে কেবল মিত্রপক্ষের সৈন্য বাহিনীরই নয়, পার্টিজান বা গেরিলা যোদ্ধাদের অকুতোভয় সংগ্রাম, অপূর্ব ত্যাগস্বীকার এবং জনগণের নির্যাতন বরণও ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে। অবশ্য সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করা উচিত যে, জার্মান সৈন্য বাহিনীও যুদ্ধের দিক থেকে অপূর্ব দক্ষতা, বীরত্ব, ত্যাগস্বীকার এবং কষ্টসহিষ্ণুতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে। বিশেষতঃ যুদ্ধের গোড়ার দিকে এই সমস্ত গুণ এবং জার্মান সামরিক সংগঠনের উৎকর্ষ ও যুদ্ধক্ষেত্রের বেষ্টননীতি দুনিয়াব্যাপী যেমন নাটকীয় চমক সৃষ্টি করিয়াছিল—যদিও শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত বাহিনী যুদ্ধ-বিদ্যার দক্ষতায়, রণকৌশলের বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগে এবং রণনীতির বিস্ময়কর নৈপুণ্যে আর সামরিক অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদনে নাৎসী জার্মানীকে বহুদূর পিছনে ফেলিয়া গিয়াছিল। ষ্ট্যালিনগ্রাদ থেকে বার্লিন পর্যন্ত বহু ঐতিহাসিক যুদ্ধজয়ে সোভিয়েত বাহিনী ও সেনানীমণ্ডলী মার্শাল ষ্ট্যালিন ও মার্শাল জুকোভ ও অন্যান্য মার্শালদের নেতৃত্বে অবর্ণনীয় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অপরপক্ষে বৃটিশ সামরিক শক্তি উত্তর আফ্রিকায় এল. আলামিয়েনের যুদ্ধে এবং তার আগে বৃটেনের স্বদেশরক্ষার সংগ্রামে, আর মার্কিন বাহিনীর প্রশান্ত মহাসাগরে ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রশংসনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। বিশেষতঃ ইঙ্গ-মার্কিন মহল সমুদ্র পারবর্তী অভিযানগুলিতে অসাধারণ সংগঠনশক্তির ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। আর মার্কিন সরবরাহ-ব্যবস্থা সমুদ্র পারের সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া মিত্রপক্ষকে প্রভূত সহায়তা দিয়াছিল—যদিও বৃটিশ নৌশক্তি ফ্যাসিষ্ট আক্রমণে প্রচণ্ডভাবে ঘায়েল হইয়াছিল।

যদিও ফ্যাসিবিরোধী মহাজোটের সমবেত চেষ্টার ফলেই ফ্যাসিষ্ট শক্তিপুঞ্জের চরম পরাজয় ঘটিয়াছে, তবু নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মাত্রই স্বীকার করিবেন যে, এই মহাযুদ্ধে হিটলারী জার্মানী যেমন ছিল প্রধান শত্রু, তেমনি ষ্ট্যালিনের রাশিয়াই সেই শত্রুকে হনন করার মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। এই মহাযুদ্ধে রাশিয়ার দেশ-প্রেমের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তির প্রাধান্যও প্রমাণিত হইয়াছে এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সোভিয়েত রাশিয়া আমেরিকার সঙ্গে শীর্ষস্থানীয় শক্তির আসন দখল করিয়াছে।

আন্তর্জাতিক জগতে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। মিত্রশক্তির অন্যতম মুখ্য অংশীদাররূপে চীনও বৃহৎ শক্তির মর্যাদা লাভ করিয়াছে এবং মহাযুদ্ধের কল্যাণে কিংবা জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্বে মহাচীনেও কমিউনিষ্ট বিপ্লব সহজতর হইয়াছে। প্রভূত মার্কিন সাহায্য সত্ত্বেও চীনের গৃহযুদ্ধে জেনারেল চিয়াং কাইসেকের দুর্নীতি-দুষ্ট গবর্নমেণ্টের পরাজয় ও পতন ত্বরান্বিত হইয়াছিল।

কেবল চীনেই বিপ্লব ঘটে নাই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট শক্তিপুঞ্জের পরাজয়ের ফলে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ এবং ঔপনিবেশিকবাদেরও মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি সহ এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের পরাধীন দেশগুলির শৃঙ্খল ভাঙিয়া পড়িয়াছে এবং ভিয়েৎনাম তথা ইন্দোচীনে বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু রক্তপাত ও সংঘর্ষও প্রচুর হইয়াছে। যেমন, ১৯৪৭ সালে বৃটেনের সহিত আপোষে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের ফলে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে এবং ভারত দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ফলে স্বাধীন পাকিস্তানের উদ্ভব হইয়াছে।

* * *

একথা নিঃসন্দেহ যে, হিটলার-মুসোলিনী-তোজোর বিরুদ্ধে ষ্ট্যালিন চার্চিল-রুজভেল্টের মহামৈত্রী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তথাপি একথা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয় যে, এই মহামৈত্রী সত্ত্বেও কোন পক্ষই তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ বিসর্জন দেন নাই এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গ কমিউনিজমকেও প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। এই সমস্ত রাজনৈতিক মতবিরোধের জন্যই ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলিতে অনেক বিলম্ব (১৯৪৪ সালের মধ্যভাগ) হইয়াছিল এবং তার জন্য মহাযুদ্ধও অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। (অবশ্য কোন কোন সমালোচকের মতে রুজভেল্ট কর্তৃক ক্যাসাব্লাঙ্কা সম্মেলন থেকে অক্ষশক্তিবর্গের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ দাবী করার জন্যই জার্মানী ও জাপান শেষ পর্যন্ত লড়িয়াছিল। অন্যথা আরও আগে আত্মসমর্পণ ঘটিত। কিন্তু বিষয়টি বিতর্কমূলক এবং চার্চিলও এর সারবত্তা স্বীকার করিতেন না।)

মহাযুদ্ধ যতই উপসংহারের দিকে অগ্রসর হইতেছিল মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে রাজনৈতিক মতবিরোধও ততই তীব্র হইতেছিল এবং এপ্রিল মাসে রুজভেল্টের আকস্মিক মৃত্যুর পর এই বিরোধ কোয়ালিশনকে প্রায় ভাঙনের সীমানায় আনিয়া ফেলিয়াছিল। বিশেষভাবে পোল্যাণ্ড, বলকান রাজ্যগুলি, অষ্ট্রিয়া এবং জার্মানী নিয়া বিরোধের অন্ত ছিল না। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পূর্বদিকে জাপানকে নিয়াও রাশিয়ার সঙ্গে যথেষ্ট মন কষাকষি ও কূটনৈতিক চালবাজি দেখা দিয়াছিল। তথাপি জার্মানী ও জাপানের সরকারীভাবে আত্মসমর্পণের আগে মিত্রপক্ষের এই মহামৈত্রী অন্ততঃ বাহ্যতঃ কাগজ পত্রে অব্যাহত ছিল—যদিও মনে মনে তিন পক্ষের মধ্যে, এমন কি বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যেও কোন কোন সামরিক বিষয়ে (যেমন, ভূমধ্য-সাগর, পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানের বিরুদ্ধে অভিযানে) অত্যন্ত মতান্তর ছিল।

বলা বাহুল্য যে, তিন বিশ্বনেতার মধ্যে কিংবা কোয়ালিশনের তিন প্রধান অংশীদারদের মধ্যে উইনষ্টোন চার্চিল ছিলেন সাম্রাজ্যপ্রেমিক, তাঁর সমস্ত চেষ্টা ও লক্ষ্য ছিল ভারতসহ সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যকে বৃটিশ প্রভুত্বের অধীনে রাখা। এইজন্য সমস্ত রণনীতি ও রণকৌশল তিনি সেদিকে পরিচালনা করার জন্য তাঁর সর্বপ্রকার কূটনৈতিক ধূর্ততা, অপূর্ব বাগ্মিতা এবং সামরিক বিষ্ণার জ্ঞান সেদিকে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁর পাল্টা দুর্ধর্ষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং বজ্রকঠোর সঙ্কল্পের অধিকারী ছিলেন ষ্ট্যালিন—সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হইতে দিতে কিংবা ফ্যাসিজমকে কোন করুণা দেখাইতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। একজন্যই

বলকান অঞ্চল ও পূর্ব ইউরোপ নিয়া রাশিয়ার সঙ্গে এত বিরোধ গিয়াছে। কিন্তু যদি কোন প্রস্তাব ষ্ট্যালিনের বিবেচনায় ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত মনে হইত, তবে মার্কসবাদে তাঁর অটল বিশ্বাস সত্ত্বেও তিনি চার্চিল-রুজভেল্ট বা পশ্চিমী মিত্রদের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিতেন না এবং মিত্রপক্ষের বিপদের দিনে (১৯৪৪ ৪৫ সালের শীতকালে) নিজের অসুবিধা সত্ত্বেও আগাইয় যাইতে পিছ-পা হইতেন না।

এই তিন বিশ্বনেতার মধ্যে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ছিলেন সর্বাপেক্ষা মার্জিত, শিষ্টাচারসম্পন্ন এবং সুবিবেচক সম্ভবতঃ সেদিনের বুর্জোয়া আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ 'জাতক' ছিলেন রুজভেল্ট। মহাযুদ্ধের ব্যাপকতা ও সঙ্কটের জন্য বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনষ্টোন চার্চিলের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা ও অন্তরঙ্গতা গড়িয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু মার্শাল ষ্ট্যালিনের প্রতি তাঁর মনে মনে গভীর অনুরাগ ছিল। এমন কি, তিনি মনে করিতেন যে, চার্চিলের চেয়ে তিনি যদি একা ষ্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেন (যেমন, তেহরান সম্মেলনে) তবে সমস্যার মীমাংসাগুলি অনেক বেশী সহজ ও ফলপ্রসূ হইতে পারে। এজন্য ষ্ট্যালিনের সঙ্গে একা সাক্ষাৎ করিতে তিনি খুব উদ্‌গ্রীব ছিলেন এবং ষ্ট্যালিনও চার্চিলের চেয়ে রুজভেল্টকে বেশী পছন্দ করিতেন। এর মূল কারণ ছিল এই যে, রুজভেল্ট উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন না, অধিকন্তু যুদ্ধের বিরোধী এবং বিশ্বশান্তির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ষ্ট্যালিন তথা সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে যদি সদ্ভাব ও সখ্যতা বজায় রাখা যায়, তবে মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বিশ্বশান্তি রক্ষা করা সহজতর ও অধিকতর বাস্তবতাসম্মত হইবে। এজন্য মিত্রশক্তিবর্গকে নিয়া যেমন তিনি ইউনাইটেড নেশন্স গঠনে উদ্যোগী ছিলেন, তেমনি ষ্ট্যালিনের সঙ্গে বন্ধুতা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে পূর্ব ইউরোপ বা বলকান সম্পর্কে রাশিয়াকে কিছু 'কনশেসন' দিতেও তাঁর আপত্তি ছিল না। ইয়াল্টা সম্মেলনে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা সম্পর্কে ষ্ট্যালিনের সঙ্গে তাঁর "গোপন চুক্তি" পরবর্তীকালে আমেরিকায় তীব্র সমালোচনার কারণ হইয়াছিল—যেমন সমালোচনা হইয়াছিল পূর্ব ইউরোপীয় ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়া। কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও বলা যাইতে পারে যে, রুজভেল্ট ও ষ্ট্যালিনের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর শান্তি রক্ষা বিষয়ে কল্যাণের দ্যোতক ছিল। কিন্তু রুজভেল্টের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর পর আমেরিকায় ট্রুম্যান এবং বৃটেনে চার্চিলের সোভিয়েত বিদ্বেষ ও বিরোধীতাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে ক্রমাগত ইয়াল্টা ও পটসড্যামের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ করিতে লাগিলেন। সুতরাং মহাযুদ্ধের পরবর্তী কাল থেকেই ঠাণ্ডা লড়াই বা 'Cold War'-এর ঝাপ্টা শুরু হইয়াছিল।

তথাপি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে চার্চিল-রুজভেল্ট-ষ্ট্যালিনের মহামিলন ও মহাজোট যে অবিস্মরণীয় অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে, আগামী শতাব্দী কাল পর্যন্ত তা পাঠকদের চিত্তে গভীর রেখাপাত করিবে।

কিন্তু তবু প্রশ্ন উঠিতে পারে—এই কোয়ালিশন টিকিল না কেন? এর জবাবও একজন মার্কিন গ্রন্থকারের রচনা থেকে দেওয়া যাইতে পারে। অবশ্য এই লেখক

সোভিয়েত পক্ষপাতী নন। তিনি (উইলিউ এল নিউম্যান) লিখিয়াছিলেন যে, ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আদৌ নতুন নয়, যখন বিপদের দিনে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে কোয়ালিশন গঠিত হইয়াছিল, কিন্তু বিপদ কাটিয়া যাওয়ার পর সেই কোয়ালিশনের অংশীদাররাই পরস্পরের মাথা কাটিতে প্রায় উদ্যত হইয়াছিল :

"The problems of coalitions are not new. Produced by fear of a common enemy, wartime unity has frequently turned to hostility and even warfare when that enemy is no longer dangerous "A drowning man graps at a serpent" said a nineteenth century Ottoman Sultan defending his alliance with his ancient Russian enemy in the face of an Egyptian invader. But when the drowning man succeeds in being rescued, he chooses his associates with care and may even join a crusade against serpents.' (১১)

অতএব মিত্রশক্তির বা সোভিয়েত-বৃটিশ-মার্কিন মহামৈত্রী ভাঙিয়া যাওয়া ইতিহাসে কোন অঘটন ব্যাপার নয়। কিন্তু ভবিষ্যতের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যাপার। কারণ, মহাযুদ্ধ অবসানের গত ৩০।৩২ বছরের মধ্যে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে পারমাণবিক ও অন্যান্য প্রলয়ঙ্কর অস্ত্র নির্মান ও গুদামজাত করার যে ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতা দেখা দিয়াছে, পৃথিবীর সমস্ত চিন্তাশী ও শান্তিকামী ব্যক্তি সে জন্য নিদারুণ উৎকণ্ঠিত। সমরাস্ত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা এমন স্তরে পৌঁছিয়াছে এবং কল্পনাতীত বিস্ফোরণ শক্তিসম্পন্ন এত বিভিন্ন মারণাস্ত্র তৈয়ার হইতেছে যে, তৃতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হইলে সমগ্র মনুষ্যজাতি, এমন কি সমগ্র জীবজগৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে। তবে, সম্ভবতঃ একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, সেই মহাশ্মশানে কাঁদিবার কিংবা 'বংশে প্রদীপ জ্বালিবার' মত কেউ আর বাঁচিয়া থাকিবে না! সুতরাং সেই ভয়ঙ্কর পরিণাম থেকে সমগ্র সভ্যতা ও সমগ্র মনুষ্যজাতিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর সর্বত্র সমস্ত দেশের জনগণের উচিত যুদ্ধ ও আগ্রাসন নিবারণ এবং বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব রক্ষা করার জন্য নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা করা।

---

(১১) After Victory—Willian L. Neumann, Harpor-Row, New York, 1969. p. 188

সমাপ্ত

মহাযুদ্ধের দিনপঞ্জী

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী কয়েকটি ঐতিহাসিক তারিখ

১৯১৪

৩ আগষ্ট প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ।
—জার্মানী কর্তৃক বেলজিয়ম আক্রমণ।

১৯১৮

১১ নভেম্বর জার্মানীর পরাজয় ও যুদ্ধ বিরতির চুক্তি স্বাক্ষর।

১৯১৯

২৮ জুন জার্মানীর সহিত ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষর।

১৯২১

২৮ জুলাই হিটলার ন্যাশনাল সোসিয়েলিষ্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টির প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত।

১৯২২

২৬ অক্টোবর ফ্যাসিষ্ট মুসোলিনীর রোম 'অভিযান'।

১৯২৩

১১ জানুয়ারী ফ্রান্স ও বেলজিয়ম কর্তৃক জার্মানীর রুড় অঞ্চল দখল।

১৯২৪

১ ফেব্রুয়ারী বৃটেন কর্তৃক সোভিয়েত গবর্নমেণ্টকে স্বীকৃতি দান।

১৯২৭

২৩ অক্টোবর ষ্ট্যালিন কর্তৃক ট্রটস্কি ও জিনোভিয়েফের বহিষ্কার।

১৯২৯

২৩ অক্টোবর ওয়াল ষ্ট্রীট ষ্টক মার্কেটের পতন। পৃথিবী ব্যাপী বাজার মন্দার শুরু।

১৯৩০

২২ এপ্রিল জাপান, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নৌ-চুক্তি।
৩০ জুন রাইনল্যাণ্ড পরিত্যাগ।

১৯৩১

১৯ সেপ্টেম্বর জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ।
২১ সেপ্টেম্বর বৃটেনের স্বর্ণমান পরিত্যাগ।

১৯৩২

২৫ ফেব্রুয়ারী হিটলার কর্তৃক জার্মানীর নাগরিকত্ব লাভ।
৮ নভেম্বর রুজভেল্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত।

১৯৩৩

৩০ জানুয়ারী হিটলার জার্মানীর চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত।
২৭ ফেব্রুয়ারী—রাইখষ্ট্যাগে অগ্নিকাণ্ড। কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে ত্রাস সৃষ্টি। বিরোধীদের দমন আরম্ভ।

২৮ ফেব্রুয়ারী—ভেইমার সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলি জরুরী অবস্থার অজুহাতে স্থগিত।

১৬ মার্চ—গোয়েবেলস্ প্রোপাগাণ্ডা মন্ত্রী নিযুক্ত।

২১ মার্চ—জাপান কর্তৃক লীগ অব্ নেশন্স পরিত্যাগ ঘোষণা।

১লা এপ্রিল—ইহুদীদের বিরুদ্ধে জাতিগত ভাবে বর্জন আন্দোলন আরম্ভ।

১৪ অক্টোবর—হিটলার কর্তৃক জার্মানীর বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ পরিত্যাগ ঘোষণা।

২৪ নভেম্বর—সমস্ত বিরোধীদলকে টেরোরিজমের দ্বারা দমনের অবাধ অধিকার অর্পণ পুলিশের বড় কর্তা হিমলারের উপর।

১৯৩৪

২৬ জানুয়ারী—জার্মানী ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে ১০ বছরের জন্য অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত।

৩০ জুন—হিটলারের 'রক্তস্নান'—ক্যাপ্টেন রোয়েম প্রমুখ ঝটিকাবাহিনীর প্রধানগণকে ও অন্যান্য পদস্থ জার্মানদেরকে হত্যা।

১৯৩৪

২৫ জুলাই—অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর ডলফাসকে হত্যা।

২ আগষ্ট—প্রেসিডেণ্ট ফন্ মার্শাল হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যু।

হিটলার কর্তৃক নিজেকে জার্মানীর রাষ্ট্রপতিরূপে ঘোষণা।

১৮ সেপ্টেম্বর—সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক বিশ্বরাষ্ট্র সংঘে যোগদান।

১৯৩৫

১৬ মার্চ—জার্মানী কর্তৃক ভার্সাই-সন্ধিভঙ্গপূর্বক বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি প্রবর্তন।

১৮ জুন—বৃটেনের সহিত জার্মানীর নৌ-চুক্তি।

৩ অক্টোবর—মুসোলিনী কর্তৃক আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) আক্রমণ।

১৯৩৬

৭ মার্চ—হিটলার কর্তৃক লোকার্নো চুক্তি বাতিল এবং জার্মান সৈন্যের রাইনল্যাণ্ড দখল।

১১ জুলাই—জার্মানী কর্তৃক অস্ট্রিয়ার সার্বভৌমত্ব স্বীকার এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি।

১৭ জুলাই—স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কো কর্তৃক গৃহযুদ্ধ আরম্ভ।

২৫-২৭ অক্টোবর—ইতালীয় জার্মান অক্ষশক্তি চুক্তি ঘোষণা।

১৮ নভেম্বর—জার্মানী ও ইটালী কর্তৃক ফ্রাঙ্কোর সামরিক জুন্টাকে স্পেনের গবর্নমেণ্ট হিসাবে স্বীকৃত।

২৫ নভেম্বর—জাপানের সঙ্গে জার্মানীর এ্যান্টি-কোমিণ্টার্ন চুক্তি স্বাক্ষর।

[১৯৩৬-১৯৩৭ ষ্ট্যালিন কর্তৃক রাশিয়ায় টেরর সৃষ্টি এবং অসংখ্য কমিউনিষ্ট কর্মী, নেতা ও সমর নেতাদের 'বিচার' ও প্রাণদণ্ড।]

১৯৩৭

১৭ ফেব্রুয়ারী—বৃটিশ অস্ত্রসজ্জার পরিকল্পনা।

৭ জুলাই—পিপিংয়ের মার্কো পলো ব্রীজে চীন-জাপানের সংঘর্ষের ছুতায় ২১ জুলাই থেকে যুদ্ধারম্ভ।

৭ সেপ্টেম্বর—ভার্সাই সন্ধি মৃত বলিয়া হিটলারের ঘোষণা।

১৩ অক্টোবর—বেলজিয়মের ভৌমিক অক্ষুণ্ণতা বজায় রাখার জন্য জার্মানীর প্রতিশ্রুতি।

৫ নভেম্বর—হিটলার কর্তৃক উচ্চতম নেতাদের গোপন বৈঠকে ইউরোপে জোর-পূর্বক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা।

৬ নভেম্বর—কমিণ্টার্ন বিরোধী চুক্তিতে ইতালীর যোগদান।

১১ ডিসেম্বর—ইতালী কর্তৃক বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ পরিত্যাগ।

১৯৩৮

৪ ফেব্রুয়ারী—হিটলার কর্তৃক জার্মান হাই কমাণ্ডের রদবদল।

১২ ফেব্রুয়ারী—অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর সুশনিগকে বার্সেটসগ্যাডেনে আনয়ন ও চরমপত্র দান।

১৫ ফেব্রুয়ারী—অষ্ট্রিয়ার বশ্যতা স্বীকার।

১২ মার্চ—অষ্ট্রিয়াকে জার্মান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং হিটলারী বাহিনী কর্তৃক অষ্ট্রিয়া দখল।

১৭ মার্চ—নাৎসী আগ্রাসনে বাধা দেওয়ার জন্য সোভিয়েত কর্তৃক সম্মেলনের প্রস্তাব।

২৪ এপ্রিল—চেকোশ্লভাকিয়ার সুদেতেন জার্মানদের নেতা হেনলেইন কর্তৃক সুদেতেন জার্মানদের স্বায়ত্ত শাসন দাবী।

১৫ সেপ্টেম্বর—চেম্বারলেনের বিমানযোগে বার্সেটসগ্যাডেন গমন, হেনলেইন কর্তৃক সুদেতেন ল্যাণ্ড জার্মানীর সঙ্গে মিলনের দাবী।

২২ সেপ্টেম্বর—চেম্বারলেন দ্বিতীয় বার হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গডেসবার্গে উড়িয়া গেলেন।

২৫শে সেপ্টেম্বর—সমগ্র যন্ত্রপাতি ও কারখানাসহ সুদেতেন প্রদেশ জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করার দাবী চেকোশ্লভাকিয়া কর্তৃক অগ্রাহ্য।

২৬শে সেপ্টেম্বর—প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট কর্তৃক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য হিটলার ও প্রেসিডেণ্ট বেনেসের নিকট আবেদন।

২৯-৩০ সেপ্টেম্বর—মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষর। হিটলার, মুসোলিনী, চেম্বারলেন, দালাদিয়ের একত্রে মিলে চেকোশ্লভাকিয়াকে চাপ দিলেন জার্মানীকে সুদেতেনল্যাণ্ড অর্পণের জন্য। মিউনিক চুক্তির নিকট চেকোশ্লভাকিয়ার নতি স্বীকার।

১ অক্টোবর—জার্মান সৈন্যদের সুদেতেনল্যাণ্ড প্রবেশ ও চেকোশ্লভাকিয়া খণ্ডীকরণ।

১২ নভেম্বর—জার্মানীতে ইহুদীবিরোধী ভয়ানক কড়া আইন ও নিষেধবিধি প্রবর্তন এবং ইহুদীদের উপর নির্যাতন।

১৯৩৯

১০ মার্চ—মিউনিকের পর ষ্ট্যালিন কর্তৃক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা।

১৫ মার্চ —চেকোশ্লভাকিয়া আক্রান্ত ও জার্মান সৈন্যদের প্রাগে প্রবেশ।

১৬ মার্চ—বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া হিটলার কর্তৃক জার্মানীর আশ্রিত রাজ্যে পরিণত।

শ্লোভাকিয়াও জার্মানীর অধীন গেল।

২০ মার্চ—নাৎসী আগ্রাসন প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গের নিকট সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব।

২১ মার্চ—ফ্রাঙ্কোর স্পেন কমিণ্টার্ন বিরোধী প্যাক্টে যোগ দিল।

২৮ মার্চ— স্পেনের গৃহযুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কো কর্তৃক রাজধানী মাদ্রিদ দখল।

৩১শে মার্চ বৃটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক পোল্যাণ্ডের পূর্ণ স্বাধীনতার গ্যারেণ্টি দান।

৭ এপ্রিল—ইতালী কর্তৃক আলবানিয়া দখল।

১৪ এপ্রিল - প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কর্তৃক হিটলার ও মুসোলিনীর নিকট একটি ব্যক্তিগত আবেদন প্রেরণ অপরের দেশ আক্রমণ না করার জন্য।

১৭ এপ্রিল—লিটভিনোফের শান্তি পরিকল্পনা চেম্বারলেন কর্তৃক অগ্রাহ্য।

২৮ এপ্রিল হিটলার কর্তৃক পোলিশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি বাতিল।

৪ মে—লিটভিনোফের স্থলে মলোটোভ সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত।

২২ মে—জার্মানী ও ইতালীর মধ্যে সামরিক মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষর।

১২ জুন—রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনার জন্য লণ্ডন থেকে মিঃ ষ্ট্র্যাংয়ের মস্কো যাত্রা।

৯ জুলাই—রাশিয়ার সঙ্গে বৃটেনের সামরিক মৈত্রী স্থাপনের জন্য চার্চিল পুনরায় জোর দিলেন।

৫ আগষ্ট—সোভিয়েতের অনুরোধে ইউরোপে শান্তিরক্ষা ও আগ্রাসনে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্য একটি ইঙ্গ-ফরাসী মিলিটারি মিশনের মস্কো যাত্রা।

ইঙ্গ-ফরাসী-রুশ আলোচনার অতি মন্থর গতি।

১০ আগষ্ট—হিটলার কর্তৃক জার্মানীকে ডানজিগ ফেরৎ দেওয়ার জন্য পোল্যাণ্ডের নিকট দাবী।

২০ আগষ্ট—ষ্ট্যালিনের নিকট হিটলারের টেলিগ্রাম।

২২ আগষ্ট—ইঙ্গ-ফরাসী কর্তৃক পোল্যাণ্ডকে প্রতিশ্রুতি দানের পুনরাবৃত্তি
—চেম্বারলেন কর্তৃক পোলিশ বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার জন্য হিটলারের নিকট আবেদন।

২৩ আগষ্ট—সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণচুক্তি মস্কোতে স্বাক্ষরিত।
(জার্মানী কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হইলে রাশিয়াও একটা অংশ দখল করিবে, এই মর্মে এক গোপন চুক্তি।)
২৪ আগষ্ট—প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কর্তৃক হিটলারের নিকট পুনরায় শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আবেদন।
৩০ আগষ্ট—রিবেণ্ট্রপ কর্তৃক পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জার্মানীর দাবীর পুনরাবৃত্তি-করণ— বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের নিকট।
৩১ আগষ্ট—পোলিশ সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য হিটলারের নিকট পোলিশ রাষ্ট্রদূতের সম্মতি জ্ঞাপন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

১৯৩৯

১ সেপ্টেম্বর—জার্মানী কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণ।
৩ সেপ্টেম্বর—বৃটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।
১-৯ সেপ্টেম্বর—জার্মান সৈন্যদের কবলে পশ্চিম পোল্যাণ্ড।
১৭ সেপ্টেম্বর—জার্মানদের ব্রেষ্ট-লিটোভস্ক প্রবেশ এবং রাশিয়ান সৈন্যদের পূর্ব পোল্যাণ্ড আক্রমন।
২৮ সেপ্টেম্বর—ওয়রশ'র আত্মসমর্পণ।
রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে পোল্যাণ্ডর পার্টিশ'ন।
১৪ অক্টোবর—স্কাপাফ্লোতে বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ রয়েল ওক্ নিমজ্জিত।
৩০ নভেম্বর—রাশিয়া কর্তৃক ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ।
১৩ ডিসেম্বর—জার্মান পকেট ব্যাটলশিপ্ গ্রাফ স্পীর রোমাঞ্চকর নৌযুদ্ধ (দক্ষিণ আমেরিকা)। এবং
১৭ ডিসেম্বর মণ্টেভিডো বন্দরে আত্মনিমজ্জন ও ক্যাপ্টেন ল্যাংসডর্কে'র আত্মহত্যা।

১৯৪০

১২ মার্চ—রাশিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর।
৯ এপ্রিল—নাৎসী জার্মানীর ডেনমার্ক ও নরওয়ে আক্রমণ।
২ মে—মিত্রপক্ষের নামসস্ পরিত্যাগ।
১০ মে—জার্মানী কর্তৃক হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও লাক্সেমবুর্গ আক্রমণ।
—বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের পদত্যাগ।
—বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী পদে উইনষ্টোন চার্চিল।
১২ মে—জার্মান বাহিনীর ফ্রান্সের সীমা অতিক্রম।
১৫ মে—ওলন্দাজ (ডাচ) বাহিনীর আত্মসমর্পণ।
১৬ মে—সেডানে ফরাসী ব্যূহভঙ্গ এবং জার্মানদের দ্রুত অগ্রগতি।
২৮ মে—বেলজিয়মের রাজা লিওপোল্ডের আত্মসমর্পণ।

২৬ মে-৪ জুন—ডানকার্ক থেকে বৃটিশ বাহিনীর পরিত্রাণ ও পলায়ন।
১০ জুন—মুসোলিনী কর্তৃক বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।
১৪ জুন—জার্মান বাহিনীর অরক্ষিত প্যারিসে প্রবেশ।
১৭ জুন পেতাঁ কর্তৃক ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা এবং ২২ জুন স্বাক্ষর।
২২ জুন—কম্পেইন অরণ্যে ফ্রান্স ও জার্মানী কর্তৃক যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষর।
১৭-২৩ জুন—রাশিয়া কর্তৃক বাল্টিক রাজ্যগুলি দখল।
২৭-৩০ জুন রাশিয়া কর্তৃক বেসারাবিয়া এবং উত্তর বাকুভিনা দখল।
৩ জুলাই—ওরান বন্দরে বৃটিশ কর্তৃক ফরাসী বৃহৎ যুদ্ধ জাহাজসমূহ আক্রমণ।
১০ জুলাই—বৃটেনের বিরুদ্ধে জার্মান বিমান অভিযান বা 'ব্যাটল অব্ বৃটেন' আরম্ভ।
৩ সেপ্টেম্বর—রাজা ক্যারল কর্তৃক রুমানিয়ার সিংহাসন ত্যাগ।
৭ সেপ্টেম্বর—লণ্ডনের বিরুদ্ধে জার্মানীর প্রথম ব্যাপক বিমান অভিযান। জার্মানী কর্তৃক রুমানিয়ার তৈলখনি দখল।
১৩-১৬ সেপ্টেম্বর—ইতালীয় বাহিনীর মিশর সীমান্ত অতিক্রম এবং সিদিবারানী দখল।
২৭ সেপ্টেম্বর—জার্মানী-ইতালী-জাপানের মধ্যে দশ বছরের জন্য ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর।
২৮ অক্টোবর—ইতালীর গ্রীস আক্রমণ।
১১ নভেম্বর—টরেন্টো বন্দরে বৃটিশ আক্রমণে ইতালীয় নৌ বহর প্রচণ্ড রকমে পঙ্গু।
১২-১৪ নভেম্বর—মলোটোভ কর্তৃক বার্লিন পরিদর্শন।
১৪-১৬ নভেম্বর—কভেন্ট্রিতে জার্মান বিমান আক্রমণ।
৯ ডিসেম্বর—উত্তর আফ্রিকায় অষ্টম বাহিনীর আক্রমণ শুরু।
১৮ ডিসেম্বর—হিটলার কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের জন্য বার্বারোসা পরিকল্পনা চূড়ান্ত অনুমোদন।

১৯৪১

৩ জানুয়ারী—উত্তর আফ্রিকায় ইতালীয়দের ব র্দিয়া পরিত্যাগ।
৬ জানুয়ারী—প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কর্তৃক 'চতুর্বিধ স্বাধীনতা' ঘোষণা।
১৮ জানুয়ারী—গভীর রাত্রে ছদ্মবেশে সুভাষচন্দ্র বসুর কলিকাতা ত্যাগ এবং কাবুল ও মস্কো হইয়া মার্চ মাসে বার্লিনে উপস্থিতি।
৩১ জানুয়ারী—অষ্টম আর্মির বেনগাজী অভিযান ও তব্রুক বন্দর দখল।
৫ ফেব্রুয়ারী—বেনগাজী বন্দর দখল।
১১ মার্চ—রুজভেল্ট কর্তৃক লেণ্ড লীজ (ঋণ-ইজারা) বিল স্বাক্ষর।
২৭ মার্চ—যুগোশ্লাভিয়ায় বিপ্লব।
২৮ মার্চ—মাতাপান অন্তরীপের যুদ্ধ।
৩১ মার্চ—উত্তর আফ্রিকায় জার্মানীর পাল্টা-আক্রমণ আরম্ভ।

৫ এপ্রিল—সোভিয়েত-যুগোস্লাভ অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর।
৬ এপ্রিল—জার্মানী কর্তৃক গ্রীস ও যুগোস্লাভিয়া আক্রমণ।
—গ্রীসে বৃটিশ কর্তৃক ৬০ হাজার সৈন্য প্রেরণ।
৭ এপ্রিল—বৃটিশ পক্ষের বেন্‌গাজী পরিত্যাগ।
১৩ এপ্রিল—সোভিয়েত-জাপান আক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত।
—জার্মানদের হাতে তোব্রুক বেষ্টিত এবং বার্দিয়া পুনর্দখল।
২২ এপ্রিল—বৃটিশ কর্তৃক গ্রীস পরিত্যাগ আরম্ভ।
৬ মে—সোভিয়েত সরকারের প্রধানের পদে ষ্ট্যালিন, মলোটোভ পররাষ্ট্র মন্ত্রী।
১০ মে—রুডলফ হেস কর্তৃক স্কটল্যাণ্ডে অবতরণ।
২০ মে—জার্মানী কর্তৃক ক্রীট দ্বীপ আক্রমণ।
২৮ মে—২ জুন—বৃটেনের ক্রীট দ্বীপ পরিত্যাগ।
৩১ মে—বৃটিশ কর্তৃক ইরাকে বিদ্রোহ দমন (২রা থেকে আরম্ভ)।
৮ জুন—মিত্র বাহিনীর সিরিয়া প্রবেশ।
১৪ জুন—জার্মানী কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণ আসন্ন—তাস কর্তৃক বিশেষ ইস্তাহারে অস্বীকার।
২২ জুন—জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ।
২৮ জুন—মিনস্ক, লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া ও পশ্চিম উক্রাইন জার্মানীর দখলে।
৩ জুলাই—ষ্ট্যালিন কর্তৃক সোভিয়েত জনগণের নিকট বেতার বক্তৃতা।
১২ জুলাই—বৃটিশ-সোভিয়েত পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষর।
১৬ জুলাই—মস্কোর অভিমুখে জার্মানদের স্মলেনস্ক শহর দখল।
৩০ জুলাই—রুজভেল্টের প্রতিনিধি হ্যারি হপকিন্সের মস্কো উপস্থিতি।
১৪ আগষ্ট—অতলান্তিক সনদে স্বাক্ষর।
—রুজভেল্ট-চার্চিল সমুদ্রবক্ষে মিলন ও যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ঘোষণা।
১৭ আগষ্ট—জার্মানদের উক্রাইনে অগ্রগতি ও নিপ্রোপেট্রোভস্ক দখল।
২৫ আগষ্ট—বৃটিশ ও রুশ বাহিনীর ইরান দখল।
৩০ আগষ্ট—লেনিনগ্রাদের শেষ রেলপথের সংযোগ জার্মানীর দখলে।
৮ সেপ্টেম্বর—ভূমিপথে লেনিনগ্রাদ সম্পূর্ণ বেষ্টিত।
১৭ সেপ্টেম্বর—কিয়েভ জার্মানীর দখলে।
—বিশাল রুশবাহিনী বেষ্টিত।
২৯ সেপ্টেম্বর—মস্কোতে বীভারব্রুক ও হ্যারিম্যান-এর উপস্থিতি।
৩০ সেপ্টেম্বর—জার্মানীর মস্কো আক্রমণ আরম্ভ।
৬-১২ অক্টোবর—মস্কোর পশ্চিমে লালফৌজের বৃহৎ অংশ বেষ্টিত।
১১ অক্টোবর—জেনারেল হিডেকি তোজো জাপানের প্রধানমন্ত্রী পদে।
১৪-১৬ অক্টোবর—মস্কোর দিকে জার্মানদের আরও অগ্রগতি।
১৬ অক্টোবর—মস্কোতে নাগরিকদের মধ্যে ত্রাস।
—জার্মান-রুমেনীয় বাহিনী কর্তৃক ওডেসা বন্দর দখল।

২০ অক্টোবর—মস্কোতে অবরোধ ঘোষণা।

২৭ অক্টোবর—জার্মানদের দখলে খারকোভ

২৫ অক্টোবর—মস্কোতে জার্মানীর প্রথম অভিযান ব্যর্থ।

৩০ অক্টোবর—সেবাস্তোপোল দুর্গের ৯ মাস ব্যাপী অবরোধ আরম্ভ।

৬-৭ নভেম্বর—জাতীয়তাবাদের উদ্দীপনামূলক ষ্ট্যালিনের 'পবিত্র রাশিয়া' সংক্রান্ত ২টি বক্তৃতা।

৯ নভেম্বর—লেনিনগ্রাদ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন

১২ নভেম্বর—বৃটেনের সুবৃহৎ যুদ্ধজাহাজ আর্ক রয়েল নিমজ্জিত।

১৬ নভেম্বর—মস্কোর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় জার্মান অভিযান আরম্ভ।

১৮ নভেম্বর—লিবিয়াতে (পশ্চিম মরুভূমি) অষ্টম বাহিনীর অভিযান আরম্ভ।

১৯ নভেম্বর—জার্মানীর দখলে রষ্টোভ বন্দর।

২৯ নভেম্বর—রুশ কর্তৃক রষ্টোভ পুনর্দখল।

৬ ডিসেম্বর—মস্কোতে রুশ বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ।

৭ ডিসেম্বর—জাপান কর্তৃক পার্লহারবার আক্রমণ

—প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের আরম্ভ।

৮ ডিসেম্বর—জাপানের বিরুদ্ধে বৃটেন ও আমেরিকার যুদ্ধ ঘোষণা।

—গুয়াম, মিডওয়ে, ফিলিপিন্স, হংকং ও মালয়ে জাপানী বোমারু আক্রমণ।

৯ ডিসেম্বর—লুজনে জাপানীদের অবতরণ

—রুশদের টিকভিন দখল এবং লেনিনগ্রাদের আত্মরক্ষা।

১০ ডিসেম্বর—বৃটেনের বিখ্যাত যুদ্ধজাহাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ জাপানীদের আক্রমণে নিমজ্জিত।

১০-১১ ডিসেম্বর—জার্মানী ও ইটালী কর্তৃক আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং মার্কিন কর্তৃক পাল্টা ঘোষণা।

২৪ ডিসেম্বর—বৃটিশ কর্তৃক বেঙ্গাজী পুনর্দখল।

২৫ ডিসেম্বর—হংকংয়ের আত্মসমর্পণ।

১৯৪২—

১লা জানুয়ারী—২৬টি জাতি কর্তৃক ইউনাইটেড নেশন্স এর ঘোষণা স্বাক্ষর।

১০ জানুয়ারী—জাপান কর্তৃক ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ।

২১ জানুয়ারী—উত্তর আফ্রিকার পশ্চিম মরুভূমিতে জার্মানীর পাল্টা অভিযান।

২৮ জানুয়ারী—জার্মানী কর্তৃক বেঙ্গাজী পুনর্দখল।

১৫ ফেব্রুয়ারী—জাপানীদের নিকট সিঙ্গাপুরের আত্মসমর্পণ।

১০ মার্চ—রেঙ্গুনের পতন।

৯ এপ্রিল—বাতানের আত্মসমর্পণ।

১ মে—মান্দালয়ের পতন।

৬ মে—কোরিজিডরের আত্মসমর্পণ।

২৭ মে—খারকোভ অঞ্চলে রুশ পাল্টা আক্রমণের জবাবে জার্মানীর পাল্টা-আক্রমণ ও রুশদের পরাজয়।

২৬ মে—মলোটোভ কর্তৃক লণ্ডনে ইঙ্গ-সোভিয়েত মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষর এবং ওয়াশিংটনে গমন।

—পশ্চিম মরুভূমিতে রোমেলের পুনরায় অভিযান শুরু।

৩০ মে—কলোনে হাজার বৃটিশ বোমারুর হানা।

৩ জুন—মিডওয়ে দ্বীপের যুদ্ধারম্ভ।

১১ জুন—দ্বিতীয় রণাঙ্গন সংক্রান্ত ইস্তাহার প্রকাশ।

১৭ জুন—বৃটিশের মিশর সীমানা পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ।

২১ জুন—রোমেল কর্তৃক তোব্রুক দখল।

২৫-২৭ জুন—চার্চিল-রুজভেল্টের মধ্যে দ্বিতীয় ওয়াশিংটন সম্মেলন।

২৮ জুন—অষ্টম বাহিনীর এল আলামিনে পশ্চাদপসরণ।

—দক্ষিণ রাশিয়ায় জার্মানীর প্রচণ্ড অভিযান আরম্ভ।

৩ জুলাই—সেবাস্তোপোলের পতন।

২৮ জুলাই—জার্মানদের রষ্টোভ পুনর্দখল।

৩০ জুলাই—'আর এক পা পিছু হটা চলবে না'—লালফৌজের প্রতি ষ্ট্যালিনের কড়া নির্দেশ।

৭ আগষ্ট—গুয়াদাল ক্যানেলে মার্কিনীদের অবতরণ।

১২-১৫ আগষ্ট—মস্কোতে চার্চিল-হ্যারিম্যান ও ষ্ট্যালিনের বৈঠক।

১৯ আগষ্ট—ডিয়েপ'পে হানা।

২৩ আগষ্ট—ব্যূহ ভেদপূর্বক জার্মানদের ষ্ট্যালিনগ্রাদের উত্তরে প্রবেশ।

—ষ্ট্যালিনগ্রাদে জার্মান বিমান আক্রমণে ৪০ হাজার নিহত।

২৫ আগষ্ট—গ্রোজনী ও বাকু তৈলখনির পথে জার্মান অগ্রগতি রুদ্ধ।

৩ সেপ্টেম্বর—ভলগার তীরে দক্ষিণ ষ্ট্যালিনগ্রাদে জার্মানদের প্রবেশ।

২৪ সেপ্টেম্বর—মধ্য ষ্ট্যালিনগ্রাদের অধিকাংশ জার্মানদের দখলে।

২৩ অক্টোবর—এল আলামিনের যুদ্ধ আরম্ভ—মণ্টগোমারীর আক্রমণ রোমেলের বিরুদ্ধে।

৪ নভেম্বর—রোমেল কর্তৃক পূর্ণ পশ্চাদপসরণ

৮ নভেম্বর—ইঙ্গ-মার্কিন মিত্র বাহিনীর ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় অবতরণ।

১৯ নভেম্বর—ষ্ট্যালিনগ্রাদে লালফৌজের পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ।

২২ নভেম্বর—তিন লক্ষাধিক জার্মান সৈন্য ষ্ট্যালিনগ্রাদে বেষ্টিত।

১২-২৩ ডিসেম্বর—ষ্ট্যালিনগ্রাদের অবরুদ্ধ জার্মানবাহিনীর ত্রাণের জন্য জেনারেল ম্যানষ্টাইনের ব্যর্থ আক্রমণ।

২১ ডিসেম্বর—অষ্টম বাহিনীর বেনগাজী দখল।

২৪ ডিসেম্বর—উত্তর আফ্রিকার ফরাসী প্রধান রাষ্ট্রনায়ক এ্যাডমিরাল দারলাঁ আততায়ীর হস্তে নিহত।

১৯৪৩

২ জানুয়ারী—জার্মান বাহিনীর ককেশাস পরিত্যাগ শুরু।

১৪ জানুয়ারী—ক্যাসাব্লাঙ্কা সম্মেলন (চার্চিল-রুজভেল্ট) আরম্ভ—২৩ শেষ। —জেনারেল ছ্যগলের শক্তি সঞ্চয়।

২৩ জানুয়ারী—অষ্টম বাহিনীর ত্রিপোলি প্রবেশ।

৩১ জানুয়ারী—ষ্ট্যালিনগ্রাদে ফন্ পাউলাসের আত্মসমর্পণ।

২ ফেব্রুয়ারী—ষ্ট্যালিনগ্রাদে জার্মানবাহিনীর চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ—যুদ্ধের মোড় পরিবর্তন।

৮-১৬ ফেব্রুয়ারী—কুরস্ক, রষ্টোভ ও খারকোভ পুনরায় রুশ দখলে

৯ ফেব্রুয়ারী—জার্মানীর কিয়েল বন্দর থেকে সুভাষচন্দ্র বসুর সাবমেরিন যোগে জাপান যাত্রা এবং তিন মাস পরে সুদূর প্রাচ্যে উপস্থিতি।

২ মার্চ—বিসমার্ক সাগরের যুদ্ধ।

১৫ মার্চ—জার্মানদের খারকোভ পুনর্দখল।

২০ এপ্রিল—ওয়ারশ ঘেটোর হত্যাকাণ্ড।

২৬ এপ্রিল—কাটিয়ান অরণ্যের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে রুশদের বিরুদ্ধে অভিযোগের জন্য লণ্ডন পোলদের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন।

৭ মে—মিত্র বাহিনী কর্তৃক তিউনিস ও বিজার্টা দখল।

১১ মে—চার্চিল-রুজভেল্টের তৃতীয় ওয়াশিংটন সম্মেলন।

১২ মে—তিউনিসিয়ায় জার্মানবাহিনীর আত্মসমর্পণ।

২২ মে—ষ্ট্যালিন কর্তৃক কমিণ্টার্ন (তৃতীয় আন্তর্জাতিক) ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা।

৪ জুলাই—বিপ্লবী রাসবিহারী বসু কর্তৃক সিঙ্গাপুরে সুভাষচন্দ্র বসুর হাতে আই-এন-এর ভার অর্পণ।

৫ জুলাই—কুরস্কের যুদ্ধারম্ভ।

১০ জুলাই—মিত্রবাহিনীর সিসিলি দ্বীপ আক্রমণ।

১২-১৫ জুলাই—ওরেল স্ফীতিমুখে রুশদের পাল্টা আক্রমণ।

২৫ জুলাই—মুসোলিনীর পদচ্যুতি ও গ্রেপ্তার।

৫ আগষ্ট—রাশিয়ানদের ওরেল এবং বেলগোরোদ দখল।

১৭—২৪ আগষ্ট—প্রথম কোয়েবেক সম্মেলন।

২৩ আগষ্ট—রুশদের খারকোভ পুনর্দখল।

৩ সেপ্টেম্বর—মিত্রবাহিনীর দক্ষিণ ইতালী আক্রমণ।

৮ সেপ্টেম্বর—ইতালীর আত্মসমর্পণ।

৯ সেপ্টেম্বর—স্যালারনোতে মিত্রবাহিনীর অবতরণ।

১০ সেপ্টেম্বর—জার্মানীর রোম দখল।

২৫ সেপ্টেম্বর—রুশদের স্মলেনস্ক দখল।

৩০ সেপ্টেম্বর—মিত্রবাহিনীর নেপলস দখল।

১৩ অক্টোবর—ইতালী কর্তৃক জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

১৮ অক্টোবর—মস্কোতে ইঙ্গ মার্কিন-রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন আরম্ভ।
১৯ অক্টোবর—ইতালীর ভলটার্নো নদী থেকে জার্মানদের পশ্চাদপসরণ।
২১ অক্টোবর—সিঙ্গাপুরে নেতাজী সুভাষ কর্তৃক অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা।
১ নভেম্বর—সলোমোন দ্বীপের বুগেনভিলে মার্কিনদের অবতরণ।
৬ নভেম্বর—রাশিয়ানদের কিয়েভ পুনর্দখল।
২২-২৬ নভেম্বর—প্রথম কায়রো সম্মেলন—চার্চিল-রুজভেল্ট-চিয়াংকাইসেকের মিলন।
২৮ নভেম্বর-.০ ডিসেম্বর—তেহরান সম্মেলন—রুজভেল্ট-ষ্ট্যালিন-চার্চিল শীর্ষ বৈঠক।
৪ ৬ ডিসেম্বর—দ্বিতীয় কায়রো সম্মেলন—রুজভেল্ট চার্চিল-ইনোমু
২৬ ডিসেম্বর—নাৎসী যুদ্ধজাহাজ শার্নহোর্ষ্ট নরওয়ের সমুদ্রে নিমজ্জিত।

১৯৪৪

৪ জানুয়ারী—ইতালীতে ক্যাসিনোর পূর্বে পঞ্চম আর্মির আক্রমণ।
২২ জানুয়ারী—আঞ্জিওতে জার্মান সৈন্যদের পিছনে মিত্রসৈন্যদের অবতরণ।
২৭ জানুয়ারী—লেনিনগ্রাদের অবরোধ সম্পূর্ণ মুক্ত।
৪ ফেব্রুয়ারী—আজাদ হিন্দ ফৌজের আরাকান দখল।
৪ মার্চ—উক্রাইনে রুশ অভিযান আরম্ভ।
২ এপ্রিল—রুশদের রুমানিয়া প্রবেশ।
৮-১৪ এপ্রিল—কোহিমা ও ময়রাং আজাদ হিন্দ ফৌজ কর্তৃক দখল।
২০ এপ্রিল—আজাদ হিন্দ ফৌজের হাতে ইম্ফলের পতন শেষ মুহূর্তে ব্যর্থ।
৯ মে—সেবাস্তোপোল পুর্নদখল।
১৮ মে—ক্যাসিনো দখল।
২৩ মে—আঞ্জিও থেকে মিত্রবাহিনীর আক্রমণ আরম্ভ।
৪ জুন—ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর দখলে রোম।
৬ জুন—নরম্যাণ্ডিতে মিত্রবাহিনীর অবতরণ—পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গণ।
১০ জুন—ফিনল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে রুশদের অভিযান
১৩ জুন—লণ্ডনে প্রথম উড়ন্ত বোমার (ভি-১) আক্রমণ।
১৫ জুন—জাপানের উপর প্রথম মার্কিন অতিকায় বোমারু আক্রমণ
১৯ জুন—মার্কিন দখলে সাইপান দ্বীপ।
২০ জুন—ভীবোর্গ রুশদের দখলে।
২৩ জুন—বেলোরুশিয়ায় রুশদের অভিযান আরম্ভ।
২৭ জুন—শেরবুর্গ বন্দর মিত্রপক্ষের দখলে।
৩ জুলাই—মিনস্ক পুনর্দখল—১ লক্ষ জার্মান সৈন্য বন্দী।
১৮ জুলাই—রোকোসোভস্কির বাহিনী কর্তৃক পোল্যাণ্ডে প্রবেশ—পিসকোভ দখল।
২০ জুলাই—হিটলারকে হত্যার চূড়ান্ত চেষ্টা—বোমা বিস্ফোরণের দ্বারা হিটলার আহত। অল্পের জন্য প্রাণরক্ষা।

২৩ জুলাই—লুবলিন দখল।
২৮ জুলাই—ব্রেষ্ট-লিটোভস্ক পুনর্দখল।
৩১ জুলাই—ওয়ারশ'র প্রবেশমুখে রুশসৈন্য।
১ আগষ্ট—ওয়ারশ' অভ্যুত্থানের আরম্ভ।
১৫ আগষ্ট—দক্ষিণ ফ্রান্সে মিত্রবাহিনীর অবতরণ।
২৩ আগষ্ট—রুমানিয়া কর্তৃক রুশ যুদ্ধবিরতির চুক্তি গ্রহণ।
২৫ আগষ্ট—প্যারিসের মুক্তি।
৩ সেপ্টেম্বর—বৃটিশ কর্তৃক ব্রুসেলস দখল।
৪ সেপ্টেম্বর—রুশ-ফিনিশ যুদ্ধবিরতি—এন্টোয়ার্পের মুক্তি।
৫ সেপ্টেম্বর—বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা।
৬ সেপ্টেম্বর—প্রথম 'ভি-২' (উড়ন্ত বোমা) লণ্ডনে বর্ষণ।
৯ সেপ্টেম্বর—বুলগেরিয়ার যুদ্ধবিরতি।
১০ সেপ্টেম্বর—রুশ-ফিনিশ যুদ্ধবিরতি—দ্বিতীয় কোয়েবেক সম্মেলন—চার্চিল-রুজভেল্ট।
১২ সেপ্টেম্বর—রুমানিয়ার যুদ্ধবিরতি।
১৭ সেপ্টেম্বর—আর্নহেমের যুদ্ধ—মিত্র বিমানসৈন্যের হল্যাণ্ডে অবতরণ।
২৯ সপ্টেম্বর—রুশদের যুগোশ্লাভিয়া প্রবেশ।
২ অক্টোবর—ওয়ারশ' এর আণ্ডারগ্রাউণ্ড সৈন্যদের আত্মসমর্পণ।
৯ অক্টোবর—মস্কোতে ইডেন-চার্চিল-ষ্ট্যালিন বৈঠক।
১৪ অক্টোবর—মিত্রবাহিনীর এথেন্স দখল।
১৯ অক্টোবর—আমেরিকানদের ফিলিপিন্সে অবতরণ।
২০ অক্টোবর—রুশ ও যুগোশ্লাভদের বেলগ্রেডে প্রবেশ।
২১ অক্টোবর—লেতি উপসাগরের যুদ্ধ।
১২ নভেম্বর—জার্মান যুদ্ধজাহাজ তিরপিৎস নিমজ্জিত।
২৪ নভেম্বর—ষ্ট্রাসবুর্গ দখল।
২ ডিসেম্বর—মস্কোতে দ্য গল।
১৬ ডিসেম্বর—আর্দেনেস পার্বত্য অঞ্চলে হিটলারী পাল্টা আক্রমণ—স্ফীতি-মুখের যুদ্ধ।
১৮ ডিসেম্বর—উত্তর বার্মা জাপানীদের কবলমুক্ত।
২৭ ডিসেম্বর—সালফৌজের বুদাপেষ্ট বেষ্টন।

১৯৪৫

৩ জানুয়ারী—আর্দেনেস অঞ্চলে আমেরিকানদের পাল্টা আক্রমণ।
১৭ জানুয়ারী—রুশদের ওয়ারশ' দখল।
২০ জানুয়ারী—হাঙ্গেরীর অস্থায়ী সরকার কর্তৃক যুদ্ধবিরতি।
২৩ জানুয়ারী—সালফৌজের ওডের নদীতীরে উপস্থিতি।
৩১ জানুয়ারী—মাল্টাতে চার্চিল-রুজভেল্ট।
৪ ফেব্রুয়ারী—ইয়াল্টাতে ষ্ট্যালিন-চার্চিল-রুজভেল্ট শীর্ষ বৈঠক শুরু।

৫ ফেব্রুয়ারী- আমেরিকানদের ম্যানিলা দখল—রাইন নদীর দিকে মিত্রবাহিনীর অগ্রগতি।

১৩ ফেব্রুয়ারী—বুদাপেষ্টের পতন

১৯ ফেব্রুয়ারী—আমেরিকানদের আইওজিমায় অবতরণ।

২৩ ফেব্রুয়ারী - পোজনান দখল।

৪ মার্চ—ফিনল্যান্ড কর্তৃক পাল্টা জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

৭ মার্চ—প্রথম মার্কিন বাহিনীর রেমাজন ব্রীজ দিয়া রাইন নদী অতিক্রম।

২৩ মার্চ - মিত্রপক্ষের রাইন নদী অতিক্রম।

২৯ মার্চ—রুশদের অষ্ট্রিয়ান সীমান্ত প্রবেশ।

১ এপ্রিল—আমেরিকানদের ওকিনাওয়া আক্রমণ।

১২ এপ্রিল—প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মৃত্যু।

১৬ এপ্রিল—লালফৌজ কর্তৃক বার্লিনের দিকে চূড়ান্ত অভিযান

১৯ এপ্রিল—আমেরিকানদের হাতে লাইপ্‌জিগ।

২৩ এপ্রিল—লালফৌজের বার্লিনে প্রবেশ।

২৭ এপ্রিল—জেনোয়া ও ভেরোনার পতন—টরগাউতে মার্কিন-রুশবাহিনীর মিলন।

২৮ এপ্রিল—পার্টিজানদের হাতে মুসোলিনী ও তাঁর প্রণয়িনী ধৃত এবং গুলিতে নিহত।

৩০ এপ্রিল—বার্লিনের ভূগর্ভের আশ্রয়ে হিটলার ও ইভা ব্রাউনের আত্মহত্যা——রাইখষ্ট্যাগের (বার্লিন) উপর লালফৌজের জয় পতাকা উত্তোলন।

১ মে—গ্রাণ্ড এ্যাডমিরাল ডোয়েনিৎস কর্তৃক জার্মানীর দায়িত্ব গ্রহণ।

২ মে—রুশদের হাতে বার্লিনের পতন—মিত্রপক্ষের নিকট ইতালীর সমগ্র জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণ।

৩ মে—মিত্রবাহিনীর রেঙ্গুন দখল।

৭ মে—রেইমসে আইজেনহাওয়ারের সদর দপ্তরে জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণ।

৮ মে—বার্লিনে মার্শাল ঝুকোভের সদর দপ্তরে মার্শাল কাইটেল কর্তৃক জার্মানীর আত্মসমর্পণ দলিল স্বাক্ষর।

৯ মে—সোভিয়েত বিজয় দিবস উদ্‌যাপন।

২১ মে—ওকিনাওয়ার পতন।

২৬ জুন—স্যান ফ্রান্সিস্কোতে বিশ্ব নিরাপত্তা সনদে স্বাক্ষর।

২১ জুলাই-২ আগষ্ট—পটসডাম সম্মেলন (ট্রুম্যান, ষ্ট্যালিন, চার্চিল এবং এ্যাটলি)

৬ আগষ্ট—হিরোশিমাতে প্রথম এ্যাটোমিক বা পারমাণবিক বোমা বর্ষণ।

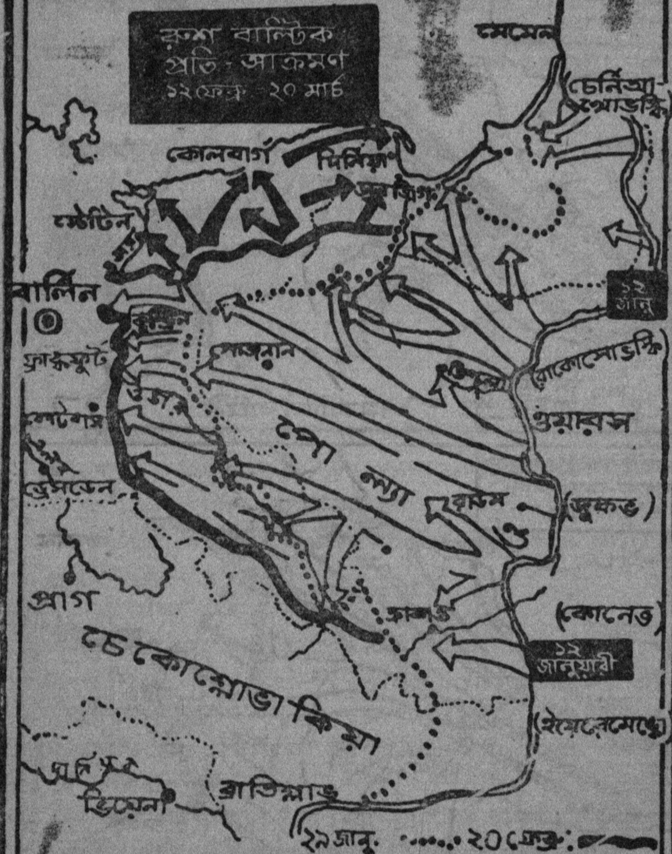
৮ আগষ্ট—সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

৯ আগষ্ট—নাগাসাকিতে দ্বিতীয় এ্যাটমবোমাবিস্ফোরণ—মাঞ্চুরিয়াতে রুশআক্রমণ।

১৪ আগষ্ট—জাপান কর্তৃক বিনাশর্তে আত্মসমর্পণে সম্মতি।

১৮ আগষ্ট—তাইহাকুতে (ফরমোজা) বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যুসংবাদ প্রচার।

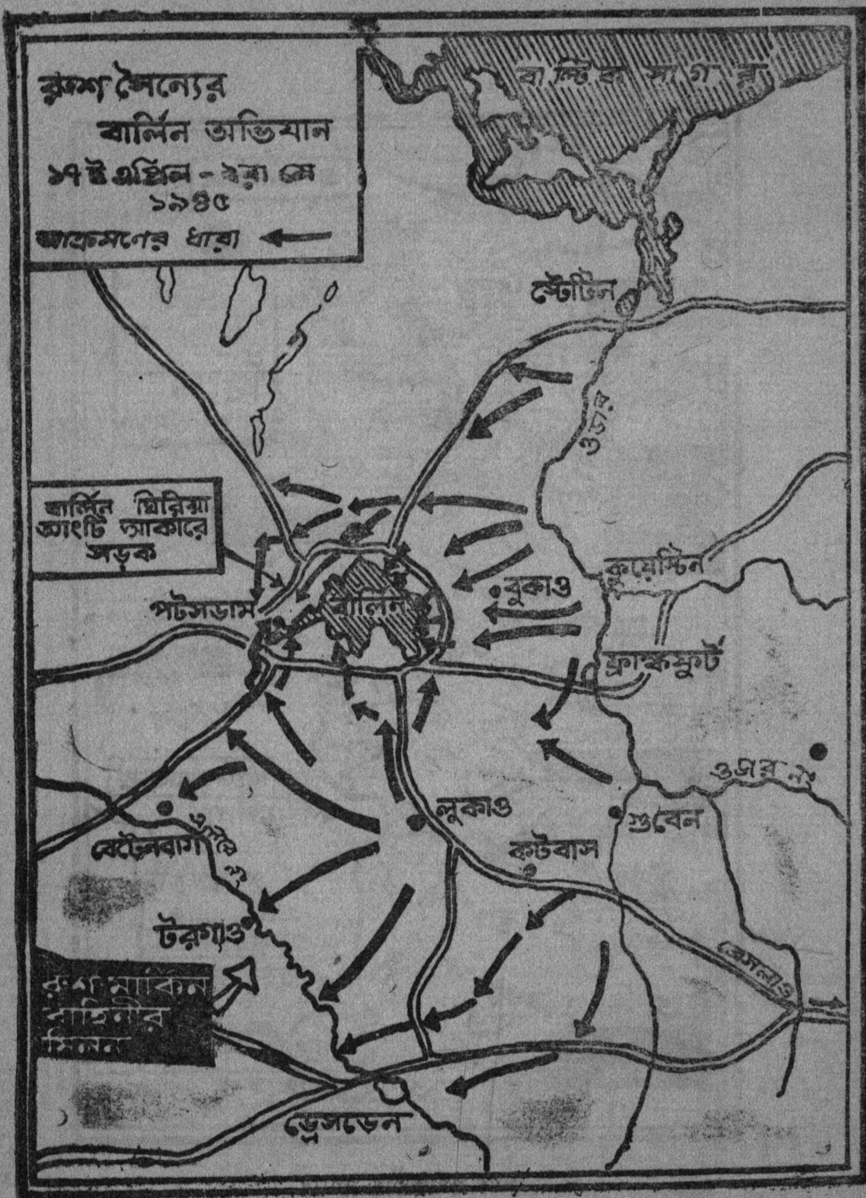
২ সেপ্টেম্বর—টোকিও উপসাগরে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ মিশৌরিতে জাপান কর্তৃক আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান।



পোল্যাণ্ডের মুক্তি ও জার্মানির দিকে আক্রমণ - ১৯৪৫

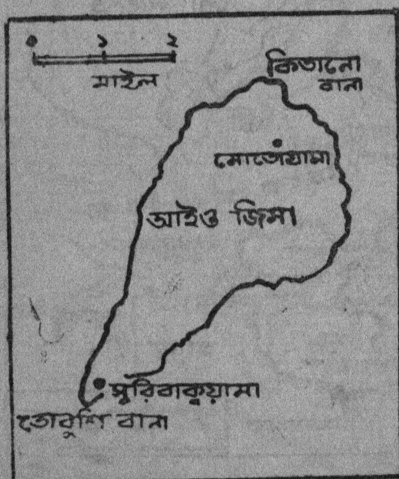


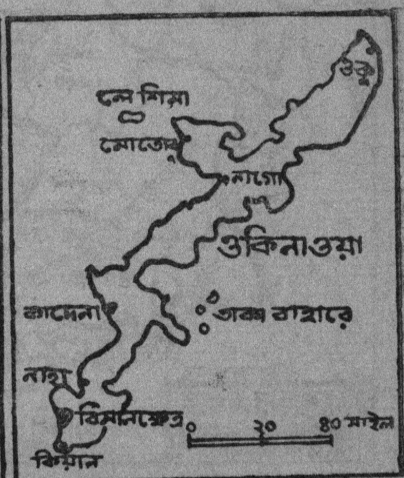
নবম পর্ব/তৃতীয় অধ্যায়


রুশ সৈন্যের
বার্লিন অভিযান
১৭ই এপ্রিল - ২রা মে
১৯৪৫
আক্রমণের ধারা
বাল্টিক সাগর
স্টেটিন
ওডার
বার্লিন ঘিরিয়া আংটি আকারে সড়ক
পটসডাম
বার্লিন
বুকাও
কুয়েস্টিন
ফ্রাঙ্কফুর্ট
গুবেন
লুকাও
কটবাস
টরগাও
রুশ মার্কিন বাহিনীর মিলন
ড্রেসডেন



নবম পর্ব / অষ্টম অধ্যায়





দশম পর্ব / চতুর্থ অধ্যায়

পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের রণনীতি

মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় আক্রমণ
দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় আক্রমণ
জাপানের আত্মরক্ষার বহির্বৃত্ত
জাপানের আত্মরক্ষার অন্তর্বৃত্ত
জাপান
টোকিও
সাংহাই
ফরমোসা
হংকং
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ
মারিয়ানা
গুয়াম
মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ
ক্যারোলিন দ্বীপপুঞ্জ
গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জ
হাওয়াই দ্বী.পু.
পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর
নিউ আয়ার্ল্যান্ড
নিউ গিনি
নিউ ব্রিটেন
ফোনিক্স দ্বী.পু.
প্রবাল সাগর
সামোয়া
ফিজি দ্বী.পু
জাভা
টিমোর
ভারত মহাসাগর
অস্ট্রেলিয়া

জাপান
হিরোশিমা ও
নাগাশাকি

দশম পর্ব / পঞ্চম অধ্যায়

নির্দেশিকা

স্থানাভাবের জন্য বিস্তৃত নির্দেশিকা দেওয়া হয় নাই
কেবল প্রধান বিষয় ও নামের উল্লেখ করা হইয়াছে।